সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একবিংশ ভাগ

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২১

একবিংশ ভাগের সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রায় দুই হাজার পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন কি, অনেক স্থলে বিষয়-বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সূচক শিরোনাম সহ পদ-কল্প-তরুর শতাধিক পদ পদ-রস-সারের কোন কোন স্থলে একই পর্য্যায় অনুসারে উদ্ধৃত হইয়াছে; সুতরাং এই পুথিখানার নাম পদ-রস-সার হইলেও ইহা যে পদ-কল্প-তরুরই একটি পরিবর্ত্তিত সংস্করণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; তবে পদ-কল্প-তরুর স্থায় ইহাতে চারিটি শাখা ও প্রত্যেক শাখায় কতকগুলি করিয়া পল্লব ধরিয়া পদাবলী সজ্জিত না করিয়া, নিমানন্দ দাস সমস্ত পদগুলিকে চতুঃষষ্টিটি রস বা বিষয়ে বিভক্ত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের উপসংহারে বৈষ্ণবদাসের রচিত নিবেদনাত্মক পয়ারগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া—

"আরে মোর আরে মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
কৃপা করি কর তোমার উচ্ছিষ্টের কুকুর॥
দন্তে তৃণ ধরি করি শ্রীচরণে আশ।
পদ-রস-সার কহে নিমানন্দ দাস॥"

বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থখানা যদি কেবল পদ-কল্পতরুরই অন্যতম পুথি হইত, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অন্য বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের যে তিনটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় "পদ-রস-সার" বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর আলোচনায় এক যুগান্তর আনয়ন করিবে।

পদ-রস-সারের ত্রিবিধ বিশেষত্ব

পদ-রস-সারের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাতে আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের বহুতর উৎকৃষ্ট অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, উহার সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ দাসকে লইয়া উহাতে কুড়ি জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পদকর্ত্তার বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে নিমানন্দ দাসের রচিত পদের সংখ্যাই প্রায় দেড় শত হইবে। উহার তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, নিমানন্দ দাস নিজে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন; সেই জন্যই আমরা তাঁহার গ্রন্থের সহিত পদ-কল্প-তরুর প্রায় দুই সহস্র অভিন্ন পদাবলীর পাঠের তুলনা করিয়া উহাতে বহুতর সন্দিগ্ধ স্থলের সমীচীন পাঠ ও বহুতর খণ্ডিত পদের ভণিতাযুক্ত শেষাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ত্রিবিধ বিশেষত্বের বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রত্যেক বিশেষত্বের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে নিমানন্দ দাসের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

নিমানন্দদাসের বিবরণ

নিমানন্দ দাসের দেশ, কাল ও সমাজ সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই পুথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, তাঁহার খুল্ল-পিতামহ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে উহার আদর্শ পুথিখানা

প্রাপ্ত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গগত রামকুমার গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা বাঙ্গালা ১২৭১ সালে উহা নকল করাইয়া রাখেন। আদর্শ পুথিখানা না কি তৎপরে গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনধামে উহার আদর্শ পুথি কাহারও নিকট আছে কি না, আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থের চতুর্থ রসের প্রথম পদটিতে নিমানন্দ দাস শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বোধনে বলিয়াছেন,—

"ইহ ত্রিজগত ভরি সব তুহু জানসি
নাহি ভজন মোর লেশ।
ইহ ভব-সাগর কৈছে হাম পারব
কহবি এহি উপদেশ॥

* * * *

বিষয় ছোড়ি হাম তুরিতহি আয়লু
তুহু জানি দুখিয়া পরান।
ইহ যুগ নাথ তুহু অব জিতলি
নিমানন্দ দাস গুণ গান॥"

ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রায়শঃ শ্রীবৃন্দাবনধাম কিংবা শ্রীধাম নবদ্বীপেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং বৃন্দাবন হইতে পদ-রস-সারের আদর্শ পুথির প্রাপ্তি ও উদ্ধৃত উক্তি—এই উভয়বিধ কারণেই নিমানন্দদাস শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করা কালে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইহাই অনুমান হয়। এই অনুমানের পোষকতায় ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির বহুসংখ্যক অভিনব পদাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কেন না, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তি-রত্নাকর" পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনের তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের অগ্রণী শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মহোদয় গোবিন্দদাসের অপূর্ব্ব কবিত্ব-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উক্ত গোস্বামি-প্রবরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গোবিন্দ কবিরাজ যখন যে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন, উহার অনুলিপি শ্রীজীব গোস্বামীর দৃষ্টির জন্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, এইরূপে জ্ঞানদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিগণের অন্যত্র বিলুপ্তপ্রায় বহুসংখ্যক পদাবলী শ্রীবৃন্দাবনে নীত ও বৈষ্ণব ভক্তগণের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। নিমানন্দদাস বোধ হয়, সেই জন্যই বৃন্দাবনে থাকিয়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের বহুতর অভিনব পদের সহিত এক গোবিন্দদাসেরই প্রায় এক শত নূতন পদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নিমানন্দ দাসের জন্মকাল নিশ্চিত না জানিতে পারিলেও তিনি যে দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। রাধামোহন

ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থের অনুশীলন করিয়াই যে বৈষ্ণবদাস তাঁহার সুবৃহত্তর পদাবলী-সঙ্কলনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা পদ-কল্প-তরুর শেষে—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে বলিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥"

ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নিমানন্দ দাস যে পদ-কল্প-তরু গ্রন্থ অবলম্বনেই তাঁহার পদ-রস-সার গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব তিনি যে বৈষ্ণবদাসেরও পরবর্ত্তী এবং তজ্জন্য দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইতে পারেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়, বৈষ্ণবদাসের অজ্ঞাত আরও ২৩ জন পদকর্ত্তার রচিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে শশিশেখর, কানাই ও তুলসীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ বটতলার মুদ্রিত পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের নাম শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিগণের তালিকায় স্থান পাইয়াছে; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও ২০ জন পদকর্ত্তার নাম এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাঁহাদিগের উল্লেখ করিব।

নিমানন্দ দাস তাঁহার গ্রন্থের অষ্টম রসের ত্রয়োদশ-সংখ্যক পদের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—

"নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ
মজিল দুহার চিত।"

এই পদাংশ-দর্শনে তিনি দ্বিজবংশোদ্ভব এবং বংশীদাস কিংবা বংশীবদনের অনুজ ছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে। আমরা পদ-রস-সার গ্রন্থে বংশীদাস ও বংশীবদনের ভণিতাযুক্ত এরূপ অনেক নূতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার সহিত পদ-কল্প-তরুর উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বংশীদাসের রচনার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং আমরা এই পদগুলিকে পরবর্ত্তী অন্য কোন বংশীদাসের রচিত বলিয়াই অনুমান করি। নিমানন্দ দাস যে ভাবে নিজের নামের সহিত অগ্রজ বংশীদাসের নাম সংযুক্ত করিয়া,—"মজিল দোহার চিত" বাক্য-দ্বারা উভয় ভ্রাতার তুল্য-প্রেমিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এই পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা বংশীদাস নিমানন্দের অগ্রজ হওয়াও বিচিত্র নহে। তথাপি বিশেষ প্রমাণাভাবে আমরা এই দ্বিতীয় বংশীদাসের নাম অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদিগের তালিকাভুক্ত করা সঙ্গত মনে করি নাই।

পদ-রস-সার গ্রন্থের "সর্ব্বকালোচিত নিত্যরাস" নামক একচত্বারিংশ রসের ৮৯ সংখ্যক পদের ভণিতাটিও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য; উহাতে "সাবিত্রী" নাম্নী জনৈক মহিলার নাম যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ "সাবিত্রী" নিমানন্দ দাসের কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া

ছিলেন, এবং নিমানন্দের পূর্ব্বেই তাঁহার "কৃষ্ণ-প্রাপ্তি" অর্থাৎ মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। আমরা সম্পূর্ণ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্যামের মুরলি শুনিতে পাই।
পিছু না গুণয়ে ধাইয়া জাই॥
কারু পতি দেখি রাখিল বান্ধি।
জাইতে না পারে মরয়ে কান্দি॥
সোঙরি শ্যামের পিরিতি লেহ।
তখনি ছাড়িল আপন দেহ॥
গুণময় দেহ তেজিয়া তবে।
শ্যামচান্দ আগে পাইল সভে॥
সকল গোপিনী হইয়া সুখী।
এ বড় কৌশল দেখ না সখি॥
ইহাদের পতি বান্ধিয়া থুইল।
কেমন করিয়া গোবিন্দ পাইল॥
নিমানন্দ দাস বলিছে তায়।
সাবিত্রা পাইল এ শ্যাম রায়॥'

নিমানন্দ দাসের অনেকগুলি পদ শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে; উদ্ধৃত পদটি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। নিমানন্দ দাসের এই বিরাট সংগ্রহে তাঁহার স্বরচিত যে ১৪৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল পদের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা নিমানন্দ দাসকে পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থপ্রণেতা রাধামোহন ঠাকুরের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা না করিলেও কবিত্ব হিসাবে তাঁহাকে "পদকল্পতরু"-গ্রন্থকার বৈষ্ণবদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিমানন্দ দাস নানা বিষয়েই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার—

"ব্রজপুর-নাগর বিপিনে জাই পৈঠল
পূরত বংশী নিসান।
ধ্বনি শুনি ধাই রাই তহি উপনীত
যাহা রসিকবর কান॥" ইত্যাদি

এবং— "মাথহি মুকুট মত্ত শিখি-চন্দ্রক
হীলত মন্দ মধুর মৃদু বায়।
মল্লিকা মালতী মাধবী মঞ্জুল
মধুকর মধুলোভে উড়ি পড়ু তায়॥"

ইত্যাদি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলিত হইবার

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

নিমানন্দ দাসের "পদ-রস-সার"*

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা বৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত "পদ-কল্প-তরু" নামক সুবৃহৎ পদাবলীগ্রন্থের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন হস্তলিখিত আদর্শ পুথির প্রাপ্তিতে একরূপ হতাশ হইয়াই আমাদিগকে "পদামৃতসমুদ্র", "পদ-কল্প-তরু" প্রভৃতি গ্রন্থের মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনে যথাসাধ্য গ্রন্থ-শোধন করিতে হইয়াছিল।

ভূমিকা

পদ-কল্প-তরুর মুদ্রণ-কার্য্য অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয় প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত উদারতাবশতঃ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে পাঠ-তুলনা করার জন্য পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের দুইখানি হস্তলিখিত পুথি প্রদান করেন। আমরা বৎসরাধিক কাল একরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঐ হস্তলিখিত পুথির সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ-তুলনা করিয়া রাশি রাশি অনৈক্য দেখিতে পাইলেও তৎসময়ে পদ-কল্পতরু গ্রন্থের অধিকাংশ মুদ্রিত হওয়ায় প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে পাঠভেদগুলি সন্নিবেশিত করিতে না পারিয়া, গ্রন্থের পরিশিষ্টে পদাবলীর শব্দ-কোষ, দুরূহ বাক্যাবলীর টীকা ও পাঠ-ভেদসম্বন্ধীয় বিচার সহ পাঠভেদগুলি মুদ্রিত করার বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ শেষ করিয়া পরিশিষ্টের সামান্য কিয়দংশ মুদ্রিত করার পরেই দারুণ দৈবপ্রতি-বন্ধকতায় উহার মুদ্রাঙ্কন স্থগিত করিতে বাধ্য হই। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া আমরা পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের একটি সংশোধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির পাঠের তুলনা, সন্দিগ্ধ পাঠের বিচার, পদাবলীর দুরূহ শব্দের কোষ-সঙ্কলন ও দুরূহ বাক্যাবলীর অর্থ-নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণবশতঃ এ যাবৎ উহার একটি সংশোধিত সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির একান্ত প্রয়ো-জনীয়তা প্রমাণিত করার জন্যই ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলির পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে (ক) ও (খ) নামাঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর কতকগুলি হাস্যজনক অশুদ্ধ

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

পাঠের সংশোধন করিয়া ঐ (ক) ও (খ) চিহ্নিত পুথির বিস্তৃত পরিচয়সহ ঐরূপ পাঠ-বিভ্রাটের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং তৎপরে পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৬, ১৩১৮ ও ১৩২০ সালের প্রত্যেকটির ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক ক্রমিক প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছি। পরিষৎ-পত্রিকার শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীর মুদ্রিত পুস্তকের বহুতর অশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ-বিকৃতির সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। পদ-কল্প-তরুর পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে মুদ্রিত গ্রন্থের অধিকাংশ অশুদ্ধির শোধন ও সন্দিগ্ধ স্থলের সুমীমাংসা সম্ভবপর হইয়া থাকিলেও অনেক সন্দিগ্ধ স্থলের সন্তোষজনক পাঠ ও অনেক অসম্পূর্ণ পদের অবশিষ্ট অংশ এ যাবৎ প্রাপ্ত না হওয়ায় আমরা পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের আরও হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রায় ২৭০০ শত পদপূর্ণ নিমানন্দ দাসের সঙ্কলিত "পদ-রস-সার" নামক যে সুবৃহৎ পদাবলী-পুস্তকখানা পাবনা জিলার অন্তর্গত পাতিয়াবেড়া, অধুনা ডেমরানিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, উহার সম্বন্ধেই অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পদকল্প-তরুর সহিত এই গ্রন্থখানার সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পদ-কল্প-তরুর প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; তাই আমাদিগের সহিত পদ-কল্প-তরু গ্রন্থ-প্রকাশের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত হইলেও বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ভূমিকায় ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে হইল।

পদ-কল্প-তরু ও পদ-রস-সারের তুলনা

তিন সহস্রের অধিক পদপূর্ণ পদ-কল্প-তরু গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস নিজের রচিত মাত্র পঁচিশটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; ঐ গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ প্রায় দেড় শত পদকর্ত্তার পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর আধুনিক সম্পাদকগণের ন্যায় এক একটি কবির রচিত পদাবলী এক স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া, কীর্ত্তনগায়কগণ যেরূপ পালার আকারে বিভিন্ন পদকর্ত্তাদিগের পদাবলী গান করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবদাসও সেই চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারেই পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি বিষয়-ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্লব বা পালায় পদাবলী সজ্জিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের একটি কিংবা একাধিক পালার সহিত অপর কোন সংগ্রহ-গ্রন্থের একটি কিংবা একাধিক পালায় সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় এবং তাহাতে অন্যান্য পদের সঙ্গে বৈষ্ণবদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলিও উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা হইলে উহা যে বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ কৌতূহলী পাঠক "পদ-রস-সার" গ্রন্থখানা উদ্ঘাটন করিয়া প্রথমেই উহাতে পদ-কল্প তরুর মঙ্গলাচরণের ২৭টি পদ অবিকল সেই পর্য্যায়ে উদ্ধৃত দেখিতে পাইবেন। তৎপরে উহাতে পদ-কল্প-তরুর পূর্ব্বরাগের পরিবর্ত্তে যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি রূপের পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু উভয় গ্রন্থের আদ্যন্ত তুলনা করিয়া আমরা উহাতে পদ-কল্প-তরুর

অযোগ্য নহে; কিন্তু নিমানন্দের এইরূপ পদের সংখ্যা বড় অধিক নহে। নিমানন্দ খাঁটি বাঙ্গালায়ই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাঁহার একটি বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিলাম,—

"চল দেখি জায়া সই চল দেখি জায়া।
দাড়ায়া রৈয়াছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া।
ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরি বাজায়া॥
হরিয়া লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া।
অঙ্গভঙ্গ কৈলে শ্যাম ঈশদ হাসিয়া॥
কালিয়া বরণখানি অঞ্জন জিনিয়া।
হেরি রূপ পুলকিত নিমানন্দের হিয়া॥"

এই "ঝুমরি" গান যে কিরূপ, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সঙ্কীর্ত্তনের গীতের উদ্দীপনাপূর্ণ যে ক্ষুদ্র অংশটি গায়কগণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করত অঙ্গভঙ্গী সহকারে দ্রুতলয়ে গান করিয়া থাকেন, চলিত কথায় তাহাকে "ঝুমর" কহে। বোধ হয়, "ঝুমরি" হইতেই এই "ঝুমর" শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং "ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরি বাজায়া" এই পদাংশের অর্থ এই হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে উদ্দীপনাপূর্ণ কোন সুরাংশ দ্রুতলয়ে বাদন অর্থাৎ সুর-বাঁট করিতেছেন; নতুবা নিজে বাঁশী বাজাইয়া নিজে গান করা একান্তই অসম্ভব বটে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পদ-রস-সার গ্রন্থের "রূপ অভিসারাসুকল্প—ঝুমর" শীর্ষক অধ্যায়টি শুধু নিমানন্দের স্বরচিত যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক পদদ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে, ঐ পদগুলির অধিকাংশেই গীতের সকল চরণে পূর্ব্বোদ্ধৃত ঝুমরির পদের ন্যায় একই অক্ষরের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ঝুমরির পদের ইহাও একটি বিশেষত্ব হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পদ-রস-সার গ্রন্থে আমরা আরও ত্রিবিধ নূতন শ্রেণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছি,—(১) তুক; (২) ছুট; (৩) তৃতীয় শ্রেণীর পদের কোন নাম উল্লিখিত না হইলেও উহাকে গদ্য-পদ বলা যাইতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গগত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন "বঙ্গ-দর্শন" পত্রিকায় "যাত্রা-সমালোচন" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন যাত্রাদলের অধিকারীর "তুক" গানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা প্রথমে "তুকের" উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। সঞ্জীব বাবুর মতে স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত "তুক" গানগুলির প্রায় সমস্ত চরণই গমক-গিট্‌কারি-বর্জ্জিত, শুদ্ধ সুরে কথার মত করিয়া গাহিয়া যাইয়া, গায়ক শেষের চরণটিতে গীতের সমস্ত মধুরতা ঢালিয়া দিতেন। সঞ্জীব বাবুর উদ্ধৃত একটি তুকের চরণগুলি আমাদিগের স্মরণ আছে,—

"সারা বন বুলে বুলে
বনফুল আনিলাম তুলে

তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে
শ্যামের কোমল অঙ্গে বাজিবে বলে।"

আমরা পদ-রস-সার গ্রন্থে যে কয়েকটি সুমধুর "তুক" প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এই লক্ষণাক্রান্ত বটে। আমরা নিম্নে উহার একটি "তুক" উদ্ধৃত করিতেছি;—

"ওরে বাঁশী কেমন কর‍্যা রে॥
কেমন করে বাজ তুমি।
দেখিব নয়নে আমি॥
গোবিন্দ-অধরে থাক।
নাম লইয়া সদা ডাক॥
চারি কড়ার বাঁশী নও।
প্রাণ নিবার কথা কও॥"

"ছুট"শীর্ষক পদগুলিও অনেকটা এই লক্ষণাক্রান্ত; তবে উহাতে পদ্যের অনুযায়ী মাত্রা, যতি ও চরণের শেষের মিল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। মিত্রাক্ষরযুক্ত প্রাচীন পদ্যের নিয়মবহির্ভূত বলিয়াই বোধ হয় এই শ্রেণীর পদাবলী "ছুট" নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটি "ছুটের" পদ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"আরে ও জাদব রায়।
একবার ফির রে॥ ধ্রু॥
গোপাল ধায় আগে আগে।
রাণী ধায় পিছে পিছে॥
আমি বুঝিলাম তোর মনের কথা।
পাসরি গিয়াছ বাধা॥
ফিরে আসি আর বার মায়ের অঞ্চল ধরিল।
তখন রাণী করে ননী দিল
খাইতে খাইতে অমনি চলিল॥
চৌদিগে ব্রজবালক মাঝে মাঝে নাচিতে নাচিতে অমনি চলিল॥"

কিন্তু এই ছুটের পদেও মিত্রাক্ষরপ্রিয় পদকর্ত্তার অজ্ঞাতসারেই যেন চরণগুলি অনেক স্থলেই মিত্রাক্ষরযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি, দুই একটি ছুটের পদে প্রায় তুকের ন্যায়ই সর্ব্বত্র মিল দেখা যায়। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"বৈল নিঠুরের আগে।
জে জাবা আপনার কাজে গো॥ধ্রু॥
জাহার লাগি জে জন মরে।
সে বধ লাগে কাহারে॥

সুমেরু সমান ছিল।
তৃণ হৈতে অধিক হৈল ॥
রাধা ছিল রূপের ডালি।
সে অঙ্গ হৈয়াছে কালি ॥
বৈল বৈল আমার হৈয়া গো ॥"

এখন পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর একটি গন্ত পদের উদাহরণ দেখুন,—

ধানশী।

"এহি তো বৃন্দাবনে সকল আছে
আমার মাধব নাই মাধব নাই মাধব নাই গো।
সেই সকল বিহারের স্থান গো সকল পড়ে আছে গো ॥
এক দিন মানিনী হৈয়া সেই নাগরকে কতই কটু কথা বৈলেছিলাম গো।
পায়ে ধরি মানাইতো মান গো
ফিরে চাইলাম না গো ॥ ইত্যাদি।

নিমানন্দ দাসের রচিত পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় সমালোচনা করার স্থান এথায় নাই; সুতরাং আমরা অতঃপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করার ইচ্ছা করিয়া নিমানন্দের সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সার্দ্ধ-শতাধিক বৈষ্ণব কবির মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম, বলরাম, লোচন, রায়শেখর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ২০।২৫ জন বৈষ্ণব কবির পরেই কবিত্ব হিসাবে নিমানন্দ দাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। নিমানন্দের সময়ে বোধ হয়, তাঁহারও কবি বলিয়া একটু খ্যাতি ছিল, নতুবা তাঁহার ন্যায় একজন বিরাগী বৈষ্ণবের পক্ষে নিজের ভণিতায় নিজকে "কবি" নামে অভিহিত করা সম্ভবপর বোধ হয় না। তাঁহার একটি পদের শেষ পংক্তিতে আছে;—"কহ কবি দাস নিমানন্দে।" ভরসা করি, কেহ ইহার কূটার্থ ধরিয়া "কবির দাস নিমানন্দ" এরূপ অর্থ করিবেন না। কালিদাসের প্রতি কর্ণাট-রাজ-মহিষীর "তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজ-প্রিয়া" বাক্যের ন্যায় এই "কহ কবি দাস নিমানন্দে" বাক্যটির অপর অর্থ থাকা সম্ভবপর হইলেও নিমানন্দ কৌশলে সেইরূপ দ্ব্যর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, বিষয়-ত্যাগী বৈষ্ণব হইলেও তিনি যে মানব-সুলভ খ্যাতি-স্পৃহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

আমরা এখন পদ-রস-সার গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষত্বের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পদ-রস-সার গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের বহুসংখ্যক অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। রসজ্ঞ পাঠকগণের নিকট বিদ্যাপতি কিংবা চণ্ডীদাসের একটি অকৃত্রিম নবাবিষ্কৃত পদের মূল্য তাদৃশ

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির অভিনব পদাবলী

মণি-মাণিক্য হইতে অল্প নহে ; নিতান্ত আনন্দের বিষয় যে, পদ-রস-সার গ্রন্থে নিমানন্দ দাস সাহিত্য-রসবিদ্‌গণের জন্য সেইরূপ একটি অপূর্ব্ব রত্ন-ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিরাট সংগ্রহের পরে বিদ্যাপতির রচিত কোন পদ যে অজ্ঞাত রহিয়াছে, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, পদ-রস-সার গ্রন্থে বিদ্যাপতির অজ্ঞাতপূর্ব্ব ষোলটি পদ পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে কেবল—

"ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
শুনবি বচন মোর।
দেহের গঠন মনের মরম
এবে সে জানিলাম তোর ॥
যে রাধা বিহনে শয়নে স্বপনে
বদনে না ছিল আন।
যাহার চরিত্র পদাবলী করি
বাঁশিতে করিছ গান ॥"

ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালা পদটি ব্যতীত অন্যান্য পদগুলি বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদ বলিয়াই বিদ্যাপতির রচনার বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাই আমাদিগের ধারণা বটে। বিদ্যাপতির নামে বঙ্গদেশে প্রচলিত বহু পদাবলীর সম্বন্ধেই কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে না। বাঙ্গালী কবির রচিত কোন কোন খাঁটি বাঙ্গালা পদও যে লিপিকর কিংবা গায়ক-দিগের ভ্রমবশতঃ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত করা হইয়াছে, আমরা পদরস-সার গ্রন্থ হইতেই তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

"রাই জাগ রাই জাগ শুক শারী বোলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে ॥"

ইত্যাদি বহুশ্রুত পদটি পদ-কল্পতরুর মুদ্রিত এবং (ক) ও (খ) চিহ্নিত হস্তলিখিত পুস্তকে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয় ; কিন্তু উহাই পদ-রস-সার গ্রন্থে বংশীবদনের ভণিতাসহ উদ্ধৃত হইয়াছে ; বংশীবদনের খাঁটি বাঙ্গালা পদাবলীগুলির রচনার সহিত এই পদের রচনার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে ; ইহা যে বিদ্যাপতির রচিত নহে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং উহা অপর কোন কবির রচিত বলিয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উহা বংশীবদনের পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। বিদ্যাপতির এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদগুলি হইতে অধিক উদ্ধৃত করাব স্থান এথায় নাই, সুতরাং আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্য কেবল দুইটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিব।

(১)

"দখিন মলয়ানিল বহই অনুকূল
কুসুমিত কানন সাজ।
তখন মধুঋতু সকল সুভ হেতু
সমুখে আয়ল দ্বিজরাজ ॥
মাধব সুসুভ করহ পয়ান।
মেলি মধুকর সমুখে শঙ্খ পুর
কোকিল মঙ্গল গান ॥ ধ্রু ॥
তুয়া মানস জনু বিপিন দেশ তহি
পূরব সব কামে।
হামারি মিনতি লেহ তুয়া পদে রাখবি
এক করিয়ে পরণামে ॥
বিদ্যাপতি কহ নায়েক শুনি শুনি
চিতক পুতলি জনু ভেল।
নয়ন-লোরে ধনি ডুবই আছলহ
হরি পরি চিরিবধ দেল ॥"

(২)

"জতয়ে কহল হরি তুঁহু হাম এক।
এত দিনে সো সভ ভেল পরতেক ॥
লোরে খসল জত অঞ্জন মোর।
সো সব অধরে লাগি রহু তোর ॥
তোহারি হৃদয়ে দশ নখ দেল।
হামারি হৃদয়ে শেল রহি গেল ॥
ভণহু বিদ্যাপতি শুন বর কান।
কাহে মিনতি করু কামিনি প্রাণ ॥

পদ-কল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের অতিরিক্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদাবলী স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীর মধ্যে নানা কারণে বহুসংখ্যক পদই যে অকৃত্রিম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, তাহা আমরা বিংশ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। রমণী বাবুর তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিত প্রায় তিন শত নূতন পদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা

পদরসসার গ্রন্থে চণ্ডীদাসের যে দশটি অজ্ঞাত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহা চণ্ডীদাসের অত্যুৎকৃষ্ট পদাবলী বলিয়া গণ্য না হইলেও উহাদিগের রচনা ও ভাবের প্রগাঢ়তা-দর্শনে সেগুলি চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম পদ বলিয়াই আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে—

"কানু কহে শুন আমার বচন
কেন বা আইলে তোরা।
এ ঘোর রজনী কুলের কামিনী
এমতি কেমন ধারা॥
কুলবতী হৈয়া ঘর তেয়াগিয়া
কেন বা আইলে বনে।
নানা ভয়ঙ্কর বৈসে নানা জন্তু
এ ভয় নাহিক মনে॥
নিজ পতি জনে করিবে তাড়নে
শাশুরি ননদী তারা।
দিবেক গঞ্জনা লাজেতে তোমরা
তাহাতে হইবে সারা॥"

ইত্যাদি দীর্ঘ পদটি চণ্ডীদাসের "রমণীমোহন বিলসিতে মন হইল মরমে পুনি। গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে রমিতে বরজ-ধনী॥" ইত্যাদি রাস-লীলাবিষয়ক সুদীর্ঘ পদের জুড়ি ও ভাগবতীয় শ্লোকাবলীর একরূপ মর্ম্মানুবাদ বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের এই দীর্ঘ পদটির শেষাংশ অতি অপূর্ব্ব; চণ্ডীদাস গোপীগণের মুখে বলিতেছেন,—

"সংঙ্কেত নিসান শুনি গোপীগণ
যেমন ত্যজিল রীতে।
সকল ত্যজিয়া আইল ধাইয়া
তোমার বাঁশীর গীতে॥
তাহে এত শুনি বিরস কাহিনী
আমরা কুলের বালা।
চণ্ডীদাস বোলে অবলা জনার
উচিত বিরহ-জ্বালা॥"

শেষের পংক্তিটিতে কবি সময়োচিত রসিকতার সহিত প্রেম-সাধনার যে নিগূঢ় তত্ত্বটি পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভবপর। পদ-রস-সারের একপঞ্চাশৎ রসের ত্রয়োদশ হইতে বিংশসংখ্যক আটটি পদ চণ্ডীদাসের রচিত "রাই-রাখাল"-বিষয়ক বটে; কৃত্রিম কোন জিনিষই খাঁটির ন্যায় মনোরম হয় না; সুতরাং এই "রাই-রাখাল" অর্থাৎ গোপীদিগের সহিত শ্রীরাধার কৃত্রিম রাখালবেশ ধারণের পদগুলি যে

ব্রজবালকগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্যরসাত্মক গোষ্ঠ-লীলার অপূর্ব্ব পদাবলীর তুলনায় অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক ও অসুন্দর প্রতীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রমণী বাবুর সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে ছয়টি রাই-রাখালের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াও আমরা তাহাতে চণ্ডীদাসের কবিতার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু পদরসসারের এই আটটি পদে বর্ণনীয় বিষয় উচ্চ অঙ্গের কবিত্বপ্রকাশের অনুকূল না হইলেও, যে স্বভাব-কবি স্বয়ং-দৌত্যের পদে শ্রীকৃষ্ণের বাদিয়া, বাজিকর, বৈদ্য, বণিকিনী প্রভৃতি ছদ্মবেশ ধারণের অতি স্বাভাবিক ও সরস বর্ণনা দ্বারা পদাবলীর পাঠকদিগের চিত্ত বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন, এই রাই-রাখালের পদগুলিতেও আমরা সেই মহাকবির রচনারই কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় পাইয়াছি। আমরা উহার একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

"দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।
গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িলা॥ ধ্রু॥
তবে বিনোদিনী   লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে জায়।
ললিতা বিশাখা   তারা দিলা দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া॥
বলে বিনোদিনী   শুন ল সঙ্গিনি
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়া   রাখাল সাজায়া
বৃন্দাবনে যাব মোরা॥
ছিদাম সুদাম   কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেখি বৃন্দাবনে   নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা॥
যত সখীগণে   আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে জন যেমন   সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন মাঝ॥
কারো রাঙ্গা ধটী   তাহে বেড়া কটি
দুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরীক্ষণ   মাথয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি॥

বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতিকুল।
আজুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে ভুল ॥"

সময়াভাবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের নূতন পদাবলী সম্বন্ধে অদ্য কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না; যদি শ্রীভগবান্ বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে পদ-রস-সারের এই অভিনব ও অজ্ঞাত পদাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া পদাবলী-প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়ার বাসনা রহিল।

পদ-রস-সার গ্রন্থে আমরা যে কুড়ি জন অজ্ঞাত কবির ভণিতাযুক্ত পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নাম ও পদ-সংখ্যা যথা,—

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণের নাম	পদ-সংখ্যা
১। অভিরাম	১
২। কাশীদাস	১
৩। কিশোর	২
৪। কুবের আনন্দ	১
৫। কৃষ্ণানন্দ	৬
৬। জয়চন্দ্র	৩
৭। তরণীরমণ	৬
৮। দীনবন্ধু দাস	৪
৯। নিমানন্দ দাস	১৪৬
১০। নীলাম্বর	১
১১। বদন	১
১২। বল্লভীকান্ত	২
১৩। বীরবাহু	১
১৪। ভাগবতানন্দ	১
১৫। মন্মথ	৪
১৬। রাঘব	১
১৭। রাজচন্দ্র	১
১৮। রাসানন্দ	৭
১৯। স্বরূপচরণ	১
২০। হরিবংশ	১

এই সকল পদকর্ত্তাদিগের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আমরা এ যাবৎ কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের যত্নে ইহাঁদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ ও আরও বহু অজ্ঞাত পদাবলী সময়ে প্রকাশিত হইবে বলিয়াই আশা করি। এই সকল পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে নিমানন্দ দাস ব্যতীত আর কাহারই অধিকসংখ্যক পদ পাওয়া যায় নাই; কোন কবির মাত্র দুই চারিটি পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যাইতে পারে না; তবে প্রাপ্ত পদগুলিকে ইহাঁদিগের শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহাঁরা অনেকেই পদরচনায় কৃতী ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়; সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য ইহাঁদিগের অন্যান্য লুপ্তপ্রায় পদগুলির উদ্ধার-সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় বটে। আমরা ইহাঁদিগের মধ্যে কেবল পদকর্ত্তা কাশীদাসের একটি রাস-লীলার পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"নন্দ নন্দন　　সঙ্গে মোহন
　　নতুন গোকুল কামিনী।
তপন-নন্দিনী　　তীরে ভালে বনি
　　ভুবনমোহন লাবনী॥
তাথৈ তাথৈ　　মৃদঙ্গ বাজই
　　মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলসে গোবিন্দ　　প্রেমে আনন্দ
　　সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
উরে লম্বিত　　কনক চম্পক
　　দাম কর্দ্দম চন্দনে।
দোহ কলেবর　　ভেল শ্রমজল
　　মোতি মরকত কাঞ্চনে॥
রাসে মাতল　　সঙ্গে ষড়্ঋতু
　　কুঞ্জকাননে রাজই।
শুক শিখী পিক　　চাতক ডাহুক
　　ভ্রমরা পঞ্চম গায়ই॥
রাসমণ্ডল　　গোপিনীকুল
　　শ্যাম সঙ্গে নব রঙ্গিণী।
দেই করতালি　　বোলে ভালি ভালি
　　কাশীদাস বলি জাইনি॥"

পদ-রস-সার গ্রন্থের সাহায্যে পদকল্প-তরুর যে শত শত সন্দিগ্ধ পাঠের সুমীমাংসা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এথায় আলোচনা করা অসম্ভব। যদি ভগবানের অনুগ্রহে কখনও পদ-কল্পতরু গ্রন্থের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি, তাহা

হইলেই কেবল উহার পাদ-টীকায় ঐ সকল পাঠভেদ প্রদর্শিত করা সম্ভব হইবে ;* নতুবা বহু-সংখ্যক প্রবন্ধ লিখিয়াও উহার কিয়দংশ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে ; সুতরাং সেই বিষয়ে অন্য কোনই আলোচনা করিতে না পারিয়া, পদ-রস-সারের সাহায্যে আমরা একটি সুবিখ্যাত পদের যে সমীচীন পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত কমলাকান্তের দপ্তরে,—

"এসো এসো, বঁধু এসো আধ আচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ॥"

ইত্যাদি ভণিতা-হীন বৈষ্ণব কবির পদটির যে অপূর্ব্ব রস-বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত সেই বিখ্যাত পদটি এই,—

"এসো এসো, বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি ॥
মণি নও মাণিক নও যে হার করে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
বঁধু, তোমায় যখন পড়ে মনে আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুয়াঁর ছলনা করি কাঁদি ॥"

পদ-কল্পতরু গ্রন্থের চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবের উনবিংশ সংখ্যক—

"আইস আইস বন্ধু আধ আচরে আসি বৈস
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি ॥"

* প্রবন্ধ-লেখকের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পদকল্পতরু গ্রন্থের পাঠ-ভেদ, দুরূহ বাক্যের টীকা, পদাবলীর শব্দ-কোষ ইত্যাদি সম্বলিত যে অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইবে, তাহার পাদটীকায় পদ-রস-সার, পদ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ-ভেদগুলি প্রদর্শিত হইবে।

ইত্যাদি পদের প্রথম কলিটির সহিত বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত গীতের প্রথম কলি প্রায় অভিন্ন হইলেও উহার বাকি তিনটি কলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; তুলনা করার জন্য আমরা সেই কলি তিনটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব ॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ ॥
নহে ত লোহের নিগড় করিয়া
বাঁধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥"

পদ-রস-সার গ্রন্থে অন্তিম কলিটি ব্যতীত অন্যান্য কলিগুলি প্রায় এই ভাবেই উদ্ধৃত দেখা যায় ; কেবল অন্তিম কলিটি বোধ হয়, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ দুইটি তুলনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধৃত পদ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কেবল দুইটি পদের প্রথম কলিটি যেরূপেই হউক, মিশিয়া যাইয়া এক হইয়া গিয়াছে। আমরা পদ-রস-সার গ্রন্থে পদ-কল্প-তরুর ঐ পদটি ব্যতীত "গোষ্ঠ-বিহার দানলীলা" নামক দ্বিপঞ্চাশৎ রস-অধ্যায়ের শেষে যে একটি স্বতন্ত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার মাঝের কয়েকটি কলির সহিত বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত গীতের প্রথম কলি ব্যতীত বাকি কলিগুলির প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য আছে ; তুলনার জন্য আমরা পদ-রস-সারের ঐ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"নীলকমল মাধব শুন হে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণনখরমণি যেন চাঁদের গাথনি
ভালই শোভে আমার গলায় ॥
ছিদামের সঙ্গে সঙ্গে যাও তুমি নানা রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া।
মনে বলে সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রহে তুয়া পানে চায়া ॥

তোমা রূপ পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে
আউলাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালায় জায়া তোমা বন্ধু গুণ গায়া
ধূমার ছলনা বৈসে কান্দি॥
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।
মণি নয় মাণিক নয় গলায় পরিলে রয়
ল নয় যে কেশের করি বেশে॥
অগোর চন্দন হৈতাম হাম অঙ্গে লাইগা রইতাম
৪ খসিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
রাধামোহনে বলে মো হেন অধীন জনে
না ঠেলিয় ও রাঙ্গা পায়॥"

রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে এই পদটি নাই; এই পদের সরল মর্ম্মস্পর্শী বাঙ্গালা রচনার অনুরূপ রচনা আমরা রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় সোয়া দুই শত পদের মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। সুতরাং অন্য কোন রাধামোহনকে এই পদের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেও পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুরকে কিছুতেই এই পদের রচয়িতা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অপর কোন রাধামোহন এই পদের রচয়িতা হইলে, তাঁহার এই জাতীয় উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলি রস-গ্রাহী বৈষ্ণব-সমাজে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ অসঙ্গত অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; সে জন্যই আমরা এই পদটিকে অপর কোন রাধামোহনের রচিত বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না; সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় এই অপূর্ব্ব পদের রচয়িতার নাম পূর্ব্ববৎ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর উদ্ধৃত পদের কলি তিনটি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, উহার প্রথম কলিটিতে যে মিলনানন্দের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কলিগুলিতে উহার উত্তরোত্তর বিকাশ না হইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলিতে প্রেমের অতৃপ্তিজনিত আক্ষেপই প্রকাশ পাইয়াছে; এরূপ ভাবসঙ্করতা স্থলবিশেষে দূষণীয় না হইলেও, অবিমিশ্র-আনন্দাত্মক সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পদে উহা সঙ্গত হইতে পারে না। পদ-কল্প-তরুর উদ্ধৃত পরবর্ত্তী কলিগুলিতে ঐরূপ আক্ষেপের পরিবর্ত্তে আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। পদ-রস-সার গ্রন্থে বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত পদটি যে স্থানে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য রস বিক্রয়ের ব্যপদেশে সখীগণ সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্ষণেকের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছে;—আর হয় ত বহু দিন পর্য্যন্ত সেই ক্ষণিক সন্দর্শনও ভাগ্যে ঘটিবে না; এ অবস্থায় মিলন ও বিরহের, আনন্দ ও বিষাদের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধার পক্ষে প্রিয়তমের নিকট নিগূঢ় প্রেম-রহস্য ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়

আকাঙ্ক্ষাগুলি ঐ ভাবে ব্যক্ত করা কত স্বাভাবিক ও কত সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা উভয় পদের তুলনা করিয়া পদ-রস-সারের পদটিকেই পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরে নানা সময়ে নানা শ্রেণীর নানা লেখক বৈষ্ণব কবির পদাবলীর উৎকৃষ্ট কবিত্বের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবির পদাবলীর প্রশংসা আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং আমরা এ স্থলে সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তবে কবির প্রতিভা কিরূপ অচিন্তনীয় শক্তিশালিনী, দেশ, কাল ও সমাজ-গত প্রভৃত পার্থক্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কবির ভাবের মধ্যে কিরূপ চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এ স্থলে তাহারই একটি উদাহরণ দেখাইব। বহু বাক্যব্যয় করিয়াও অন্যে যে ভাবটি প্রকাশ করিতে পারেন না, প্রতিভাসিদ্ধ দুই চারি কথার সঙ্কেতে যেখানে কবি সেই ভাবটি অতি অপূর্ব্বভাবে পরিস্ফুট করিয়া দেন, সূক্ষ্মদর্শী সংস্কৃত আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ সেখানেই 'ধ্বনি' বা শ্রেষ্ঠ কাব্যের সারভূত লক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই 'ধ্বনি' না থাকিলে রচনার লালিত্য, শব্দের মাধুর্য্য কিংবা অলঙ্কারের চাতুর্য্য কিছুতেই কবির রচনাকে সেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমরত্ব প্রদান করিতে পারে না। সহৃদয় পাঠক বৈষ্ণব কবির পদাবলীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই কবি-প্রতিভাসিদ্ধ ধ্বনির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাইবেন। আমরা পদ-রস-সার হইতে একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদ উদ্ধৃত করিয়া ইহার উদাহরণ দেখাইব। শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীর রবে আকৃষ্ট হইয়া অভিসারোন্মত্তা শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—

"সেই বন কতই দূর।
বনপথ কভু দেখি নাই গো ॥ ধ্রু ॥
আমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি।
বনপথ কভু দেখেছি ॥
যে বনে শ্যাম বাজায় বাঁশী।
মনে বোলে দেখে আসি ॥
তোরা বলিস বাঁশী বনে বাজে।
বাঁশী বাজে আমার হৃদয়মাঝে ॥

প্রিয়তমের বংশী-রব-শ্রবণে প্রণয়িনীর একান্ত তন্ময়তা "বাঁশী বাজে আমার হৃদয়-মাঝে" এই কথাটির দ্বারা কবি যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, বোধ হয়, অন্য শত কথার দ্বারাও সেইরূপ ব্যক্ত হইতে পারিত না। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে। বনমাঝে কি মনোমাঝে॥" ইত্যাদি সর্ব্বজন-বিদিত গীতটিতেও উহার প্রায় সদৃশ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে; তবে বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধার নিশ্চয়াত্মক বাক্যে

তাঁহার তন্ময়তার যে সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রবাবুর গীতের সংশয়াত্মক বাক্যে সেই তন্ময়তা সেই পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; বক্তৃী নায়িকার অবস্থার পার্থক্যই এই প্রভেদের কারণ বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করিলে বৈষ্ণব কবির পদাবলীর সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনায় এইরূপ অচিন্তিত সাদৃশ্য আরও অনেক দেখিতে পাইবেন।

পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহের সম্বন্ধে সহৃদয় কৃতী সমালোচক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"পদ-কল্প-তরুর আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমারের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তন্দ্রালসতা দৃষ্ট হয়, এটি একটি প্রবাদ-বাক্য। বৈষ্ণব কবিগণের পদগুলিও সর্ব্বত্রই প্রতিভা-প্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থলে পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট; কিন্তু পদ-কল্প-তরুর প্রতি পত্রেই এমন দুই একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন।" আমরা ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ বৈষ্ণব কবির পদাবলীর অনুশীলন করিয়া দীনেশ বাবুর এই উক্তির সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিয়াছি; তাই আজ এই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে এথায় সমাগত লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বর-পুত্রদিগের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি,— এ পর্য্যন্ত আমরা যে ভাবে বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর আলোচনা করিয়া আসিতেছি, অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সেইরূপ পল্লব-গ্রাহী আলোচনাই যথেষ্ট নহে, অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীই অশিক্ষিত লিপিকর ও অসতর্ক মুদ্রাকরদিগের হস্তে পতিত হইয়া বহু পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী মুদ্রাঙ্কণ অভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে; আমাদিগকে এক্ষণ উহাদিগের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; বিপুল অধ্যবসায় সহকারে বৈষ্ণব কবির পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার, দুরূহ শব্দের অভিধান প্রণয়ন, দুরূহ বাক্যাবলীর অর্থ-নির্ণয় ও বৈষ্ণব কবিগণের অজ্ঞাত ইতিহাস-সংগ্রহ প্রভৃতি ক্লেশসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। যদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এত দিনের সমবেত চেষ্টায়ও এই কার্য্য অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে আমরা সাহিত্য-সেবী বলিয়া যতই আড়ম্বর করি না কেন, অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবার পুণ্য সাধনা হইতে আমাদিগকে যে একান্তই বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সভাপতির অভিভাষণ

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা আবশ্যক। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ কি, সাহিত্য শব্দের অর্থ কি, পরিষৎ শব্দের অর্থ কি ও এই তিনটি জড়াইয়াই বা অর্থ কি?

বঙ্গীয় শব্দের কি অর্থ, তাহা আমি জানি না, শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় চলিত নাই। চলিত যে শব্দ আছে, তাহা বাঙ্গালা। বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলে বুঝিতে পারি, হয় বাঙ্গালা দেশের, না হয় বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য। কারণ, বাঙ্গালা শব্দে বাঙ্গালা দেশও বুঝাইতে পারে, ভাষাও বুঝাইতে পারে। বঙ্গীয় শব্দটি কিন্তু সেরূপ নহে, বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া ও গকারের সঙ্গে যে অ-কার ছিল, তাহাকে লোপ করিয়া বঙ্গীয় শব্দ হইয়াছে। বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় সংস্কৃতে দেখি নাই। বঙ্গীয় শব্দ সংস্কৃত নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সব শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হইতে পারে, তাই বলিয়া আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কই, বাঙ্গালার ব্যাকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করি, বাঙ্গালার জন্য, বাঙ্গালা ভাষার উপকারার্থ বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিতে আমাদের কতদূর অধিকার আছে, জানি না। যদি সংস্কৃতের মত বাঙ্গালায় ঈয় প্রত্যয়ের পুরা মাত্রায় অধিকার থাকিত, তাহা হইলে খালীয়, নালীয়, রেলীয়, মেলীয়, ডেঙ্গীয়, গাছীয়, লতীয় প্রভৃতি কত কথাই আমরা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। বঙ্গীয় কথাটা দোআঁস্‌লা হইয়া গিয়াছে। নামের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, এখন আর শুদ্ধ করার উপায় নাই। এই নাম ২০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ইহার আবার কত শাখা-প্রশাখা হইয়াছে, এখন আর বদল করা পোষায় না। কিন্তু মানে ত একটা করিতে হইবে? বঙ্গ বলিতে সংস্কৃত ভাষায় কোন্ দেশ বুঝাইত? অনেক সময় মনে হয়, সারা বাঙ্গালাই বুঝাইত। কিন্তু অনেকের মত যে, ও শব্দে শুধু পূর্ব্ববাঙ্গালা বুঝাইত, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট। কালিদাস বঙ্গ শব্দে গঙ্গার দুই ধার বুঝিয়াছেন। লোকে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বলে, তখন এখনকার সমস্ত বাঙ্গালাই বুঝায়, কিন্তু বঙ্গাল শব্দ নিতান্ত নূতন নয়, দুচারখানি প্রাচীন পুথিতে এবং দুচারখানি শিলাপত্রে বঙ্গাল শব্দ দেখা গিয়াছে। যখন বঙ্গাল শব্দটা বাঙ্গালা রূপ ধারণ করিয়া খুব চল্‌তি হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব্ববাঙ্গালা বুঝায়। বল্লালসেনের রাজত্বে পাঁচটি ভাগ ছিল;—বঙ্গ, বাগড়ী, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা। এ বঙ্গ বলিতে গেলে পূর্ব্ববাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কিন্তু কেবল পূর্ব্ববাঙ্গালার নয়, সারা বাঙ্গালারই সাহিত্য-পরিষৎ। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় শব্দের অর্থ সারা বাঙ্গালা করিয়া লইতে হইবে। আর এই সারা বাঙ্গালা বলিতে বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও তাহার উপর সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুরের খানিকটা বুঝিতে হইবে। বাদ পড়িবে প্রায় সমস্ত দারজিলিঙ্গটা। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ এই হইল।

এখন সাহিত্য শব্দের অর্থ কি ? সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত বটে, কিন্তু বড় বেশী পুরাণ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। সহিত শব্দের উত্তর 'ষ্য' করিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে ; কিন্তু কিসের সহিত ? বোধ হয়, ব্যাকরণের সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দে স্মৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, দর্শন, এ সকল কিছুই বুঝায় না, কেবল বুঝায়, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার। যাঁহাদের হাতে ৬০।৭০ বৎসর আগে বাঙ্গালা ভাষার ভার পড়িয়াছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে সাহিত্য বই আর জানিতেন না ; সুতরাং সাহিত্য শব্দটার অর্থ বাড়াইয়া লিটারেচার শব্দের সমান করিয়া তুলিয়াছেন। এখন লিটারেচার শব্দের অর্থ কি ? লিটারেচার শব্দের প্রথম অর্থ ছিল—কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ; কিন্তু পরে দাঁড়াইয়াছে, যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই লিটারেচার। দিনকতক আগে বিজ্ঞান ও দর্শনে লিটারেচার শব্দের প্রয়োগ হইত না, এখন তাহাও হইতেছে। এখন গভর্মেণ্টের ফসলের রিপোর্ট দিতে হইলেও সে সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, সব পড়িতে হয়, সে সম্বন্ধে সব লিটারেচার পড়িতে হয়। জেলেদের মাছ ধরা সম্বন্ধেও এখন মস্ত লিটারেচার হইয়াছে। আমাদেরও এখানে সাহিত্য শব্দের এইরূপ মুলুক-জোড়া অর্থ লইতে হইবে। যদি ইহার অর্থ সংকোচ করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। এ পরিষদে হেমবাবু, যতীন্দ্র-বাবু, হীরেনবাবু, রামেন্দ্র বাবুর স্থান থাকে না। ইংরাজিতে লিটারেচার শব্দ যেমন, সংস্কৃতে সেইরূপ একটি শব্দ আছে। লিটারেচার অর্থ বরং সঙ্কুচিত, কিন্তু সে শব্দের সঙ্কোচ কোথাও নাই, সেই শব্দ 'বাঙ্ময়'। ইংরাজি লিটারেচার অর্থে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে, কিন্তু যাহা লেখা হয় নাই, সেখানে ও শব্দ যাইবে না ; 'বাঙ্ময়' লেখাই হোক, না লেখাই হোক, সর্ব্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বাক্ হইলেই বাঙ্ময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, তার অর্থ কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া বাঙ্ময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলেথা ছড়াগুলি, মাঝিদের সারিগান এবং অনেক ধর্ম্মের ছড়া ইত্যাদি জিনিষগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকারের মধ্যে আসিতে পারে না।

এখন পরিষৎ শব্দের অর্থ কি ? পরি পূর্ব্বক ষদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া পরিষদ্ শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ চারিদিকে বেড়িয়া বসা। অতি পূর্ব্বকালে বেদের এক একটি শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে চরণ বলিত। এক এক জায়গায় এক এক চরণের যতগুলি লোক হইত, তাঁহাদের লইয়া এক একটি পরিষৎ হইত। কতগুলি লোক লইয়া পরিষৎ হইবে, তাহা ঠিক ছিল না। ক্রমে পরিষৎ শব্দ রাজসভায় উঠিল, সেখানে পরিষদে কতকগুলি মেম্বর হইবে, তাহা ঠিক হইয়া গেল। ক্রমে যাহারা রাজপরিষদে যায়, তাহারা পারিষদ হইল, ক্রমে পারিষদ শব্দে খোসামুদে বুঝাইতে লাগিল। পরিষৎ পারিষদ দুই শব্দই ক্রমে উঠিয়া গেল, ক্রমে সভা, সভ্য ও সদস্য শব্দ অধিক ব্যবহার হইতে লাগিল।

পণ্ডিত লোকের সভাকে বরাবরই লোকে পরিষৎ বলিয়া আসিয়াছে। কালিদাসও বলিয়াছেন,—"অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ।" এইরূপ একরূপ কার্য্যে বা একরূপ লেখাপড়ায় বা একরূপ ব্যবসায়ে যাহারা দক্ষ, তাহাদের লইয়া ইউরোপে যে সভা হইত, তাহার নাম ছিল ইউনিভারসিটি। তখন জুতাওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, জুতা সেলাইওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, দরজীর ইউনিভারসিটি ছিল, ময়রার, ছাতাওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, জেলের ইউনিভারসিটি ছিল। এখন অন্য ব্যবসায়ের ইউনিভারসিটির নাম হইয়াছে guild, ইউনিভারসিটি নামটা ক্লারিক অর্থাৎ লেখাপড়ার ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ শব্দটাও সেইরূপ বৈদিক চরণ ছাড়িয়া, রাজসভা ছাড়িয়া সাহিত্যেরই একচেটিয়া হইয়া যাইতেছে। দশ জনে মিলিয়া একত্র কাজ করিলে পরিষৎ হইবে, দুই জনে করিলে হইবে না।

তাহা হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শব্দে আমরা কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, বাঙ্গালা দেশবাসী দশ জন লোক একত্র হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এখানে একটা কথা নূতন আছে, বাঙ্গালা দেশবাসী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এই তিনটি শব্দের মধ্যে বাঙ্গালা দেশবাসী বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। কিন্তু ঐটি উহ্য না করিলে মানেই হয় না। কারণ, চীনের লোক দশ জনে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা সেই দশ জনকে কি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলিবেন? যদি চীন দেশের লোক কলিকাতা আসিয়া আপনাদের মেম্বর হয়, তাঁহাকে মেম্বর করিতে আপনাদের কোন আপত্তি হইতে পারে না। বঙ্গদেশবাসী বলিতে গেলে বঙ্গদেশবাসী খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদী, জৈন সব বুঝাইবে। সুতরাং ইহাদের বাঙ্ময় সব পরিষদের অধিকারে আসিবে। পৃথিবীর কিছুই বাকি থাকিবে না। কিন্তু এখনও সবাই আসে নাই। যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ—এমন কি, শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, একজন মুসলমান। মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য-পরিষদের মেম্বর হন, সেটি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাঙ্গালার কোন কাজই হইতেছে না। অনেকে মনে করেন, মুসলমানেরা আরবী পার্শী লইয়া থাকেন, বাঙ্গালার জন্য তাঁহাদের মায়া নাই, তাঁদের দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে। কিন্তু সে কথা ত সম্পূর্ণ সত্য নহে, অনেক বাঙ্গালা বই তাঁহারা লিখিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে ভাষার নাম মুসলমানী বাঙ্গালা, ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের উর্দু। তাঁহারা যে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তার নাম ফুলনাগরী বা কাঠনাগরী, এখনও সিলেটের মুসলমানেরা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া তাঁহাদের যত কিছু বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সেই অক্ষরে লিখিয়া থাকেন। মুসলমানের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, তাহা এক দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। কোন জাতি আপনার ব্যাকরণের বিভক্তিগুলি পরের ভাষা হইতে লয় না, কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত বিভক্তিগুলি

দিয়াছেন। আমরা প্রথমার বহুবচনে যে "রা" বলি, সেটা আমরা মুসলমানদের নিকট পাইয়াছি। আমাদের 'দিগকে', 'দিগের', 'দের' প্রভৃতি বিভক্তিও পার্শী হইতে লওয়া। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিতে গেলে মুসলমানের সহায়তা ভিন্ন হইতেই পারে না। আমাদের অভিধানের এক তৃতীয়াংশ কথা মুসলমানী। আমাদের দেশের জনকয়েক লেখক মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; সুতরাং সংস্কৃত ছাড়া শব্দ ব্যবহার করিব না, পার্শী শব্দ সব উঠাইয়া দিব। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পার্শী শব্দ এখনও অবাধে চলিতেছে। আরও এক কথা, যদি আপনারা বাঙ্গালা-সাহিত্য-পরিষৎ নাম দিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে কতক পরিমাণে বাদ দিতে পারিতেন। যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে লইতেন, যাঁহারা না লিখেন, তাঁহাদিগকে লইতেন না। কিন্তু আপনারা নাম দিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বিস্তার করিতে যাইতেছেন, তবে বাঙ্গালায় বসিয়া যাঁহারা ফার্সী, উর্দ্দু ও মুসলমানী বাঙ্গালায় বহুসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দেন কি করিয়া? সেও ত বঙ্গীয় সাহিত্য!

আমার বোধ হয়, প্রথম হইতেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার একটু সঙ্কোচ করিয়া লইলেই ভাল হইত। এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করিবার সময় সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছিলেন যে, এসিয়ার চতুঃসীমার মধ্যে স্বভাবে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা মানুষে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, সমস্তই এ সভার অধিকারভুক্ত হইবে। অর্থাৎ সমস্ত জিনিষই অধিকারভুক্ত হইবে, তবে এসিয়ার বাহিরে নয়, এসিয়ার মধ্যেই চাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, এখন তাঁহারা যদি কখন দশ জন ফ্রেঞ্চ মেম্বর পান, সেই ফ্রেঞ্চ মেম্বরদের অনুরোধে সমস্ত ফরাসী সাহিত্য আসিয়া পড়িতে পারে। এতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হয়। বাঙ্গালার বাহিরে যাবার বন্দোবস্তটা না করিলেই ভাল হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার যখন এত বড়, আশা যখন এত উচ্চ, দৌড় যখন এত দূর, তখন কোন্ কাজে ইহার বিশেষ অধিকার, তাহা বলা বড় কঠিন। যদি বলি, বিজ্ঞানেই অধিকার, তবে ভাষাতত্ত্বওয়ালারা চটিয়া যাইবেন। যদি বলি, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের উপরেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বেশী, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বলিবেন, আমাদের কথাটা সাহিত্য-পরিষদে উঠিবে না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, কোন্ বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বেশী অধিকার বা বিশেষ অধিকার, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার আমার দরকার নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাণ্ড অধিকারের মধ্যে কোন্ বিশেষ বিষয়ে আমার দুটা কথা কহিবার অধিকার আছে, তাহারই কথা কহিব এবং স্থির করিলাম, সে কথাটি পুথি খোঁজা।

ছাপাখানা আমাদের দেশে বেশী দিন হয় নাই। যাঁহারা বড় পুরাণ খবর জানেন,

তাঁরা হয় ত বলিবেন যে, হাল্‌হেড সাহেব ১৭৭৯ সালে হুগলিতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। সে সকল ত পুরাণের কথা; আসল কথা এই যে, ছাপাখানাটা ৬০।৭০ বৎসর হইল, খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে; তাহার আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও দুই একখানি পুথি হাতে লিখিয়া পড়িয়াছি। সবই লেখা হইত হাতে, একখানা হাতের লেখা পুথি দেখিয়া দশ জন নকল করিয়া লইত। লোকের যাহা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব হাতের লেখা পুথিতেই থাকিত। ক্রমে যখন ইংরাজি পড়াশুনা খুব আরম্ভ হইল, ছাপা বহি খুব চলিতে লাগিল; লোকে আর পুথির তত আদর করিত না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, পৈতৃক পুথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্ব্বদা সেগুলিকে ঝাড়াঝুড়া করিতেন, পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। ভাদ্র মাসে পুরা রৌদ্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না—সেই দিন পুঁথিগুলিকে রৌদ্রে দিতেন। সমস্ত দিন নিজে পাহাড়া দিতেন, পাছে হঠাৎ জল হইলে পুথিগুলি ভিজিয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেইগুলিকে পেতেনে সাজাইয়া রাখিয়া তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার ছেলে ইংরাজি স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরি করিতে গেল, বাবার বড় আদরের জিনিষ পুথিগুলিকে রক্ষা করিল, ফেলিয়া দিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র অল্প ইংরাজি লেখাপড়া শিখিল, তার পরে চাকরি করিতে গেল; পুথি-পাঁজির কোন ধারও ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় কত আবর্জ্জনা রহিয়াছে। ছেড়া ময়লা কাল ন্যাকড়ায় জড়ান কতকগুলা কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয় ত রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিতে লাগিল, তখন পুথি অথবা তাহার পাটার কথা মনে পড়িল; সুবিধা পাইলেন ত একখানা পুথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সে দিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম;—দেখিলাম, একজনের বাড়ীর পিছনে রাস্তার ধারে রাশীকৃত পুথির পাতা পচিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পাটাগুলি পোড়ান হইয়াছে। বাড়ীর গিন্নী মা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুথিগুলি বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ীর গিন্নীর মা সরস্বতীর উপর অতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুথির পাতা লইয়া কি করেন, অনায়াসে বুঝা যায়।

এইরূপে চারিদিকে হাতের লেখা পুথি নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনেকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হয়, পঞ্জাবের সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের অনেক পুথি ছিল। তাঁহার পুত্র রাধাকিষণ লর্ড লরেন্সের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুথিরক্ষার জন্য এক পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন ভিন্ন গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই সকল গভর্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুথিরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট এই জন্য ২৪০০০৲ টাকা বৎসর বৎসর খরচ

করেন। বাঙ্গালার ভাগে ৩২০০৲ টাকা পড়ে। সে সময়কার সকল গভমেণ্টই কিছু কিছু পান। পঞ্জাব গভর্মেণ্টের টাকা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের টাকা অনেক দিন বন্ধ ছিল, এখন দুই ভাগ হইয়াছে; একভাগ সংস্কৃত পুথির জন্য, আর এক ভাগ নাগরী পুথির জন্য দেওয়া হয়। মান্দ্রাজে ঐ টাকার এক অংশ আরকিওলজিকাল ডিপার্ট-মেণ্টকে দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বোম্বাইয়ে ঐ টাকায় পুথি খরিদ হয় ও ঐ পুথি দেকান কলেজের লাইব্রেরীতে রাখা হয়। বাঙ্গালায় ঐ টাকা এসিয়াটিক সোসাইটীর হাতে দেওয়া হয়, তাঁহারা ঐ টাকা খরচের ভার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে দেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকে পুথি খোঁজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০০০ পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ৮০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০ সংগ্রহ হইয়াছে। মান্দ্রাজে প্রথম ভার থাকে অপার্ট সাহেবের উপর। ইনি কোন্ পণ্ডিতের বাড়ী কি কি পুথি আছে, তাহারই তালিকা ছাপাইয়াছেন। তারপর হল্‌চ্ সাহেব তিনখানি রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় নূতন পুথি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে কেনা পুথির একটি তালিকা আছে। তাহার মধ্যে ভাল ভাল পুথিগুলিতে ইতিহাসের কথা যাহা পাওয়া যায়, সব তুলিয়া দেওয়া হয়। হল্‌চ্ সাহেবের পর শেষগিরি শাস্ত্রী কিছুদিন এই কার্য্য করেন এবং তাঁহার রিপোর্টগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি যে কয়খানি পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়। এখন মহারাজ রাজশ্রী রঙ্গাচার্য্য রাও বাহাদুর এই কার্য্য করিতেছেন। তিনি এই অল্প দিনের মধ্যে ১৩।১৪ ভলিউম বহি ছাপাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের টাকা দুই ভাগ হয়। এক ভাগের কর্ত্তা হন সার রামগোপাল ভাণ্ডারকর, আর এক ভাগের কর্ত্তা পিটারসন্ সাহেব। দুই জনেই ছয় ভলিউম করিয়া রিপোর্ট লেখেন, রিপোর্টের ভূমিকায় অনেক নূতন নূতন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির হয়। জৈন-সাহিত্য এইখান হইতেই প্রথম প্রচার হইতে থাকে। ভাণ্ডারকর বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য অনেক। সার রামগোপাল এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ কাজের ভার তাঁহার পুত্র শ্রীধর ভাণ্ডার-করের উপর অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রত্যেক রিপোর্টের সহিত কেনা পুথির একটি তালিকা দেওয়া থাকে এবং ভাল ভাল পুথি হইতে ইতিহাসের কথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

লাহোর, অযোধ্যা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে কেবল কেনা পুথির তালিকা বাহির হয়। ঐ তালিকায় গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, লেখার সময় প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় খবর থাকে। উহার সঙ্গে রিপোর্ট আদি কিছুই থাকে না।

বাঙ্গালায় যে সকল পুথি খরিদ হইত, তাহার একটি তালিকামাত্র ছাপা হইত এবং সোসাইটীর পণ্ডিতেরা সমস্ত দেশ ঘুরিয়া যে সকল নূতন পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপা হইত এবং সেই সকল পুথি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংরাজিতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচ বৎসর অন্তর একটি রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় ঐ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংরাজিতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়া দিই।

ইহাতে একটু অসুবিধা হইত। পরের বাড়ীর পুথির বিবরণ ছাপা হইত, নিজের বাড়ীর পুথির বিবরণ একেবারে ছাপা হইত না। তাই সোসাইটী বলিয়া দিয়াছেন যে, যত দিন নিজের বাড়ীর পুথির বিবরণ ছাপা না হইতেছে, তত দিন আর অন্য কোন কাজ হইবে না।

এতক্ষণ লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকা হইতে যে কাজ হইতেছে বা হইয়াছে, তাহারই কথা বলিলাম। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর, আলবার, নেপাল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও অনেক নূতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট ও তালিকা ছাপা হইতেছে। এ সকলই সংস্কৃত পুথি লইয়া, কেহ কেহ তাহার সহিত প্রাকৃতও যোগ করিতেছেন, কেহ বা কথিত ভাষার প্রাচীন পুথিও যোগ করিতেছেন। কথিত ভাষার পুথি সংগ্রহের জন্য বড় একটা চেষ্টা হয় নাই। যুক্তপ্রদেশে নাগরী-প্রচারিণী সভা লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকার অর্দ্ধেক খরচ করিতেছেন এবং বৎসর বৎসর তাহার রিপোর্ট দিতেছেন।

রাজপুতানায় ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহের জন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গভর্মেণ্ট ঐ বিষয়ে বন্দোবস্তের ভার এসিয়াটিক সোসাইটীর উপর দেন। সোসাইটী সে ভার আমার উপর দেন, আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কার্য্য এখনও পুরাদস্তুর আরম্ভ হয় নাই।

ভাট-চারণের পুথি সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া। তাই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট নিজেই সে সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অন্য কোন চলিত ভাষার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সেই সকল ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চলিত। যে দেশের ভাষা, সেই দেশের গভর্মেণ্টের তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন আসামী পুথির জন্য বোম্বাই টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়; যেমন তেলেগু পুথির জন্য লাহোর টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়। যদি বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট বাঙ্গালা পুথির জন্য টাকা খরচ না করেন, যদি আসামের জন্য আসাম-গভর্মেণ্ট টাকা খরচ না করেন, তাহা হইলেও অন্যায় হয়। বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদেরও প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য বাঙ্গালী

মাত্রেই বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে।

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখা-দেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ. বাঙ্গালায় এত বহি

আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—'আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।'

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পারিব। সুতরাং বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণাম। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটী ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া ধর্ম্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেন বাবু ছাপাইয়াছেন।

আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর ময়ূর-ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেন বাবুও আমার মত পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুথি-সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি কিনিতেন। যাহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের বদলে পুথি লইয়া আসিত, নগেন বাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না; তবে তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভারসিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এসিয়াটিক সোসাইটির জন্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটী তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্ব্ববাঙ্গালায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য দীনেশ বাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশ বাবুর কথামত বাঙ্গালা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে, দীনেশ বাবু উহা যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশ বাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেন বাবু আমার নৈহাটীর বাড়ীতে যান। কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটী যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি

লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।

আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার এইটি প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা পুথি খোঁজার আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম "সুভাষিত-সংগ্রহ", উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম—"দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"।

"সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি বেণ্ডল সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং "দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব 'সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে নেপালে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার দোঁহা-কোষ-পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল, তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়", উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম "চর্য্যাপদ"। আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

বেণ্ডল যে সুভাষিত-সংগ্রহ ছাপাইয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষার আটাশটি দোঁহা টীকাটীপ্পনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন,—ঐ ভাষা একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার দুই একটি দোঁহা এখানে দিতেছি।

গুরু উবএসো অমিঅ রস হবহিং ন পিঅ উজেহি।

বহু সহ মরুত্থলিহিঁ তিসিএ মরিথউ তেহি।

প্রফেসর বেণ্ডল তাঁহার প্রথম পরিশিষ্টে একবার বলিয়াছেন, অপভ্রংশ ভাষা, আর একবার বলিয়াছেন, বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটি যে কি, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালিপ্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈনপ্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মারহাট্টাও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম;—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত 'সেতুবন্ধ কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। তিনি বলেন,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর আভিরী, সৌবিরী প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২।৩ শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি "প্রাকৃত-প্রকাশে" মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মাহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌরসেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সূর্য্যমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেণ্ডল এই নূতন

ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন; তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জ্জমা তেঙ্গুরে আছে। প্রফেসার বেণ্ডল দুই চারি জায়গায় ঐ তর্জ্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজি ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষে সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৪ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটি দোঁহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি দুইখানি দোঁহাকোষ পাইয়াছি, একখানিতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে, আর একখানিতে প্রায় এক শতটি আছে। শেষোক্ত দোঁহাখানির সর্ব্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দোঁহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোঁহায় বলিয়াছে,—গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়্দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়্দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক্ না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাহারা ঈশ্বর, ধর্ম্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্র বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধারণ করে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্ করে, কানে খুস্‌খুস্ করে

ও লোককে ধাঁধাঁ দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন? ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

ক্ষপণকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরও বলেন,—ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে,—মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না, কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, সকলই গেরুয়া কাপড় পড়ে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ, তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

এখানে পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোন উপায়ই নাই। সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে। তিনি বলেন,—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই। দুই এক. সুতরাং সহজিয়ারা

অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দোঁহা এই ;—

পর অপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দুই এক); সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরমপদস্বরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বঅ চিত্ত তরুঅর হরউ তিহুঅনে বিত্থা
করুণা ফুল্লিহ্য ফল ধরই নামে পর উআর।

অদ্বয় চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করেন, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম, সরোরুহবজ্রপাদের দোঁহা ও অদ্বয়বজ্রের টীকার মূল কথাগুলি বলিয়া দিলাম। সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুস্কিল আছে; সেটি এই যে, সহজীয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাঙ্গালা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা কি না? সরোরুহ-বজ্রের দুইটা দোঁহা দিয়াছি, একটা গান দিই। এই গানটি চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দের বাঙ্গালায় সরহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে।

সুইণা হ অবিদারঅরে নিঅমন তাহোরেঁ দোসে
গুরুবঅন বিহারেরেঁ থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥ ধ্রু॥
অকট হুঁ ভবই অণা
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা॥ ধ্রু॥
অদঅভুর ভব মোহারো দিসই পর অপ্যণা
এ জগ জলবিম্বকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥ ধ্রু॥
অমিয়া আছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পসর বস অপা
ঘারেঁ পারেঁ কা বুঝ্‌ঝিলে মরে খাইব মই দুঠ কুণ্ডরাঁ॥ ধ্রু॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালি কিমো দুঠ্যা বলন্দেঁ
একেলে জগ আলিঅ রে বিরহুঁই ছন্দেঁ॥ ধ্রু॥

হে মন ! তোমার অবিদ্যা-দোষ হেতু এবং স্বপ্নেও লোভ থাকায় গুরুবচন ত্রৈলোক্য ছাইয়া ফেলিল, এখন তুমি কোথায় লুকাইয়া থাকিবে ? হুঙ্কার-বীজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, তুমি গগনে প্রবিষ্ট হইলে, এক্ষণে তোমার অবিদ্যা নাশ হইবে। তুমি বঙ্গদেশে স্ত্রীগ্রহণ করিলে, তোমার বিজ্ঞান পলাইয়া গেল। ভবের মোহ অদ্ভুত, যে হেতু তাহাতে আপন পর দেখা যায়। সহজ-মতে এ জগৎ জলবিম্বের ন্যায় এবং আত্মা শূন্যস্বরূপ। অমৃত আশে রে চিত্ত, তুই বিষ খাইতেছিস, তুই কর্ম্মের নিতান্ত বশ, তুই ঘরে পরে কি বুঝিলি, আমি দুষ্ট কুণ্ডকে মারিয়া খাইব। সরহ বলেন,—রে গোয়ালিনী, দুষ্ট বলদ লইয়া আমি কি করিব ? একলাই জগৎ বিনাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে ত্রিভুবনে বিহার করিব।

কায় ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল
সদগুর বঅনে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধহুরে নাহী
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী নৌকা টাণুঅ গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ ॥ ধ্রু ॥
বাট অভঅ খান্ট বি বলআ
ভব উলোলেঁ ষঅ বি বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
ফুল লই ষরে সোন্তে উজাঅ
সরহ ভণই গণে পমাএঁ ॥ ধ্রু ॥

দেহ নৌকা, মন তাহার দাঁড়, সদ্‌গুরু-বচন এ নৌকার হাল হউক। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকাটিকে রক্ষা কর, পারে যাইবার অন্য উপায় নাই, অন্য নৌকায় যেমন গুণ টানিয়া যায়, এ নৌকা সেরূপ নহে। এ নৌকা ত্যাগ করিয়া সহজ পথে যাও, অন্য উপায়ে যাইবার জো নাই। পথে কোন ভয় নাই, বলদ দুটিও খাটিতে পারে। ভব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে, খরস্রোতে কুল উজাইয়া যাইতেছে। সরহ বলেন,—আমি প্রমাদ গণিতেছি।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ ধ্রু ॥
অম্হে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষো ॥ ধ্রু ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসাণেরে কংথা ॥ ধ্রু ॥

জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন্ত ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে ধর্ম্ম স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।

সরহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত অনেক জিনিষ লইয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত বরেন্দ্রের রাজা রামপালদেবের রাজত্বের পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের এই কয়খানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা হইয়াছে। তত্ত্বদশক, যুগনদ্ধপ্রকাশ, মহাসুখপ্রকাশ, তত্ত্বপ্রকাশ, সেককার্য্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত সেকপ্রক্রিয়া, প্রজ্ঞোপায়, দয়াপঞ্চক, মহাযানবিংশতি, অমন সিকারতত্ত্ব, মহাযানবিংশতি, দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা অর্থাৎ যে দোঁহাকোষের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। অদ্বয়বজ্রকে তেঙ্গুরে কোথাও মহাপণ্ডিত, কোথাও আচার্য্য, কোথাও অবধূত বলিয়াছে।

সরহপাদেরও কয়েকখানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা আছে; যথা,—বুদ্ধকপালতন্ত্র-পঞ্জিকা, জ্ঞানবতীনং, বুদ্ধকপালসাধনং, সর্ব্বভূতবলিবিধি, শ্রীবুদ্ধকপালনামমণ্ডলবিধিক্রমপ্রদ্যোতন।

এসিয়াটীক সোসাইটীর পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে, যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্ম্মা। তারানাথ বলেন,—শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেণ্ডল সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। এ কথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শান্তিদেবের মা উহাকে বলিলেন,—তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভাল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্ম্মে উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তি একটি সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। একদিন একটি নিবিড় বনের মধ্যে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার

লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভাল জল খাইতে দিল এবং পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া দিল। পরিচয়ে জানা গেল, সে মেয়েটি মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিবাই শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—আমি উহাঁরই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট গেলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বার বৎসর রহিলেন এবং মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শান্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার রাউত হইলেন। রাউত শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি। আমাদের দেশের গন্ধবেণেদের চারিটি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি রাউত আশ্রম অর্থাৎ রাউতাশ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করে। অনেক বড় বড় নগরে রাউতপাড়া নামে একটি পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য রাউতেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল, ক্রমে তাহারা টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহারা রাজাকে বলিল,—আপনি অচলসেনকে এত ভালবাসেন, ওর তরবারি ত কাঠের, ও কি করিয়া যুদ্ধ করিবে? তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলেই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলয়ারের তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, একটি চক্ষু বাঁধিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। রাজা খুব খুসি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলয়ারখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকে তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার সঙ্ঘে তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল ভুসুকু, কারণ, ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি কুটীং গতোপি তদেবেতি ভুসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ ভুসুকুনামখ্যাতিং সঙ্ঘেঽপি। অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল থাকিত, শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটীতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত।

এইরূপে বহু দিন যায়। শান্তিদেব কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং একদিন তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে হইবে। নালন্দায় রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্ম্মশালা

সাজান হইত, সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়া বসিল,—শান্তিদেব! তোমায় আজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তি যতই গররাজি হন, ছেলেরা ততই জিদ করিতে লাগিল। শেষ তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, এ একটি কথাও কহিতে পারিবে না, আমরা হাসিব ও হাততালি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে বসিয়া বলিলেন,—"কিম্ আর্ষং পঠামি অথার্ষং বা।" শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর্ষ শুনিয়াছেন, অথার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা বলিলেন,—এ দুয়ে প্রভেদ কি? শান্তিদেব বলিলেন,—পরমার্থজ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ এবং জিন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আর্ষ। যদি বল, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুবরাজ আর্য্য মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন;—

যদর্থবদ্ধধর্ম্মপদোপসংহিতং ত্রিধাতুসংক্লেশনিবর্হণং বচঃ।
ভবে ভবেচ্ছাস্ত্যনুশংসদর্শকং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্যথা॥

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে আর্য্য পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অথার্ষ আর সুভূতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান্ তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন,—আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অথার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্ব্বেই শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় নামে তিনখানি অথার্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্য্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্য্যার ভাষা অতি সুললিত, যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শান্তি মধুরস্বরে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতে॥

ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জ্বলবর্ণ বিমানে চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মঞ্জুশ্রী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পরদিন পণ্ডিতেরা তাঁহার কুটীতে গিয়া বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল সূত্রসমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানও হইয়াছে। শান্তিদেব ও ভুসুকু যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যেমন সরহপাদের কতকগুলি গান দিয়াছি, সেইরূপ ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভুসুকু ও

শান্তিদেব এক কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে। এসিয়াটীক সোসাইটীর পুথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি মাত্র পাতা, কিন্তু এখানি পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটী-নির্ম্মাণ, ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাঙ্গালা গান আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রবিকলা মেলুহ, শশিকলা বারহ বেণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায়॥

আরও— অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অরুহেঠ কমল করি শয়ন অরু।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্য্যহ সুরকায় চ্ছাড়ি ন যাই
সো তুর যোগীঞ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি ধুরুন্তি যোগ।

এই পুস্তকের ভুসুকুও রাউত। শান্তিদেবও ভুসুকুও বটে, রাউতও বটে। আর বাস্তবিকও শান্তিদেব যখন অভিধর্ম্মের বই একখানি লিখিলেন, সূত্রান্তের বই একখানি লিখিলেন, শিক্ষার বই একখানি লিখিলেন, বিধির বই একখানি না লিখিলে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ পুরা হইল কই? শান্তিদেব যে শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমরা তেঙ্গুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগ-তন্ত্রবলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু রাউত ভুসুকুর বাড়ী যে বাঙ্গালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভুসুকুর একটি গান আছে; সেটি এই,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥ ধ্রু॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ ধ্রু॥
ডহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ন জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা॥ ধ্রু॥
সোন তরুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ॥ ধ্রু॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥ ধ্রু॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে (চণ্ডালী) করিয়া লইলে।

সহজ-মতে তিনটি পথ আছে ;—অবধূতি, চণ্ডালী, ডোম্বি বা বঙ্গালী। অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোম্বিতে কেবল অদ্বৈত; দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালায় অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেই জন্য বাঙ্গালা অদ্বৈত মতের যেন আধারই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন,—রে ভুসুকু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বাঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। জহোর কোথা না জানিলেও এ গানে বেশ বোধ হয়, রাউত ভুসুকু ও শান্তিদেব বাঙ্গালী। রাউতের আর একটি গান এই ;—

আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতি এঁসো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সারে কিং তং (কং) বোড়োখাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝিষ তুট বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরু মরীচি গন্ধনইরীদাপতি বিম্বু জইসা
বাতাবর্ত্তে সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বাঁঝি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া
বালুআএলেঁ সসবসিংগে আকাশ ফুলিলা
রাউতু ভনই কট ভুসুকু ভনই কট সঅলা অইস সহার
জইতো মূঢ়া অছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত বুলাইও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, ভুসুকু বলেন,—কি আশ্চর্য্য! সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্‌গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে, শান্তিদেব, রাউতু ও ভুসুকু এক। তিনি মহাযান ও সহজযান, উভয় যানেরই লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ী বাঙ্গালায়ই ছিল। এখন তিনি কোন্ কালের লোক? প্রফেসর বেণ্ডল একবার বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাসমুচ্চয় ইংরাজী সনের সপ্তম শতে লেখা হইয়াছিল। আবার বলিয়াছেন যে, না, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর ও তিব্বতের ক্রিদি সোঁসান রাজার রাজত্বের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। যদি শ্রীহর্ষের পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে হুয়েনসাং তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত তিব্বত-রাজের রাজত্বকালে তাঁহার পুস্তক তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকগুলি তাহার পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল। সুতরাং ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণাচার্য্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোঁহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে। প্রথম দোঁহাটি এই ;—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই পরমথ পবিস
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরঞ্জন লীন ॥

২য়— আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিত মান বহন্তি
পক্কসিরি ফলঅ অলি জিম বাহেরিত ভ্রমযন্তি ॥

৩য়— যোহি চিঅ রঅ ভূষিঅ ফুজ্জোহেসি হুউ
পোক্অর বীঅ সহাবহুহ নিঅ দেহ হি দিধউ ॥

৩০শ— ওঁ বুঝিঅ বিরল সহজসুন কাহি বেঅ পুরাণ
তোপো তোসিঅ বিষয় বিরপা জগুরে অশেষ পরিমান ॥

৩১শ— জে কিঅ নিচ্চল মন রঅন পিঅ ঘরণী লই এথো।
সো বাজির নাহুরে মরি বুত্তত পরমরো ॥

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের অনেকগুলি গান আছে।—

জো মন গোএর আলা জালা
আগম পোথী ইষ্টা মালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কই সেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅবাক্চিঅ জসু ণ সমায় ॥ ধ্রু ॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ কিকসইসা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

যে সকল বিকল্পজাল মনের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কায়, বাক্, চিত্ত সে সহজের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা, কারণ, যে জিনিষ বাক্‌পথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইব? যে সে বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্নু বলেন,—কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয়।

অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহি সই করিব নিবাস।
যো মন গোঅর সো উআস॥
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না।
ভনই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মোহি অহি ন পই সই॥

আলি কালি এক করিয়া, অবধূতি-মার্গ রোধ করিয়া, চণ্ডালিমার্গে গিয়া কৃষ্ণাচার্য্য আনন্দিত হইলেন। ওহে কাহ্নু, তুমি কোথায় গিয়া বাস করিবে? যাহারা বড় যোগী, তাহারাও এ ধর্ম্মে উদাসীন। যে তিনটি তিনটিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক দেখিতে গেলে তাহারা ভিন্ন নয়। ভিন্ন নয় বুঝিলেই ভবচ্ছেদ হয়। যে যে উৎপন্ন হয়, সেই সেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাদের আনাগোনা দেখিয়া কাহ্নু আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, জিনপুর অতি নিকটেই আছে। তিনি বলিতেছেন,—এখানে মোহ প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কৃষ্ণাচার্য্য এককালে বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোঁহাকোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুকহেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা না বলিলে আমার এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবে না। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই দাড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্য্যা-

চর্য্যাবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটি দিলাম ;—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিআই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥
ভনই লুই আমহে সানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইণ॥

দেহ তরুবর, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল ; লুই বলেন,—মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটী পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন,—আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ অলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

তেঙ্গুরে যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরে পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের টীকা প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশিলা বিহার হইতে ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন রত্নকীর্ত্তি। রত্নকীর্ত্তি প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞানেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। বোধ হয়, শান্তিদেব ও লুই একই সময়ের লোক, বরং তিনি কিছু পূর্ব্বে হইতে পারেন।

লুই আচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলে॥

অলক্ষলখচিতা মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলেঁ ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীনে দুলখ পরমনিবানে ॥
দুঃখেঁ দুঃখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপত্র দারিক দ্বাদশ ভুঅনেঁ লধা ॥

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল গান পূর্ব্বে তুলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্ত্তনেরই পদ। সে কালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল এবং সঙ্কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন 'চর্য্যাপদ' বলিত। এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে, বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত, কিন্তু নাথেরাও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীননাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম ;—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ডমরা ॥

এ বাঙ্গালা কবিতাটি মীননাথের। অন্যান্য নাথেরা যে বাঙ্গালায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্টীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারানাথ বলেন,—গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উহাঁকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছন্দনাথ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে

অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছন্দনাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি যত লোকায়ত ধর্ম্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই যে সকল ধর্ম্মের নাম করিলাম, ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পর মেশামেশি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে। আবার ইদানীন্তন লোকে না বুঝিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুলটা আরও পাকিয়া গিয়াছে। এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশী ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেয়। যতদিন সে ইতিহাস না হয়, তত দিন আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিব না, আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না, আমাদের কোথায় কি গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না। কোন্ বিষয়ে আমাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না। কিন্তু এরূপ ধীরভাবে বহুদিন ধরিয়া পড়িবার লোক কই? যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অর্থাগমের উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের জ্বালায় পড়াশুনাই করিতে পারে না, যাহাদের সে জ্বালা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাদের সেরূপ করিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আমাদের ইতিহাস যে অন্ধকারে আছে, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে, কিন্তু না বুঝিয়া না জানিয়া কোন কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না।

পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। বাঙ্গালা পুথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে;—১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। ৪। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কতরকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন,—আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের কথা বলিলেই শুনে, অন্য কথা বলিলে বড় একটা শুনিতে চায় না। জিনিষ কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চাই, সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালান আমাদের বড়ই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টারও অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনিগণ, ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুই জিনিষের; যাহারা পথ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে, তাহার অভাব।

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও কাজ করিবার লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে, নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্ম্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল পুথি কিনিয়াছেন, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি খণ্ডিত, গোড়া হইতে ২৮ পাতা পর্য্যন্ত আছে। শেষ নাই বলিয়া কবি পুথিখানির কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা জানা গেল না, তবে প্রতিলিপিকারক প্রত্যেক পাতার পার্শ্বে "জর্ম্মলীলা" লিখিয়া রাখিয়াছেন; তাহা হইতেই বুঝা গেল যে, এখানি "শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা"। পাতাগুলি এক ফুট লম্বা ও চারি ইঞ্চি চওড়া; দুই পৃষ্ঠে লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় নয় লাইন করিয়া লেখা আছে। পুথির অবস্থা ভাল, লেখাও খুব প্রাচীন নহে, আবার নিতান্ত আধুনিকও নহে। তাই বলিয়া কবির রচনা সে শ্রেণীর নহে। কবির সময় পরে নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ধরণের রাগরাগিণীযুক্ত নাতিদীর্ঘ পদাবলীদ্বারাই এই গ্রন্থখানি গঠিত। এই ২৮ পাতে ৬২টি সম্পূর্ণ পদ ও ৬৩ সংখ্যক পদের কিয়দংশ আছে। পুথিখানির আরম্ভ এইরূপ,—

/৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ নারায়ণপরা বেদা ইত্যাদি শ্লোক।

তাহার পরেই শ্রীরাগে কথাবস্তুর অবতারণা যথা,—

রাগশ্রী ॥

কংসরাজ নরপাত জনম লভিয়া ক্ষেতি
অসুরদলন কৈল ভার।
বষ্মতি ভারাক্রান্তে ভাবিতে লাগিলা আন্তে
কিসে মোর হইবে নিস্তার ॥
সহিতে না পারি বল কবে জাই রসাতল
এইমত ভাবে বসুমতি।
চিন্তিত হইলা মনে জাইব কাহার স্থানে
কাঁহা গেলে ঘুচিব দুর্গতি ॥
অষুরের বড় বল ভারে দুই টলবল
কোথা জাই কি করি উপায়।
ভাবে তায় বসুন্ধরা মনেতে করিল শারা
জাব মেন ব্রহ্মার সভায় ॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই দেবা তাহার করিব শেবা
এই মনে চিন্তিত উপাএ।
এই মনে দড়াইয়া চলল আনন্দ হইয়া
গেলা সেই দেবের সভাএ ॥

গেলা পৃথি সর্গগ পূরে ব্রহ্মা রুদ্র একেশ্বরে
বসীয়া আছেন দুই জনে।
হেনকালে বসুমতি অনেক করিল স্তুতি
মুঞি প্রভু আইল দরশনে॥
কহে ব্রহ্মা মহেশ্বর কেন আইলে যুগোচর
কহ যুনি কোন বিবরণ।
কহে তবে করপুটে দুই দেব সনিকটে
মোরে রক্ষা কর দুই জন॥
কোন প্রীয়োজন আছে কহ ২ মোর কাছে
যুনি তার করিব বিচার।

* * * * *

কহে তবে বসুন্ধরা হইয়া (?) কাতর পারা
যুনি দেব ধরনির কথা।
শ্রবন পরশী যুনি ব্রহ্মা দেব যুলপানি
চণ্ডিদাষ বড় পায় বেথা॥ ১॥

শেষ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং পুথিখানির সমাপ্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা গেল না। শেষে কবির কোন পরিচয়, গ্রন্থের কোন পরিচয় বা রচনাকালের কোন উল্লেখ ছিল কি না, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। যে ৬২টি সম্পূর্ণ পদ এই ২৮ খানি পাতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের শেষাংশ হইতে আমরা নিম্নোক্ত কয় প্রকার ভণিতা পাইয়াছি,—

(১) চণ্ডীদাস বড় পায় বেথা॥
(২) চণ্ডীদাস বলে যুন দুই জনে
(৩) চণ্ডীদাস কহে সেই যে দেখহে
(৪) চণ্ডীদাসে বলে বড়ই অদ্ভুত
(৫) দিন চণ্ডীদাস বলে॥
(৬) দিন চণ্ডীদাসে গান।
(৭) দিন চীণ্ডদাস গায়।
(৮) দিন চণ্ডীদাস বলে।
(৯) দিন চণ্ডীদাস ভনে।

এইরূপে 'চণ্ডীদাস' ও 'দীন চণ্ডীদাস' ব্যতীত এই ৬২টি ভণিতা হইতে কবির সম্বন্ধে আর কোন কথা জানিবার উপায় নাই।

ইহা ব্যতীত এই ৬২টি পদ হইতে আমরা আর যাহা যাহা নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম পদটিতে কংসাসুরের অত্যাচারে ও তাহার দল-বলের ভারে পৃথিবী-পীড়িতা হইয়া উদ্ধারের আশায় ব্রহ্মা ও শিবের শরণ লইবার সঙ্কল্প করিয়া এমন এক স্থানে গেলেন যে, সেখানে ব্রহ্মা ও শিব দুই জনে একত্র হাজির ছিলেন। দ্বিতীয় পদটিতে বসুমতী নিজের দুর্দ্দশা শুনাইলেন। তৃতীয় পদটিতে ব্রহ্মা ও শিব দুই জনে পরামর্শ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের উপায় যাহা বলিয়া দিলেন, তাহা যে তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে, তাহা যে বেদোক্ত বিধান, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখ বেদ-বিহিত বিধি স্মরণ করিয়া উপায় বিধান করিলেন, ইহা বড়ই শোভন বটে, কিন্তু কবির নিজের ভাষায় তাহা শুনিলে, তবে তাহার বৈদিক পারিপাট্যটা ভাল রকম বুঝাইবে বলিয়া সেটিও আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

জয়শ্রী ॥

করজোড়ে আছে　　বসুমতি দেবি
কহেন কাতর বানি।
কিরূপে আমার　　পরিত্রান হয়ে
কহ ঠাকুর তুমি ॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই　　বশী এক ঠাঞি
যুগতি হইল সারা।
সত্যযুগ পরে　　বেদে নাম ধর
দ্বাপরে আছয়ে ধারা ॥
পুর্ন সনাতন　　লিখিল পুরান
কৃষ্ণবর্ণ অবতার।
বেদে জে কহিল　　তাহাই হইল
সুনহ বচন সার ॥
দুই জন ইহা　　করিল বচন
কহিয়া বেদের বানি।
শুক্ল রক্ত পিত　　বরন বিভিন্ন
কৃষ্ণ অবতার গুনি ॥
তেই সে উৎপতে　　অসুর ভারেতে
ধরনি রহিতে নারে।
অতএব নানা　　বেদ অধ্যায়ন
টেলয়ে অসুরাসুরে ॥

চণ্ডিদাষে কহে সেই যে দেখহে
তার সে তোমরা থল।
কেমতে এ সব পরিত্রান হয়ে
হই দুঃখ কর দুর ॥ ১ ॥

চতুর্থ পদে ব্রহ্মা ও শিব ধরণীকে লইয়া ভগবান্ অনন্ত-শয়নের নিকট গেলেন। ধরণী কিন্তু স্বীয় বেশ লুকাইয়া গাভীরূপ ধরিয়া চলিলেন। লক্ষ্মী দেবী অনন্তশায়ীর চরণসেবা করিতেছিলেন, তিনি গরুটিকে দেখিয়া একবারে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কেন বা আইলে গাবি।
কি নিমিত্তে কাজ কহ না উত্তর
নিজের অন্তরে ভাবি ॥

এই হুকুম পাইয়া—

কহিতে লাগিলা সেই গাভীবর
লক্ষ্মীর আদেশে কয়।

পঞ্চম পদে গাভী বলিল,—

মুঞি নহি গাভি অবলা জনম
মোর নাম বসুন্ধরা।

তারপর অসুরের ভারের কথা জানাইল এবং বলিল,—

দুর্গতি নাশিতে আর কেবা আছে
গোলোক ঈশ্বর বই।
তেঞি শে আইনু প্রভুর গোচর
সকল বেদনা কই ॥

লক্ষ্মী শুনিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

সকলি সফল করিব তোমার
কোনহুঁ না হব দায়।

তবে কি জান? এখন,—

প্রভুর নিদ্রায় মন।
নিদ্রাভঙ্গ হলে সব নিবেদিব
দিন চণ্ডীদাস কন ॥

এইটুকু কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই—

চৌদ্দ মন্বন্তর গেলা কত যুগ
জেমত বিম্বক কায়া।

ষষ্ঠ পদে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনি—

ভ্রিঙ্গারের জল আনি জগাইল
সেই লক্ষ্মি দেবি রাণি।

দয়াময়ও কটাক্ষ ইঙ্গিতে গাভীর প্রতি নজর পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—

কেন বা আসিলে হেথা।

গাভীও অমনি—

কহিতে লাগিল সকল বির্ত্তান্ত
পুরুবকাহিনী কথা॥

চক্রপাণি "হাসিয়া মুদিলা আখি" এবং—

ধিয়ানে জানল সকল বির্ত্তান্ত
পাইল অসুর সাথা।

সপ্তম পদে বসুমতী নিজ দুঃখ বিস্তৃত করিয়া জানাইয়া বহু প্রকারে স্তব করিল।

অষ্টম পদে শ্রীহরি ধরণীকে বলিয়া দিলেন,—

ইহার উপায় রচিব সকল
নিজ স্থানে জাহ তুমি।

তাহার পর—

ধরণিরে তুসি বৈকুণ্ঠ ইশ্বর
ছাড়িয়া নিশ্বাস নাসা।
তাহে উপজিল এক নিরমল
রূপসি সুন্দরী পাসা॥

এই 'পাসা' যে কি, তাহা বুঝিলাম না। ইহা 'থাসা' হইলে থাসা মানে হইত; কিন্তু পুথির অক্ষরটি বড় স্পষ্টাকৃতির 'প', কোন সন্দেহ করিবার উপায় নাই। তবে যদি লেখক-প্রমাদ বলিয়া কোন দোহাই দিয়া অন্যার্থ করা যায়। তারপর এই রূপসীর তিলোত্তমার মত রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

নবম পদে ভগবান্ এই যুবতীকে লইয়া একটু বিপদে পড়িয়াছেন; তিনি ভাবিতেছেন,—

এমন রূপসি কাহে সমর্পিব
ইহাই ভাবিএ মনে।

নিজে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া—

চাহেন লক্ষ্মীর পানে।
হাসি লক্ষ্মী দেবী স্বরর্থ হইআ
চাহেন চরণ পানে॥

তাহার পর বলিয়া দিলেন,—

ভোলা মহেশ্বর কৈলাস ইশ্বর
ইহারে বরণ করি।

আর—

লক্ষির বচন কমললোচন
লইল মানস পুরি ॥

এইরূপে ভগবানের নিশ্বাসে তিলোত্তমা সুন্দরী জন্মিল এবং লক্ষ্মীর ঘটকালীতে ভগবান্ তাহাকে ভোলা মহেশ্বরের হাতে দিতে রাজি হইলেন। ইহার এরূপে উৎপত্তি এবং এরূপে সম্প্রদান-ব্যবস্থা লিখিয়া কবি এইখানে একটি বেশ কৈফিয়ত দিয়াছেন। কৃষ্ণজন্মলীলায় কেহ কোন পুরাণে আর কখন এমন কথা ত শুনে নাই, তাই কবি চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

চণ্ডিদাস বলে অদ্ভুত কথা
বড়ই বিসম কথা।
এ সব কাহিনী দশমে না পাবে
অনহু পুরাণে জাতা ॥

'দশমে' অর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই কাহিনী নাই, তবে কোথায় আছে? না—অনহু পুরাণে, অর্থাৎ অন্য পুরাণে আছে। চণ্ডীদাস ফাঁকি দিবার লোক নহেন, 'অনহুঁ পুরাণে জাতা' বলিয়া তিনি কথাটা চাপা দিয়া যাইবার লোক নহেন। দশম পদের গোড়ায় তিনি বলিতেছেন,—

সির্দ্ধপুরাণে ব্যাসের বর্ণনে
এ সব কাহিনী আছে।
শ্রীভাগবতে না পাবে বেকতে
এ কথা কহিব পাছে ॥

কবি "পাছে" এ কথা আরও খুলিয়া কহিয়াছেন কি না, এ খণ্ডিত পুথি হইতে তাহা বলিবার উপায় নাই; কিন্তু কবির কৃপায় আমরা ব্যাসোক্ত 'সিদ্ধপুরাণে'র অস্তিত্ব-সংবাদ পাইতেছি এবং তদুক্ত অন্ততঃ একটিও নবীন উপাখ্যানের পরিচয় পাইতেছি। এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিসংগ্রাহক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ন্যায় চণ্ডীদাসোক্ত এই 'সিদ্ধপুরাণ'খানিকে কাহারও মাচার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিলে, ব্যাসের কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আর একটি সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এবং দুনিয়াতেও এক অশ্রুতনাম অভিনব পুরাণের অস্তিত্ব জাহির হইবে।

তাহার পর ব্রহ্মা ও শিব নিকটে আসিলে হরিই পৃথিবীকে দেখাইয়া কংসের অত্যাচার বর্ণনা করিলেন। এইখানে পুথিতে একটি চমৎকার বানান-রহস্য আছে। "ভাল হৈল দুহে আইলে অেথাতে।" এখানে 'এথাতে' লেখা হইয়াছে অ-তে ে-কার যোগ করিয়া। হাতের

লেখা পুথিতে অনেক উদ্ভট উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার বানান দেখা যায়, কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুশৃঙ্খল বানান-বিকার আর দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তাহার পর নারায়ণ বলিয়া দিলেন,—

পুরুব কাহিনী অবতার বেদ
সেই হল্য অভিপ্রায়।

অর্থাৎ নারায়ণ বেদের পূর্ব্বকাহিনী অনুসারে অবতার হইবেন, স্থির হইল এবং কিরূপে লীলা হইবে, তাহারও গ্রন্থসম্মত নজীর ধরিয়া দিলেন,—

সেই সে নিখিল পুরাণ কথন
দশম আক্ষ্যান রীতে।
দিভুজ মুরুলি বদনে সদনে
করিব ব্রজের ভিতে॥

অতএব ঠিক হইয়া গেল, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিধান লইয়া নারায়ণ কৃষ্ণ অবতারের কার্য্য ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর—

ব্রহ্ম হর আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক কায়।

এই বলিয়া দ্বাদশ গোপালের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পর একটি নূতন ব্যবস্থা করা হইল।—ত্রয়োদশ পদের প্রথমেই আছে,—

প্রভুর নিশ্বাসে রূপসি জন্মিল
তাহার সুনহ বানি।
দেব সুরপুরে পুষ্পমাল্য গন্ধে
বরন করিল আনি॥
দেব সুলপানি আনি চক্রপানি
থাপিল তাহার হাথে।
ইহার পোসন করিবে জতন
দিলাম তোমার হাথে॥
জখন সপ্তম বালক ধরিব
সেই সে অসুর কংস।
মায়ের বেদন বড় উপজিব
করিব বালক ধ্বংশ॥
এ সব আগেতে উৎপাত হইব
অষ্টম গর্ব্ভের কালে।

এই সে রূপসি কাত্যাঅনি নাম
জন্মিল নন্দের ঘরে ॥
জসোদা উদরে জন্মিব সাদরে
ভাণ্ডিব কংসেরে দিয়া।
আমারে লইব বসুদেব পিতা
রাখিব তথাই নঞা ॥
গোকুলে রাখিব নন্দের ভুবনে
ভবানি আনিব ইথে।
এই শব হব অষ্টম গর্ব্ভেতে
কহিল পুরুব রিতে ॥
গোলক ইশ্বর এ কথা কহিআ
ভব বিরিঞ্চির আগে।
ব্রজগোপকুলে সুখে জন্ম গিয়া
জাইব পর্ছ্যতভাগে ॥
চণ্ডিদাস বলে দৈবকী োদরে
জন্মিব গোলক হরি।
অষ্টম গর্ব্ভেতে প্রভু ভগবান্
রাসলিলা অবতারি ॥ ১৩ ॥

এতক্ষণে সিদ্ধপুরাণোক্ত বিষ্ণু-নিশ্বাসজাতা সুন্দরীর প্রয়োজন যে কি, তাহা বুঝা গেল। এই পদের 'দৈবকী োদরে' পদে—অ-তে ো-কার দিয়া উদর স্থলে 'ওদর' বানান করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ পদে দৈবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর ১৪।১৫।১৬ ও ১৭ পদে কংসভয়ে নন্দালয়ে পুত্র রাখিবার পরামর্শ। সপ্তদশ পদে বসুদেব বলিতেছেন,—

দৈবকী দেখিআ বসুদেব কহে
সুন্তাছি পুরাণ কথা।

* * * *

এবং অন্যত্র—

সুন্যাছি পুরাণে ব্যাসের বচনে ইত্যাদি—

অর্থাৎ ব্যাসোক্ত কৃষ্ণজন্মের বিবরণ রাম না হইতে রামায়ণের মত স্বয়ং কৃষ্ণের বাপ-মাও পূর্ব্বেই শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কবির কৃপায় তাহার সহিত যেন রেওয়া মিলাইয়া লইতেছেন। তাহার পর উনবিংশ পদ পর্য্যন্ত স্তব-স্তুতি, যমুনা-যাত্রা ও যমুনার তরঙ্গে উত্তরণ প্রভৃতি—শিশুপতনের আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে। উনবিংশ পদে দুটি নূতন শব্দ পাইয়াছি,—

(১) "চৌদিকে সন্তনা জাইব কেমনে"—অর্থাৎ সন্তনা অর্থে প্রহরী।

(২) "দ্বারের ভসলা আপনি খসিল"—ভসলা অর্থে বন্ধন, না অর্গল, না তালা? এই দুইটি শব্দ ধরিয়া কবির মাতৃভূমি কেহ ঠিক করিতে পারিবেন কি?

তাহার পর ২০।২১।২২।২৩ পদে কৃষ্ণের ভগবতী স্মরণ, তাঁহার শিবারূপে পথপ্রদর্শন, যমুনা-স্তুতি, যমুনায় শিশু পতন, বসুদেবের খেদ ও শিশুর পুনঃপ্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ২৪।২৫ পদে শিশুলাভে নন্দ-যশোদা ভাগ্য বলিয়া মানিতেছেন ও শিব-বরে এমন ছেলে পাইয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ২৬ সংখ্যক পদে বসুদেব নন্দকে কংসের চরের হাত হইতে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া রাতারাতি চলিয়া আসিতেছেন,—এইটা নূতন কথা। সমস্ত পুরাণে আছে, বসুদেব নন্দ-যশোদার অজ্ঞাতে পুত্র রাখিয়া কন্যা লইয়া আসেন, আর সেই জন্যই নন্দ-যশোদার কৃষ্ণে পুত্র-বুদ্ধিও অকৃত্রিম হইতে পারিয়াছিল। কবি চণ্ডীদাস এই পদটি লিখিয়া আসলে গলদ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখানেও বসুদেব নন্দকে "আর দেব বাক্য, সেই হব সাক্ষ্য, পুরবকাহিনী আছে" বলিয়া নন্দকে বন্ধু-পুত্রপালনে এবং নিজ কন্যা শত্রুহস্তে মরিবার জন্য দান করিতে সম্মত করিলেন—ইহা আরও নূতন ও বিস্ময়কর কথা। পুরাণের দোহাই দিয়া এমন করিয়া পুরাণ উল্‌টাইতে কোন বৈষ্ণব লীলালেখককে ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ২৭ পদে কংস কন্যাজন্মের সংবাদ পাইলেন। অষ্টাবিংশ পদে মহামায়ার অভিশাপ, উনত্রিংশ পদে গোকুল নগরে গত দিবসে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহা আনিবার জন্য কংসের দূত নিয়োগ বর্ণিত আছে। এই পদে,—

কালি নিশাকালে　　　একটি ছাআল
জসদা প্রসবে সুখে॥
ঘানা ঘোনা সুনি　　　না দেখি নআনে
গোচর করিলাম তোএ।

এখানে "ঘানা ঘোনা" অর্থে "কাণাকাণি" বটে, কিন্তু কোন্ দেশের কথা? ইতিপূর্ব্বে পঞ্চদশ পদে আমরা পাইয়াছি,—

এমত ছাআলে　　　রাখিবার তরে
অনেক ভাবন বরে॥
এই কানঘোনা　　　পাইছে বেদনা
দুহার জাতনা দেখি।

এই পদের এই 'কানঘোনা' শব্দের অর্থ ঐ কাণাঘুষার মত কাণে কাণে পরামর্শ। এখন 'কানঘোনা' ও 'ঘানা ঘোনা' একই দেশের একই অর্থপ্রকাশক দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ, না এক অন্যের বিকৃতিজাত? তারপর ৩০।৩১ পদে নন্দের শিশুহত্যার পরামর্শ বর্ণিত হইয়াছে। ৩২।৩৩।৩৪।৩৫ পদে নন্দোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ৩৬।৩৭ পদে শিশুপ্রশংসা ও ৩৮ পদে শিশু-দর্শনে শিবাগমন বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টি পদে শিশুর ক্রন্দন থামাইবার জন্য

যশোদা সন্ন্যাসী দেখিয়া শিবকে ঝাড়ফুঁক করিতে বলিতেছেন, বাও-বাতাস না লাগে, তজ্জন্য ঔষধ বাঁধিয়া দিতে হাতে পায়ে ধরাধরি করিতেছেন, শিব বিষ্ণুনামমালা পড়িয়া শিশু-রক্ষা মন্ত্র পড়িতেছেন, ইত্যাদি বর্ণনা আছে। ইহাও নূতন কথা,—হিন্দুস্থানের নন্দোৎসবে এইটি একটি বিশেষ ঘটনা। ভাগবতে ইহার কোন উল্লেখ নাই বা আর কোন বাঙ্গালী কবিকেও ইহা বর্ণনা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কবিও সে কথা ৪৬ সংখ্যক পদে আমাদের বলিয়া দিতেছেন, যথা,—

এ কথা কহিল আগম পুরাণে
নিখিল ব্যাসের সুত্র।
অষ্টদশ গন্থ কনখানে আছে
ফুট্‌কে কহিবে * * ॥
* * বৈবর্ত্তে লিখন পুরাণে
নবম অধ্যাত্তে পাবে।
মহাদেব জুগি আইলা গোকুলে
কৃষ্ণ দরশন লোভে ॥
* * * এ লিঙ্গপুরাণে
লেখিআছেন ব্যাসবরে।
লিঙ্গের পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়
পাইবে মনের সবে ॥
* * * কৃষ্ণ দরশন
আইলা জে সুলপানি।
আগমে পাইবে এ সব বচন
জে কথা কহিল আমি ॥
দশমে * * * * ব্যাস
ভাগবতে কেনে নাহি।
অন্য উপদেশ কহিঅে এ সব
আগে জে কহিল তাহি ॥
দশমে * * নহে দরশন
অন্য উপদেশ বানি।
চণ্ডিদাস কহে মধুর বচন
ফুটকে কহিল আমি ॥

তাহার পর ৪৮ সংখ্যক পদে শিব যশোদাকে কৃষ্ণাবতার-রহস্য-কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া শিশুকে সাবধানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

তাহার পর ৪৯।৫০ পদে কবি নিজ ভাষায় "বৃন্দাবন-রস, রস আস্বাদিতে, জন্মিল গোলক হরি"—এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহার পর ৫১ পদ হইতে পুনরায়—

এবে কহি সুন   বাল্যলিলা কিছু
শ্রবণ পরসি সুন।
চণ্ডিদাস কহে   রসলিলা সার
সংসারে নাহিক হেন ॥

ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর কয়েকটি পদে চাণূর-মুষ্টিক প্রেরণ ও নন্দের ঘোষযাত্রা বর্ণিত আছে। ঘোষযাত্রার শেষে কবি কংসালয়ে নন্দ-বসুদেবের মিলন ঘটাইয়া বসুদেবকে দিয়া বলাইয়াছেন,—

কহে বসুদেব   সুন নন্দঘোষ
বালক দিআছি তোহে।
বুঝিয়া জাকর   তোমারে সপিনু
কি কবে আমার মোহে ॥
বংশ রক্ষ্যা জদি   পারহ রাখিতে
তবে সে বড়াই বড়।
ইহাকে অধিক   আর কি বলিব
তোমারে কহিল দড় ॥

তারপর পূতনা প্রেরণ ও পূতনা-বধ-বর্ণনায় ৬০ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। ৬১ সংখ্যক পদে গোকুলবাসীর বিস্ময় বর্ণিত আছে। ৬২ সংখ্যক পদের আরম্ভ এইরূপ,—

রাজা পরিক্ষিত   কহিতে লাগল
সন্দেহ হইলা মনে।
সুনহ গোসাঞী   ব্যাসের নন্দন
পুছি এ তোমার স্থানে ॥

এমন করিয়া কথাবন্ধ কিন্তু এ পুথির আর কোন পদে নাই, পুথির আরম্ভেও নাই। এই যে অতর্কিত ভাগবতানুসরণ, ইহা পদাবলীবন্ধ পুথির উপযোগী নহে। ইহা যেন মাহাত্ম্য বা মঙ্গল-গ্রন্থ লিখিবার রীতি। হঠাৎ এমনটা কেন হইল, কিছু বুঝা যায় না। পরে আর ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই পর্য্যন্ত বিবরণ এ পুথিতে আছে। পুথিখানির বিশেষত্ব,—পুথিখানিতে 'য' ও 'ণ' মোটেই ব্যবহৃত হয় নাই। দীর্ঘ উকারযুক্ত শব্দ মোটে নাই। কেবল র-এ উ বা উকার-যোগে সর্ব্বত্র 'রূ'-রূপই লিখিত হইয়াছে। দীর্ঘ ঈকারযুক্ত শব্দ অতি সামান্য। 'স'-দ্বারা সমস্ত শ-এর কাজ চালান হইয়াছে। দুএক স্থানে শ-কে দেখা যায়। 'য়' মাঝে মাঝে অতি বিরলভাবে

চোখে পড়ে, কিন্তু 'অ' ও 'য়'—উভয়ের স্থানেই অ-কারের অবাধ প্রয়োগ দেখা যায়। রেফের প্রয়োগে যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়; উর্ত্তম, বির্ত্তান্ত, ভির্ন আছে, আবার 'তপফলাজিত', 'ধম্ম' 'কম্ম' ইত্যাদিও আছে। অ-কারে ে-কার যোগ, ো-কার যোগ অনেক দেখা যায় এইটিই এ পুথির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। কোথাও 'ছাওয়াল' বা 'ছাবাল' নাই—সর্ব্বত্র 'ছাআল' আছে। 'বলিয়া' 'করিয়া' আছে, 'বল্যা' 'কর্যা' নাই, কিন্তু 'পাঞ্যা', 'হঞ্যা' আছে। 'পাইলাম' 'করিলাম' আছে, 'পাইলাঙ' 'করিলাঙ' নাই। 'বলিআ' 'করিআ' আছে, আবার 'লইঞা' 'পাইঞা' 'ধরিঞা'ও আছে। 'হঞা' 'পাঞা' 'দঞা' ইত্যাদিও আছে।

পুথিখানির বিবরণ এই পর্য্যন্ত। অতঃপর কবি ও কবির সময় সম্বন্ধে দু কথা বলিতে হইবে। গ্রন্থখানি রাগ-রাগিণীযুক্ত পদাবলীতে লেখা এবং গ্রন্থকারের নাম চণ্ডীদাস শুনিলেই, বিদ্যাপতির সমসাময়িক, বাশুলী-সেবক, রজকী রামীর সাধক নায়ক, কবিরাজ বড়ু চণ্ডীদাসকে মনে পড়ে; কিন্তু আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুও সাহস হয় না। চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত সুপরিচিত পদাবলীগুলি ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্ব্বে আর দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। একখানির পরিচয় দিয়াছেন, চট্টগ্রামের মুনশী আবদুল করিম। সে গ্রন্থখানির নাম—"রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।" নরোত্তমের নামযুক্ত রাধার 'মান-ভঙ্গের' ছন্দের ন্যায় ছন্দে সেখানি রচিত। এই গ্রন্থখানির বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার ৯ম ভাগের অতিরিক্ত সংখ্যার (পুথির বিবরণের ৫৫ পৃষ্ঠায়) ৭৬ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন পরিষৎ পত্রিকার ৫ম বর্ষে চণ্ডীদাসের "রাসলীলা"-বিষয়ক অনেকগুলি পদ ও 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' নামে কতকগুলি পদ ছাপা হইয়াছে। সেগুলি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী লইয়া 'গীতচিন্তামণি' নামে গ্রন্থ ছিল; কিন্তু সে পক্ষে এখনও কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পরিষৎ যেখানি শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছেন, সেখানি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেরই রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সে ঝঙ্কার নাই, সে সহজ সরল ললিত শব্দবিন্যাস নাই, সে মনোহর ভাবও নাই। এগুলিও সুরবদ্ধ পদ্য ভিন্ন আর কিছু নহে। সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীতে ভণিতায় "বাশুলী আদেশে", "বড়ু চণ্ডীদাসে ভাষে" প্রভৃতি পদবিন্যাস যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাঁহাকে এই জন্মলীলার "দীন চণ্ডীদাসে কহে" ভণিতার মধ্যে দেখা যায় না। 'কলঙ্কভঞ্জনে'র কবিও যে বাশুলী আদেশপ্রাপ্ত বড়ু চণ্ডীদাস, তাহা এই গ্রন্থখানির প্রকাশে সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িল। কলঙ্কভঞ্জনের কবির কবিত্ব এবং কাব্য, জন্মলীলার কবির কবিত্ব ও কাব্য হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, জন্মলীলা চণ্ডীদাসের কবিত্ব-চেষ্টার প্রথমাবস্থার রচনা, কলঙ্কভঞ্জন মধ্যমাবস্থার রচনা এবং সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীগুলি তাঁহার পরিণত কবিত্ব স্ফূর্ত্তির

ফল। তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পদাবলী-সাহিত্যের সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় ২০শ ভাগ ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কবিত্ব সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের নামে চণ্ডীদাসের রচনায় অনেক ভেল চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি ধরিবার উপায়ও তিনি কতক কতক বাহির করিয়াছেন। পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে সে সকল পরীক্ষার সুবিধা হইবে।

ভাষার যে নমুনা দিলাম, তাহাতে জন্মলীলার কবি চণ্ডীদাসকে কবিকঙ্কণের পাশাপাশি লইয়া গেলে অন্যায় হইবে না। পুথিখানিরও বয়স দেড় শত বর্ষের অধিক হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে যত ঘনিষ্ঠভাবে এক বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় এবং উভয় শ্রেণীর পদাবলীতে রচনারীতি ও পদবিন্যাসের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায়, ততটা অন্য চণ্ডীদাসদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিন জন অথবা দুই জোড়া বা চারি জন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা*

বাঙ্গালা ভাষা মানভূমে কিছু "কোণ-ঠেসা" হইয়া পড়িয়াছে। এইখানেই বঙ্গভাষার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। জেলা পার হইয়া পশ্চিমে হিন্দি ও দক্ষিণে উড়িয়া মস্তক উন্নত করিয়াছে। তাহার উপর এখানে সাঁওতাল, ধাঙ্গর, খেড়িয়া প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বহুসংখ্যায় বাস করে। অনার্য্য জাতির ভিতর আজিও অনেকে আপনাদের মধ্যে তাহাদের আদিম ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণের ভিতর অনেকে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত ছত্রিশগড় রাজ্য হইতে আসিয়াছে। এই সকল প্রবাসিগণ আপন আপন জন্মস্থান হইতে ভাষার পৃথক্ পৃথক্ রীতি আনয়ন করিয়াছে। এই প্রকারে বিবিধ ভাষায় ও বিভিন্ন রীতির চাপে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা এখানে কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া পড়িয়াছে।

মানভূমে ভাষার কোমলতার দিকে লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই। নিয়ত ঠ-ঢ-বহুল মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষার সংস্রবে থাকিয়া ভাষার কোমলতা সম্পাদন সম্বন্ধে লোকে কোন চেষ্টা করে না। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের ভাষা কতকটা মানভূমী ভাষার অনুরূপ। কিন্তু বাঁকুড়ায় কোমলতা সম্পাদন জন্য লোকে যে প্রকার আনুনাসিক-বাহুল্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এখানে তাহা নাই। এখানে লোকে যে প্রকার দৈহিক বলে বলীয়ান্, সেই প্রকার সবলে ভাষার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ভাষার উপর খ, ছ, ফ, ঠ ঢ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ বা aspirateএর প্রাধান্য কিছু অধিক। এখানে যে কোন কথা উচ্চারণ করিতে হইলে লোকে তাহার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়া দীর্ঘ ও ঘোরাল শব্দ নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সম্যক্ কথিত ভাষার উপর এই উপদ্রব নির্দ্দয়ভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে।

শ, ষ, সএর সম্যক্ উচ্চারণপার্থক্য বাঙ্গালা ভাষায় নাই,—এখানেও নাই। তবে এখানে শ মাত্রেরই উচ্চারণে কিছু অধিক পরিমাণে হিন্দির প্রাধান্য অনুভূত হইয়া থাকে। শ-বর্ণের উচ্চারণ কতকটা স্ বা ছ-বর্ণের মত, অথবা উভয় বর্ণের উচ্চারণের মধ্যবর্ত্তী। কথিত ভাষায় তালু ও মূর্দ্ধা দন্তের নিকট পরাস্ত।

অন্যান্য স্থানে যে প্রকার আকারান্ত শব্দের 'আ' স্থানে 'এ' সংযুক্ত করিয়া কোমলতা বিধান হয়, এখানে তাহা হয় না। বাঙ্গালার চিরপরিচিত 'আজ্ঞে' এখানে মস্তক উন্নত করিয়া আছে। যে কোন গ্রাম্য লোকের সহিত কথা কহিলে অসংখ্য 'আজ্ঞা'র প্রবাহ শ্রোতাকে প্লাবিত করিয়া দিবে। 'আজ্ঞা'র সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হইবে।

---

* এই প্রবন্ধের কতকাংশ ইতিপূর্ব্বে "ঊর্ম্মিকা" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

শব্দান্তক 'ই' বা 'ইয়া' এখানে 'য্+আ' বা 'যা'এ পরিণত হইয়াছে। 'মতি' এখানে লিখিত ভাষায় 'মত্যা' এবং কথিত ভাষায় 'মৎত্যা' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নিয়মানুসারে 'গড়িয়া', 'গড্যা' এবং 'খেড়িয়া' 'খেড্যা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষায় এই য্+আ অন্তক শব্দের সংখ্যা নিতান্ত প্রচুর। এই য্+আ বা 'যা'এর উপদ্রব স্থলবিশেষে সাধারণ বাঙ্গালা বানানের নিয়মকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। র্+য্ সংযুক্ত হইলে 'র্য্য' হওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের রীতি। কিন্তু এখানে 'র‍্যা' ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু র্+য্+আ বর্ণের সংমিশ্রণে 'র্য্যা' হয় না। এ দেশে পিত্তলের কলসী বা ঘড়ার নাম 'গর‍্যা'। লিখিত ও কথিত উভয় ভাষাতেই এই 'গর‍্যার' দর্শন মিলিবে। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হইলে 'গর‍্যার' যে মূর্ত্তি হইবে, লোকে তাহা চিনিবে না।

'তুমি' শব্দের সম্বন্ধপদে 'তোমার' হওয়া উচিত। কিন্তু লোকে বলিবে ও লিখিবে 'তুমার'। তাহার পর বাঙ্গালার পরিচিত 'আইল' বা 'আ'ল' শব্দ এখানে 'আড়' হইয়া পড়িয়াছে। 'ল্' ও 'ড়'এর এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

পদের প্রথম অক্ষরে 'ন' থাকিলে এখানে সাধারণতঃ ঐ 'ন' স্থানে 'ল' আগম হয়। এখানে 'নাগা' সন্ন্যাসী কেহ বলিবে না, তাহার পরিবর্ত্তে 'লাগা' কথার ব্যবহার করিবে। এই নিয়মানুসারে 'নয়' ক্রমশঃ 'লয়' ও 'নাতি' 'লাতি'তে পরিণত হইয়াছে।

এখানে লোকে কয়েকটি কথার অক্ষরগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রলা' স্থানে 'লরা', 'বাতাস' স্থানে 'বাসাত' ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'পুতিয়া দিলাম' এই বাক্য মানভূমী ভাষায় অনূদিত হইলে, 'তুপা দিলি' এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

'গিয়াছে' বা 'গেছে' শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে মানভূমের লোকে তাহার মধ্যভাগে একটি 'ল' সংযুক্ত করিয়া দিবে। 'রাম কলিকাতায় গিয়াছে', এই বাক্য স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইলে দাঁড়াইবে, 'রাম কল্‌কাত্তাকে গেল্‌ছে।'

'আছাড়' কথার পূর্ব্বে মানভূমে 'ক্' আগম হইয়া থাকে। 'আছাড়' এখানে 'কাছাড়' হইয়া গিয়াছে। 'আছাড় দিব' বলিতে হইলে লোকে বলিবে—'কাছাড়্যা দিব।'

ভবিষ্যৎকালে সমাপিকা ক্রিয়ার পর তৃতীয় পুরুষে বিকল্পে 'ক' প্রয়োগ সাধারণ বাঙ্গালা ভাষায় আছে। পরমপূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকে উক্ত প্রকার 'ক'এর দানসাগর করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানভূমী বাঙ্গালার নিকট স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও হার মানিতে হইয়াছে। এখানে উপরোক্ত স্থলে একটিও 'ক'-বর্জ্জিত পদ ব্যবহৃত হয় না। 'হইবে', 'যাইবে', 'করিবে' ইত্যাদি পদ এখানে একেবারেই নাই। প্রত্যেক স্থলেই এখানে 'হইবেক', 'যাইবেক', 'করিবেক' ইত্যাদি পদের ব্যবহার প্রচলিত।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কর্ম্ম ও সম্প্রদান-কারকে শব্দের পর 'কে' যোগ

হয়। কিন্তু মানভূমে গত্যর্থক ক্রিয়াপদের অধিকরণেও 'কে' যোগ হইয়া থাকে। 'ঘরে যাও', 'মাঠে চল', 'বাড়ীতে যাও' ইত্যাদি স্থানে এখানে লোকে বলিবে,—'ঘরকে যাও', 'মাঠকে চল', 'বাড়ীকে যাও' ইত্যাদি। এই প্রকার ব্যবহার কতকটা সংস্কৃত 'গৃহং গচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যের অনুরূপ।

উপরোক্ত প্রকার ব্যবহার ব্যতীত এখানে 'কে'র অপর একপ্রকার ব্যবহার আছে। যিনি মানভূমে না আসিয়াছেন, তিনি এই প্রকার ব্যবহারের কথা কল্পনায় আনিতে পারেন না। 'আনিবার জন্য', 'কিনিবার জন্য' ইত্যাদি বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে অসহায় 'কে' ব্যবহৃত হয় এবং 'কে' উপরোক্ত বাক্যাংশগুলির অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। 'কে'র এই প্রকার ব্যবহারকে স্থানীয় ভাষার একটি বিশেষ রীতি বা idiom বলা যাইতে পারে। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে এইপ্রকার ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা—	মানভূমের প্রচলিত ভাষা—
জল আনিতে যাও	জলকে যাও।
ঘাস কাটিতে গিয়াছে	ঘাসকে গেল্‌ছে।
মাছ ধরিতে যাইবে	মাছকে যাইবেক।
তামাক কিনিতে চল	তামুককে চল।

'যাব না', 'করিব না', 'আসিবে না', ইত্যাদি স্থলে 'না'র পর একটি 'ই' যোগ করা এখানকার রীতি। উক্তপ্রকার বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে 'যাব নাই', 'করিব নাই', 'আসিবেক নাই' ইত্যাদি সাধারণতঃ মানভূমের চলিত রূপ। এই 'নাই' হিন্দি 'নেহি'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

'না' শব্দের অন্য একপ্রকার বিকৃতি বা রূপান্তর এখানে পরিলক্ষিত হয়। 'যাবি না?' 'করিবি না?' ইত্যাদি স্থানে মানভূমে বলিবে, 'যাভি নঃ?' 'করভি নঃ?' ইত্যাদি। 'না' শব্দের পরিবর্ত্তে জিজ্ঞাস্য স্থলে বিসর্গান্ত 'ন' শব্দের প্রয়োগ মানভূমের সাধারণ রীতি।

এইপ্রকার বিসর্গান্ত 'ন' অক্ষরের অনুকরণে আর একটি অক্ষরের উপর বিসর্গ যোগ করা হইয়া থাকে। এই অক্ষরটি 'ব'। পূর্ব্বাঞ্চলে স্নেহসহকারে যেরূপ স্থলে লোকে 'যা বাবা', 'খা বাবা' ইত্যাদি বলে, সেইরূপ স্থলে এখানে 'বাবা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপরোক্তপ্রকার স্থলে এখানে বলিবে,—'যা-বঃ' 'খা-বঃ' ইত্যাদি। 'বাবা' শব্দ এইপ্রকারে রূপান্তরিত হইলেও পিতাকে কেহ 'বঃ' বলিয়া সম্বোধন করে না। সেরূপ স্থলে 'বাবা' কদাচিৎ 'বাপহে', 'বাপুহে' বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি আছে।

অনেক দিনের পর হঠাৎ কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্ময়পূর্ব্বক 'কি হে' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'কি হে, তুমি কখন্ এলে' প্রভৃতি বাক্যের ভিতর 'কি হে' শব্দ কতকটা নিরর্থক ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যবহৃত এই

নিরর্থক 'কি হে' শব্দের পরিবর্তে এখানে সাধারণতঃ 'হৈঃ' শব্দের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। 'হৈঃ' শব্দও এ স্থলে নিরর্থক।

কলিকাতা অঞ্চলের লোক মানভূমে আসিলে 'বটে' 'আজ্ঞা'র জ্বালায় বিব্রত হইয়া উঠেন। সম্মতিসূচক 'বটে' কথার ব্যবহার বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু মানভূমে 'বটে' শব্দের অসাধারণ প্রভুত্ব। এখানে 'বটে' শব্দ ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়। 'তিনি ভাল লোক', এ কথা বলিয়া মানভূমবাসী তৃপ্তি অনুভব করিবে না। তৎ-পরিবর্ত্তে লোকে বলিবে,—'তিনি ভাল লোক বটেন।' ক্রিয়াপদের বটের অর্থ কতকটা ভূ ধাতুর অনুরূপ। 'বটে' শব্দ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত ভূ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। বারাণসীর 'বটে' মানভূম পর্য্যন্ত আত্মপ্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে। নিরর্থক 'বটে', 'আজ্ঞা' বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কোন লোককে 'তোমার বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর পাইবেন,—'আমার বাড়ী মানভূম জেলা বটে, আজ্ঞা পাড়া পরগণা' ইত্যাদি।

'পারিব না' কথার চলন স্থানীয় লোকের মধ্যে এক প্রকার নাই বলিলে চলে। তৎ-পরিবর্ত্তে 'লাব্‌ব' বলাই এখানকার রীতি। বাঁকুড়া জেলাতেও 'নাব্‌ব' কথার বহুল ব্যবহার আছে। কিন্তু মানভূমের সীমায় পদার্পণ করিলেই 'ল' আত্মপ্রকাশ করিয়া 'লাব্‌ব' পদের সৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালা পদ্যে 'নারিব' কথার চলন আছে। কিন্তু এখানে গদ্যে 'লার্‌ব' কথার বহুল প্রচলন।

'পাইলাম', 'গেলাম', 'ছিলাম', 'দেখিলাম' ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার স্থলে যথাক্রমে 'প্যালি', 'গেলি', 'ছিলি', 'দেখ্‌লি' ইত্যাদি মানভূমের প্রচলিত রূপ। এই প্রকার পরি-বর্ত্তনের কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখান সম্ভব নহে। প্রথম পুরুষে অতীত কালে সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ এই প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

এখানে Subjunctive moob এ অতীত কালে ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদ এক প্রকার নূতন রূপ গ্রহণ করে। এই প্রকার রূপ অন্যত্র কোথায়ও দেখা যায় না। এরূপ স্থলে 'পাইতাম', 'যাইতাম' ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে 'পাথি', 'যাথি' ইত্যাদি রূপ হয়। এই প্রকার ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালা রূপ—	মানভূমী রূপ—
যদি বিবাহ-বাড়ীতে আসিতাম ত কত খাইতাম	বিয়াঘরকে আস্‌থি ত কত খাথি।
যদি কলিকাতায় যাইতাম ত কত দেখিতাম	কল্‌কাত্তাকে যাথি ত কত দেখ্‌থি।
যদি বনে যাইতাম, তাহা হইলে কত পাখী মারিতাম	বনকে যাথি ত কত পাখ্‌ মার্‌থি।
যদি দেশে রহিতাম ত কত রোজগার করিতাম	দেশ্‌কে রইথি ত কত রোজগার কর্‌থি।

এই প্রকার স্থলে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। বাক্যের গঠন দৃষ্টে লোকে অনায়াসে ঐ প্রকার অর্থ করিয়া লয়।

মানভূমী ভাষায় ণিজন্ত প্রকরণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও নূতন। 'খাওয়ান', 'খাওয়ান', 'দেওয়ান' ইত্যাদি স্থলে 'খাওয়া করান', 'খাওয়া করান', 'দেওয়া করান' ইত্যাদি পদের ব্যবহার হয়। 'কৃ' ধাতুর সাহায্যে কলেজের বালকেরা যে প্রকার সহজে সংস্কৃত লিখিতে অভ্যাস করে, সেই প্রকার 'কৃ' ধাতুর যোগে এখানে ণিজন্ত প্রকরণ সমাহিত হয়। এই প্রকার ণিজন্তের ব্যবহার বাঁকুড়া জেলাতেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদ হইতে মানভূমে অবাধে ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুস্তকে 'প্রভাতিল', 'বিলাপিল', 'কেলিছে', 'বিদায়ি' প্রভৃতি ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত অদ্যাপি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। মানভূমে যে প্রকার ক্রিয়াপদ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে বোধ হয়, অনেকে নিতান্ত বিস্মিত হইবেন। এখানে নিম্নোক্তরূপ ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ্য বা বিশেষণ-পদ	নিষ্পন্ন ক্রিয়া	অর্থ	উদাহরণ
বর্ষা	বর্ষাণ	বৃষ্টি হওয়া	আজ বড় বর্ষাচ্ছে।
বাস (গন্ধ)	বাসান	গন্ধ দেওয়া	ফুল্‌টা খুভ্‌ বাসাচ্ছে।
গন্ধ	গঁধান	দুর্গন্ধ বাহির হওয়া	পুখুরের (পচা) জলটা গঁধাচ্ছে।
ধূপ (রৌদ্র)	ধূপান	রৌদ্র হওয়া	পাহাড়ের উপর্‌কে বড় ধূপায়।
মেঘ	মেঘান	মেঘ হওয়া	আকাশটা টুকু (একটু) মেঘাচ্ছে।
বিকল	বিকলান	কাতর ভাবে চীৎকার করা	তুই ক্যানে বিক্‌লাচ্ছিস্‌।
জাড়	জাড়ান	শীত করা	আজ রাত্‌কে ভারি জাড়াবে।
ভিন্ন	ভিনান	ভিন্ন বা পৃথক্‌ হওয়া	তারা তিন্‌টা ভাই ভিনাল।
মরণ	মরাণ	মারিয়া ফেলা	বাছাকে মরাব।
চিক্কণ	চিকনাণ	চিক্কণ করা	ক্ষর্‌টা খুভ্‌ ভাল করে চিক্‌নাবি।
বাঘ	বাঘান	বাঘে ধরা	কাঁদ্‌নাকে (একজনের নাম) বাঘাল।

ইত্যাদি—

পূর্ব্বাঞ্চলের লোক মানভূমে আসিলে তাঁহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে কতকগুলি কথার ব্যবহার করিতে হইবে। একবার লেখকের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভাষার উৎপাতে কিছু বিপন্ন হইয়াছিলেন। এক দিন এক বৃদ্ধ লোক একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে সঙ্গে লইয়া কার্য্যোপলক্ষে ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। ভদ্রলোকটি নিতান্ত বিনয়ী ও শিষ্টালাপী। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোক বালিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'এটি কি তোমার মেয়ে?' বৃদ্ধ এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়া রাগে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিল। শেষে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল,—"আপনি একটা হাকিম বটেন, আপনি এই ছাঁটাকে বল আমার মাইয়া; এটা আমার বিটি বটে নঃ?" অর্থাৎ আপনি একজন

সম্ভ্রান্ত লোক ; আপনি এই ছেলেটাকে আমার 'মাইয়া' বলিলেন ; এটা আমার কন্যা নহে কি ? ভদ্রলোক ত ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার অপরাধ বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, 'মাইয়া' শব্দের অর্থ 'কন্যা' নহে, 'স্ত্রী', তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বাস্তবিক এ দেশের ভাষায় 'মেয়ে' বলিয়া কোন কথা নাই। 'মাইয়া' কথার ব্যবহার আছে। পরন্তু 'মাইয়া' কথার অর্থ স্ত্রী। ভাষার এ প্রকার অর্থগত বৈষম্য সময়বিশেষে বিপদের কারণ হওয়া অসম্ভব নহে।

এখানে বাজার করিতে গেলে একটি বিশেষ কথা জানিয়া রাখিবার প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় চারি টাকা মণ হইতে কোন জিনিষ পাঁচ টাকা মণে উঠিলে ঐ জিনিষের "দাম বাড়িয়াছে" বলে। আবার জিনিষের দাম পাঁচ টাকা মণ হইতে চারি টাকা মণে নামিলে "দর কমিয়াছে" বলে। কিন্তু মানভূমে তাহার ঠিক বিপরীত। এখানে প্রথমোক্ত স্থলে বলিবে "দর কমিয়াছে" ও শেষোক্ত স্থলে বলিবে "দাম বাড়িয়াছে।" কোন জিনিষের চারি টাকা মণ হইলে, এক টাকায় দশ সের পাওয়া যাইবে। আবার পাঁচ টাকা মণ হইলে, এক টাকায় আট সের পাওয়া যায়। এই প্রকারে এক টাকায় যে পরিমাণে কোন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণের কম-বেশী দেখিয়া জিনিষের দাম কম বা বেশী হওয়া বুঝিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে এক টাকায় বিক্রীত জিনিষের কম-বেশীকে এখানে দামের কম-বেশী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এ প্রকার কম বেশীর হিসাব অন্যান্য স্থানে পরিচিত নহে।

এই প্রকারে মানভূমের প্রচলিত বাক্যাবলী, তাহার অর্থ ও ব্যাকরণের সম্যক্ নিয়মাবলী সংগৃহীত হইলে, তাহাতে ভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ অনেক নূতন নিয়মের পরিচয় পাইবেন।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

[গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক]

৺আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এক অংশ ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে।[১] পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যাতে উল্লিখিত গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক পরিভাষা প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়[২], ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[৩], শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত[৪] ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] মহাশয়গণ ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকাতে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় পরিভাষা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত একখানি অপ্রকাশিত জ্যামিতিক পরিভাষা আছে। যে সমস্ত স্থলে পরলোকগত বসু মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষার সহিত পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সাদৃশ্য আছে, তাহাদের উল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে। এই সাদৃশ্য প্রকাশার্থ যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Added—পিণ্ডিত ; মিশ্রিত।

Addendum—ক্ষেপ।

Addition—মিশ্রণ। বিশ্লেষ, সঙ্কলিত, সঙ্কলন, যুক্তি (হ)।

Additive quantity (the least root with reference to)—লঘুমূল।

Aether—খ, অক্ষয়

Algebra—বীজগণিত, বীজ। বীজ (হ)।

Alligation (medial)—সুবর্ণগণিত। সুবর্ণগণিত (হ)।

Altitude ভুজ। উন্নতাংশ, উন্নতি (যো) উন্নতি (হ)।

Amplitude (degree of)—অগ্রভাগ।

Amplitude (sine of)—অগ্রজ্যা। অগ্রা (যো)।

Amplitude (sun's)—অগ্র।

Analysis—বীজ। বিশ্লেষ-সাধন (নি)।

Angle—কোণ, দ্বিভুজ, অগ্র, আর।

Angular—সাগ্র। চাপাত্মক বা চাপীয় (ম)।

Anomalistic equation of a planet—মন্দফল।

Anomaly—মন্দ। কেন্দ্র (যো)।

Anomaly (argument of)—মন্দকেন্দ্র।

Assimilation (in arithmetic)—জাতি। (of the difference)—বিশেষ জাতি ; বিশ্লেষ জাতি।

---

(১) সা—প—প—১৭শ ভাগ পৃঃ ১৩১-১৩৩।

(২) সা—প—প—২য় ভাগ পৃঃ ১২৭-১৪০।

(৩) সা—প—প—২য় ভাগ পৃঃ ৩১২-৩২৬।

(৪) সা—প—প—১ম ভাগ পৃঃ ১৪১-১৪৭ ২য় ভাগ পৃঃ ১৬-১৯।

(৫) সা—প—প—৬ষ্ঠ ভাগ পৃঃ ২৪০-২৪১ ও ২০শ ভাগ পৃঃ ১৭-২৩।

Assimilation (of the remainder)—শেষজাতি।

Apex (of the orbit of a planet)—উচ্চ

Aphelion—তুঙ্গ। মন্দোচ্চ (ভৌমাদির) (যো ও ম ও হ)।

Apogee—উচ্চ। মন্দোচ্চ (রবি, চন্দ্র) (যো ও ম) অপপার্থিব (ম)।

Apparent—স্ফুট।

Apsis (higher)—দ্বিতীয় কেন্দ্র; মন্দোচ্চ।

Aquarius (sign)—আপ্য, কুম্ভ, ঘট।

Arc—চাপ; ধনু। চাপ; ধনু (হ)।

Area (abstract or precise)—স্ফুটফল।

„ (of a circle)—ফল।

Arcturus—স্বাতি।

Argument (of an equation)—কেন্দ্র।

Arithmetic—অঙ্কবিদ্যা, গণতা, গণন, পাটীগণিত, পরিপাটী।

„ (eight rules of)—পরিকর্ম্মাষ্টক।

Arithmetician—পিণ্ডিল।

Arm of a triangle—ভুজ।

Ascension (oblique)—লগ্ন। স্বদেশোদয় (যো)।

Ascensional diffrence—চরজ্যা, লগ্নভুজ। চর, চরার্দ্ধ (যো)।

Assimilation of fraction—ভাগজাতি।

Asterism—গগনেচর, নক্ষত্র।

Astrologer—জ্যোতির্ব্বিদ্, ভগ্নচক, মৌহূর্ত্ত।

Astronomical science—কেবলী, খগোল-বিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র।

Atmosphere—অম্বর, আষ্ট্র, উর্দ্ধবত্ম্য, ঘনাশ্রয়।

Atom—কারণকারণ, পরমাণু।

Barter (rule of)—ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক।

Base (of any figure in geometry)—ভূমি, মহী। ভূ, কু (হ)।

Base of a triangle (segment of the)—অবাধা। অববাধা, আবাধা (হ)।

Beam (Sun or Moon)—কর।

Billion—নিখর্ব্ব।

Billions (ten)—পদ্ম। মহাপদ্ম (হ)।

Binomial—দ্বিপদ।

Body (heavenly) of a secondary kind—উপগ্রহ।

Bracket—কোষ্ঠ।

Breadth—পরিণাহ; আয়াম।

Bulk—গোল।

Cancer—কর্কট।

Canopus—অগস্ত্য। অগস্ত্য (ম)।

Capricornus—আকোকের।

Chord (of an arc)—একজ্যা, গুণ, জীবা, জ্যকা, জ্যা, শিঞ্জা, জ্যাপিণ্ড।

Circle (Circumference of a great)—ভাগন।

Circle (great)—পরিধি, মণ্ডল।

„ (Sector of a) বৃত্তখণ্ড।

„ (Segment of a) খণ্ডমণ্ডল, বৃত্তখণ্ড।

„ (signs of the)—রাশিচক্র।

„ (small)—দৃগ্গোল, দৃঙ্মণ্ডল।

Circumference—পরিবেষ্টন, পালি। পরিধি (হ)।

Cloud (large black rainy)—মহানাদ।

Cloud (rainy)—ঘনাঘন।

Co-efficient—বর্ণ, অঙ্ক (হ)।

„ (of any number) গুণ, প্রকৃতি

Co-efficient (the relation of the unknown number and its)—যাবৎ তাবৎ।

Colatitude of a place—নত।

Combination of like series (in calculation)—তুল্যভাবন।

Common measure (leaving no)—নিচ্ছেদ, নিরপবর্ত্ত।

Commutation—শীঘ্রকেন্দ্র।

Compass—কর্কট।

„ (intermediate points of a)—বিদিশ, দিক্।

Complement (of an arc to 90°)—কোটি। অনুপূরক (অ)। পূরক (নি)।

Composition—ভাবন।

„ by the difference of products—বিশেষভাবনা।

Computation (arithmetical)—পরিকর্ম্মণ।

Concave—উত্তান।

Cone—সূচি। সূচি (যো) সূচীখাত (হ)।

Conjunction of the earth and moon—মহাকল্প।

„ (grand period of general)—কল্প।

„ (planetary)—সঙ্গম। গ্রহযুতি, গ্রহযুদ্ধ (যো)।

„ (of a planet with the moon)—ক্রান্ত।

„ (of the sun and moon)=বিমর্দ্দন; কেন্দুসঙ্গম। দর্শ (যো)।

Constellation=ঋক্ষ; কক্ষ। নক্ষত্র (যো)। রাশি ও উপরাশি (ম)।

Constellation containing two stars of which one is Δ Sagitarus, first of the two constellations each called Ashasha—পূর্ব্বাষাঢ়া।

Constellation figured by an arrow containing 3 stars one of which is γ Cancer—তিষ্য।

Constellation containing 3 stars one of which is γ Orionis—অগ্রহায়ণী; মৃগশির।

Constellation comprising 4 stars apparently α β, γ, Δ, Delphini and signed by a drum—ধনিষ্ঠা।

Constellation containing 100 stars one of which is Δ Aquarii—শতভিষা।

Constellation represented by three foot steps containing three stars α, β γ Aquilae—শ্রবণা।

Constellation as signed by a hand containing 5 stars—হস্তা।

Constellation comprising 3 stars of which one is α Scorpionis—জ্যেষ্ঠা।

Constellation represented by a conch (containing 2 stars one of which is γ Leonis)—পূর্ব্বফল্গুনী।

Constellation (Pleiades)—কৃত্তিকা।

Constellation containing five stars, figured by house apparently α, β, μ μ, and i Leonis—মঘা।

Constellation containing 32 stars figured by a tub or one of stars of γ Piscium figured by a wheel, carriage and contains five stars α, β, γ, Δ, ω Taurus—রেবতী

Constellation containing four stars in the shape of festoon, the stars are supposed to be α, β, γ, Libra and V Scorpionis—রাধা।

Convex—ন্যুব্জ।

Cosine (of an angle)—কোটিজ্যা, ভুজজ্যা।

Coversed sine—কোটিউৎক্রমজ্যা, ভুজোৎক্রমজ্যা।

Curve—কুটি। রেখা (নি)।

Cycle—চক্র, কালচক্র। চক্র (যো)।

Cycle of 60 years—বৃহস্পতিচক্র।

Day (of full moon) ইন্দুমতী।

Day natural, i.e. from sun rise to sun rise—সাবন।

Day (of a new moon) তিথিক্ষয়।

Day (lunar) কর্ম্মবাটী, তিথি। চান্দ্র দিন, তিথি (যো)।

Day (24th part of a)—হোরা।

Declination—অপম। অপক্রান্তি (যো)

Declination (of a planet)—স্ফুটক্রান্তি। স্ফুটক্রান্তি (যো)।

Declination (of a point in the ecliptic)—ক্রান্তিভাগ।

Declination (planets sine of) ক্রমজ্যা।

Declination (sine of the) ক্রান্তিজ্যা, ক্রমজ্যা।

Demand (in arithmetic the sum sought) ইচ্ছক।

Demonstration (in arithmetic or geometry) উপপত্তি। সাধন, প্রমাণ, পরীক্ষা (নি)। উপপত্তি (হ)।

Denominator of a fraction—ছেদ, হর।

Dependance of a larger number on smaller in a progressive series—তারতম্য।

Depth (in measurement)—বেধ, বেধন।

Depth (mean)—সমবেধ।

Dew—খজল, খবাষ্প, নীহার।

Diagonal—কর্ণ। শ্রুতি (নি)।

Diagram—ক্ষেত্র।

Diameter (of the circle of the sun or moon)—বিস্তৃত, বিস্তার, ব্যাস। (increase of the) বৃদ্ধি।

Deferent—কক্ষ।

Digit (or $\frac{1}{12}$th part of any dimension)—অঙ্গুল।

Disc (of the earth in computing eclipse)—সূচি।

Digit (of the moon)—ইন্দুকলা, ইন্দুদল, ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা।

Disc (of the moon)—ইন্দুমণ্ডল।

Disc (of the sun)—আবেশন, প্রতিসূর্য্যক, মণ্ডল।

Disc (of the sun or moon) উপসূর্য্যক, পরিধি, পরিবেশ, মণ্ডল, ঠ।

*Dividend—ভাজ্য।

Divisible—ভাজ্য।

Division—ভাগ, হর, ভাজন, হরক, হরণ। ভাগহার, হরণ (হ)।

Division—(by a common measure) অপবর্ত্তন।

Divisor—ছেদ, ভাগক, হর, হারক, হার।

Dodecagonal figure—দ্বাদশাস্রি।

Earth—ক্ষিতিমণ্ডল। ভূগোল (হ)।

Earth (circumference of the)—ভূপরিধি। ভূপরিধি, ভূবেষ্টন (যো)।

Earth (surface of the) ইলাতল, ক্ষিতি পীঠ, ক্ষ্মাতল।

Eclipse—রাহুগ্রাস। গ্রহণ, গ্রাস (যো)। গ্রহণ (হ)।

Eclipse (duration of the) স্থিতি। স্থিতি-কাল (যো)। স্থিতি (হ)।

Eclipses (sun's disc in computing) সূচি।

Eclipse (time from apparent conjuction to the end of) বিমর্দ্দার্দ্ধ।

Ecliptic—ক্রান্তি, ক্রান্তিকক্ষ, ক্রান্তিমণ্ডল। ক্রান্তিবৃত্ত, অপথমণ্ডল, অপবৃত্ত (যো)।

Eigth—পাদার্দ্ধ।

Elementary—আধিভৌতিক।

Elevation of a mountain—নগোচ্ছ্রায়।

Elimination—নাশ।

Entrance of the Sun into the Zodiac—উদ্গান।

Enumerating—গুণন।

Equation—সমীকরণ, ফল। সমীকরণ (যো ও হ)।

Equation (a term in an)—খণ্ড।

Equation (of a degree)—আপ্ত।

Equation of a planet (anomalistic)—ফল।

Equation (side of an, in a primary division)—পক্ষ। পক্ষ (হ)।

Equation (solar)—রবি ফল।

Equation (unilateral)—একবর্ণ সমীকরণ।

Equation (unknown quantities)—অব্যক্তসাম্য।

Equator (arc of the)—লগ্ন।

Equator—(circumference of the terrestrial) স্বদেশ মধ্যপরিধি। নিরক্ষ-বৃত্ত, লঙ্কা (যো)।

Equatorial region—নিরক্ষ দেশ।

Equator (terrestrial)—নিরক্ষ। নিরক্ষ, ব্যক্ষ (হ)।

Equinoctial and solstitial points—অয়ন।

Equinoctial line—ভূচক্র।

Equinoctial points—ক্রান্তিপাত। বিষুবৎ, বিষুব (হ)।

Equinoctial year—অয়নকাল।

Equinox—বিষুব, বিষুপ।

Equinox (autumnal)—তুলায়ন।

Equinox (autumnal, moment of the Sun's entering Libra)—জলবিষুব।

Equinox (day of the)—বিষুবদিন।

Equinoxes (passage of sun to the next sign at the)—বিষুব সংক্রান্তি।

Equinox (precision of the)—ক্রান্তি-পাতগতি। ক্রান্তিপাতগতি, অয়নচলন, অয়নাংশগতি (যো)।

Equinox (Vernal)—মহাবিষুব।
Extension—ঘন।
Figure (plane)—ক্ষেত্র।
Finite—আন্তবৎ। সীমাবদ্ধ (নি)।
Focal point—অগ্রাংশু, অগ্রকর।
Fog—তমস্ত।
Fraction—অংশ, ভিন্ন, ভাগ, রাশিভাগ। ভিন্ন (হ)।
Fractional—ভাগিক।
Fractional difference (reduction of)—বিশ্লেষ জাতি।
Fraction (multiplication of)—ভিন্ন গুণন।
„ (cube of a)—ভিন্নঘন।
„ (division of)—ভিন্নব্যাহর।
„ (square of a)—ভিন্নবর্গ।
„ (subtraction of)—ভিন্নব্যবকলন।
„ (addition of)—ভিন্নসঙ্কলন।
Friction—অথট্টন।
Frost—ইন্দ্রাগ্নি, ধূম, খজল, নীহার।
Fullmoon—পূর্ণেন্দু।
Full moon (day of)—পূর্ণমাসী, পূর্ণিমা।
Gemini (a constellation) জিতুম। মিথুন (হ)।
Geometry—রেখাগণিত। জ্যামিতি, ক্ষেত্রতত্ত্ব (অ) ক্ষেত্রব্যবহার (হ)।
Gibbous—অগুমণ্ডল। কুবৃত্ত, ন্যূনবৃত্ত (ম)।
Globe—ইলাগোল, পরিমণ্ডল।
Globe (celestial or terrestrial)—গোল।
Globe (terrestrial)—ভূগোল।
Gnomon—কীল। কীলক, শঙ্কু, নর, (যো)।
Gnomon (midday shadow of the)—পলভা, বিষুবছায়া, বিষমছায়া। অক্ষভা, বিষুবচ্ছায়া, পলভা (যো)।
Gnomon (shadow of the)—ভা। বিষুবদ্ভা, পলভা (যো)।
Hail—ইড়াচর, ঘনোজল, পয়োঘন।
Heavenly body—জ্যোতিষ্ক। জ্যোতিঃ (হ)
Halo—অংশুমালা। পরিবেষ (যো)।
Heptagon—সপ্তাস্র। সপ্তভুজ (নি)।
Hexagon—ষট্‌কোণ। ষড়্‌ভুজ (নি)।
Hoarfrost—খজল, খবাষ্প, তুষারকণা।
Horizon (sensible) অম্বরান্ত, চক্রবাল, চক্রপাল, মণ্ডল, দিগন্ত। ক্ষিতিজ, কুজবৃত্ত, ক্ষিতিবৃত্ত, কুবৃত্ত, হরিজ (যো)। ক্ষিতিজ (হ)।
Horizontal line—দ্বিজ্যামার্গ।
Hundred (bearing interest per)—শতিক।
Hurricane—ঝড়ানিল।
Hypotenuse—অক্ষকর্ণ। কর্ণ, শ্রুতি (হ)।
Hypotenuse of a right-angled triangle (formed between the gnomon and the two sides of the shadow)—বিষমকর্ণ।
Hypotenuse (of triangle)—কর্ণ।
Icicle—তুষারকণা।
Index—কুট্টক।
Index of the power—ঘাতমাপ।
Interest (compound)—চক্রবৃদ্ধি।
Inversion (rule for)—ব্যস্তবিধি, বিলোমক্রিয়া, বিলোমবিধি।
Involution—ঘাতক্রিয়া।

Isoscelis triangle—দ্বিসম ত্রিভুজ। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (নি)। দ্বিসম-ত্রিভুজ (হ)।

Latitude (argument of the)—অক্ষকর্ণ, পতনকেন্দ্র। বিক্ষেপকেন্দ্র (যো)।

Latitudes (celestial)—বিক্ষেপ। শর, বিক্ষেপ, ক্ষেপ, অস্পষ্ট শর (যো)।

Latitude (having no)—নিরক্ষ। ব্যক্ষদেশ (যো)।

Latitude of a planet—পতন।

Latitude (sine or cosine of)—লম্বজ্যা।

Latitude (terrestrial)—অক্ষ। অক্ষ (হ)।

Lens (crystal)—অর্কাশ্মন্, সূর্য্যকান্ত।

Leonis α—ধ্রুব

Leo (sign) আরণ্যরাশি।

Lightning—চিলমীলিকা, অচিরদ্যুতি।

Linchpin—অক্ষাগ্রপিলক।

Line (curved)—ধনুর্ম্মার্গ।

Lines which form an angle—দ্বিভুজ।

Longitude (celestial)—ধ্রুবক। গ্রহ, খেট, ভুক্তি, রাশ্যাংশাদি, অপবৃত্তাংশ (যো)।

Longitude (difference of)—দেশান্তর।

Longitude of a planet reckoned from the vernal equinoctial point—শায়ন।

Lunar asterism—নক্ষত্রচক্র।

Lunar—কর্ম্মবাটী।

Lunar month—চান্দ্রমাস।

Lunation—উত্তরকাল।

Magnitude—গোল। আয়তি (নি)।

Mathematical determination or ascertainment—ব্যবহার।

Matter (elementary)—কারণ।

Mean (in astronomy)—মধ্য, মধ্যম।

Measure (common)—অপবর্ত্ত।

Meridian (first)—নিরক্ষদেশ।

Mean motion—মধ্যমগতি।

Measure in general—মান, পরিমাপক।

Measure (mean)—সমমিতি।

Measuring by—নির্বর্ত্তন।

Meniscus—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

Meteor—উল্কা, কলুক, খোল্ক।

Milkyway—নাগবীথী।

Million—নিযুত, প্রযুত। প্রযুত (হ)।

Million (one hundreth thousand)—মহাশঙ্খ। নিখর্ব (হ)।

Million (one thousand)—মহাশঙ্খ। অব্জ, পদ্ম (হ)।

Minus—ঋণ, ক্ষয়।

Mirage—মরীচিকা।

Month (intercalary)—অধিমাস।

Month (reckoned from one new moon to another)—মুখ্য। মুখ্য চান্দ্রমাস (হ)।

Month (of thirty solar days)—সাবন।

Moon—ওষধীপতি, ওষধীপ। ইন্দু, অমৃতাংশু, শীতাংশু, শীতদীধিতি (হ)।

Moon (a digit of the) in shadow—কলঙ্ককলা।

Moon beam—পূর্ণানক।

Moon (false)—চন্দ্রাভাস।

Moon (full)—রাকা। পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী (হ)।

Moon (new)—মাসপ্রমিত। অমাবাস্যা (হ)।

Moon (sphere or orb of the)—চন্দ্রগোল, চন্দ্রমণ্ডল।

Moonlight—চন্দ্রগোলিকা,চন্দ্রশালা,চন্দ্রাতপ।
Motion (rotatory)—চক্রাবর্ত্ত।
Multiplicant—গুণনীয়। গুণ্য হ)।
Multiplication—অভ্যাস, গুণন, পূরণ। গুণন, হনন, প্রত্যুৎপন্ন (হ)।
Multiplication (cross)—বজ্রবধ, বজ্রাভ্যাস।
Multiplied—পিণ্ডিত, প্রত্যুৎপন্ন।
Multiplier—গুণক, পূরক, প্রবৃত্তি। গুণক (হ)।
Multiplying (a mode of)—পাটসন্ধি।
Node (ascending)—উপপ্লব, রাহু, উপরক্ত, উপরাগ, কৃষ্ণবর্ত্ম, গ্রহ। পাত (বো)। পাত (হ)।
Node (descending)—অকচ, আহিক, কেতু। সবড়ভপাত (বো)।
Node (of planet's orbit)—পাত।
Numeral—সঙ্খ্যা।
Number (any one of a set whose sum is required)—পদ।
Number—রাশি। রাশি (হ)।
Number (entire)—রূপ। রূপ (হ)।
Numeration—সঙ্খ্যতা, সঙ্খ্যান।
Numerator (of a fraction)—অংশ, ভোগ, লব, বিভাগ।
New moon (day preceding that of the)—সিনীবালী।
Oblong—আয়ত।
Obtuse angular—বহির্লম্ব।
Octagon—অষ্টাস্র। অষ্টভুজ (নি)।
Occultation of a star—সমাগম। অস্তগমন (বো, ম)।
Odd (in number)—বিষম।
Orb—মণ্ডল।
Orbit (of a planet)—কক্ষ। কক্ষাবৃত্ত (বো)। কক্ষা (হ)।
Orion (stars in the head of)—চান্দ্রমস, ইল্বল।
Parallelopiped—দ্বাদশাস্র।
Pentagon—পঞ্চকোণ। পঞ্চভুজ (নি)।
Planet—খগ, খেচর, গ্রহ, ভ।
Planet distance of a—ধ্রুব।
Planet (minor)—উপগ্রহ।
Planets (daily position of)—পাদচার।
Planets' orbit (inclination to the ecliptic of the) পরমাপম।
Planet (true distance of a, from the earth)—চলকর্ণ।
Planisphere—খগোল।
Plus—ধন।
Point of the compass (intermediate) প্রদিশ।
Point (moveable in the heavens)—গ্রহ।
Polar star—উত্তানপাদজ, গ্রহাধার, নক্ষত্রনেমি, জ্যোতিরথ, দ্যুতিকর।
Pole (north)—ধ্রুব। মেরু, সুমেরু (বো)।
Pole (of any great circle)—ধ্রুব।
Pole (south)—কুমেরু। বড়বা, কুমেরু (বো)।
Principal—ধনমূল, প্রয়োগ, সাধক। মূল (হ)।
Product (of a sum in multiplication)—ঘাত, প্রত্যুৎপন্ন।

Progression (arithmetical)—অনুপাত
Proportion—অনুপাত।
Quadrant of a circle—পাদ, বৃত্তপাদ।
Quadrant (twenty-fourth part of a) —পিণ্ড।
Quantities (from their difference or that of their squares finding of) —বিষমকর্ম্ম।
Quantity—গোল।
Quantity (additive)—ক্ষেপক।
Quantity (affirmative)—ধন।
Quantity (arithmetical or algebraical) রাশি।
Quantity (assumed in algebra)—উদ্বর্ত্তক।
Quantity (discrete or distinct)—রূপ।
Quantity (given)—দৃশ্য।
Quantity (infinte)—অনন্তরাশি। অনন্তরাশি (হ)।
Quantity (irrational) করণ।
Quantity (known)—রূপ, ব্যক্তরাশি। রূপ (হ)।
Quantity (one unknown)—একবর্ণ, অব্যক্ত রাশি। অব্যক্ত, যাবৎ-তাবৎ (হ)।
Quantity (negative)—ঋণ। ঋণ, ক্ষয় (হ)
Quantity (subtractive)—বিশুদ্ধি।
Quantity (such that a given number being multiplied by it and the product added to a given quantity the sum may be divisible without remainder by a given divisor)—কুট্টক।

Questions (enumeration of the, in an arithmetical or algebraical sum)—আলাপ।
Quotient—আপ্ত, ফল।
Quotient (completing a)—নিয়।
Radian—অংশুমৎ।
Radius of the equator—ভূকর্ণ।
Rainbow—ইন্দ্রায়ুধ।
Ray (of light)—অংশু, উপধৃতি, কিরণ, ঋষি।
Ray (pencil of)—অংশুজাল, করজাল।
Rays (of the rising sun)—বালাতপ।
Rectangular—জাত্য।
Reflected—ছায়াময়।
Reflected image—ছায়া।
Reflected light—প্রতিভা।
Reflection—আভাস, নিশাসন, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিফল, প্রতিফলন। মূর্চ্ছন (যো ও ম)। প্রতিফলন (অ)।
Remainder—অন্তর, উত্তর, শেষ।
Revolution (of a celestial body)—ভ্রমণ। ভ্রম, ভ্রমণ, পর্য্যায়, পরিবর্ত্তন (যো)। ভগন (হ)।
Right angled triangle (one of the sides of a)—ভুজকোটি।
Right ascension—লগ্নভুজ।
Rotundity—পরিমণ্ডলতা।
Rule of inversion—বিলোমক্রিয়া, বিলোমবিধি, ব্যস্তবিধি।
Rule (of supposition)—ইষ্টকর্ম্ম।
Rule of three—ত্রৈরাশিক। ত্রৈরাশিক (হ)।

Rule of three (direct)—ক্রমত্রৈরাশিক, সমত্রৈরাশিক।

Rule of three (inverse)—বিলোমত্রৈরাশিক। ব্যস্তত্রৈরাশিক (হ)।

Sagittarius (the constellation)—মৌক্তিক। ধনুঃ (হ)।

Saturn—আদিত্যসূনু। অর্কজ, আর্কি, শনৈশ্চর, মন্দ (হ)।

Scalene triangle—বিষমভুজ। বিষমবাহুত্রিভুজ (অ)। বিষম ত্রিভুজ (হ)।

Scorpio (sign)—কৌর্প্য।

Second (of a degree)—বিকলা।

Section (in geometry)—মার্গ।

Sector of a circle—বৃত্তখণ্ড। বৃত্তচ্ছেদক (অ)।

Segment (of the base of triangle)—অবধ, অবাধ।

Series (last term of a)—পদ।

Shadow (of a gnomon specially as indicative of the position of the sun)—ছায়া।

Side (of any angular geometrical figure)—বাহু।

Side (of a triangle, square etc)—দোস্। বাহু, ভুজ (নি)।

Sign (rising of a)—লগ্ন।

Sign of the Zodiac—রাশি। রাশি, ভ, গৃহ, ভবন (যো)।

Sine of 30° or of the radius—একজ্যা।

Snow—ঘবাষ্প, তুষার।

Solar process for all astronomical computations—বাক্য।

Solid (contents of)—ঘনফল।

Solid (in geometry)—ঘন।

Solstice (northern or summer)—উত্তরায়ন।

Solstice (southern or autumnal)—দক্ষিণায়ন।

Space—দিগন্তর।

Sphere—গোল। বর্তুল (নি)। গোল (হ)।

Sphere (celestial)—আকাশমণ্ডল।

Sphere (incomplete)—খণ্ডমণ্ডল।

Spherics—গোলাধ্যায়।

Square—চতুরস্র, চতুষ্কোণ, চতুষ্টয়। সমচতুরস্র, সমচতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র (অ)।

Square number—বর্গ।

Square of a cube—বর্গঘন।

Square root—বর্গমূল। বর্গমূল, বর্গপদ (হ)।

Square (side of a)—পার্শ্ব।

Star—ঋক্ষ, কক্ষ, তারা, ভ।

Star (falling)—কেতু, ধূমকেতু।

Substitution of a value (in arithmetic)—উত্থাপন। উত্থাপন (হ)।

Subtraction—পতন, ব্যবকলন, শোধন। ব্যবকলিত, ব্যবকলন, শোধন (হ)।

Subtrahend—শোধক। শোধক (হ)।

Sum—যোগ।

Sum (in arithmetic)—পিণ্ড।

Summed either by arithmetic or algebra—রাশিগত।

Sum sought—ইচ্ছক।

Sun and moon (a period of time during which the sum of the motions of the, amounts to one

নক্ষত্র, the mean duration of which 23 hours 47′ 44″)—যোগ।

Sun's entering Aries (moment of)—মহাবিষুব।

Sunset (place or time of)—সায়মণ্ডন।

Sun's entrance into a new sign—তন্থ।

„ into a zodiacal sign moment of লগ্ন।

Sun (setting)—আসন্ন।

Sun (quarter to which the sun is proceeding)—প্রধূপিত।

Sun (southern course of the)—বিসর্গ।

Sun (true or apparent motion of the—স্ফুটসূর্য্যগতি।

Superficies—পৃষ্ঠ, ধরাতল।

Superficial (contents of any figure) —পৃষ্ঠফল।

Surd—করণ। করণী (হ)।

Table (astronomical)—পত্তাকা।

Taurus (constellation) – তাবুরি।

Tetragon—চতুষ্কোণ।

Thunder cloud—আনক।

Time (reckoned from full moon to full moon)—উত্তরকাল।

Transposition—তুল্যশুদ্ধি। সমশোধন, তুল্যশুদ্ধি (হ)।

Trapezium—বিষমচতুরস্র। বিষমচতুর্ভুজ (অ)। সমানলম্বচতুর্ভুজ (হ)।

Triangle—ত্রিকোণ, ত্রিপুটক, ত্রিভুজ।

Triangle (apex or summit of)—বদন।

Triangle (formed by the three sides of a trapezium produced to the point of meeting)—সূচি।

Triangle (opposite side of)—উচ্চ।

Triangle (upright side of)—উচ্ছ্রয়, কোটি।

Trinomial (in arithmetic)—ত্রিপদ।

Tropics (space within the)—ক্রান্তি-বলয়। রবিকাষ্ঠা প্রদেশ (যো)। অয়নান্ত-বৃত্ত (ম)।

Twilight—ব্রহ্মভূতি। সন্ধ্যা (যো)।

Typhoon—ঝঞ্ঝানিল।

Undulation—ঊর্ম্মিমত্তা।

Ursa major—সপ্তর্ষি। সপ্তর্ষি, চিত্রশিখণ্ডী (ম)। সপ্তর্ষি (হ)।

Ursi minoris—উত্তানপাদ।

Water (a sudden rush of which the source is unknown)—গণ্ডশিকা।

Wind (southerly)—মলয়ানিল।

Zenith distance—নত, নতভাগ, নতাংশ। নতাংশ (যো)।

Zodiac—রাশিচক্র, জ্যোতিশ্চক্র, ভগণ। রাশিচক্র, ভ-চক্র, ভগণ (যো)।

Zodiac (rising of the sign of)—হোরা।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

পবন-চক্র*

বহমান পবনে যে শক্তি থাকে, তাহা সংগ্রহের উপায়স্বরূপ চক্রের নাম পবনচক্র (Wind-mill)। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি কয়েক প্রকার পবনচক্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম। আবিষ্কার নহে, পরীক্ষা আমার উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমে একটু ইতিহাস দিতেছি। আমার প্রবাস-বাটীতে এক খণ্ড ভূমি আছে। সময়ে সময়ে সেখানে শাগ-পালা করা হয়। কটকে গ্রীষ্মাধিক্য, মাটিতে বালুকাধিক্য, প্রচুর জল না পাইলে শাক বাঁচে না। এখানে কুআই জলের আধার এবং দোড়ী-কলশী দিয়া জল-তোলা প্রচলিত। কুআর দুই পাশে পা দিয়া দাঁড়াইয়া সমুখে মাথা নোআইয়া দুই হাতে দোড়ী ধরিয়া এক কলশী এক কলশী করিয়া জল তোলা হয়। কত শত বার সহস্র বার এইরূপে জল-তোলা দেখিয়াছি, কিন্তু ক্লেশের কথা মনে হয় নাই। একদিন দেখিলাম, মালী বহু কষ্টে মিনিটে দুই কলশী মাত্র জল তুলিতেছে। মাটির কলশী ওজনে ২ শের, কলশীর জল ৯ শের, কুআর জল ১২ হাত নীচে। অতএব মিনিটে "কাজ" হইতেছিল ২ × ১১ × ১২ = ২৬৪ হাত-শের। ১ হাত-শের ইংরেজী প্রায় ৩ ফুট-পৌণ্ডের (foot-pound) সমান। অতএব দেখিলাম, মালী মিনিটে প্রায় ৮০০ ফুট-পৌণ্ড কাজ করিতেছিল।

আমরা ইচ্ছা করি, মালী হউক, মুনিষ হউক, প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু বস্তুতঃ করে না, পারে না। আয়াসসাধ্য কাজ পাঁচ ঘণ্টার অধিক করিতে পারে না। প্রত্যহ কুআ হইতে ৪ ঘণ্টা জল তুলিতে পারে কি না, সন্দেহ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে দিয়া কিংবা লঘু কাজ করাইয়া ৮ ঘণ্টা খাটাইতে পারি। কিন্তু ফলে ৪।৫ ঘণ্টা খাটনির সমান কাজ পাই। অতএব আমার মালী চারি ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টায় করিতেছিল, মিনিটে ৪০০ ফুট-পৌণ্ড কাজ করিতেছিল।

কুআ হইতে জল তোলায় আয়াস লাগে। সমুখে মাথা নোআইয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে, সেই অবস্থায় ভারী কলশী টানিতে, মানুষরূপ যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু কত কমিয়া যায়? যে কাজ স্ব-চ্ছন্দে করিতে পারে, যে কাজে শক্তি-প্রয়োগে অসুবিধা নাই, যেমন সমান রাস্তায় চলা, কাঁধে কিংবা মাথায় কিংবা পিঠে মোট বহিয়া চলা, মোট লইয়া পাহাড়ে চড়া, এ সব কাজ মুনিষে কত পারে? আমি নানা দিক দিয়া দেখিয়া অনুমান করি, মিনিটে ২২০০ ফুট-পৌণ্ড বা ৭০০ হাত-শের কাজ পারে। এক অশ্ব-শক্তি দ্বারা মিনিটে ৩৩০০০ ফুট-পৌণ্ড, সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পৌণ্ড কাজ ধরা হয়। অতএব আমার হিসাবে ১ মানুষ-শক্তি $= \frac{১}{১৫}$ বা ০·০৬ অশ্ব-শক্তি। অন্য দেশে যত হউক, এ দেশে ১৫ জন মুনিষ দ্বারা

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

১ অশ্বশক্তির কাজ কদাচিৎ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ২০ জন মুনিষেও অবিরাম ২।৩ ঘণ্টা এক অশ্বশক্তির কাজ পারে না।

আমার নালী ১/৪০ অশ্বশক্তির কাজ করিতেছিল। ৮ ঘণ্টায় ছাড়াইয়া দিলে ১/৮০ অশ্ব-শক্তির কাজ করিত। অসুবিধায় ফেলিয়া মানুষ-শক্তি কমাইয়া চতুর্থাংশে কিংবা পঞ্চমাংশে দাঁড় করাইয়াছি। কুআর উপরে কপি-কল (pulley) বসাইয়া দোড়ী টানিয়া জল তুলিলে মানুষের কার্য্যক্ষমতা বাড়ে। তখনও কিন্তু ১ মানুষ-শক্তি = ১/৪০ অশ্বশক্তির অধিক হয় না। অবিরাম কাজ করাইলে ১/৫০ অশ্বশক্তিতে দাঁড়ায়। বিলাতী দু-নলা পম্প দ্বারা জল তোলাইয়া দেখিয়াছি। অল্প সময়ের পক্ষে ১ মানুষ-শক্তি = ১/৬০ অশ্বশক্তি হয় বটে ; কিন্তু আধ ঘণ্টাও এত থাকে না, কমিয়া ১/৮০ হয়। একবার এক কৃষিপ্রদর্শনীতে পম্প দ্বারা হড়্‌হড়্‌ করিয়া জল তুলিয়া গ্রাম্য-দর্শকের মনে চমৎকার জন্মাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু প্রদর্শক-মহাশয় শক্তি-ব্যয়ের দিক্ দেখান নাই। তা ছাড়া, গ্রাম্য কৃষকের পম্প কিনিবার পয়সা কোথায়, গ্রামে পম্প মেরামত করিবার কর্ম্মকার কোথায় ? আমার বাগানের শাকের জল-কষ্ট কিছু নহে। জল বিনা কৃষিকর্ম্ম হয় না, অবর্ষার দিনে নদী-বিল-পুকুরে জল থাকিতেও শস্য শুখাইয়া যায়। কুআয় সেঅনী কিংবা দোন ফেলা চলে না।

এই সব চিন্তা করিয়া আমি আমাদের দেশীয় প্রাচীন অরঘট্ট বা আরাটা নির্ম্মাণ করাইলাম (১ম পট)। দেখি নাই, নাম শুনিয়াছিলাম। রাটা, রাহাট নামে এই যন্ত্র ভারতের পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত আছে। একখান চাকার বা ঢাকের উপর দিয়া মাল্যাকারে বদ্ধ কতকগুলা ঘট উঠিতে নামিতে থাকে। (ইংরেজীতে নাম Persian wheel)। প্রথমে যেটা করাইয়াছিলাম, তাহাতে ১ মানুষ-শক্তি ১/২৪ অশ্বশক্তি হইয়াছিল। মোটা ফাঁপা বাঁশের ঘট করাইয়াছিলাম। বাঁশ কাঁচা বলিয়া এবং রোদ জল খাইয়া ঘট ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পরে টিনের ৫-শেরী ঘট করি। সে সময়ে ঢাক ঘুরাইবার হাতল পরিবর্ত্তে তারা-আকারে অরা করাই। ইহাতে ১ মানুষ-শক্তি ১/২০ অশ্ব-শক্তি হইয়াছিল। টিনের ঘটও টিকিল না। শেষে দস্তা-লেপা লোহার পাতের ঘটের আয়োজন করি।

কিন্তু আরাটা ঘুরাইতেও ত মানুষ চাই। দিন দিন মুনিষের অভাব বাড়িতেছে। গ্রামে (হুগলী জেলায়) মুনিষের দিনিকা ছয় আনা। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, তৈলীয় ইঞ্জিন দ্বারা গ্রাম্য অল্প-স্বল্প কাজ-কর্ম্ম চলে না। চলিলেও, ইঞ্জিন কিনিবার বসাইবার পয়সা, ভাঙ্গা সারিবার কামার কোথায় ? ইঞ্জিন দূরের কথা, গো-শক্তি প্রয়োগেরও সুবিধা নাই। বহু বহু গ্রাম আছে, যেখানে গোরুর গাড়ী যাইবার পথ নাই। এইরূপ চিন্তা আসে যায় ; গ্রীষ্মকাল আসিল, বাগানে জলকষ্ট প্রবল হইল। পবনের বেগও বাড়িল। এখানে, এখানে কেন, বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে মধ্যাহ্নসময়ে পবন প্রবল হয়। বেলা ১০।১১টা হইতে গ্রীষ্ম বাড়িতে থাকে ; পবনবেগও বাড়ে, অপরাহ্ণে হ্রাস পায়। পবনের কত শক্তি প্রত্যহ অপচিত হইতেছে। পবনচক্র চাই। আমার চাই,—নহে ; দেশে পবনচক্র নির্ম্মাণের, স্থাপনের, চালনের

সুবিধা আছে কি না, গ্রাম্য সূত্রধার কর্ম্মকার পবনচক্র গড়িতে, জুড়িতে, চালাইতে পারিবে কি না? আমার পবনচক্র নির্ম্মাণের ইতিহাস এই।

বাষ্পীয় ও তৈলীয় ইঞ্জিনের দিনে (ইয়ুরোপের) পুরাতন পবনচক্র অশোভন বটে; কিন্তু কাজ ত চাই। আমেরিকা দেশে, কলের মুলুকে, কৃষকে পবনচক্র চালায়। ইয়ুরোপেও আছে। এ বিষয় পরে উল্লেখ করিব। বিলাতে পবনচক্র নির্ম্মিত হইয়া এ দেশে বিক্রয়ার্থে আসিতেছে। কিন্তু কিনিতে প্রচুর পয়সা চাই। এক অশ্ব-শক্তির তৈলীয় ইঞ্জিন কিনিতে ৩০০৲ টাকা চাই। সে শক্তির দৃঢ় পবনচক্র কিনিতে ১৫০০৲ টাকা চাই। কলিকাতার এক বিক্রেতা নামে ½ অশ্বশক্তির (বোধ হয়, কাজে ইহার অর্দ্ধেক) পবনচক্রের দাম ৫০০৲ টাকা চাহিয়াছিলেন। এ সব লোহার; অনেক অঙ্গ ঢালা লোহার, যাহা ভাঙ্গিলে জোড়া যায় না। মাদ্রাজে চেটার্টন সাহেব কৃষিক্ষেত্রে জল তুলিবার অভিপ্রায়ে এক বিলাতী পবনচক্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। চক্রের ভাঙ্গাচোরা মেরামত করাইতে করাইতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়র, বড় কারখানা তাঁহার হাতে ছিল; তাই তাঁহাকে পরীক্ষা ছাড়িয়া দিতে হয় নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশে চারিটা চক্র স্থাপিত হইয়াছিল, একটা দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কি কারণে হয় নাই, তাহা জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, কোনটার কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোনটা যোগ্য স্থানে স্থাপিত হয় নাই। প্রায় দেড় বৎসর হইল, পুরীতে এক সাহেব এক ছোট পবনচক্র বসাইয়া কুআ হইতে জল তুলিতেছেন এবং রাত্রে তাড়িত আলো জ্বালিতেছেন। প্রায় এক বৎসর হইল, সেখানে এক উদ্‌যোগী বাঙ্গালী এক চক্র দ্বারা বাগানের জল তুলিতেছেন।

আমাদের দেশে পবনচক্রের প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপযোগিতা পরীক্ষিত হয় নাই। বিদেশীয় ইঞ্জিনিয়র, যিনি বাষ্পের, তেলের, গেসের ইঞ্জিনে অভ্যস্ত, তিনি পরীক্ষা করিতে বসিলে অনিশ্চিত পবনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন না। দুই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে,—বিলাতী পবনচক্রের নির্ম্মাণ দেখিয়া তাহার বহুলতা পরীক্ষা করিতে হইবে; আমাদের দেশের পবনের গতিক বুঝিতে হইবে। কখনও মন্দ পবন, এত মন্দ যে, পবনচক্র নড়ে না; কখনও প্রবল পবন, এত প্রবল যে, পবনচক্র থামে না; কখনও বাত্যা, যাহার আবর্ত্তে পবন-চক্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে-সে স্থানে পবনচক্র যোগ্য নহে। পবন-প্রবাহ নদী-প্রবাহের তুল্য অবিরাম নহে; যেখানে জলপ্রবাহ নাই কিংবা মৃদু, সেখানে জলচক্র-স্থাপনা যেমন নিষ্ফল, যে গ্রামে পবনপ্রবাহ মৃদু কিংবা অধিকাংশ দিন মৃদু, সেখানে পবনচক্র তেমন নিষ্ফল। আমাদের দেশের নদী যেমন, পবনও তেমন উচ্ছৃঙ্খল। গ্রীষ্ম-কালে নদী শুখাইয়া দেশে জলকষ্ট হয়, বর্ষাকালে বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়। শীতকালে রবী ফসলের জন্ত জল চাই, তখন পবনবেগ থাকে না; গ্রীষ্মকালে নদী ও কুআর জল নামিয়া যায়, জল-তোলার কষ্ট হয়, তখন পবনবেগ পাই বটে, কিন্তু ঝড়ও পাই। আমার দুইটা চক্র কাল বৈশাখীর পরাক্রমে উন্মূলিত ও ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ পবনচক্র-প্রয়োগের যোগ্য দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইলে মনস্তাপ মাত্র লভ্য হয়। বাষ্পীয় তৈলীয় ইঞ্জিনের দেশ-কাল-পাত্র নাই। আগুন অনুগত ভৃত্য; এখানে জ্বলিব না, এখন জ্বলিব না, এ কাজের নিমিত্ত জ্বলিব না, এ কথা বলে না। পবন চিরদিন কামচারী, প্রভুত্ব মানে না, করিতে চায়। ইহার মতি বুঝিয়া কাজ করাইতে হয়। গুণ এই, যখন কাজ করে, তখন বিনা বেতনে করে। সেয়ানা সাবধানে সুযোগ অন্বেষণ করে; দেশ দেখে, কাল দেখে, যোগ্য কর্ম্ম দেখে; কখনও বা আশায় কর্ম্মের আয়োজন করিয়া রাখে, আসিলেই কাজ করাইয়া ফেলে।

পবনের বেগ ঘণ্টায় এক মাইল হইলে আমরা জানিতে পারি না, দুই-তিন মাইল হইলে বুঝিতে পারি, চারি-পাঁচ মাইল হইলে মন্দ বায়ু বলি, দশ-বার মাইল হইলে ধীর থাকে না, কিন্তু সুখকর থাকে, পনর-ষোল মাইল হইলে সমীরণ বলিতে পারি, চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হইলে প্রভঞ্জন বলায় দোষ হয় না। বায়ু তরল; জল তরল, জল অপেক্ষা ৮০০ গুণ তরল। এক ঘনফুট জল ওজনে ৩০ শের, এক ঘনফুট বায়ু ৩ তোলা মাত্র। এই কারণে পবনের বেগেই শক্তি। ঘণ্টায় ব মাইল বেগ হইলে বাধার শতবর্গ ফুটে ঠেল ৯×ব২ তোলা ধরা যাইতে পারে। ১০ মাইল বেগে ১১ শের, ১৫ মাইলে ২৫ শের, ২০ মাইলে ৪৫ শের ঠেল পড়ে। ভারী ভারী মহাজনী নৌকা পাইলে পবনের ঠেলে চলে। অতএব বেগ অল্প হইলে পাইল বাড়াইতে হয়, নতুবা প্রাপ্ত শক্তি অল্প হয়। কিন্তু পাইল বাড়াইতে গেলে পবনচক্রের আকার বাড়ে, আকার বাড়িলে ভার বাড়ে, নির্ম্মাণনৈপুণ্য ও ব্যয়বাহুল্য আবশ্যক হয়, মৃদু পবনে চলে না। অবশ্য এমন কল হইতে পারে না, যাহাতে সবই সুবিধা; এমন কল নাই, যাহাতে সুবিধা অসুবিধার বিরোধ মিটাইতে হয় না।

আবহমান-মন্দিরে পবনবেগ প্রত্যহ পরিমিত হইতেছে। খৃঃ ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ সালের পড়্তা করিলে দেখা যায়, কটকে জানুআরি মাসে দৈনিক বেগ ৩৬, ফেবরুআরিতে ৫২, মার্চে ৬৯, এপ্রিলে ১০৮, মে-তে ১২০, জুনে ৯৯, জুলাইতে ৭৮, আগষ্টে ৭০, সেপ্তম্বরে ৫৩, অক্টোবরে ৪০, নভেম্বরে ২৮, ডিসেম্বরে ৩৩ মাইল। বলা বাহুল্য, প্রত্যহ এত এত মাইল বেগে বাতাস বহে না। তথাপি এই মতন আশা করিতে পারি। দেখা যায়, দিবা রাত্রির মধ্যে এক একবার পবনবেগ অধিক হয়, এক এক সময় বাতাসের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। প্রায় আট ঘণ্টা অধিক হয়, অবশিষ্ট ১৬ ঘণ্টায় থাকে না বলা চলে। দৈনিক বেগের দশমাংশ বেগ আট ঘণ্টা পাওয়া যাইতে পারে। পবনচক্রের পক্ষে ৮।১০ মাইল বেগ নিম্ন-বেগ বলিতে পারা যায়। ইহার কমে চক্র ঘুরিতে পারে, কিন্তু কাজ হইবে না। এই হিসাবে কটকে মার্চ হইতে আগষ্ট, এই ছয় মাস চক্র চলিতে পারে; তন্মধ্যে এপ্রিল, মে, জুন, এই তিন মাস বরং যোগ্য কাল, অন্য তিন মাস প্রায় অযোগ্য।

আমি শীতকালে চক্র-নির্ম্মাণ আরম্ভ করাইলাম। এমন চক্র চাই, যাহাতে ভারী কিংবা ঢালা লোহা লাগে না, যাহা গ্রাম্য কর্ম্মকার গড়িতে পারিবে। গ্রাম্য কর্ম্মের নিমিত্ত দুই চারি

মানুষ-শক্তি পাইলেও চলে। আমেরিকার কোন কোন স্থানে গ্রাম্য কৃষকে জাম্বো (Jumbo) নামে এক প্রকার পবনচক্র নিজেরাই গড়িয়া চালায়। ইষ্টিমারের জল-কাটা পাখার মতন ইহাতে পাখা থাকে এবং উঠে নামে। এই কারণে ইহার নাম মর্কটচক্র রাখিয়াছিলাম (২য় পট)। পবনচক্রের পাখা বড় বড়, প্রায়ই চারিটা। বস্তুতঃ ইষ্টিমারের জল-কাটা পাখা এক প্রকার জলচক্র। স্রোতে বসাইলে তাহা ঘুরিত এবং জল-শক্তি দ্বারা অন্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত। চক্রের উপর ও নীচের পাখা জলে ডুবাইয়া রাখিলে চক্র ঘুরিতে পারে না; কারণ, জলের ঠেল দুই পাখাতে সমান পড়ে। অক্ষের উপরের পাখা জলের বাহিরে থাকে, নীচের পাখায় জলের ঠেলে চক্র ঘোরে। পবনচক্রেও এইরূপ ব্যবস্থা চাই। চক্রের সম্মুখে ও পশ্চাতে অক্ষ পর্য্যন্ত উচ্চ দুই প্রাচীর থাকিলে কেবল উপরের পাখায় পবনের ঠেল পড়ে। আর এক আবশ্যক কথা আছে। নদীস্রোত একই দিকে বহে, পবন-স্রোত বহে না। বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে শীতকালে উত্তর, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু বহে। ঠিক উত্তর, ঠিক দক্ষিণ নহে, কিংবা মাসের সব দিন ঠিক এক দিক্ হইতে বহে না। কিন্তু এমন স্থানও আছে, যেখানে উত্তর দক্ষিণের এ-দিক্ ও-দিক্ অধিক হয় না। শরৎ ও বসন্ত কালের পক্ষে এ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, দক্ষিণমুখা হঠাৎ উত্তরমুখা, কিংবা উত্তরমুখা বাতাস হঠাৎ দক্ষিণমুখা হইতে পারে না। এই দিক্‌পরিবর্ত্তন অল্পে অল্পে কিছু দিন ধরিয়া হয়। শরৎকালে পবনবেগ অল্প, পবনচক্রের পক্ষে অকর্ম্মণ্য। বসন্তকালে অকর্ম্মণ্য নহে। কিন্তু সে সময়ে পবনদিক্ পরিবর্ত্তন হেতু কিছু দিন মর্কটচক্র দ্বারা কাজ প্রায় হইবে না।

কিন্তু কত শক্তি পাওয়া যাইতে পারে? এ বিষয়ের পরীক্ষা হয় নাই, ফলও জানা নাই। গণিত-সাহায্যে স্থূল অনুমান করা যাইতে পারে। সহজে বুঝা যায়, পবনচক্রের পাখার বেগ পবন-বেগের সমান হইলে, বাতাসের ঠেল পড়ে না, শক্তি জন্মে না। পাখার বেগ কম হওয়া চাই। এমন কাজ দিতে হইবে, যাহাতে কম হয়। এ কথা পরে হইতেছে। এ দেশের এক ঘন-ফুট গরম বায়ুর ভার ০'০৭ পৌণ্ড, এবং সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পৌণ্ডে এক অশ্বশক্তি। এক ঘন-ফুট বায়ু সেকেণ্ডে র ফুট বহিলে ০'০০১১৪ র^{২} ফুট-পৌণ্ড কাজ করে। যদি পবন-চক্রের পবন-পীড়িত পৃষ্ঠ পৃ বর্গফুট হয়, তাহা হইলে পবন দ্বারা সেকেণ্ডে ০'০০১১৪×পৃ×র^{৩} ফুট-পৌণ্ড কাজ এবং জাত অশ্বশক্তি ০'০০০০২×পৃ×র^{৩} হয়। পবনচক্রে কিন্তু এত শক্তি পাওয়া যাইবে না। কত পাওয়া যাইবে, সেইটা কথা। প্রথমতঃ দেখা যায়, পবনবেগ অপেক্ষা চক্রবেগ কম করিতেই হইবে। অত্যন্ত কম করিলে কাজও কম হইবে। যদি পবনচক্র-পরিধি-বেগ সেকেণ্ডে ব ফুট হয়, তাহা হইলে পৃ বর্গফুটে পবনের ঠেল পড়ে ০'০০২৩×পৃ× (র—ব)^{২} পৌণ্ড, এবং কাজ হয় ০'০০২৩×পৃ× (র—ব)^{২}×ব ফুট-পৌণ্ড। জলচক্রাদির তুলনায় অনুমান হয় ব=⅓ র হইলে কার্য্যক্ষমতা সমধিক হইবে। এই অনু-মানে কাজ হইবে ০'০০০০৩×পৃ×র^{৩} ফুট-পৌণ্ড এবং অশ্বশক্তি হইবে ০'০০০,০০,০৫×পৃ×র^{৩}। পবনবেগ ঘণ্টায় ১০ মাইল অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৫ ফুট এবং পবনপীড়িত পৃষ্ঠ ৫০

বর্গ ফুট হইলে ০·০৮ অশ্বশক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ এক মানুষ-শক্তির কিছু অধিক।*

পবনচক্র নির্ম্মাণের সময় আসিল। পাখা কত বড় করিলে আমার পরীক্ষা চলিতে পারিবে, তাহা এখন জানা আবশ্যক হইল। কাজেই একটু অঙ্ক-কষাকষি না করিলে নয়। ১০ মাইল পবনবেগে এক মানুষ-শক্তি পাইলেই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। এই হেতু আমার অধিকাংশ চক্রের পাখা বা কপাট ৬×৮ বর্গফুট, দুইটায় ৮×১০ বর্গফুট করাইয়াছিলাম। আমার বাসায় তিন পাশে উচা প্রাচীর-ঘেরা একটা স্থান আছে। সেখানে উত্তর-মুখা পবনও পাওয়া যায়। চক্র নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইল, কাজের যোগ্য হইল। কিন্তু দুই এক দিন মধ্যে রাত্রে ঝড় আসিয়া চারি পাখা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া গেল। পবনচক্র নির্ম্মাণের সময় প্রভঞ্জনের ভীম-রূপ ভুলিয়া যাই। অল্পের মধ্যে কিসে আবশ্যক শক্তি পাই, সেই চিন্তা প্রবল হয়। চক্রের পাখা অনায়াসে খুলিয়া নামাইয়া রাখিতে পারিতাম।

স্থানটি তিন দিকে ঘেরা, এক দিকে খোলা, কিন্তু সম্পূর্ণ খোলা নহে। তিন দিকে ঘেরা বলিয়া সেখানে পবনের আবর্ত্ত জন্মিত এবং নিম্নগামী পাখায় বাধা দিত। অতএব স্থানটা মর্কট-চক্রের যোগ্য ছিল না। তথাপি চক্র রূপান্তর করিলাম। পাখায় পাটের চট; বাহু উঠিবার সময় কাপড়ের পর্দ্দার মতন প্রায় অক্ষ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া বাতাস ধরিত, নামিবার সময় নীচে খসিয়া জড় হইয়া পড়িত, পবন প্রতিরোধ করিত না (২য় পট, ৫ম চিত্র)। ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিলে পর্দ্দা গুটাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেই চক্র নিরাপদ্ হইত। ঝড়ের সময় মাঝী নৌকার পাইল খুলিয়া ফেলে, সে কারণে পাইল অসিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বুঝিয়াছিলাম, এক দোষ সারিতে গিয়া অপর দোষ ঘটিয়াছে। শত শত বার পর্দ্দা উঠিতে পড়িতে থাকিলে বেশী দিন টিকিবে না। অতএব মর্কট-চক্র করিতে হইলে চটের পাখায় চলিবে না। ঘেরা স্থান দেখিয়া বসাইলেও চলিবে না।

বসন্তকালে মর্কট চক্র স্থাপিত হইয়াছিল, যে কালে পবনের দিক্ ঠিক থাকে না। কাজেই এমন চক্র চাই, যাহা পবনের দিক্ মানিবে না, যে দিকেই বহুক, চক্র চলিবে। শকটের চক্র

---

* এ বিষয়ের গণিত দুরূহ এবং গণিতের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের অনৈক্য হয়। উপরে ন^{৩} ধরা গিয়াছে; ফলে ন^{৩} কি ন^{২} হইবে, তাহার নিশ্চিত জ্ঞান অল্প। পরে ক্ষেপণী-চক্রের বেলা ইহার উল্লেখ করা যাইবে। নদী-স্রোতের জলচক্রের (Mid-stream water wheel) সহিত তুলনা করা যাউক। নদীর মাঝে জলচক্র বদ্ধ করিলে, এবং নদীবেগ ন, চক্রপরিধি-বেগ ব, জল-আহত পৃষ্ঠ পৃ ধরিলে ইঞ্জিনিয়ররা বলেন, এই জলচক্রের কার্য্যকারী অশ্বশক্তি = ০·০০২৮ × পৃ × (ন—ব) × ন × ব হইবে। তাঁহারা দেখিয়াছেন, ব = ০·৪ন কিংবা ০·৫ ন হইলে কর্ম্মক্ষমতা সমধিক প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে, জাত অশ্বশক্তি ০·০০০৬৭ × পৃ × ন^{৩} হয়। জল অপেক্ষা গরম বায়ু ৮৫০ গুণ লঘু। অতএব পবনচক্রে 'উক্ত' সূত্র প্রয়োগ করিলে পবনচক্রের অশ্বশক্তি ০·০০০,০০,০৭ × পৃ × ন^{৩} পাই। কিন্তু অন্য ইঞ্জিনিয়ররা উক্ত জলচক্রের অশ্বশক্তি = ০·০০২৮ × পৃ × (ন—ব) × ন, কেহ বা ০·০০৬ × পৃ × (ন—ব) দিয়াছেন। যেখানে পরীক্ষা হইয়াছে, সেখানে এত মতভেদ।

উপর নীচে ঘোরে। মর্কট-চক্রও এইরূপ ঘোরে। অতএব ইহা শকটীয় চক্রের দৃষ্টান্ত। কুম্ভকারের কুলাল-চক্র ভূ-সম ঘোরে। যে চক্র এইরূপ ঘোরে, তাহা কুলালীয় চক্র। যদি এইরূপ চক্রের বাহু বা অরাতে পাখা আঁটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাতাসে ঘুরিবে না (৩য় পট)। কারণ, দুই পাশের দুই পাখায় ঠেল পড়িবে, এক ঠেল অন্য ঠেল রোধ করিবে। প্রাচীর দিয়া এক পাশের পাখায় বাতাস লাগা নিবারিত হইলে এই কুলালীয় পবন-চক্র ঘুরিতে থাকিবে। এই চক্রও আমেরিকার কৃষকেরা গড়িয়া কার্য্যসিদ্ধি করে। আমার বাসায় এরূপ চক্র বসাইবার যোগ্য স্থান ছিল না। তা ছাড়া বাতাসের দিক্ দেখিয়া প্রাচীর নড়াইতে হইত। কামরাঙ্গার সাদৃশ্যে এই চক্রের নাম কর্ম্মরঙ্গ।

আবহ-মানমন্দিরের ছাদের উপরে চারি বাহুতে বদ্ধ চারি বাটী ঘুরিতে থাকে। তাহাও কুলালীয় চক্র, যদিও তদ্দ্বারা পবন-বেগ-মাইল মাপা হয়। বাটীর ভিতরে ঠেল যদি ৩ হয়, বাহিরে ২। এই ১ অতিরিক্ত ঠেল হেতু এই চক্র ঘোরে। বাটীর আকারে পাখা করা সহজ নহে। এ কারণ প্রথমে আদর্শে টিন বাঁকাইয়া চারি ডোঙ্গা আঁটিলাম (৪র্থ ৫ম পট)। এইরূপে দ্রোণ-চক্রের উৎপত্তি। কিন্তু এই আকার অপেক্ষা দুই পাখা বহির পাতার মতন মাঝে আঁটিয়া মুখ খুলিয়া কোণিয়া করা সহজ। ইহাও দ্রোণ-চক্র। আদর্শে দেখিয়াছি, এই চক্র একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে এবং পবন মৃদু না হইলে বেশ ঘুরিত। এক সময়ে তিন দ্রোণে বাতাসের ঠেল পড়িত, চতুর্থ দ্রোণ কোণ দিয়া বাতাস কাটিয়া চলিয়া আসিত। কিন্তু ঝড়ে দ্রোণ-রক্ষার উপায় দেখিলাম না। মাটিতে দাঁড়াইয়া দ্রোণ খুলিয়া লইতে পারা যায় বটে, কিন্তু আমার প্রাচীর-ঘেরা স্থানে উচ্চে দ্রোণ আঁটিতে হইত।

এই কারণে এই চক্র বৃহৎ করাইলাম না। ষট্-বাহুযুক্ত ১৩ ফুট ব্যাসের এক কুলালীয় চক্র করাইলাম (৪র্থ ৫ম পট)। পাখার পরিবর্ত্তে ইহাতে ছয় (৬ × ৪ ফুট) কপাট বসিল, যে কপাট বায়ুমুখে আপনি বন্ধ হয়, বায়ু-বিমুখে মুক্ত হয়। নাগরদোলার সহিত সাদৃশ্যে যেন নাগর কপাট খুলিতেছে, বন্ধ করিতেছে, এই চক্রের নাম নাগর-চক্র হইল। এক এক চক্রের এক এক নাম না দিলে কর্ম্মকার ও কর্ম্মকরের সহিত কথাবার্ত্তায় অসুবিধা হইত। লঘু করিতে, মৃদু পবনেও কাজ পাইতে, কাঠের চৌকাঠে পাটের চট দিয়া কপাট করাইয়াছিলাম। তিন মাইল মাত্র পবন-বেগে ঘুরিত, পাঁচ সাত মাইলে কুআর উপরে স্থাপিত আরাটা ঘুরাইয়া অল্প অল্প জল তুলিত। কয়েক অসুবিধা ছিল। কুআর নিকটে চক্র বসাইবার উন্মুক্ত স্থান ছিল না; ৪০ হাত দূরে রশি দিয়া পবনচক্রের কপির সহিত আরাটার কপির যোগ করিতে হইয়াছিল। স্বল্পশক্তি পবনচক্রের পক্ষে দীর্ঘ রশির ভার ও নানা ঘর্ষণের বাধা অধিক হইয়াছিল। তখন ১০ মাইল পবনও পাই নাই।

পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি, পবন-শক্তি সংগ্রহের সময় কেবল সংগ্রহের প্রতি মন থাকে, পবনের ভীমাকার স্মরণ থাকে না। ঝড় আসিলে চক্রের দশা কি হইবে, তাহা মনে আসে নাই। এক রাত্রে এত বেগে বাতাস বহিতে লাগিল যে, সে রাত্রে পবন-চক্রের কপাটের

সঘনে পতন-শব্দে প্রতিবেশীর আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তত রাত্রে কপাট খুলিয়া নামাইবার উপায় ছিল না। প্রাতে সব খুলিয়া ফেলিতে হইল। ঝড়ে রক্ষার উপায় চাই, কপাটের ঠক্-ঠক শব্দও বন্ধ করা চাই। পবন-সুযোগে চক্র-চালনা সহজ, দুর্যোগে রক্ষা সহজ নহে।

পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া আর বৃহৎ চক্র করাইলাম না। ছোট ছোট আদর্শ গড়াইয়া ইচ্ছা-মতন আটকাইবার উপায় দেখিতে লাগিলাম। ইহার ফলে ১৬ ফুট ব্যাসের শকুন্তচক্রের উৎপত্তি (৪র্থ ৫ম পট)। বহুকাল পূর্ব্বে, পঞ্জাবে না কোথায়, এক সাহেব শকুন্তচক্র করাইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘজীবী করিতে পারেন নাই, সে চক্র কালবৈশাখীর কাল-গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। রক্ষার সহজ উপায় পাইলাম। এই চক্রও কুলালীয় চক্র ; মধ্যে স্তম্ভ, স্তম্ভে চারি দীর্ঘ বাহু বদ্ধ। এই বাহু হইতে পাখা (১০×৮ ফুট) ঝুলিতে লাগিল। পবনমুখে নৌকার পাইলের মতন একখানা পাখায় বাতাস ধরিত, সে সময়ে বিমুখের পাখা উঠিয়া ভূমি-সম হইত, বাতাসের গতিরোধ হইত না। দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটা বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিতেছে ও উঠিতেছে। এই সাদৃশ্যে চক্রের নামকরণ হইয়াছিল। দিনের বেলা বাতাস বহিলে কুআ হইতে জল তোলা কাজ হইত, অপরাহ্ণে পাখার নিম্ন প্রান্ত তুলিয়া সমুখের অক্ষ-বাহুতে বাঁধিয়া রাখা হইত, তখন যেন চাঁদোআ টাঙ্গানা হইত। হাত পাইতে পারিবে, ইচ্ছা হইলে মাটিতে দাঁড়াইয়া দুই জনে পাখা খুলিয়া নামাইতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে অধিক উচ্চে পাখা ঝুলানা হয় নাই। উন্মুক্ত স্থান হইলে শকুন্তচক্র উপযোগী, সন্দেহ নাই। গড়িতে চালাইতে থামাইতে কষ্ট নাই। আমার স্থানের পক্ষে উপযোগী হয় নাই, পবনের আবর্ত্ত জন্মিয়া চাঁদোআর নিম্নপৃষ্ঠে আঘাত করিত, পবন প্রবল হইলে চাঁদোআ পত্-পত শব্দে উঠিত পড়িত। প্রাচীর দূরে দূরে ছিল, তথাপি আবর্ত্ত জন্মিত।

এই হেতু আবার উচ্চ চক্র চিন্তা করিতে হইল। প্রথম নাগরচক্রের রূপান্তর করাইলাম (৭ম পট)। এবার এক একখানা কপাটের পরিবর্ত্তে প্রতি বাহুতে দুই দুইখানা অল্প-পরিসর কপাট বসিল, যেন দ্বারের খড়্খড়ী কপাট। কপাট পড়ার ঠক্-ঠক শব্দও প্রশমিত হইল। ঝড়ের উপক্রম দেখিলে এক বাহুর দুই কপাট ফাঁক করিয়া বাহুতে আঁটিয়া রাখা হইত, অন্য দুই বাহুর কপাট পবনের গতিকে পবনের দিকে একাশী হইয়া থাকিত। চক্রের অক্ষে চড়িয়া সেখান হইতে দোড়ী টানিয়া যখন ইচ্ছা তখন চক্র নিশ্চল করিতে পারা যাইত। ইহার আদর্শে এমন কৌশলও ছিল, যাহাতে ঝড় বহিলে এক বাহুর কপাট আপনি খুলিয়া যাইত, চক্র বন্-বন ঘুরিত না। আশ্চর্য্য এই, এই সহজ উপায় প্রথম ষট্-বাহু নাগরচক্র স্থাপনার সময় মনে হয় নাই।

কিন্তু এ দিকে যাহাই হউক, চারি বাহুর চারি কপাটের মধ্যে এক সময়ে একটার বাতাসের ঠেল পড়ে, অন্য তিনটা কেবল আকার ও ভার বৃদ্ধি করে। ৫০ বর্গফুটে বাতাস ধরিতে গিয়া ২০০ বর্গফুট পাখা বা কপাট আঁটিতে হয়। চারি কপাট বৃহৎ

করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে চক্রের যাবতীয় অঙ্গ বৃহৎ ও ভারী করিতে হয়। কুলালীয় চক্রের ইহাই দোষ। এক সময়ে তিনটা কপাট কর্ম্মণ্য করাইতে পারিলে প্রতি কপাটে যতই হউক, তিনের সমষ্টি একটার অধিক হইবে। প্রথমে আদর্শ গড়িয়া পরীক্ষা করিয়া পরে বৃহৎ চক্র করাইলাম (৪র্থ পট ৪র্থ চিত্র, ৫ম পট ৩য় চিত্র)। এই সংস্কৃত নাগরচক্রে চারি কপাট এমন সংলগ্ন করা হইয়াছিল যে, পবন-মুখে তিনখানা কপাটে ঠেল ধরিত, কেবল একখানায় ধরিত না। প্রথম কপাটে ৪৫° কোণে, দ্বিতীয়খানায় ৬৮° কোণে, তৃতীয়খানায় ২২° কোণে পবনের ঠেল পড়িত। কপাট তির্য্যক থাকিলে পবনের কত ঠেল পড়ে, তাহা গণিতবিদ্যায় দুরূহ প্রশ্ন। সহজ ভাবে দেখিলে, তিন কপাটে এক কপাটের দেড়গুণ হইতে প্রায় দুই গুণ ফল হইত অর্থাৎ প্রতি কপাট ৫০ বর্গফুট হইলে তিন কপাটে ৭৫ হইতে ৯০ বর্গফুটের কাজ হইত। কপাটের ঠক্-ঠকানিও কমিল। কপাটের দুই অসমান ভাগে ঠেল লাগিত, ফলে কপাট বেগে বাহুতে আঘাত করিত না। আবশ্যক হইলে কপাট খুলিয়া রাখাও সহজ হইল। সোজা রাখিলেই ঝড়-বাতাস লাগে না। এখনও কিন্তু অক্ষে চড়িয়া কপাট খুলিয়া বাহুতে বাঁধিয়া রাখিতে হইত। ভূমিতে দাঁড়াইয়া কপাট খুলিবার বাঁধিবাব উপায় করিতেছিলাম, যখন এক দিন অপরাহ্ণে সে চিন্তা হইতে নিস্তার পাইলাম। আমি বাড়ীতে ছিলাম না। ঝড়ের শঙ্কা না দেখিয়া চক্রের কর্ম্মকর কপাট খুলিয়া রাখে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গেল। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া দেখি, অক্ষের চারি পাদ (বা ঠেক-কাঠ) সমূলে উৎপাটিত ও চক্র ধরাশায়ী হইয়াছে। অভিমন্যু আগম জানিতেন, নির্গম জানিতেন না, এই হেতু অকালে মারা যান। আমি চক্রের আগম-নিগম দুই জানিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চক্রস্তম্ভের পাদকাষ্ঠ দৃঢ়-প্রোথিত হয় নাই। একে বালি মাটি, তাহাতে বৃষ্টি হইয়া পাদকাষ্ঠ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মোটা মোটা কাঠে পাদ বদ্ধ করিয়া, অন্ততঃ মোটা তার দিয়া বড় বড় পাথর বাঁধিয়া, মাটিতে পুঁতিলে দুর্দ্দৈব ঘটিত না। এই শিক্ষা কিন্তু মনেই রহিয়া গেল। বর্ষাকাল আসিল, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে পবনচক্র ছিল কি না, কে জানে? লোকে বলে, ইয়ুরোপে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে পবনচক্রের আরম্ভ হইয়াছিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর পবনচক্র হতাদর হইয়াছে। তৈলীয় ইঞ্জিনের পর আরও হইয়াছে। তথাপি হলাণ্ড ইটালী প্রভৃতি দেশে বড় বড় জলার জল মারিবার তরে বড় বড় পবনচক্র দ্বারা পম্প চালিত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, আমেরিকার একটা নগরে এক বৎসরে পাঁচ হাজার পবনচক্র বিক্রয়ার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ যে সকল কাজে ত্বরা নাই, অথচ অল্প শক্তি দ্বারা কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে, পবনবেগ পাইলে পবনচক্রই উত্তম যন্ত্র। পবন অনিশ্চিত বটে, কিন্তু সব দেশে অনিশ্চিত নহে, বৎসরের সব সময় অনিশ্চিত নহে।

ইয়ুরোপের পুরাতন পবনচক্র এক প্রকার শকটীয় চক্র, চারি দীর্ঘ পাখা পবনবেগে

ঘূর্ণিত হইত। নৌকার যেমন ক্ষেপণী বা দাঁড়, এই চক্রের পাখা প্রায় তেমন। ইহাকে ক্ষেপণীচক্র বলা যাউক। প্রথম প্রথম চক্রের স্তম্ভ ধরিয়া ঘুবাইয়া পবন-মুখে ক্ষেপণী রাখিতে হইত। পরে চক্রের একটা পুচ্ছ আবিষ্কৃত হইল, যদ্দ্বারা চক্র সর্ব্বদা পবনমুখে থাকিত। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ঝড়-সম্বরণের কৌশল আবিষ্কার হইয়াছে; ইহার পূর্ব্বে প্রবল পবনের সময় চক্র নিশ্চল করিতে পারা যাইত না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, পবনচক্রের প্রতি আমেরিকার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ফলে পুরাতন চারি ক্ষেপণীর পরিবর্ত্তে বহু-পক্ষসংযুক্ত বিম্বাকার চক্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পুরাতন ও নূতন চক্র পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, পবনশক্তি-সংগ্রহে দুই-ই সমান, বরং ক্ষেপণী চক্র উত্তম, মার্কিন বিম্বচক্র ঘূর্ণন-সৌকর্য্যে উত্তম।

আমেরিকার হাত পড়িলেও পবনচক্রের যথোচিত উন্নতি হয় নাই। ইহার গণিত সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পরীক্ষা ব্যতীত গণিত দ্বারা জাত শক্তি বলিতে পারা যায় না। ১৫।১৬ মাইল পবন-বেগে ১২ ফুট বিম্বচক্র দ্বারা কেহ বলেন সিকি, কেহ বলেন আধ, কেহ বলেন এক, কেহ বলেন দেড় অশ্ব-শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। বিক্রেতা শক্তি বাড়াইয়া বলে, কিন্তু সকলে বলে না। ক্ষেপণী-চক্র ও বিম্ব-চক্র দ্রুত ঘূর্ণনশীল। পবনবেগ অপেক্ষা এইরূপ চক্রের পরিধিবেগ অধিক। আড়াই হইতে তিন গুণ পর্য্যন্ত অধিক হইলেই কার্য্য-ক্ষমতা সমধিক হয়। এইরূপ বেগ রাখিলে এবং ব পবনবেগ ফুট, পৃ পবন-পীড়িত পৃষ্ঠ-বর্গ-ফুট হইলে একটা পুরাতন সূত্রে বলে যে জাত অশ্বশক্তি $= \frac{\text{পৃ} \times \text{ব}^{3}}{1080000}$ অর্থাৎ $0.0000009 \times$ $\text{পৃ} \times \text{ব}^{3}$ হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই নিয়মে শক্তি পাওয়া যায় না। ব্যাসবর্গের অনুপাতে পৃষ্ঠফল বাড়ে। তদনুসারে ১৬ ফুট ব্যাসের চক্রে ১১ ফুট চক্রের প্রায় দ্বিগুণ শক্তি পাইবার কথা। মাদ্রাজে চেটার্টন সাহেব ১০ মাইল পবনবেগে ১৬ ফুট বিম্বচক্র দ্বারা মাত্র $\frac{1}{2}$ অশ্বশক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, পবনবেগের ঘন অনুপাতে শক্তি বাড়ে না, বর্গ অপেক্ষা কিছু অধিক অনুপাতে বাড়ে। বস্তুতঃ ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিমিত্ত লিখিত গ্রন্থবিশেষে* ব^{3} পরিবর্ত্তে ব^{2} আছে। উল্‌ফ সাহেব-লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে আছে যে, ১৬ মাইল পবনবেগে ১২ ফুট চক্রে ০.২১, ১৬ ফুট চক্রে ০.৪১, ২৫ ফুট চক্রে ১.৩৪ অশ্বশক্তি জন্মে।

বিম্বচক্র এত নির্ম্মিত ও চালিত হইয়াছে, তথাপি দেখা গেল, অনেক অজ্ঞাত আছে। নাগরচক্রের ন্যায় কুলালীয় চক্র অত্যল্প নির্ম্মিত হইয়াছে। কুলালীয় চক্র সম্বন্ধে সবই প্রায় অজ্ঞাত। ক্ষেপণী-চক্রে ও বিম্ব-চক্রে তির্য্যক্‌ভাবে পবনের ঠেল পড়ে; ফলে পবনের শক্তির দশ

---

* The Practical Engineer Pocket-book and Diary, 1911. মার্কিন বিম্বচক্রবিষয়ে বিখ্যাত পুস্তক, The wind-miil as a Prime-mover. By Alfred R. Wolff. Published by John Wiley and sons. দুই বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বিলাত হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম ছাপা নাই।

বার আনা কাজে লাগে না। কুলালীয় চক্রে সমস্ত ঠেল লাগে। তথাপি কুলালীয় চক্রের আকার বৃহৎ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বচক্রের স্তম্ভে চক্র-স্থাপনা কঠিন, কুলালীয় চক্রে সহজ। কুলালীয়চক্রের এই গুণ দেখিয়া আমি এই চক্র-নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলাম। ইয়ুরোপে কুলালীয় চক্র দুই একটা আছে, একটা দ্বারা ৫।৭ অশ্বশক্তির সংবাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু কত কাল টিকিয়া আছে, জানিতে পারি নাই। বিশ্বচক্র অপেক্ষা ক্ষেপণীচক্র নির্ম্মাণ ও স্থাপন কিছু সহজ। আমি দুই-এরই আদর্শ করাইয়াছিলাম (৮ম পট)। ছোট আদর্শে যত সহজ, বৃহৎ প্রমাণে অবশ্য তত সহজ নহে। আদর্শে টিনের পাখা আঁটিয়াছিলাম।

কিন্তু যাহাঁরা বসন্তকালে মাধবীলতার শুষ্ক ফল গাছ হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে দেখিয়াছেন, তাহাঁরা জানেন, ফলে তিনখানি পাখা আঁটিয়া প্রকৃতি কত সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনখানি পাখা সোজা মেলিয়া না থাকিয়া সমুখে কোণিয়া হইয়া থাকে। কুকশিমা গাছের ফল বা বীজে লোমগুচ্ছ থাকে। এই লোমও সমুখে কোণিয়া হইয়া বর্ষাকালে কৃষকের মাথার টোকার আকারে থাকে। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, শকটীয় চক্র করিতে হইলে সমুখে কোণিয়া করা আবশ্যক। মাধবীফলের তিন পাখার এক পাখা বড়। একটা বড় না হইলে উড়িয়া দূরে পড়িতে পারিত না। সমুখ দিকে কোণও অধিক, প্রায় ৩৫° সমুখ দিকে হেলানা। এত কোণ দিয়া পবনচক্র গড়িলে চক্র-স্থাপনা কঠিন হয়, চক্রটা ঝুলিয়া পড়ে। এই হেতু আমার মাধবীচক্রের তিন পাখা ১৫°।২০° কোণ করিয়া আঁটিয়াছিলাম। একটায় ছয়খানা পাখা আঁটিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রি-পক্ষ ও ষট্‌-পক্ষ চক্রের কাজে প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই। বৃহৎ গড়াইবার অবসর হয় নাই। তবে বুঝিয়াছি, স্বল্পশক্তি মাধবীচক্র কিংবা ক্ষেপণীচক্র গড়া গ্রাম্য কর্ম্মকারের অসাধ্য নহে।

ছেলে-খেলার মধ্যে কাগজের এক প্রকার পদ্ম বিক্রয় হয়। বাতাসের মুখে ধরিলে পদ্ম নিজের অক্ষে থাকিয়া বেগে ঘুরিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ছেলেরা গুলঞ্চ ফুলের মাঝে খড়িকা পরাইয়া ফুলটি বাতাসের মুখে ধরে। ফুলটি বেগে ঘুরিতে থাকে, তাহারা বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া থাকে। বিস্ময়ের কথাই বটে। মানুষের যন্ত্রনির্ম্মাণ-বুদ্ধি প্রকৃতির অনুকরণে খুলিয়াছে। মার্কিন বিশ্বচক্র গুলঞ্চ ফুলের দৃষ্টান্ত হইয়াও নহে। গুলঞ্চ ফুলের পাখড়ীর মধ্যেও কোণ আছে।

ডেনমার্ক দেশের রাজা নানা আকারের পবনচক্রের দোষ-গুণ পরীক্ষার নিমিত্ত খ্রীঃ ১৮৯১ সালে এক ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে পরীক্ষক মহাশয় মারা যান, পরীক্ষাও স্থগিত হয়। তাহাঁর দুইটা ফল জানিতে পারিয়াছি। প্রথম, মার্কিণ বিশ্বচক্রে অধিক পাখা হেতু কার্য্যক্ষমতা না বাড়িয়া অল্প হয়, পাঁচ ছয়টা পাখা দ্বারা অধিক হয়। দ্বিতীয়, সে কয়টা পাখা পবন-মুখে সোজা না থাকিয়া কোণিয়া হইয়া থাকিলে ভাল হয়। অর্থাৎ তিনি মাধবীচক্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এখন আমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে জানাইয়া প্রবন্ধ শেষ করি। মৃদু পবনেও দুই চারি

মানুষ শক্তির পবনচক্র যে-সে গড়িতে পারে। কিন্তু যোগ্য দেশ না পাইলে নিষ্ফল। যেখানে বার মাস কিংবা আবশ্যক কয়েক মাস প্রায় একই বেগে পবন বহে, সেখানে পবনচক্র প্রায় নিরাপদ্। উন্মুক্ত স্থান, যেমন মাঠ, যেখানে কতক দূর পর্য্যন্ত ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা নাই, সেখানে ভূমির নিকটে প্রায় সমান পবন পাওয়া যায়। সেখানে উচ্চ স্তম্ভ আবশ্যক হয় না, কাজেই চক্র-স্থাপনা সহজ। কিন্তু ভূমির নিকটে যত আবর্ত্ত, উচ্চে তত হয় না। আবর্ত্ত পবন-চক্রের শত্রু। ঝড়ও পবনের আবর্ত্ত মাত্র এবং উচ্চে ঝড় যত লাগে, নীচে তত লাগে না। এই দুই বুঝিয়া স্থান-নির্ব্বাচন আবশ্যক। ছোট ছোট চক্র পাকা-বাড়ীর ছাদেও স্থাপন করা যাইতে পারে।

যাবতীয় চক্রের মধ্যে যে চক্রে পাখা দৃঢ়বদ্ধ থাকে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কপাট খুলিতে পড়িতে পড়িতে পরে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। যদি প্রায় একই দিকে, যেমন উত্তর-দক্ষিণ দিকে, বাতাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে মর্কট-চক্র সুসাধ্য। মর্কটচক্রে প্রাচীর আবশ্যক। ইহার পরিবর্ত্তে মর্কট-চক্রের বাহুতে শকুন্ত-চক্রের পাখা কিংবা বাহুর মাঝামাঝি কপাট বসাইতে পারা যায়। পর্দা অপেক্ষা কপাট ভাল বটে, কিন্তু পাখা কিংবা কপাট দিয়া বড় মর্কটচক্র স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি একই দিকে পবন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভূমি-নিকটস্থ কর্ম্মরঙ্গ-চক্র উৎকৃষ্ট। এরূপ স্থানের পক্ষে দ্রোণচক্রও ভাল। ভূমির নিকটে সব চক্রই ভাল; কারণ, নির্ম্মাণ-ব্যয় অল্প হয়, কাজের সময় পাখা জুড়িয়া অন্য সময় অক্লেশে খুলিয়া রাখিতে পারা যায়। স্তম্ভ উচ্চ করিতে হইলে সব চক্রই দুঃসাধ্য হয়। তখন ক্ষেপণীচক্র কিংবা মাধবী-চক্র বিহিত। একটু বুঝিয়া করিতে পারিলে এই দুই চক্র নির্ম্মাণ কঠিন নহে. ক্ষেপণী-নির্ম্মাণে একটু বিচক্ষণতা চাই। ক্ষেপণী সোজা নহে, ইক্ষুরূপের মতন বাঁকা। মাধবীচক্রের পাখাও এই রকম বাঁকা। এই দুই চক্রের মাথায় লোহার অক্ষ, লোহার দাঁতাল চাকা ইত্যাদি লাগে। এ কারণ গ্রামে নির্ম্মাণ সুসাধ্য নহে। ছোট পবনচক্র করিতে হইলে বাইসিকেলের চাকা দিয়াও ষট্‌পক্ষ বিশ্বচক্র অসাধ্য হয় না। নাগর-চক্রের আকার বড় হয় বটে, কিন্তু ঘুরাইতে অধিক বল লাগে না। আমার ১৬ ফুট ব্যাসের নাগরচক্র ৮।৯ বৎসরের বালকে স্বচ্ছন্দে ঘুরাইতে পারিত। বলা বাহুল্য, কাঠ বাঁশ ইত্যাদি রোদ জল খাইয়া শীঘ্র জীর্ণ হয়। গড়িবার সময় উত্তমরূপে তেল-রঙ্গ কিংবা আলকাতরা লেপা কর্ত্তব্য, বর্ষা পূর্ব্বে বর্ষা পরে দুইবার লিপিলে অনেক কাল টিকিবে। ভারী হইলেও যাবতীয় চক্রের যাবতীয় অঙ্গ বহল করা আবশ্যক। পবনের সহিত বিরোধ, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। পবনচক্র সম্বন্ধে অন্য দুই এক কথা পটবিবৃতিতে লেখা হইবে।

পবনচক্র বসাইবার পূর্ব্বে পবনের গতিক জানা আবশ্যক। বৎসরাবধি দেখিতে দেখিতে চক্রনির্ম্মাণের সময় কোন্ অঙ্গ কি প্রকার করা আবশ্যক, তাহা সহজে বুঝা যাইবে। বাঁশের মাথায় ঘুরনিয়া পতাকা বাঁধিয়া অনায়াসে পবন-দিক্ নির্ণয় হয়। আমি টিনের মৎস্য করিয়া মীনকেতন করিয়াছিলাম। পবনবেগ মাপিবার কিন্তু এমন সহজ উপায় নাই। যে নগরে

আবহ-মানমন্দির আছে, সেখানে পবনমান-যন্ত্রে বেগ-মাইল পরিমিত হয়। কিন্তু মন্দিরে যত বেগ, দূরেও তত বেগ না থাকিতে পারে। কটকে পবন-মানযন্ত্র আছে, কিন্তু দূরে বলিয়া তাহাতে পরিমিত বেগের ভরসা করি নাই। এক কি দুই বর্গফুট একখণ্ড টিন কিংবা কাঠের পাতলা পাটা এক ধার (কোণ নহে) হইতে ঝুলাইয়া পবনের মুখে ধরিলে সেটা পশ্চাৎদিকে হেলে (৪র্থ পট ৬ষ্ঠ চিত্র)। তখন নিম্নপ্রান্তে স্প্রিং-বেলেন্স্ লাগাইয়া পবনের বিমুখে টানিয়া সোজা করিলে পবনের ঠেল পৌণ্ড কিংবা অন্য ওজনে জানিতে পারা যায়। পবনের কত বেগে কত ঠেল, তাহা জানা আছে। ইহা হইতে ঠেল দেখিয়া পবনবেগ গণিতে পারা যায়। সূত্র এই,—ঘণ্টায় ব মাইল বেগ হইলে প্রতি বর্গফুটে ঠেল = ০·০০৩× ব² পৌণ্ড। যথা, ৫ মাইল বেগে ০·০৭৫, ১০ মাইলে ০·৩, ১৫ মাইলে ০·৬৮ পৌণ্ড। স্প্রিং-বেলেন্স্ দিয়া টানিয়া টানিয়া হেলন চিহ্নিত করিয়াও রাখা যাইতে পারে। কত টানে কত কোণ দেখিয়া পরে তদ্দ্বারা পবনবেগ পরিমিত হইতে পারিবে। স্প্রিং-বেলেন্স্ অভাবে অন্য কৌশল আবশ্যক। ছোট হালকা কপির উপর দিয়া সূতা বাঁধিয়া টাকা ঝুলাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। (প্রায় ৩৯ তোলায় ১ পৌণ্ড)।

এখন আমার পবনচক্রের একটাও নাই। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে সে সব নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। দুই বৎসরে প্রায় ছয় মাস যে আনন্দে কাটিয়াছিল, যে শিক্ষা হইয়াছিল, তাহাই প্রচুর মনে করি। তথাপি যে দিন শুনিব, দেশে অপরে পবন আয়ত্ত করিয়াছেন, সে দিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

পরিশিষ্ট

১। দৈনিক পবনবেগ মাইল। (খ্রিঃ ১৯০৫—১৯০৮ সালের পড়তা)।

পূর্ব্বেকার বঙ্গপ্রদেশের মধ্যে কোথায় কোথায় পবনচক্র-চালনার যোগ্য পবন পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থানের নিকটেও এইরূপ পবনবেগ পাওয়া যাইবে। সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী স্থানে পবন প্রায়ই প্রবল থাকে। তথাপি দেখা যাইবে, পুরী শ্রেষ্ঠ। এখানে বার মাস প্রচুর শক্তি পাওয়া যাইবে। এইরূপ, বার মাসে শক্তি পাইবার পক্ষে বিহার ও ছোটনাগপুরে অনেক স্থান আছে। গয়ায় বেগ অধিক নহে, কিন্তু মাসে মাসে হ্রাসবৃদ্ধি অধিক হয় না। এখানে লঘু কাজ হইতে পারে। বঙ্গের মধ্যে বহরমপুর, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি অপর দুই এক স্থানও এই তালিকায় দিলে চলিত। আমার ছাত্র শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র সেন কলিকাতা-গেজেট হইতে তালিকাটি করিয়া দিয়া প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি করিল।

নগর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
কলিকাতা	৭৫	৯৯	১১৬	১৫৫	১৬৩	১৬৯	১৪৪	১৩১	৯৯	৬৬	৫৫	৬৫
দার্জ্জিলিঙ্গ	৮৫	১৩২	১৮১	১৩৭	১২২	৯৩	৭৯	৯৩	৮৪	৬২	৫৪	৬৭
ঢাকা	৪১	৫৬	৮৭	১৪০	১২৭	১৫২	১৫২	১৪৭	১১২	৪৭	২৮	৩২
নোয়াখালী	৪৫	৫৭	৮০	১৫০	১২৬	১৭৯	১৭৯	১৬৯	১০৩	৫৩	২৮	৪৩
চাটিগাঁ	৬৭	৬৫	৯০	১৪৯	১৩০	১৭৭	১৩৬	১৫২	১১৭	৫৬	৫৬	৬৬
ধুবড়ী	৯৮	১২০	১১০	২২২	২০০	১১৮	১২১	১১২	১১৮	১০৬	১৩৫	১৬২
বাঁকিপুর	১০৬	১২২	১৩৮	১৫৯	২১৩	১৯০	১৯১	১৯৫	১০৭	৫৯	৪৮	৬৫
গয়া	৮২	৭১	৯৫	৯৫	৯৯	৯১	৭৩	৭৬	৭৮	৬৬	৬৫	৫৮
ডেহরী	৯১	১২২	১০২	১৪৮	১৬৬	১৭৭	১৭২	১৬৭	১২৩	৭৪	৬১	৫৭
বক্সর	১১৪	১৪২	১৬৮	২১২	১৬৫	১৫৬	১৩৫	১১৯	১১১	৬৯	৭৭	৮৯
মতিহারী	৬৯	৯৬	৯৯	১১৯	১৩০	১১৩	১০৪	১০৯	৭৯	৩৯	৩১	৪২
মজাফ্ফরপুর	৪১	৫৮	৯৫	১১৫	১৪৯	১৪৪	১১৩	১১৩	৬১	৪১	৩৬	২০
মালদহ	১১১	১১২	১০৯	১৪৭	১২৬	১৫৮	১৭১	১৬১	১১৫	৬২	৫২	৯২
হাজারীবাগ	১৪৭	১৬৩	১৭৭	২১৭	২১০	২২৮	১৮১	১৬৪	১৬২	১২২	১১৮	১১২
রাঁচি	১৫৯	১৭৫	১৯৩	২২৫	২০১	২২০	১৯৩	১৭৯	১৬৭	১৪০	১২৭	১৩৪
পুরুলিয়া	৭৪	৮৩	১০৪	১২০	১২০	১১২	৯৩	৯১	৭২	৬৪	৭২	৭০
বালেশ্বর	৫৩	৬৬	৮৯	১১৯	১৪০	১২৮	১১৬	১২০	৭২	৪২	৩১	৪৭
পুরী	২২১	২৮৩	৩২৯	৩৮৪	৪১৪	৩৯৭	৩২৬	৩১১	২৩৯	১৮৪	১৮৪	১৯৪

২। পট-বিবৃতি

১ম পট। ১ম চিত্রে আরাটা কুআর উপরে স্থাপিত। ২য় চিত্রে মধ্যে উপরে ঢাক আরাটার অ অক্ষে বদ্ধ। ঢাকের উপর দিয়া এক জোড়া রশি। দুই পাশের দুই রশিতে সমান অন্তরে ৬টা ঘট বাঁধা আছে। প্রতি ঘটে ৫ শের জল ধরে। মিনিটে ১৫ শের জল উঠিতে থাকে। ইহা লঘু কাজ, যে-সে তুলিতে পারে। ৮টা ঘট বাঁধিলে ২০ শের উঠিতে থাকে। ইহাও কঠিন নহে। কুআর জল নামিয়া গেলে রশি তদনুসারে লম্বা করিতে হইবে। কিন্তু ঘটের সংখ্যা একই থাকিবে। অর্থাৎ নীচে হইতে জল কম উঠিবে। আরাটা ঘুরাইতে তা তারাকার ছয় অরা ১ম ও ৪র্থ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই হাতে অরা সমুখ দিকে টানিতে হইবে। হাত ছাড়িয়া দিলে বিপরীত দিকে ঢাক ঘুরিয়া যাইবে। ইহা নিবারণ নিমিত্ত ঢাকের উপরে মুদনী-কাঠে লোহার কবজায় ছিটকী দৃঢ় বদ্ধ করা গিয়াছে। এই

ছিটকী লাগিয়া লাগিয়া অরা সমুখে আসিবে, পেছু ঘুরিবে না। পবনচক্র দ্বারা আয়াটা চালাইবার অভিপ্রায়ে ঢাকের বামে কাঠের পাটার কপি বদ্ধ হইয়াছে। ৩য় চিত্রে দুইখানা কাঠের পাটার চাকা ধারে কোণ করিয়া বোলটু দিয়া আঁটিয়া কপি হইয়াছে। পবনচক্রের স্তম্ভের বৃহৎ কপিও পাটার করা গিয়াছিল।

২য় পট। ১ম চিত্রে মর্কট-চক্র। দুই পাশে প্রাচীর। বাঁশের বেড়ার প্রাচীর হইতে পারে। চক্রের পাখা পাতলা পাটার, টিনের করা চলে। অল্প কালের নিমিত্ত বাঁশের মোটা চাঁচেরও হইতে পারে। ২য় চিত্রে মর্কট-চক্রের ছেদক। অক্ষে বাহু নানা প্রকারে বদ্ধ করিতে পারা যায়। বাহুর মাথা পরস্পর জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। চিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। ৪র্থ চিত্রে আর এক মর্কট-চক্রের ছেদক। দুই বাহুর নিকটে দুই মোটা তার। পর্দা বা পাইলে লোহার কড়ি বাঁধিয়া তারে পরানা হইয়াছে। বাহু উপরে উঠিলে কড়ি সরিয়া পাইল ঝুলিয়া পড়ে, নীচে নামিলে জড় হয়। এই চক্রের পাখা কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। সুতরাং চক্র ভাল নহে।

৩য় পট। ১ম চিত্রে কর্ম্মরঙ্গচক্র। ২য় চিত্রে খুঁটী ও স্তম্ভ। ৩য় চিত্রে ছেদক। চারি খুঁটীর মাথায় শাঙ্গা, মাঝে মাটিতে পীঠে (পাথরের কিংবা পাকা গাঁথনির) লোহার কীল (গোঁজ)। এই দুইএর আশ্রয়ে স্তম্ভ ঘুরিতে পারে। ৪র্থ চিত্রে তির্য্যক্ ছেদক। চক্রের তিন বাহু আবরণ করিতে বৃত্তার্ধ প্রাচীর আবশ্যক।

৪র্থ পট। ১ ২ ৩ ৪ ৫ চিত্রে চক্রের পাখা বা কপাটের স্থিতি ও গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ চিত্রে কপাট-পবনমান। ইহার মাথায় মৎস্য ঘুরিয়া বায়ুদিক্ দেখাইয়া দেয়।

৫ম পট। বাহুতে পাখা ঝুলাইবার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তম্ভের মাথা হইতে লোহার মোটা তার দিয়া বাহু উপরে টানিয়া রাখা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ পট। স্তম্ভে বাহু বদ্ধ করিবার নানা ক্রম হইতে পারে। তিনখানা কাঠের বাহু পরস্পর জুড়িয়া ছয় বাহু করিলে মধ্যস্থ কোণে স্তম্ভ ধরিবে (৩য় চিত্র)। চারি বাহু করিতে হইলে ১ম ২য় চিত্রে প্রদর্শিত লোহার বাহুবন্ধ আবশ্যক। ৪র্থ চিত্রে শকুন্ত-চক্রের পাখা ঝুলাইবার ক্রম। ৫ম চিত্রে স্তম্ভ ধরিয়া রাখিবার পাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরে লোহার চাদরের আসন। ইহার মাঝে গোল ছিদ্র। আসনে পাদ বদ্ধ। স্তম্ভে লোহার শামা, নতুবা কাঠ ক্ষয় পাইবে। আসনের উপরে কর্ম্মকর দাঁড়াইবার বসিবার পাটা।

৭ম পট। একটা প্রায় সম্পূর্ণ উচ্চ নাগবচক্র। দুই বাহু মাত্র প্রদর্শিত।

৮ম পট। এখানে ক্ষেপণী ও মাধবীচক্র। আ আসন পর্য্যন্ত সহজে বোঝা যাইবে। মাথার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পুচ্ছ সংলগ্ন করিবার ক্রম হঠাৎ স্পষ্ট হইবে না। বলা বাহুল্য, এই দুই চক্র ছোট করাইতে গেলে মাথা লোহার না করাইলেও চলে। কাঠের করাইয়া অক্ষ ঘুরিবার ছিদ্রে অবশ্য লোহার উলো বা শাখা আঁটিতে হইবে। এই মাথা আসনের উপরে থাকিয়া চারিদিকেই ঘুরিতে পারে। এই দুইএর মাঝে লোহার গুলী, যেমন বাইসিকিলের

চাকার উলোতে থাকে, বসাইলে মাথা অনায়াসে ঘোরে। কাঠের পুচ্ছ যেন নৌকার হাইল। মাথায় কবজা দিয়া সংলগ্ন। এই হেতু আবশ্যক সময়ে পুচ্ছ ঘুরাইয়া চক্রের সমান আনিতে পারা যাইবে। ২য় চিত্রে লোহার দুই দাঁতাল চাকা, ১ম চিত্রে অক্ষ বাঁকাইয়া স্তম্ভ উঠা নামার উপায় করা গিয়াছে। অবশ্য, স্তম্ভ যাহা ঝুলিতেছে, তাহা অক্ষের আঙ্গটার নীচে থাকিয়া চারি দিকে ঘুরিতে পারা চাই। টেঁক-ঘড়ীর চেইনে এই কৌশল থাকে। ক্ষেপণী ও মাধবীর পাখা বাঁকাইবার নিয়ম প্রদর্শিত হইল না। প্রদর্শনের সুবিধা নাই। ইষ্টিমারের ইস্ক্রুপ, যাহা দ্বারা জল কাটে, তাহা কিংবা তাড়িত পাখা প্রভৃতি দেখিলে কতকটা জ্ঞান হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

———

দ্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*

দ্রুমাঙ্কণ কথাটা আমাদের নিকট নূতন। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে "Dendritic markings" বলে। কোন কোন পাথরের উপরে গাছপালার মত দাগ দেখা যায়—এইগুলি কখনও তাম্রবর্ণের, কখনও রক্তবর্ণের, কখনও কৃষ্ণ বা অন্যান্য বর্ণের হইয়া থাকে। এই সকল দাগই দ্রুমাঙ্কণ এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদেরই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা উদ্দেশ্য রহিল।

দ্রুমাঙ্কণের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ। আমাদের মোটামুটি বিশ্বাস আছে যে, উহা প্রস্তরের গায়ে লৌহ, মেঘনীজ অথবা এইরূপই অন্য কোন ধাতুর অক্সিদ গলিত অথবা মিশ্রিত রঙ্গিন জল আস্তে আস্তে চুঁয়াইয়া পড়িয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। সার্ আর্কিবল্ড্ গিকী বলেন,—

"These are the arborescent deposits usually of some dark metallic oxide—(especially of iron and manganese) which are formed through the agency of infiltrating water along the joints or other divisional planes of minerals and rock. Occasionally dendrites present so strong a resemblance to vegetable forms as to be readily mistaken for fossil plants. Landscape marbles owe their appearances to a variety of this structure."

যদিও উড্‌ওয়ার্ড (H. B. Woodward) প্রমুখ কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান† করিয়াছেন এবং যদিও ইহা দ্রুমাঙ্কণসম্বন্ধীয় সমগ্র বিষয়টির একটি অংশ, তবুও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সমগ্র বিষয়টির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় হয়ই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক এই বিষয়ে কিছুদিন ধরিয়া যে কয়টি ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারই ফল এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল।

(ক) একদিন হঠাৎ আমার নজরে পড়িয়া গেল,—সামান্য বৃষ্টির পর কিঞ্চিৎ কর্দ্দমাক্ত সিমেণ্ট্-করা ফুট্‌পাথের উপর খালি পায়ের দাগের ভিতরকার ভাগে বেশ সুন্দর একপ্রকার দাগ হইয়াছে (প্রথম চিত্র দেখ)। এই চিত্রে দেখা যাইবে যে, স্বভাবতঃ যে যে স্থানে পায়ের সঙ্গে রাস্তার অধিকতর স্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই দাগটার আয়তনও অধিকতর হইয়াছে এবং পা উঠাইবার সময় যে অংশটা হঠাৎ উঠিয়া যায় অর্থাৎ গোড়ালিটার দাগের মধ্যভাগেই এই দাগটা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হইয়াছে ; কারণ, এই স্থলেই রাস্তার সহিত পায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্পর্শ হইয়া থাকে এবং বিভাগটাও অপেক্ষাকৃত হঠাৎ হইয়া পড়ে। অন্যান্য অংশের সহিত রাস্তার বিভাগকালে একটু "পিছলাইয়া যাওয়ার মত" গতি হইয়া থাকে এবং সংযোগও অপেক্ষাকৃত অল্পদেশব্যাপী।

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

† Geol. Mag. 1892. p. 110.
Q. J. G. S. 1894. p. 393.

(খ) রাস্তার খুব হাল্‌কা অল্প-বালুকাবৃত অংশগুলিতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দাগ সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে, তবে কর্দ্দমের দাগ ও বালুকার দাগে এই প্রভেদ যে, পরবর্ত্তী দাগের সূক্ষ্মতা পূর্ব্ববর্ত্তী দাগের অপেক্ষা কতক পরিমাণে অস্পষ্ট (দ্বিতীয় চিত্র দেখ)।

(গ) একটা অনুসন্ধিৎসা থাকিয়া যাওয়াতে আরও কয়েকটি ঘটনায় ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য পাথরকে ঘসিয়া খুব পাতলা ও স্বচ্ছ করিবার জন্য যখন লৌহাদির পাতের উপর ঘষা হয়, তখনও সেই সকল পাতের উপর ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম যখন পাথরগুলি উচু নীচু থাকে, তখন দাগগুলি তেমন পরিষ্কার হয় না। পাথরও যত মসৃণ হয়, দাগও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে; কিন্তু ঘষিবার সময় যদি অধিক জল ব্যবহার করা হয়, তবে দাগগুলি পাথর ও লৌহপাতের বিচ্ছেদ হওয়া মাত্রই অস্পষ্ট ও মোটা মোটা হইয়া যায়। তৃতীয় চিত্র একখানা জেডিয়াইট (Jadeite)এর ফলক মসৃণ করিবার সময় উহাতে যে ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রতিকৃতি। লৌহ পাতে ঘষিবার পর আরও মসৃণ করিবার জন্য যখন পিত্তলের পাতে ঘষা হয়, তখন ঐ দাগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

(ঘ) ভিজা হাতে সাবান মাখিবার সময় হঠাৎ হাত হইতে তাহা পড়িয়া গেলে দেখিলাম, কতকটা ফেনা সাবানের উপর ঠিক ক্রমাঙ্কণাকারে সজ্জিত হইয়াছে।

এইরূপ অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট কোন দুইখানি সমতল কঠিন পদার্থের বিচ্ছেদ কালে সেই তরল পদার্থটি সর্ব্বদাই ক্রমাঙ্কণে সজ্জিত হইতে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই সকল ছাড়া আরও দুই এক উপায়ে সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

(ঙ) রাজমিস্ত্রি দেয়ালে চূণকাম করিতে যাইয়া কোন জায়গায় অধিক পরিমাণে চূণা-জল লাগাইয়া ফেলিলে দেখা গিয়াছে, সেই জল দেয়াল গড়াইয়া নীচের দিকে পড়িবার সময় এক প্রকার ক্রমাঙ্কণ সৃষ্টি করিল। এই স্থলে ক্রমাঙ্কণটি চূণের জলের নহে;—দেয়ালের পুরাতন ময়লা রঙের প্রলেপের। অতিরিক্ত চূণা-জলটা যেমন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নানাদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িতেছিল, সেই সঙ্গে নূতন চূণের প্রলেপটা ধুইয়া যাইয়া পুরাতন ময়লা প্রলেপ বাহির হইয়া এইরূপ ক্রমাঙ্কণে দাঁড়াইয়াছে।

চতুর্থ চিত্রে প্রতিকৃত ক্রমাঙ্কণের ভিতরকার শাদা শাদা লতাপাতাগুলিও অনেকটা পূর্ব্বোক্ত ধরণে অঙ্কিত। ইহাও রঙ্গিন তরল পদার্থটির বাহির হইতে শুকাইতে শুকাইতে ও তৎসঙ্গে উহার রঙ্গের ভাগ ক্রমেই হ্রাস পাইতে পাইতে মধ্যভাগে পহুঁছিয়া পরিষ্কার জলে পরিণত হইয়া ও অবশেষে শুকাইয়া যাইয়া সেই স্থলের অনাবৃত শাদা পাথরটা বাহির হইয়া পড়াতে উৎপন্ন। চারিদিকের রঙ্গিন পাথরের তুলনায় পাথরের এই শাদা অংশগুলি সবস্থা-স্থিত, ঠিক শাদা না হউক, ঈষৎ পীতাভ লতা-পাতার মত দেখাইতেছে।

(চ) চূণকামের সময় আরও একপ্রকার ক্রমাঙ্কণ দেখা গিয়াছে। দেয়ালের কোন কোন ভগ্ন অংশে নূতন করিয়া বালি ধরাইয়া তাহার উপর চূণকাম করিবার সময় একটু একটু

ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে দেখা গিয়াছে যে, আশে পাশের চুণা জল আসিয়া বালুকণিকার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর ডালপালা বিস্তার করিয়াছে। আবার কোন জায়গায় অপেক্ষাকৃত একটু গভীরতর গর্ত্ত পাইয়া খানিকটা চুণা-জল জমা হইয়া বৃন্তাগ্রে ফল, পুষ্প অথবা পাতার মত সজ্জিত হইয়াছে। পঞ্চম চিত্রের উৎপাদনে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে।

(ছ) রাসায়নিক পরীক্ষাগারেও ক্রমাঙ্কণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক দিন পূর্ব্বে ফটোগ্রাফীর অন্ধকার ঘরে এক তাড়া পুরাতন, বাতিল নেগেটিভের মধ্যে কয়েকখানার গায়ে অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাই। হাইপোদ্রব (Hypo-solution)টা খুব ভাল করিয়া ধোয়া হয় নাই বলিয়া, উহাই কাচের গায়ে গড়াইয়া ছড়াইয়া যাইয়া এবং হাইপো-দ্রবটা কতকটা স্ফাটিকীভূত হইয়া এই অপূর্ব্ব ক্রমাঙ্কণের সৃষ্টি করিয়াছিল। অসতর্কভাবে ধোওয়া বাসনেও এইরূপে উৎপন্ন ক্রমাঙ্কণ প্রায়ই দেখা যায়। আবার যে স্থানে অপরিষ্কার বাসনগুলি ধুইবার জন্য রাখা হয়, তাহার উপরেও যে কত অপরিণত ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ত সীমাই নাই।

(জ) চঞ্চল বাতাসে মোমবাতি জ্বলিলে উহা চারিদিকে গলিয়া পড়িয়া কিরূপ ক্রমাঙ্কণের মত দেখায়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

(ঝ) নূতন শিক্ষার্থীর নিকট রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সীসকবৃক্ষ (Lead tree) তৈয়ারী করা একটা মজার পরীক্ষা।

(ঞ) অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর আলোচনা করিবার সময়ে, স্ফাটিকের প্রথম দেহসঞ্চার ক্রমাঙ্কণকে কতখানি অনুকরণ করে, তাহাও অনেকেই দেখিয়াছেন। স্ফাটিকীভবন শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য ক্রমাঙ্কণ তাহার অন্যতম সহায়।

এই সকল ঘটনার সহিত যে ক্রমাঙ্কণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বভাবতই মনে উদিত হয় এবং মনে হয় যে, যে ব্যাপারটা আমাদের নিকট এত দিন একটা অপরিস্ফুটতাময় ছিল, এই সকল ঘটনাবলী যেন তাহা কতকটা পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিবে। বস্তুতঃ অনুসন্ধান ও তুলনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বাস্তবিকই এই সকল ঘটনার সহিত ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির ধরণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির ধরণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে ;—

১। স্ফাটিকীভবন শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সংগঠন।

(ক) স্ফাটিকগুচ্ছ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ।

(খ) অপরিণত অপূর্ণাঙ্গ স্ফাটিকের পূর্ণত্বের চেষ্টায় উদ্ভূত ক্রমাঙ্কণ।

২। পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সংগঠন।

(ক) কৈশিকাকর্ষণ ও এইরূপ একই ধরণে তরলের উপর ক্রিয়াশীল অন্যান্য শক্তির দ্বারা অঙ্কিত ক্রমাঙ্কণ।

(খ) মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পরিচালিত জলীয়ের ক্রমাঙ্কণ।

(গ) বিশেষ অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের বিশেষ প্রকারের চাপ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ।

এইরূপ আরও অনেক প্রকারের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে, যাহা সুন্দর, সূক্ষ্ম ও পরিপাটী ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির হেতু হইতে পারে; কিন্তু একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সূক্ষ্ম ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির কোন্‌টি যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই কয়টির যে কোনটির অতিরিক্ত ক্রিয়াই ক্রমাঙ্কণের সূক্ষ্মতার কারণ হইতে পারে। সাধারণতঃ একটি কারণে ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তি হয় না; কয়েকটি কারণ নানাবিধ অবস্থার মধ্যে মিলিত হইয়া একটি ক্রমাঙ্কণ সৃষ্টি করে; সুতরাং অবস্থা-ভেদেও ক্রমাঙ্কণের সূক্ষ্মতার এবং পূর্ণতার প্রভেদ হইয়া থাকে।

ক্রমাঙ্কণের আরম্ভ সাধারণতঃ একটি বিন্দু অথবা রেখা * মাত্র। এই কেন্দ্র-স্থানটি যে পরিণত ক্রমাঙ্কণের কোন্ ভাগে পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই। কখনও পাথরের গায়ে কোন একটা বিশেষ রন্ধ্র দিয়া নির্গত হইয়া রঙ্গিন তরল পদার্থটা চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে ও নানারূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে (৬ষ্ঠ চিত্র দেখ)। আবার কখনও এই কেন্দ্রটির এক দিক্ দিয়াই সেই রঙ্গিন পদার্থটা বিস্তৃত হইয়া সেই কেন্দ্রটাকে পরিণত ক্রমাঙ্কণের মূলের স্থায় কল্পনার উপযোগী করিয়া দেয়। রেখা-আরম্ভের সম্বন্ধেও এই একই কথা। কখনও সেই রেখাটির এক ধারেই রঙ্গিন পদার্থটা বিস্তৃত হইয়া উহাকে পরিণত সমগ্র ক্রমাঙ্কণটির ভিত্তির স্থান দিয়া থাকে, তখন কল্পনার চক্ষে দেখিলে মনে হয় যেন, মাটীর উপর কতকগুলি গাছ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আবার যখন আরম্ভ-রেখাটির দুই ধারেই রঙ্গিন পদার্থটা ছড়াইয়া যায়, তখন কোন কোন স্থলে এইরূপ দেখায়, যেন জলের উপর এক সারি গাছ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে দেখায়, যেন সমস্ত ক্রমাঙ্কণটি একটি আস্ত পাতা এবং আরম্ভ-রেখাটি তাহার প্রধান শির। সকল স্থলেই যে এইরূপে আরম্ভ করিয়াই ক্রমাঙ্কণ পরিণতাবস্থায় সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। ক্ষুদ্রায়তন ক্রমাঙ্কণের পক্ষে একটি ক্রমাঙ্কণী শক্তির দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াই তাহার সূক্ষ্মতার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বৃহদায়তন ক্রমাঙ্কণেরও সেই পরিমাণ সূক্ষ্মতা পাইতে হইলে, কয়েকটি শক্তির আবশ্যক; বিশেষতঃ যে স্তরদ্বয়ের মধ্য দিয়া রঙ্গিন পদার্থটা চুঁয়াইয়া ক্রমাঙ্কণের সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ হওয়া বেশীর ভাগ ক্রমাঙ্কণের পক্ষেই খুব আবশ্যক (যেমন পায়ের দাগের ভিতরের এবং ডেভিয়াইটের উপরের ক্রমাঙ্কণের আবশ্যক হইয়াছিল)। পূর্ব্বলিখিত ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির ধরণগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া দেখিলে, একটা বৃহদায়তন অথচ সূক্ষ্ম ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার কল্পনা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে।

(১) রঙ্গিন পদার্থের প্রাচুর্য্য না হইলে, বৃহদাকার ক্রমাঙ্কণ অসম্ভব, সুতরাং ঐরূপ একটি ক্রমাঙ্কণের প্রারম্ভে রঙ্গিন পদার্থটা কোন রন্ধ্র বা ফাটল দিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ

---

* জ্যামিতি-সিদ্ধ বিন্দু বা রেখা মনে করিলে অতিরিক্ত সূক্ষ্মতা মনে করা হইবে।

করিয়া মাধ্যাকর্ষণের জোরে নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে ও মোটা মোটা বৃত্তাংশ-বেষ্টিত ক্রমাঙ্কণের সৃষ্টি করিয়াছে। রঙ্গিন তরল পদার্থের প্রাচুর্য্য হেতু স্ফাটিকীভবন শক্তি তখনও ক্রিয়া করিতে পারে নাই; তখন শুধু পরিচালন-শক্তিই আপনার ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে।

২। মাধ্যাকর্ষণ যথাসাধ্য ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার বেগ অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে, এমন সময়েই কৈশিকাকর্ষণ তাহার দলের অন্যান্য শক্তির সাহায্য লইয়া চিত্রটিকে সূক্ষ্মতর করিতে উপস্থিত হইল। অমনি সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল, পাতা অঙ্কিত হইতে লাগিল ও মোট ক্রমাঙ্কণটি জটিলতর হইতে লাগিল।

৩। দ্বিতীয় ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ক্ষেত্রটি স্ফাটিকীভবন শক্তির কার্য্যের উপ-যোগী হইয়া উঠিল। তরল পদার্থটি যতই শুকাইতে লাগিল, স্ফাটিকীভবনও ক্রমে ততই পূর্ণতর হইয়া চিত্রটিকে আরও সূক্ষ্ম করিতে লাগিল।

৪। চতুর্থ অবস্থা—পূর্ব্বকথিত 'স্তরদ্বয়ের বিচ্ছেদ'; কিন্তু ক্রমাঙ্কণ এ অবস্থায় কখন্ পৌঁছিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এমন ক্রমাঙ্কণও আছে, যাহাকে কখনও এ অবস্থার অধীন হইতেই হয় নাই; তাহারা তাহাদের সাধারণ কারুকার্য্য লইয়াই কালে ধ্বংস হয়। কিন্তু উৎপত্তিকালে ক্রমাঙ্কণ এই অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, উহার যথাসম্ভব সূক্ষ্মতা উৎপন্ন হয় না; তাহা কেবল সম্ভাবনার মধ্যেই রহিয়া যায়।

মসৃণ রাস্তার উপর কর্দ্দমাক্ত পদের প্রত্যেক বিক্ষেপেই কোন না কোন আকারের ক্রমাঙ্কণ হইয়া থাকে। পাথর ঘষিবার পাত হইতে মসৃণ প্রস্তরফলকের প্রতি বিচ্ছেদই ক্রমাঙ্কণ উৎপাদন করে। অসমতল জায়গায় জলীয় পদার্থ পতিত হইলে প্রতি বারই মোটা মোটা ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হয়; ফলতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত পর্য্যবেক্ষণের কোনটিই দৈবাৎ বা হঠাৎ হইয়া পড়ে নাই। সেই সেই অবস্থায় প্রতি বারেই সেই সেই ধরণের ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। তবুও ক্রমাঙ্কণসম্বন্ধীয় আমার অনুমানগুলিকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে আরও কয়েকটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতটিই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুইখানি কাচ-ফলকের একখানির মধ্য দিয়া একটি রন্ধ্র করিয়া লওয়া হয়। শুধু ঐ রন্ধ্রটি বাদ দিয়া দুইখানি কাচেরই এক পিঠে বালুকা-মিশ্রিত মোম গালাইয়া সমান ভাবে মাখাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে প্রলেপটি মোটামুটি সমতল হইয়াও খুব মসৃণ হয় নাই; অথচ ভিতর দিয়া বেশ একটু একটু দেখা যায়, এমন করা হয়। এইরূপে প্রলিপ্ত কাচ দুইখানির লিপ্ত পিঠগুলি লাগালাগি করিয়া চারি ধারে খুব চাপ দিয়া রাখা হয় এবং পূর্ব্বোক্ত রন্ধ্র দিয়া নিশাদল (Ammon chloride), কাল কালী ও একটু গঁদ-মিশ্রিত জল কয়েক দিন ধরিয়া খুব আস্তে আস্তে চুয়াইতে দেওয়া হয়। ভিতরে প্রবেশ-করা জলটা একেবারে শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্বে দেখা যায় যে, যে যে দিকে মোমের প্রলেপ সামান্য একটু উঁচু নীচু আছে, সেই সেই দিকেই রঙ্গিন জলটা ছড়াইয়াছে এবং বালুকা-কণিকার মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম নালিও বাহির

হইয়াছে। যে যে স্থলে জল অনেকটা শুকাইয়াছে, সেই সেই স্থানে নিশাদলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাও বাঁধিয়াছে।

তার পর কাচ দুইখানি টানিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিলে দেখা গিয়াছে, ক্রমাঙ্কণটি মোটের উপর অনেক নূতন কারুকার্য্য লাভ করিয়াছে। মোটা মোটা দাগগুলি কোন দিকে সঙ্কুচিত হইয়া আবার কোন দিকে বিস্তারিত হইয়া মোট ক্রমাঙ্কণটিকে জটিলতর করিয়াছে।

এই পরীক্ষা হইতেও ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলি করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছি।

উপসংহারে আমি ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালকের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; কারণ, তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া সেই বিভাগের কতকগুলি ক্রমাঙ্কণযুক্ত প্রস্তরের এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত কতকগুলি ছবির আলোক-চিত্র লইতে আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস*

আলোক কি, এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে হইলে, আলোক-সংসৃষ্ট সকল প্রক্রিয়ার সবিশেষ তথ্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। কিরূপে ইহার গতি নিয়মিত হয়, ইহার দেশ-কালেরই বা বিশেষত্ব কি, এই সকল প্রশ্নই আলোক-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত এবং ইহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ সকল বিষয়েই আমাদের জ্ঞান অত্যন্তই অল্প। এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই আমাদের এরূপ অজ্ঞানতার কারণ উপলব্ধি হইবে। শুধু আলোক কেন, সকল বিজ্ঞান-বিষয়েই মনুষ্যের জ্ঞান স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ হইবার কথা। আলোক-তত্ত্ব ইহার বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। আলোক ও অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি কথা, কতকগুলি নিয়ম আমাদের সম্যক্ পরিজ্ঞাত; কিন্তু সেই সকল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের অর্থ কি? যে কোন ব্যাপার একই ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং একই ভাবে আমরা উপলব্ধি করি, তাহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া আমরা গণ্য করিয়া থাকি। আলোকের গতি, রশ্মি পরাবর্ত্তন, ব্যবধান ও ভূমিভেদে ইহার গতির ব্যতিক্রম এবং তজ্জন্য অবস্থাভেদে তির্য্যক্ গমন, এ সকল বিষয়েও যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলই এই শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু যখনই আমরা সে সকল নিয়মের গূঢ় তথ্য অনুসন্ধান করিতে যাই, তখনই দেখি, তাহা কঠিন সমস্যাপূর্ণ। যে সকল প্রক্রিয়া এই সকল নিয়মের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সে সকল এত সূক্ষ্ম এবং তাহাদের তত্ত্ব এত গভীর যে, মনে হয়, সে সকল কখনই মনুষ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইবে না। এই জন্য এই সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যতদূর সম্ভব, এই সকলের প্রক্রিয়ার অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। প্রথমে স্থূলতঃ যাহা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই সেই চিত্রে প্রকটিত করা হয়। ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব যতই অধিগম্য হয়, আমাদের চিত্রও তত পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে; কিন্তু যতদিন না আমরা আমাদের শক্তির ক্রমবিকাশে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম প্রক্রিয়া-সকল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, তত দিন আমরা প্রকৃতির বাস্তব রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিব না।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হিন্দুরাই প্রথমে আলোক সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। 'মরীচিকা' সম্বন্ধে ন্যায়-ভাষ্যে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে।

"গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোষ্মনা সংসৃষ্টাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্য চক্ষুষা সন্নিকৃষ্যন্তে, তত্রেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষাদুদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে।"

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরশ্মি ভূতল হইতে উত্থিত উত্তাপের সহিত সংসর্গবশতঃ উচ্চ নীচভাবে স্পন্দিত হইয়া দূরবর্ত্তী দর্শকের চক্ষুর সহিত সংসৃষ্ট হয় এবং সেই সূর্য্যকিরণে দৃষ্ট বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংসর্গজনিত জলজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, ভাষ্যকার এই ব্যাখ্যা দার্শনিক তত্ত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপে অবতারণা করিয়াছেন; কারণ, এই বিষয়ে বার্ত্তিক টীকাতে এইরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে;—

সূর্য্যকিরণ স্পন্দিত হইলে, আমাদের জলজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে; এ স্থলে সূর্য্যরশ্মি ও স্পন্দন উভয়ই বর্ত্তমান, তবে সেই স্থলে ঐ জ্ঞান জলকে অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া দূষিত হইয়াছে।

যাহা হউক, ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভাষ্যকারের সময়ে মরীচিকার কারণ এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইত এবং তাহার পূর্ব্বেই আলোক সম্বন্ধে আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। ইহাও সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, এই সকল আলোচনা বিশেষভাবে যে সকল পুস্তকে বা পুথিতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, সে সকল পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে।

ন্যায়ভাষ্যে প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে এইরূপ মত নিবদ্ধ রহিয়াছে;—

চক্ষুরশ্মি দর্পণের প্রতিঘাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও স্বীয় মুখের সহিত সংসৃষ্ট হয় এবং এইরূপ সংসর্গবশতঃ নিজের মুখের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বার্ত্তিক টীকাতে এই বিষয়ে আরও লিখিত আছে যে, চাক্ষুষ জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মই দৃষ্ট হয়। যাহার সহিত চক্ষুরশ্মির অগ্রভাগের সম্বন্ধ হয়, তাহাকেই ঐ জ্ঞান সম্মুখবর্ত্তিরূপে অবধারণ করে।

ন্যায়সূত্রের পূর্ব্বে এইরূপ মত প্রচলিত ছিল যে, দৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই এক একপ্রকার রশ্মি আছে। ন্যায়সূত্রকার এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন, যখন রাত্রিতে (অন্য আলোক না থাকিলে) লোষ্ট্র প্রভৃতির জ্ঞান হয় না, তখন তাহাদের এবম্প্রকার রশ্মি থাকিতে পারে না।

স্বচ্ছগুণ সম্বন্ধে ন্যায়সূত্রে এইরূপ মত বিবৃত আছে;—

অপ্রতিঘাতাৎ সান্নিকর্ষোপপত্তিঃ।

চক্ষুরশ্মি কাচ ইত্যাদিতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপেই যে সকল বস্তু কাচ ইত্যাদি স্বচ্ছ বস্তুর অপর দিকে থাকে, তাহাদের সহিত চক্ষুরশ্মি সংলগ্ন হয় এবং তাহাদের জ্ঞান উৎপাদন করে। প্রাচীরাদি অস্বচ্ছ বস্তু চক্ষুরশ্মিকে ফিরাইয়া দেয়।

ন্যায়কন্দলির মতে চক্ষুরশ্মির রূপস্পর্শ ইন্দ্রিয়গম্য নহে; কিন্তু উক্ত রশ্মি দূরে গমনপূর্ব্বক অবহিত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে এবং বেদান্ত-পরিভাষার মতে চক্ষুরশ্মি সূর্য্যরশ্মির মত স্বচ্ছ; সুতরাং তাহারও শীঘ্র গমন হইতে পারে।*

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয় আমাকে এই সকল শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ও তাহার অর্থও বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই সকল মত বিষয়ে শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ সকলই ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক-যুক্তির দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে তাহাদের প্রাসঙ্গিকতা শুধু এই মাত্র যে, ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশে ন্যায়সূত্রের অনেক দিন পূর্ব্বেই আলোক-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

এ বিষয়ে আর একটি বিশেষ কথা এই, ইয়ুরোপে এম্পিডোক্লেস্‌ই প্রথম আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে, আলোকিত বস্তু হইতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পরমাণু নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই সকল পরমাণু ও চক্ষুরশ্মির সংযোগে দৃষ্টিজ্ঞান সমুৎপাদিত হয়; কিন্তু ইহার অগ্রেই পাইথাগোরাস এবং তাঁহার শিষ্যেরা ইহার বিরুদ্ধে এই মত প্রচার করেন যে, আলোকিত বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত পরমাণুর সহিত চক্ষু তারার সংঘাতেই দৃষ্টি-বোধ জন্মে। যাহা হউক, এম্পিডোক্লেসের কাল খৃ-পূর্ব্ব ৪৪৪, সুতরাং যদি ন্যায়সূত্রের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত বোধ হয়, কাহারও আপত্তিকর হইবে না যে, একই সময়ে আলোক সম্বন্ধে গ্রীস ও ভারতবর্ষে একই প্রকারের মত প্রবর্ত্তিত ছিল। তবে কোন্ জাতি অন্য জাতির নিকট ঋণী, ইহা আলোচ্য বিষয়; কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার শক্তি আমার নাই।

চক্ষুরশ্মি দ্বারাই দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে, এই মতই ইয়ুরোপে অনেক দিন চলিয়া আসে। অবশেষে অ্যারিষ্টটল (খৃ-পূর্ব্ব ৩৫০) অতি সহজ যুক্তির দ্বারা এই মতের খণ্ডন করেন। তাঁহার যুক্তি এই—চক্ষুরশ্মি দ্বারাই যদি দৃষ্টি-জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে আমরা অন্ধকারেও দেখিতে পাই না কেন? অ্যারিষ্টটলের মতে সমস্ত বিশ্বদেব, যাহাকে শূন্য বলা যায়, তাহা শূন্য নয়, কোন অজ্ঞাত পদার্থপূর্ণ; কোন গূঢ়শক্তি যখন তাহাকে আলোড়িত করে, সেই আলোড়নই আলোক। এই আলোক পরমাণু-সমষ্টি নহে। তাঁহার মতে আলোক কোন স্বচ্ছ পদার্থ এবং যদি আলোকিত বস্তু ও চক্ষুর মধ্যে কিছুই (কোন দেশ বা ভূমিই) না থাকিত, তবে আমরা দেখিতে পাইতাম না। অ্যারিষ্টটলের প্রথম মতের সহিত আধুনিক মতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় মত পূর্ব্বেই বেদান্ত-পরিভাষায় সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ যুক্তির অর্থ বোধ হয় এই যে, বস্তুর যে বিশেষত্ব তাহাকে আলোকিত করে, সেই গুণের প্রভাব চক্ষুতে উপস্থিত না হইলে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মিতে পারে না; সুতরাং চক্ষু ও আলোকিত বস্তুর মধ্যদেশ যদি শূন্য অর্থাৎ নির্গুণ হইত, তবে দৃষ্টিজ্ঞান সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিও তাহাই।

অ্যারিষ্টটলের সময় হইতে ডেকার্টের সময় পর্য্যন্ত আলোক-বিষয়ে যাহা কিছু আবিষ্কার হয়, সে সকলই দুইটি ব্যাপার লইয়া—রশ্মি পরাবর্ত্তন, ব্যবধান ও ভূমিভেদে তির্য্যক্‌গমন। অসমতল পরকলার সাহায্যে যে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, এ কথা আর্কেমিডেস্ জানিতেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনেক গবেষণা করেন এবং ইঁহার সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী বিজ্ঞানবিৎ আলহাইনা ভিটেনিয়োই সর্ব্বপ্রথম গণিতের সাহায্যে আলোকতত্ত্ব চর্চ্চা আরম্ভ করেন। রজার বেকন ছায়াবাজীর যন্ত্র আবিষ্কার করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে এবং

কেহ কেহ বলেন, তিনিই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ; কিন্তু জনসন বলিয়া একজন ওলন্দাজই যে প্রথম দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার পুত্র একদিন দূরে দেখিবার একখানি চসমা ও নিকটে দেখিবার একখানি চসমা কাছাকাছি রাখিয়া দেখিলেন, তাহাদের ভিতর দিয়া বস্তু বড় দেখায়। তাহাতেই দূরবীক্ষণের সৃষ্টি। তবে গ্যালিলিয়োই প্রথম দূরবীক্ষণের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ এখনও অল্প দূরস্থ বস্তু দেখিবার জন্য (নাট্যশালা ইত্যাদিতে) ব্যবহৃত হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণে দৃষ্ট বস্তু বৃহত্তর দেখায় ; কিন্তু তাহাতে দৃষ্ট বস্তুর আর কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অবশেষে কেপ্লার জ্যোতিষ্ক দর্শনোপযোগী দূরবীক্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং বস্তুরাগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম কার্য্যতঃ (হাতে-কলমে) দেখান, দৃষ্ট বস্তুর যে প্রতিবিম্ব চক্ষু-তারাতে পড়ে, তাহার নিম্নদেশ দৃষ্ট বস্তুর উর্দ্ধদেশের এবং উর্দ্ধদেশ দৃষ্ট বস্তুর নিম্নদেশের প্রতিকৃতি।

আলোকরশ্মি যখন কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অন্য এক স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হয়, তখন তাহা যে আর ঋজুভাবে চলিতে পারে না, তাহা সকলেই জানেন। ইহাকে আলোক-রশ্মির ‘তির্য্যক্‌গমন’ বলা যাইতে পারে। এই ব্যাপার যে নিয়মবদ্ধ, তাহা স্নেল প্রথমে আবিষ্কার করেন ; কিন্তু ডেকার্ট তাহা স্বাবিষ্কৃত বলিয়া প্রচার করেন এবং তিনিই উদাহরণ দ্বারা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, যদি একখানি বস্ত্র ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে প্রতিবক্র-ভাবে একটি বর্ত্তুল নিক্ষেপ করা যায় এবং এই বর্ত্তুল যদি বস্ত্র ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে যেমন বর্ত্তুলের গতির দিক্ কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, আলোক-রশ্মিরও সেইরূপে তির্য্যক্‌গমন নিয়মিত হয়।

ডেকার্ট আলোক-বিষয়ে এক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার মতে সমস্ত বিশ্ব কোন এক-প্রকার সম্পূর্ণরূপে স্থিতি-স্থাপক বস্তুতে পূর্ণ ; তাহারই মধ্য দিয়া আলোক নিমেষের মধ্যে ‘চাপ’-রূপে গমন করে। রাগ বা বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, এই স্থিতি-স্থাপক বস্তু পরমাণু-সমষ্টি এবং এই সকল পরমাণু দ্রুতগতিতে ঘূর্ণ্যমান। এই গতির আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে রাগের পার্থক্য নিয়মিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে ঘূর্ণ্যমান অণুরাশি রক্ত-বর্ণের জ্ঞান উৎপাদন করে ইত্যাদি। ডেকর্টের মতে আলোকের গতি স্বচ্ছ পদার্থের লঘুত্ব অনুসারে অধিক হয়। ফার্ম্মা তাহার বিপরীতমতাবলম্বী ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে, আলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে যে পথ অবলম্বন করে, সেই পথ অন্য সকল পথ অপেক্ষা স্বল্পতম সময়সাপেক্ষ। ফার্ম্মা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই নিয়মের স্বার্থকতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলা যাইতে পারে না। তিনি বলেন, প্রকৃতি দ্রুততম পন্থাই ভালবাসেন। এখনও ফার্ম্মার এই আবিষ্কারের তথ্য আমাদের জানা নাই। তবে আমি গণিততত্ত্বের সাহায্যে অল্প দিন হইল, দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি যে, যদি ফার্ম্মার নিয়ম স্বীকার করিয়া লওয়া যায় এবং যদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যোমাণুতে পরিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সে

সকল ব্যোমাণু সর্ব্বদাই চাঞ্চল্যপূর্ণ,—জড়ভাবাপন্ন নহে এবং আমাদের আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বের মূলেই বাস্তবিক এই স্বীকার্য্য বর্ত্তমান। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও কার্ম্মার নিয়মের তথ্য এখনও স্থির হয় নাই, তথাপি ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, আলোক-রশ্মির সকল ক্রিয়াই ইহার অন্তর্ভূত।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে হুক আলোক সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার মতে আলোক এক প্রকারের দ্রুত স্পন্দন। এই কম্পন স্থিতিস্থাপক সমভাবাপন্ন ব্যোমাণুপূর্ণ ভূমিতে ঋজু-ভাবে গোলকের ব্যাসের মত সকল দিকে বিস্তারিত হয়। হুকের মতে স্বচ্ছ পদার্থ যত গাঢ় হয়, আলোক ইহার মধ্য দিয়া তত সহজে যাইতে পারে এবং এই জন্য আলোকের তির্য্যক্‌গমন হইয়া থাকে। অনেক দিন পরে হাইগেন্‌স্ জ্যামিতিক সম্পাদ্য-বিষয়ের রীতি-অনুসারে যেরূপে আলোক-রশ্মির তির্য্যক্‌পথ নির্দ্ধারণ করেন, হুকও সেই প্রকারে ঐ পথ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হুকের মতে আলোক-রশ্মির দিক্‌পরিবর্ত্তনের সময়েই তাহার কম্পনেরও দিক্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং সেই সময়েই আলোকের বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

নিউটন হুকের প্রণোদিত আলোক-তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন এবং বর্ণবিষয়ে তাঁহার মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা স্বকৃত পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু হুকের আলোকতত্ত্ব তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মত মাত্র; তাহার প্রমাণ তিনি কিছু প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং নিউটন সে মত অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আপত্তির কারণ, আলোকের অনেক বিশেষত্ব সেই তত্ত্ব অনুসারে অপ্রতিপাদ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি এই জন্যই আলোকিত বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাণু সকল দর্শকের নেত্রে পতিত হইয়াই দৃষ্টিজ্ঞান উৎপাদন করে, এই মতের পোষকতা করেন এবং এই মত অস্বীকার করিলে কিরূপে আলোকের সকল প্রক্রিয়ার কারণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইলেন।

যদি আলোক ব্যোমাণুর স্পন্দন হয় এবং ব্যোমাণুপূর্ণ দেশ যদি স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আলোক তরঙ্গাকারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইবে; ইহাই হুকের মত; ইহাও আধুনিক মত। এই মত স্বীকার করিলে আলোকের সর্ব্বথা ঋজুগমন ও ছায়াতত্ত্ব অপ্রতিপাদ্য হইয়া পড়ে। তরঙ্গ কোন বাধা পাইলেই সে বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়; সুতরাং আলোকও এইরূপ বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে পারে; ইহা না দেখাইতে পারিলে, তরঙ্গতত্ত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নিউটন এরূপ কোন প্রমাণ না পাইয়াই তরঙ্গতত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে কোন মতাবলম্বীই ছিলেন না। অণুতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহাদ্বারা তিনি আলোকের বিশেষত্ব সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু তরঙ্গতত্ত্ব প্রমাণিত হইলে উহাই যে অধিক স্বীকার্য্য, ইহাও অতি বিশদভাবে বিবৃত করেন। নিউটনকে অণুতত্ত্বের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া লোকের ধারণা আছে; কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সেই ধারণা অনুসারেই তরঙ্গতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন।

নিউটনের আলোকের ঋজুগমন সম্বন্ধীয় আপত্তি খণ্ডিত হইতে এক শত বৎসরেরও অধিক দিন লাগে। ইয়ং ও ফ্রেনেল অতি বিশদভাবে দেখাইয়া দিলেন, তরঙ্গসকল সাধারণতঃ ঋজুভাবেই প্রবাহিত হয় এবং আলোকতরঙ্গও বাধা পাইলেই বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া যায়। তবে আলোক-তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বাধাও সেইরূপ ক্ষুদ্র হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন বাতায়নের ভিতর দিয়া আলোক আসে এবং সেই বাতায়নের প্রস্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে স্থান অনাবৃত, সুধু যে সে স্থানেই আলোক আসে, তাহা নয়; যে স্থান আবৃত, তাহারও কতক দূর পর্য্যন্ত নানাবর্ণের আলোক-রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে অন্ধকারের রেখা প্রতিবিম্বিত থাকে। এই ব্যাপার নিউটনেরও বিদিত ছিল। ফ্রেনেল দেখাইলেন, ইহার কারণ আলোক সম্পূর্ণরূপে তরঙ্গগুণবিশিষ্ট।

কিন্তু কি প্রকারের তরঙ্গ? সকলেই জানেন, জলে যখন তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন জল উচ্চ-নীচভাবে স্পন্দিত হয়; কিন্তু তরঙ্গের গতি সে দিকে নয়। আলোকস্পন্দনও এই প্রকারের;—স্পন্দন যে দিকে, তরঙ্গ তাহার সমকোণ-সম্পাতে অগ্রসর হয়। কারণ, তাহা না হইলে কোন কোন স্ফটিকের মধ্য দিয়া আলোক গমন করিলে ইহা যে দ্বিভাগে বিভক্ত হয়, তাহার কারণ দর্শান অসম্ভব হয়। ফ্রেনেলই প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এই সকল স্ফটিকে কি বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্য তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আলোক এইরূপে বিভক্ত হয়।

এই গবেষণা আরও বৃহত্তর গবেষণার অন্তর্ভূত। আলোক, আলোকিত পদার্থ হইতে দর্শকের চক্ষুতে আসিবার সময়ে যে ভূমিতে বিচরণ করে, তাহার গুণ কি? আলোক তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়; সুতরাং সেই ভূমি স্পন্দমান অণুসমষ্টি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ইহা স্থিতিস্থাপক-গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা প্রয়োজন। আবার স্পন্দন যে দিকে, তরঙ্গ তাহার সমকোণ-সম্পাতে অগ্রসর হয় বলিয়া, এই ভূমি জলের ন্যায় তরল না হইয়া লৌহের ন্যায় গাঢ় হওয়া প্রয়োজন। যাহাকে আমরা শূন্য বলি, তাহা গাঢ় পদার্থে পূর্ণ, এ কথা আপাততঃ অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে; বাস্তবিকও ব্যোমাণুকে গাঢ় পদার্থ বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। ইহার অর্থ সুধু এই;—ব্যোমাণু যখন আলোকের প্রভাবে অতি দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে, তখন তাহার স্থিতিস্থাপক গুণের সহিত সাধারণ গাঢ় পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহা বাস্তবিক আলোকভূমির একটি চিত্রমাত্র এবং ইহার সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানগোচর ব্যাপার সকলের কারণ নির্দ্দেশ করা কতকপরিমাণে সম্ভবপর হয়। কিন্তু অতি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, এ চিত্র একান্তই অসম্পূর্ণ। গাঢ় বস্তুর স্পন্দনবিষয়ে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলের অনুরূপ অনেকগুলি গুণই আলোকস্পন্দনে বর্ত্তমান নাই। গ্রীন, কেল্ভিন, রেলে ইত্যাদি মহাপণ্ডিতগণ গণিতের সাহায্যে এই সকলের আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, আলোকের গূঢ়তত্ত্ব এরূপে উদ্ঘাটিত হইবে না।

আলোকের গতি যে ভাবেই বিহিত হউক না কেন, ইহা যে একপ্রকারের শক্তি, তাহার

আর সন্দেহ নাই; সুতরাং আলোকের ভূমিতেও শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আর কোন ভূমিতে যদি শক্তি নিহিত থাকে, তাহা হইলে দুইই একভূমি হওয়া সম্ভব। তড়িৎ যে ভূমিতে কার্য্য করে, সে ভূমিও এইরূপ বলিয়া ফ্যারাডে দেখাইয়াছিলেন। ম্যাকসোয়েল ফ্যারাডে-নির্দ্দিষ্ট পথে গণিতের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া দেখাইলেন, আলোকের ও তড়িতের ভূমি একই। তিনি চিন্তা ও গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন, আলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে গতিতে গমন করে, তড়িতের স্পন্দনও সেই গতিতে দূরে গমন করে। তাঁহার সময়ে এই তত্ত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু ছিল না। কয়েক বৎসর পরে হার্টজ্ এই চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যন্ত্রসাহায্যে যখন বিদ্যুতের চমক্ স্ফুটিত হয়, তখন তড়িতের স্পন্দন হইতে থাকে এবং ইহা যে দেশ-দেশান্তরে ব্যোমাণুর ভিতর দিয়া গমন করে, ইহার প্রমাণ এখন আর বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা এইরূপেই হইয়া থাকে। এ ব্যবস্থা এখন সর্ব্বদেশে বিস্তৃত।

কিন্তু তড়িৎ কি? ইহা কি অণুবিশেষ? যদি তাহাই হয়, ভুবনবিস্তৃত যে ব্যোমাণু-কম্পনের শক্তিকে আমরা আলোক-শক্তি বলি, সেই অণু হইতে কি ইহা পৃথক্? অনেক দিন এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। এক্ষণে স্থির হইয়াছে, ইহাদের পার্থক্য স্বীকার না করিলে আলোকের সকল সমস্যা বিশদভাবে নিরাকৃত হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা হইলে, আমাদের তিন প্রকারের পরমাণু স্বীকার করিতে হয়। রাসায়নিক পরমাণু, তড়িতাণু ও ব্যোমাণু। এ বিষয়েও অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকলের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে হইলে, এই কথা বলিতে হয়, সমস্ত বিশ্বদেশ চাঞ্চল্যময় ব্যোমাণুপূর্ণ। এই চাঞ্চল্যের অবস্থাভেদে, ব্যোমাণুসমষ্টি বিশেষ গুণসম্পন্ন হইলে, তাহাকে তড়িতাণু বলা যায় এবং এই চাঞ্চল্যেরই অবস্থাভেদে তড়িতাণুসমষ্টিতে রাসায়নিক অণুর সৃষ্টি হয়। কেল্ভিন দেখাইয়াছেন, ঘূর্ণ্যমান তরল পদার্থ গাঢ় পদার্থের গুণবিশিষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ গতিভেদে অণুর গুণ নিয়মিত হয়। আবার রাসায়নিক অণু হইতেই যে তড়িতাণু সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই তিন প্রকার অণুর পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করা এবং তাহাদের গতির যে বিশেষত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। যত দিন এই সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত না হয়, তত দিন আলোক-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অপূর্ণ থাকিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ

(On the Phenomena of ordinary Reflection and Refraction as studied from the stand-point of the Theory of Diffraction)

ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগদ্বারা আলোকরশ্মির পরাবর্ত্তন (Reflection) এবং তির্য্যগ্‌বর্ত্তন (Refraction) সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তত্ত্ব এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলি উপযুক্ত যন্ত্রযোগে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠকালে যন্ত্রযোগে পরীক্ষার ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কোন এক স্থানে শব্দ উৎপাদন করিলে কিয়দ্দূরে তাহার অনুভূতি হইতে সময় লাগে, ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার ব্যাখ্যাস্থলে বলেন যে, শব্দ-উৎপাদক বস্তু তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুসমুদ্রে নিজের স্পন্দনানুযায়ী সঙ্কোচন ও প্রসারণের পরম্পরা বা সন্তান উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্কোচন ও প্রসারণের বীচিপরম্পরা বা বীচিমালা যখন পুরোভাগে চলিয়া আমাদের কর্ণপটহে পৌঁছিয়া তাহাকে উপর্য্যুপরি আন্দোলিত করে, তখন আমরা স্নায়ব শক্তির সাহায্যে শব্দের জ্ঞান লাভ করি। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এক স্থানে আলোক উৎপাদন করিলে, কোন দূরবর্ত্তী স্থানে তাহার অনুভূতি হইতে সময় লাগে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না, কারণ, এই সময় অতি অল্প। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা হয় যে, আলোক-উৎপাদক বস্তু ও আলোকজ্ঞাতার মধ্যে এমন কোন ব্যবহিত-পদার্থ বা আধান আছে, যাহার মধ্য দিয়া আলোকের শক্তি প্রবাহিত হয়; এই আধান-পদার্থ ঈথার নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। স্থির পুষ্করিণীর উপর লোষ্ট্রপাতে যে নিয়মে বীচিতরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়, শব্দ বা আলোকও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া নীত হয় (১ম চিত্র)। বীচিমালার পুরোগমনের সময় যদি আধান-পদার্থের নিবিড়ত্বের পরিবর্ত্তন হয়, তবে পুরোগমনের বেগও ঠিক থাকে না; নিবিড়তর আধানের মধ্যে গেলে তরঙ্গের বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

একটি বিন্দুতে উপর্য্যুপরি দুইটি বীচিসন্তানজাত স্পন্দন আরোপ করিলে দেখা যায় যে, সেই বিন্দুর অবস্থান অনুসারে কোথাও বা তাহার স্পন্দনশক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, কোথাও বা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যেখানে দুইটি একমুখী স্পন্দন আসিয়া মিলিত হয়, সেখানে উহাদের প্রত্যেকের শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করে এবং সময়ক্রমে যখন তরঙ্গ দুইটির পরিধি বিস্তৃততর হইয়া পড়ে, তখন সেই বর্দ্ধিত-শক্তি-স্পন্দন কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যায়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, একই আধান-পদার্থের ভিতর দিয়া দুই

বীচিমালার আন্দোলন এক সঙ্গে চলিলে এক এক রেখাপথ ধরিয়া তাহাদের শক্তি প্রবাহিত হয় (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্র)। এই রেখাপথগুলিকে সাধারণভাবে রশ্মি নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দুই রশ্মির মধ্যগত বা পার্শ্বগত বিন্দুগুলিকে পরস্পর বিমুখ বা প্রতীপমুখ স্পন্দন আন্দোলিত করিবার চেষ্টা করে; সুতরাং উভয়ের সম্মিলনে বিন্দুগুলি স্থির থাকে।

বিভিন্ন প্রকার নিবিড়ত্ববিশিষ্ট দুই আধান-পদার্থের যোগস্থলে যদি কোন অনচ্ছ পদার্থের সূক্ষ্ম পরদা স্থাপন করিয়া, তাহাতে অতি-সন্নিহিত দুইটি রন্ধ্র রাখা যায় এবং তাহাদের উপর এক দিক্ হইতে আলোকতরঙ্গ আপতিত হয়, তাহা হইলে সেই রন্ধ্র দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া উভয় আধান-পদার্থেই স্পন্দন সৃষ্ট হইয়া বিস্তারিত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক আধান-পদার্থেই যে যে রেখায় দুই তরঙ্গমালাজনিত স্পন্দন একমুখী হইবে, সেই সেই রেখাতেই আমরা আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইব। প্রত্যেক আধান-পদার্থেই উক্ত রেখাগুলির যে রেখায় আপতিত বীচিমালার যে কোন বীচি রন্ধ্রদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া নূতন বীচিমালার সৃষ্টি করিয়া একই সময়ে একমুখী হইয়া মিলিত হয়, সেই রেখাতেই আমরা উজ্জ্বলতম রশ্মি* দেখিতে পাই এবং উহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী রেখাগুলিতে ক্রমশঃ ক্ষীণতর রশ্মি দৃষ্ট হয় (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্র)। গণিতের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে যে, এই রেখাগুলি অতিবৃত্ত হইবে।

আধান-পদার্থ দুইটিতে রশ্মি-রেখার সংখ্যা দুইটি কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, বীচির দৈর্ঘ্য—দৈর্ঘ্য বেশী হইলে রশ্মি-রেখার সংখ্যা অল্প হয়। নিবিড়তর আধান-পদার্থে দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় বলিয়া রশ্মি-রেখার সংখ্যাও অধিক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীভূত রন্ধ্র দুইটির মধ্যে দূরত্বের হ্রাস হইলে রশ্মিসংখ্যাও অল্প হয়। এই দূরত্ব ক্রমশঃ কমাইয়া অবশেষে উভয় আধানের বীচি-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকেরও কমে পরিণত করিলে রশ্মি-রেখা দুই স্থানে এক একটিতে পরিণত হইবে (২য় চিত্র); অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বলতম রশ্মি দুইটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। দুইটি আধান-পদার্থের যে কোনটির মধ্যে রশ্মি-রেখার সংখ্যা রন্ধ্রদ্বয়ের দূরত্বের দ্বিগুণের সহিত আশ্রয়-পদার্থে বীচি-দৈর্ঘ্যের অনুপাত দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, রশ্মিরেখার সংখ্যা সেই অনুপাতের অঙ্কের সমান হইবে; অনুপাতের অঙ্কে ভগ্নাংশ থাকিলে তাহাকে পূর্ণ করিয়া এক ধরিতে হইবে। যদি অনুপাত একের অপেক্ষা কম অর্থাৎ প্রকৃত ভগ্নাংশ হয়, তবে রশ্মিসংখ্যা একের অধিক হইতে পারে না। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্রে প্রদত্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও রন্ধ্রদ্বয়ের দূরত্ব হইতে রশ্মিরেখার সংখ্যা তুলনা করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

গণিত-সাহায্যে ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীভূত রন্ধ্র দুইটির মধ্যবিন্দু দিয়া, পরদার উপর উভয় আধান-পদার্থের মধ্য দিয়া লম্ব পাতিত করিলে উহার

* ৪র্থ চিত্রে এই রশ্মি স্থূলরেখাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

একই দিকে অবস্থিত উভয় আধান-পদার্থস্থিত ১ম, ২য়, ৩য় আদি-ক্রমে যুগ্মরশ্মিরেখার অসীম পথগুলির উক্ত লম্বের সহিত অবনতিজ্ঞাপক কোণদ্বয়ের জ্যাএর অনুপাত একই হয় এবং উক্ত অনুপাতই ঐ দুই আধান-পদার্থের তির্য্যগ্‌বর্ত্তনের মাত্রাজ্ঞাপক। উক্ত রশ্মিযুগ্মের একটিকে অপরটির অনুপূরক বলা যাইতে পারে। এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বলতম রশ্মিদ্বয় এই যুগ্মগুলির অন্যতম।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিবিড়তর আধান-পদার্থে রশ্মিরেখার সংখ্যা বিরলতর আধান-পদার্থে রশ্মিরেখার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং উভয় আধান-পদার্থে ১ম, ২য় আদিক্রমে রশ্মিযুগ্ম লইলে দেখা যায় যে, নিবিড়তর আধান-পদার্থে কতক-গুলি রশ্মিরেখা অবশিষ্ট থাকে, যাহাদের যুগ্ম অর্থাৎ অনুপূরক বিরল আধান-পদার্থে পাওয়া যায় না। ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে, ঐ রশ্মিরেখাগুলির অসীমপথ সকলের উপরিউক্ত লম্বের সহিত অবনতিসূচক কোণগুলির প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আপতন-কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর। গণিতের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই সকল রশ্মির উৎপাদক দুইটি বীচিমালার প্রথমটি, কেন্দ্রীভূত প্রথম রন্ধ্রপথে বিরল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয়; কিন্তু সেগুলি অল্প দূর প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেই রন্ধ্রদ্বয় যাহার কেন্দ্র, এরূপ একটি অর্দ্ধবৃত্তাভাস কল্পিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক পরাবর্ত্তিত হয় এবং যে সময়ে বীচিমালার দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় রন্ধ্রপথে বিরল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, ঠিক সেই সময়ে উক্ত রন্ধ্রপথে কেন্দ্রীভূত হয়। এই দুই বিপরীতমুখী বীচিমালার সম্পাতে বিরল আধান-পদার্থে এক স্থির-বীচিমালা সৃষ্ট হইয়া উক্ত বৃত্তাভাসেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং উক্ত দুই বীচিমালা বিরল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া উপরিউক্ত রশ্মিগুলির যুগ্ম অর্থাৎ অনুপূরক রশ্মির সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু উহারা প্রত্যাহতগতি হইয়া নিবিড় আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয় এবং উপরিউক্ত রশ্মিগুলিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলে। এই রশ্মিগুলিকে আমরা রন্ধ্রদ্বয়ে আপতিত আলোক-তরঙ্গের নিবিড় অথবা বিরল আধান-পদার্থে অবস্থিতি অনুসারে পূর্ণ পরাবর্ত্তিত বলিতে পারি।

ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রন্ধ্রদ্বয়ে আপতিত আলোক-তরঙ্গ বা রশ্মি যদি নিবিড়তর আধান-পদার্থে অবস্থিত হয় এবং রন্ধ্রোপরি পাতিত লম্বের সহিত উক্ত রশ্মিরেখার অবনতি ক্রমশঃ অধিক করা যায়, তাহা হইলে উভয় আধান-পদার্থস্থিত উজ্জ্বলতম রশ্মিদ্বয় উহাদের উভয় পার্শ্বস্থিত অপর রশ্মিগুলি সমেত ক্রমশঃ পরদার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এবং নিবিড়তর আধান-পদার্থে যে যে রশ্মিরেখার অসীমপথগুলির উক্ত লম্বের সহিত অবনতিসূচক কোণ যথাক্রমে বিশিষ্ট আপতন-কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, বিরলতর আধান-পদার্থস্থিত সেই সেই রশ্মির অনুপূরক বা যুগ্ম রশ্মিগুলির অভাব পর পর উপরিউক্ত নিয়মানুসারে পরিলক্ষিত হইতে থাকে এবং সেই সেই রশ্মিগুলি পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য যে, নিবিড় আধান-পদার্থস্থিত উজ্জ্বলতম রশ্মি ও উহার পার্শ্বস্থ অর্থাৎ লম্বের দিকে অবস্থিত কয়েকটি রশ্মিও এই

নিয়মের বহির্ভূত নহে। অর্থাৎ বিরল আধান-পদার্থে উহাদের অনুপূরক রশ্মির অভাব লক্ষিত হইতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে উহারা পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু রন্ধ্রদ্বয়ে আপতিত আলোকতরঙ্গ বা রশ্মি যদি বিরলতর আধান-পদার্থে অবস্থিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত রশ্মিরেখার লম্বের সহিত অবনতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে পরদা ও উক্ত আধান-স্থিত উজ্জ্বলতম রশ্মির মধ্যে অবস্থিত রশ্মিগুলি মাত্রেরই ক্রমশঃ অভাব উক্ত আধানে লক্ষিত হয় এবং নিবিড় আধানে অবস্থিত উক্ত রশ্মিগুলির অনুপূরক রশ্মিগুলি পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হয়। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদি রন্ধ্রদ্বয়ের দূরত্ব উভয় আধান-পদার্থে ব্যাপ্ত বীচিদৈর্ঘ্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধেক হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ যখন আপতিত তরঙ্গ কেবল মাত্র দুইটি—একটি বিরলতর ও অপরটি নিবিড়তর আধান-পদার্থে উজ্জ্বলতম রশ্মি সৃজন করে, তখন কেবল মাত্র পূর্ণ পরাবর্ত্তন হইতে পারে।

অনচ্ছ পরদায় যদি দুইয়ের অধিক সমদূরবর্ত্তী রন্ধ্র থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেও ঠিক উপরিলিখিত ফল পাওয়া যায়।

আমরা সাধারণতঃ আলোকের যে পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহাও এই আলোচনার বিষয় হইতে পারে ও উহার একটি বিশেষ উদাহরণস্বরূপে বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, দুইটি আধান-পদার্থের ও উহাদের যোগস্থলের অনচ্ছ অণুগুলি স্বচ্ছ ঈথারে সমদূরবর্ত্তিভাবে সংবদ্ধ মনে করিলে উক্ত যোগস্থলকে সমদূরবর্ত্তী বহু রন্ধ্রবিশিষ্ট পরদার মত মনে করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব আলোকতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকেরও বহু কম। সুতরাং আধান-পদার্থদ্বয়ের যোগস্থলে আলোকরশ্মি পতিত হইলে তাহা হইতে কেবল মাত্র একটি পরাবর্ত্তিত ও একটি তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত রশ্মি সৃষ্ট হয় এবং প্রথমোক্ত রশ্মিরই কেবল পূর্ণ-প্রতিফলন লক্ষিত হয়।

এই প্রবন্ধে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ইংরাজী প্রতিশব্দ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

অতিবৃত্ত—Hyperbola. অনচ্ছ—Opaque. অসীমপথ—Asymptote. আপতন কোণ—Angle of Incidence. একমুখ—Same phase. নিবিড়ত্ব—Density. নিবিড়তর—Denser. পূর্ণপরাবর্ত্তন—Total Reflection. পূর্ণতির্য্যগ্‌বর্ত্তন—Total Refraction. পরাবর্ত্তন—Reflection. তির্য্যগ্‌বর্ত্তন—Refraction. তির্য্যগ্‌বর্ত্তনমাত্রা—Index of refraction. বিশিষ্ট আপতন কোণ—Critical Angle. বিরলতর—Rarer. আধান-পদার্থ—Medium. ব্যাবর্ত্তন—Diffraction. বৃত্তাভাস—Ellipse. রশ্মি—Ray. যোগস্থল—Surface of separation. স্বচ্ছ—Transparent. স্থির-বীচি—Stationary Wave. অনুপূরক—Complement.

চিত্র-পরিচয়

য য'—পরদা। ও, ও'—পরদাস্থিত রন্ধ্রদ্বয়। ক—ও ও' এর মধ্য-বিন্দু। ল ল'—কএর মধ্য দিয়া পরদায় পাতিত লম্ব। প, প—রন্ধ্রোপরি আপতিত রশ্মি। $প'$, $প'_{১}$, $প'_{-১}$, $প'_{২}$, $প'_{-২}$ ......—পরাবর্ত্তিত বিভিন্নমুখী রশ্মিরেখাসমূহ। $প''$, $প''_{১}$, $প''_{-১}$, $প''_{২}$, $প''_{-২}$, ...—তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত বিভিন্নমুখী রশ্মিরেখাসমূহ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিত্রে আপতিত রশ্মি বিরল আধান-পদার্থে অবস্থিত। ৫ম চিত্রে উক্ত রশ্মি নিবিড় আধান-পদার্থে অবস্থিত। চিত্রে $প'$ ও $প''$, $প'_{১}$ ও $প''_{১}$, $প'_{২}$ ও $প''_{২}$ প্রভৃতি এবং $প'_{-১}$ ও $প''_{-১}$, $প'_{-২}$ ও $প''_{-২}$ প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক। ৫ম চিত্রে $প'_{২}$ ও $প'_{-৭}$ চিহ্নিত রশ্মিদ্বয় পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হইয়াছে। ৪র্থ চিত্রে $প''_{২}$ ও $প''_{-৪}$ চিহ্নিত রশ্মিদ্বয় ও ৩য় চিত্রে $প''_{১}$ চিহ্নিত রশ্মি পূর্ণ তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীজগদিন্দু রায়
অধ্যাপক, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ।

পিণ্ডারির পথে তাম্রমল*

১৯১৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে বাগেশ্বর(১) ত্যাগ করিয়া আমরা(২) যখন হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডারির চিরহিমানী ও হিমনদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন আলমোরা হইতে ৩২ মাইল দূরে এক স্থানে তাম্রমলের (copper slag) একটি প্রকাণ্ড স্তূপ আমরা দেখিতে পাই। সরযূর উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত চূণের প্রস্তরস্তরযুক্ত অনুচ্চ পাহাড়ের সম্মুখে এই স্তূপটি অবস্থিত। বর্ত্তমান পথ হইতে স্তূপের চূড়া ও গহ্বরের দ্বার প্রায় নয় দশ ফুট উচ্চ। নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ এই গহ্বরে এখন গো রক্ষা করে। ইহাতে চারি পাঁচটি গো রক্ষা করা হয়। গহ্বরের মধ্যে প্রস্তরগাত্রে স্থানে স্থানে চুল্লীর কালি লাগিয়া আছে। কালি বেশী দিনের নহে। গো-রক্ষকেরা কখন কখন এ স্থানে রন্ধন করে।

তাম্রমলের গুটিগুলির আয়তন জামরুলের মত। এগুলির উপরিভাগ অত্যন্ত আবড়-খাবড়। উপরে স্থানে স্থানে করতজিট প্রস্তরের ক্ষুদ্র টুকরা সংলগ্ন আছে। মলগুলি সাধারণতঃ কাল, তবে স্থানে স্থানে কাঁসার রং দেখা যায়। এগুলির উপরে স্থানে স্থানে পিঙ্গল

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিংশভাগ, ২য় সংখ্যায় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "সরিফপুরের লৌহমল" নামক প্রবন্ধে উক্ত স্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি iron slagএর বর্ণনা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় সুরেশ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, slag শব্দের বাঙ্গালা কি হইবে এবং আমারই পরামর্শ-মত উক্ত ইংরাজী শব্দের পরিচায়করূপে "মল" শব্দের প্রয়োগ করেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম যে, কোনও আকরে কিট্ট, কয়লা ও ভস্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে এই আকর হইতে খনিজ বাহির করা হইয়াছে (পৃঃ ৯৩)। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, "কিট্টং মলঃ ইত্যমরঃ।" বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে "খিট" শব্দ slag from iron surface অর্থে ব্যবহৃত হয় (Ball. Economic Geology. পৃঃ ৬৩৭)। এই "খিট" শব্দ যে "কিট্টং" শব্দেরই রূপান্তর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমি এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার পূর্ব্বে সুরেশ বাবুর নিকট slag শব্দের পরিচয়-বোধক যে "মল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেই অর্থে "মল" শব্দের প্রয়োগ অতি প্রাচীন কালেও আমাদের দেশে ছিল। "কিট্ট" শব্দ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। সুতরাং বোধ হয় যে, এই শব্দের পরিবর্ত্তে "মল" শব্দের ব্যবহারই বিশেষ সুবিধাজনক। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

(১) আলমোরা হইতে ২৬ মাইল উত্তরে গোমতী ও সরযূনদীর সঙ্গমে অবস্থিত পাহাড়ী হিন্দুদিগের তীর্থ ও বাণিজ্য স্থান।

(২) পিণ্ডারি অভিযানের সভ্যগণ ;—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্, অভিযানের নায়ক; শ্রীযুক্ত বলরাম সেন বিএস সি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে বিএস সি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস সি এবং আমি।

আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে ; ইহা সবুজ সস্তক (malachite) ও লৌহের পিঙ্গল মড়িচার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সস্তক তাম্রমলের তাম্র ও বাহিরে অঙ্গারাম্লের সংস্পর্শে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লৌহদ্রাবে বুড়্বুড়ি দেয়। ভাঙ্গিলে তাম্রমলগুলি বহু ছিদ্রপূর্ণ দেখা যায়। এগুলি বাষ্পের বুদ্বুদের চিহ্ন। ভাঙ্গিলে যে নূতন পাত্র উৎপন্ন হয়, সেগুলি অসমতল ও স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত। ভাঙ্গা তাম্রমলগুলিতে বহুবিধ রং দেখা যায়। রং হিসাবে মলগুলি মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—(ক) কাল ও পোড়া ইস্পাতের মত, (খ) নীল, (গ) মার্জ্জিত ইস্পাতের রঙ্গের ও (ঘ) কাঁসার রঙ্গের মত।

প্রাপ্ত তাম্রমলগুলিতে কাল ভাগ অত্যন্ত বেশী ও পোড়া ইস্পাতের রংএর অংশ অতি কম। ক-চিহ্নিত মলে খাট ও মোটা কাল অগিট (augite) স্ফটিক অনেক আছে। স্ফটিকগুলি কাল কাচে প্রোথিত, বুদ্বুদ-গাত্রগুলি কাল ও কাচময়। এই মলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৪৫ ; ইহাতে কষ্টে ছুরি দ্বারা আঁচড় দেওয়া যায় ; ইহার কষ সবুজ ; ইহা ভঙ্গুর ; চুম্বক ইহার গুঁড়ার প্রায় সকল ক্ষুদ্র অংশই আকর্ষণ করে ; ইহার কারণ এই যে, মলে অয়স্কান্ত স্ফটিক বর্ত্তমান আছে ; লৌহদ্রাবে ইহার গুঁড়া দিলে উদজন সল্বিদ (H_2S) বাষ্পের অল্প অল্প গন্ধ বাহির হয় ও দ্রাবের রং পিঙ্গলপীত বর্ণ ধারণ করে ও ইহা ক্রমে গাঢ় হয়। ফুটাইলে অম্লদ্রবণের ভিতর জিকার বা জিউলির আঠার মত থল্-থলে পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ক-চিহ্নিত মলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল,—SiO_2—৪৫·৮৮, Al_2O_3—৫·৯২, Fe_2O_3—৮·৮৯, MgO—১৬·১, CaO—২০·১১, H_2O ও H_2S ইত্যাদি ২·৯৮, Cu_2O·৮৮। কাল মলে তাম্র অতি কম, নাই বলিলেও চলে। পোড়া ইস্পাতের রঙ্গের মলগুলিতে তাম্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী।

মলগুলিতে নীলভাগ অতি অল্প পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কাচের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। কাচে অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক প্রোথিত রহিয়াছে। বাষ্পের বুদ্বুদের গাত্রগুলি লোহিতাভ পিঙ্গলবর্ণের ও কাচময়। এই কাচের উপর অতি ক্ষুদ্র তাম্র স্ফটিক চিক্‌চিক্ করিতেছে। নীল মলের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করিতে পারা যায় নাই ; কারণ, ইহা কাল মলের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে। এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩·৮০। ইহার গুঁড়ার রং নীলাভ। নীল মলের প্রায় সর্ব্ব অংশেই তাম্রের ক্ষুদ্র স্ফটিক দেখা যায়। কোন কোন স্থানে তাম্র স্ফটিকের অষ্টপত্র দৃষ্ট হয়। নীলমলে ছুরি দ্বারা অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়। ইহা ক-চিহ্নিত অপেক্ষা কঠিন। ইহা ভঙ্গুর ও চূর্ণ করিলে অতি অল্প অংশই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা ক-চিহ্নিত মলটির মতই কার্য্য করে। তবে উদজন সল্বিদ বাষ্প একটু বেশী বাহির হয়। ইহাতে তাম্রের পরিমাণ বেশী ও অন্যান্য উপাদান কম।

মার্জ্জিত ইস্পাতের রঙ্গের মলও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ইহাও প্রায় সমস্তই কাচময়। কাচে অতি অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক প্রোথিত দেখা যায়। বাষ্পের বুদ্বুদের গাত্র-গুলি ইস্পাতের রঙ্গের, তবে স্থানে স্থানে লোহিতাভ পিঙ্গলবর্ণের। ইহা কাচ দিয়া আবৃত। এই মলের সীমায় অল্প পরিমাণ তাম্রের সূক্ষ্ম স্ফটিক ও স্ফটিকীল দেখা যায়। এই স্থানে

মধ্যে মধ্যে নীল অংশ আছে। এগুলি তাম্রের চাক্‌চিক্য। এই মল কাল মলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩·৬৫। ছুরি দ্বারা ইহাতে অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়; ইহা খ-চিহ্নিত অপেক্ষা কঠিন। এগুলি ভঙ্গুর। ইহা চূর্ণ করিলে দুই একটি কণামাত্র চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইহার কষ ধূম্র ও পিঙ্গল। লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা খ-চিহ্নিতটির মত কার্য্য করে এবং এই খ-চিহ্নিত মল হইতে যে পরিমাণে উদজন সল্বিদ বাষ্প বাহির হয়, এটি হইতেও প্রায় সেই পরিমাণে উদজন সল্বিদ বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে তাম্রের পরিমাণ বেশী ও অন্যান্য উপাদান কম।

কাঁসার রঙ্গের মলও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রিজম পত্রযুক্ত স্ফটিক চিক্‌চিক্ করিতে দেখা যায়। এগুলিরও রং কাঁসার মত ও কাঁসার রঙ্গের কাচে প্রোথিত আতসি কাচ দ্বারা পরীক্ষা করিলে অনুমান হয়, এগুলি একনতিক (monoclinic) শ্রেণীর অন্তর্গত। নিম্নলিখিত পত্রগুলি এই স্ফটিকে পাওয়া গিয়াছে—(১০০), (০১০), (০১০)। (০১০) পত্রের সমান্তরে সমভঙ্গপ্রবণতা বর্ত্তমান আছে। ইহা অতি সুস্পষ্ট। এই মলের স্থানে স্থানে তাম্রের স্ফটিকও দেখা যায়। বাষ্পের বুদ্‌বুদের গাত্রে উক্ত স্ফটিক চিক্‌চিক্ করিতেছে। এগুলি কাচে প্রোথিত। কাঁসার রঙ্গের মল ক-চিহ্নিত মলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩·৭১। ইহার কষ ধূমাভ পিঙ্গল। পূর্ব্বমলগুলি অপেক্ষা ইহাতে পিঙ্গলবর্ণের আভা একটু বেশী। ছুরি দ্বারা ইহাতে অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়। এ মলগুলি ভঙ্গুর। ইহার গুঁড়া চুম্বক দ্বারা মোটেই আকৃষ্ট হয় না। লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা পূর্ব্বগুলির মতই কার্য্য করে। ইহাতে তাম্রের পরিমাণ বেশী ও অন্যান্য উপাদান অতি কম ও উদজনসল্বিদ বাষ্প মোটেই পাওয়া যায় না।

অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রমলগুলির অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হয়। খ ও গ-চিহ্নিত মলগুলির পাত বহু কষ্টেও প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। কারণ, এগুলি অতি কম ও সূক্ষ্ম অবস্থায় আছে। ঘ-চিহ্নিত মলটির একটি পাত অতি কষ্টে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক-চিহ্নিত মলটির প্রায় দশ বার খানি পাত প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক-চিহ্নিত মলের পাতের রং অণুবীক্ষণে সাধারণতঃ সবুজাভ পিঙ্গল বর্ণের। মধ্যে মধ্যে কাল অংশ আছে। আলোকময় অংশ অগিট স্ফটিকে পূর্ণ। এগুলি খাট, মোটা ও সংখ্যায় অধিক। ইহাদের অধিকসংখ্যক সমান্তরাল অবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, কেবল দুই চারিটিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যেগুলি সমান্তরালভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেগুলি Idding's প্রণীত গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠার ৮, ১০ ও ১১ চিত্রের সম্মুখভাগের অনুরূপ। ৮ চিত্র অতি কম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এগুলি ডায়পসিড ও সর্ব্বপ্রথমে স্ফটিকীভূত হইয়াছে। যেগুলি সমান্তরালভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না, সেগুলি ঐ পৃষ্ঠার ৮ চিত্রের (০১০) পত্রের দিকের মত(১)। কাল অংশ কাচময়। ইহাতে অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক আছে। এগুলি লম্বা, ইহাদের

(১) Rock Minerals—Iddings.

দৈর্ঘ্য বিস্তার অপেক্ষা প্রায় ৩, ৬ ২০, এমন কি, ২৫ গুণ। ইহাদের বিলোপ সমান্তরাল। ইহাদের আকৃতি 'ইডিং'এর ৩০২ পৃষ্ঠায় ১১ চিত্রের মত লম্বা। এইগুলি হইতে অনুমান হয়, স্ফটিক-গঠনের শক্তি অগিটে এইরূপ যে, ইহাতে (১০০) পত্রই বিশেষভাবে সর্ব্বাগ্রে ও শীঘ্র উৎপন্ন হয়। (০১০) পত্র কখন বিদ্যমান আছে, কখন রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে স্থান অনেকক্ষণ তরল ও উত্তপ্ত ছিল, সেই স্থানে অন্যান্য পত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্থান শীঘ্রই কাচ-ভাবাপন্ন হইয়াছে ও অল্প উত্তপ্ত ছিল, সে স্থানে (১০০) পত্র গ-রেখার দিকে অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কাচভাবাপন্ন দ্রাবের গতি নাই বটে, তবে অণুর গতি থাকে। এ গতি স্ফটিক-গঠনের শক্তি জন্যই হয়। ক-চিহ্নিত মলের পাতে মধ্যে মধ্যে অম্লক্রান্ত স্ফটিক দেখা যায়। ঘ-চিহ্নিত মলটির পাতের রং অণুবীক্ষণে ঈষৎ পিঙ্গলাভ ইস্পাত ধূসর। ইহাতে খাট ও মোটা অগিট স্ফটিক ও কাঁসার রঙ্গের প্রিজম পত্রযুক্ত স্ফটিক, কাঁসার রঙ্গের কাচে গ্রথিত রহিয়াছে। অপাইট স্ফটিকগুলির অধিকাংশেই (১০০) পত্র আছে। দুই চারিটিতে মাত্র (০১০) পত্র দেখা যায়। যাহাতে (০১০) পত্র পাওয়া যায়, সেইগুলি সব ইডিংএর ৩০২ পৃষ্ঠার ৮ চিত্রের মত। সম্ভবতঃ এগুলি ডায়পসিড ও সর্ব্বপ্রথমে দ্রাবের উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় চারিদিক্ সমান ভাবে স্ফটিকীভূত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল (১০০) পত্রযুক্ত স্ফটিকগুলি ইডিংএর ৩০২ পৃষ্ঠার ১০ ও ১১ চিত্রের মত। সম্ভবতঃ এগুলি অগিট ও ডায়পসিডের কিছু পরে দ্রাবের কম তরল ও কিছু কম উত্তাপে উৎপন্ন হইয়াছে। কাঁসার রঙের স্ফটিকগুলি অণুবীক্ষণে ইস্পাত ধূসর রং দেয়। আড়া-আড়ি ভাবে অবস্থিত নিকলের প্রিজম দ্বারা দেখিলেও তাহাই। এগুলিতে সমভঙ্গপ্রবণতার সমান্তরাল রেখাগুলি অতি স্পষ্ট। উৎক্ষিপ্ত আলোকে এগুলি জ্বলিতে থাকে। স্ফটিকগুলি অতি ক্ষুদ্র ও সমতাপত্তিজনিত বর্ণ অতি অস্পষ্ট; এই কারণে এগুলির অন্ধকারাচ্ছন্নতা পরীক্ষা করা যায় না। এগুলি যে তাম্রের স্ফটিক নহে, তাহা ঠিক। সম্ভবতঃ এগুলি তাম্র ও বালুকাযুক্ত কোনও প্রকার যৌগিক পদার্থ (copper silicate*)। পরীক্ষা করিয়া যতদূর অনুমান হয়, তাহাতে বুঝা যায়, এগুলি কম উত্তাপে স্ফটিকীভূত হয়। আর স্ফটিক গঠনের শক্তি এরূপ যে, সর্ব্বপ্রথম ও শীঘ্র (১০০) পত্র উৎপন্ন হয়। স্ফটিকগুলি প্রায়ই সমান্তরাল। ইহাতে অনুমান হয়, ইহাতে সমান্তরালভাবে উৎপন্নের শক্তিও বিশেষ প্রবল ও কার্য্যকরী।

তাম্রমলগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লৌহ ও গন্ধকময় তাম্র-আকর হইতে তাম্র প্রস্তুতের বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় প্রণালীর (১) পর পর অবস্থা মোটামুটি এগুলিতে বর্ত্তমান আছে। লৌহ, গন্ধক, তাম্র ও অম্লজন—এই কয়টির বিশেষ রাসায়নিক গুণের উপর এই প্রণালী চলিতেছে। হিমালয়ের পর্ব্বতবাসীরা যে মোটামুটি এই রাসায়নিক গুণের বিষয়

(*) Metallargy by Prof A. H. Sexton.

(১) Rock Minerals—Iddings.

অবগত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলের পর্য্যটকেরা (১) এ স্থানের তাম্রমলের কথা উল্লেখ করেন নাই। আর এ স্থানে কোন য়ুরোপীয় প্রণালীর কল বা বাড়ী নাই। ইহা ব্যতীত মলগুলি বিশেষ বড় নহে। ইহাতে অনুমান হয়, পর্ব্বতবাসীরাই এই স্থানে তাম্র প্রস্তুত করিত। পর্ব্বতবাসীরা সাধারণতঃ যে স্থানে ধাতুর আকর পাওয়া যায়, তাহার নিকটেই ধাতু প্রস্তুত করে। এই অঞ্চলে পর্য্যটনের সময় দেখিয়াছি, এ অঞ্চলে যে স্থানে লৌহমল আছে, তাহার অতি নিকটেই লৌহের আকর পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এই স্থানের নিকটে পর্ব্বতের ভিতর কোন স্থানে তাম্রের আকর পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ ফুরাইয়া গিয়াছে কিংবা কোন কারণবশতঃ ইহার অস্তিত্বের বিষয় পাহাড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

(১) Rec. G. S. I, Vol XXXV, 1907, part IV A tour to the Pindari glacier by Major St John Gore. A four Weeks tramp through the Himalayas by J. C. Forrester.

নূতন উপায়ে 'যুক্ত-লবণ' গঠন*

(প্লাটিনম, তাম্র এবং রৌপ্যের সহিত 'পরিবর্ত্তিত' আমোনিয়মমূলক যুক্ত-আইওদিদ সকল)

এই অভিনব প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্ব্বে লণ্ডন ও আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছি (J. Chem. Soc., 1913, 103, 426 ; J. Amer. Chem. Soc., 1913, 35, 1185)। সেই সমস্ত প্রবন্ধে এই নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত প্রায় পঞ্চাশটি নূতন যুক্ত-লবণ (doublesalt) বিবৃত হইয়াছে। এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আরও পনেরটি যুক্ত-লবণ প্রস্তুত করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইহার সাহায্যে যে কেবল এক প্রকার লবণ গঠিত হয়, তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহা বহুপ্রকার লবণ প্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহার করা যায়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই উপায় অবলম্বনে এমন অদ্ভুত লবণসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা পূর্ব্বে অন্য কোন উপায়ে আর কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যুক্ত-লবণ প্রস্তুত সোজা প্রণালীতেই হইত। এই উপায়ে যে দুই পদার্থের যোগে যুক্ত-লবণ হয়, তাহার একটি অপরটিতে গুলিয়া সেই মিশ্র পদার্থ হইতে দানা বাঁধাইতে হয়। ইহা অনেক সময় অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং সময়-সাপেক্ষ; যেহেতু উহার মধ্যে যে কোন একটিকে প্রথমে স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু এই বিপরীত প্রণালীতে কোনওটিকেই স্বতন্ত্র প্রস্তুত করার আবশ্যক হয় না, দুইটিই একেবারে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমোনিয়ম প্লাটিনিক আইওদিদ (Ammonium platinic iodide) পূর্ব্বোক্ত সোজা প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে প্লাটিনম ক্লোরিদ হইতে আমোনিয়ম আইওদিদ সাহায্যে প্লাটিনম আইওদিদ প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে সেই দ্রব আমোনিয়ম আইওদিদ দ্রাবণে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে অভীষ্ট লবণ দানা প্রস্তুত করি। এই নূতন উল্টা প্রণালীতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। প্লাটিনম ক্লোরিদ হইতে একেবারে যুক্ত প্লাটিনম আইওদিদ পাওয়া যাইবে আর সেই কষ্টসাধ্য প্লাটিনম আইওদিদ স্বতন্ত্র প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমোনিয়ম আইওদিদের একটি গাঢ় দ্রাবণ করিতে হয় এবং তাহাতে প্লাটিনম ক্লোরিদ অল্প অল্প করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ এই যুক্ত-লবণ পতিত হয়। রাসায়নিক হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। এইরূপে 'পরিবর্ত্তিত' আমোনিয়ম আইওদিদ (substituted ammonium iodide) সকলের দ্রাবণে প্লাটিনম ক্লোরিদ দিয়া প্রায় পঁচিশটি নূতন যুক্ত প্লাটিনম আইওদিদ প্রস্তুত হইয়াছে (Jour. Chem.

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

Soc, 1913, 103, 426)। প্লাটিনমের পক্ষে সোজা এবং বিপরীত প্রণালী উভয়ই প্রযোজ্য; কিন্তু তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদের সহিত যুক্ত-লবণ প্রস্তুতকালে সোজা প্রণালী কোন কাজেই আসে না। কারণ, তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদকে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনরূপে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। প্রস্তুতকালে ইহা তাম্রযুক্ত (cuprus) আইওদিদ এবং আইওডিনে (iodine) বিশ্লেষিত হয়। বিপরীত প্রণালীতে তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদ বিশ্লেষিত হইবার পূর্ব্বে আমোনিয়ম আইওদিদের সহিত যোগ হওয়াতে বিশুদ্ধ যুক্ত-লবণ উৎপন্ন হইয়া পতিত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, 'পরিবর্ত্তিত' আমোনিয়ম আইওদিদের গাঢ় দ্রাবণে তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদ প্রদান করিতে হয় এবং এইরূপে উল্লিখিত লবণসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে ক্যাডমিয়ম (Cadmium) এবং পারদের অনেক যুক্তলবণ প্রস্তুত হইয়াছে। এই বিষয় আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রে পূর্ব্ববৎসর প্রকাশ করিয়াছি (J. Amer. Chem. Soc., 1913, 35, 949)। এই প্রণালীর সাহায্যে অনেক যুক্ত কার্ব্বনেটাদি প্রস্তুত করিয়া লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীতে বিবৃত করিয়াছি (Proc. Chem, Soc., 1913, 29, 185)। যে সকল যুক্ত লবণ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিবার সময় নাই, কেবল তাহাদিগের নামগুলি উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইবে। তাহাদিগের বাঙ্গা।। প্রতিশব্দ না থাকাতে ইংরাজিতেই নাম লিখিতেছি। যথা,—

Piperidinium platiniodide
Coniinium platiniodide
Isoquinolium platiniodide
Guanidine platiniodide
Quinaldine ethylplatiniodide
Methylethylpropylphenyl ammonium platiniodide
Tripropylammonium cupriodide
Trimethyl p-tolylammonium cupriodide
Isoquinoline cupriodide
Tetramethyl ammonium silver iodide
Trimethyl p-tolyl ammonium silver iodide
Pyridinium silver iodide
Quinolinum silver iodide
Tetrapropylammonium silver iodide.

এই অনুসন্ধানটি আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ বি এস্‌সি মহাশয়ের সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরসিকলাল দত্ত

চিকিৎসাশাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার একটি সহজ যন্ত্র*

সকল প্রকার বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অম্লজন বায়ুই প্রধান। শ্বাস-প্রক্রিয়ার সহিত অম্লজনের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে বাতাস গ্রহণ করি, তাহাতে প্রত্যেক ভাগ অম্লজনের সহিত তাহার চারি গুণ নেত্রজন (nitrogen) মিশ্রিত আছে। বাতাসে এইরূপ ভাবে নেত্রজন মিশ্রিত থাকিবার কারণ কি ? ইহার কারণ এই যে, খাঁটি অবিমিশ্রিত অম্লজন বায়ু অত্যন্ত তেজস্কর (active) ; উহা নেত্রজনের ন্যায় নিষ্ক্রিয় (inert) বায়ু-মিশ্রিত না থাকিলে যাবতীয় পদার্থ অতি শীঘ্র ভস্মীভূত হইত এবং আমাদের শরীরের ক্ষয় বা অন্তর্দ্দাহ (internal combustion) অতি শীঘ্র হইয়া জীব অতি অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অবিমিশ্রিত অম্লজন যেমন জীবশরীরে বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে, চাপযুক্ত অম্লজনের (compressed oxygen) ব্যবহারেও সেইরূপ ফল হয়। দেখা গিয়াছে যে, কোন জীবকে বায়বীয় চাপের ৩।৪ গুণ চাপের (3 or 4 atmospheric pressures) অম্লজনের মধ্যে রাখিয়া দিলে উহার অচিরে মৃত্যু হয়।

খাঁটি অবিমিশ্রিত বায়ু উপরোক্ত হিসাবে বিষাক্ত হইলেও কতকগুলি কারণে উহা আধুনিক চিকিৎসাজগতের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ। এই বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে অম্লজন বায়ু জীবশরীরে কি ভাবে কার্য্য করে, তৎসম্বন্ধে সামান্য দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।

আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বাতাস টানিয়া লই, তাহা হইতে ফুসফুসের মধ্যস্থিত রক্ত শতকরা ৪ হইতে ৫ ভাগ অম্লজন গ্রহণ করে এবং শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ অঙ্গারাম্লবায়ু (carbonic acid gas) প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি। রক্তমধ্যস্থিত লাল রংএর কণাগুলির (red corpuscles) মধ্যে হেমোগ্লোবিন (hæmoglobin) নামক একপ্রকার দানাদার (crystalline) পদার্থ আছে। উহা বাতাসের সংসর্গে আসিলে উহা হইতে অম্লজন লইয়া অক্সিহিমোগ্লোবিন (oxyhœmoglobin) নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহার রং ঘোর লাল এবং এই জন্যই শিরামধ্যস্থিত (arteries) রক্তের রং এত লাল। অন্তঃকরণের সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা যখন সমস্ত শরীরে রক্তসঞ্চালন হয়, তখন প্রস্থান নাড়ী (artery)-স্থিত অক্সিহিমোগ্লোবিন (oxyhœmoglobin) যুক্ত ঘোর লালবর্ণের রক্ত শরীরের অন্যান্য স্থানে

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

উহার মধ্যস্থিত অম্লজন বায়ু ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের পুষ্টি সাধন করে এবং গ্রহণী নাড়ী (veins) দ্বারা অঙ্গারায় ইত্যাদি অপর গুণসম্পন্ন নীলবর্ণ রক্ত ফুসফুসের মধ্যে ফিরিয়া আইসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাতাসে প্রতি ভাগ অম্লজনের সহিত চারি ভাগ নেত্রজন মিশ্রিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ ভাগ বাতাস নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে তবে আমরা একভাগ অম্লজন পাই। সহজ শরীরের পক্ষে এইটুকু অম্লজন যথেষ্ট। কিন্তু যখন রক্তাল্পতা (anæmia), হাঁপানী (asthma), দম আটকান (asphyxia) এবং অন্তঃকরণ ও ফুস্‌ফুসের অন্যান্য রোগে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন অন্তঃকরণের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঠিক ভাবে হয় না, কাজেই ফুস্‌ফুসস্থিত রক্তও যথেষ্ট পরিমাণ অম্লজনের সংসর্গে আসিতে পায় না। এই সকল অবস্থায় রোগীকে খাটি অবিমিশ্রিত অম্লজন বায়ুর আঘ্রাণ লওয়াইলে অতি শীঘ্র ও সহজে রোগী সুস্থ ও সবল হয়। এই কারণেই আধুনিক চিকিৎসকগণ অম্লজন ব্যবহারের পক্ষপাতী।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সামান্য জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষণ প্লেগ ও যক্ষ্মা পর্য্যন্ত সকল রকম রোগেই অম্লজন বায়ুর ঘ্রাণ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাণ্ডি, মৃগনাভি প্রভৃতি তেজস্কর ঔষধ সেবন না করাইয়া প্রসবের পর প্রসূতিকে অম্লজন আঘ্রাণ লওয়াইয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। ক্লোরোফরমের পর রোগীকে শীঘ্র সুস্থ করিবার জন্যও অম্লজন ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে অম্লজন বায়ু প্রয়োজন হইলে দুই উপায়ে উহা পাওয়া যাইতে পারে; প্রথম—লোহার চোঙ্গায় অত্যন্ত চাপে ভরা অম্লজনের ব্যবহার (compressed oxygen cylinder), দ্বিতীয়—সদ্যপ্রস্তুত অম্লজনের ব্যবহার। প্রথমটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং লোহার চোঙ্গা অত্যন্ত ভারী বলিয়া সহজে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। দ্বিতীয় উপায়ে প্রস্তুত অম্লজন অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল অম্লজন সদ্যপ্রস্তুত করিবার যন্ত্র পাওয়া যায়, তাহাদের মূল্যও খুব সুলভ নহে। সাধারণ গৃহস্থোপযোগী এইরূপ সুলভ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আমি বহুদিন হইতে করিতেছি এবং সেই চেষ্টার ফল আপনাদিগকে জানাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এই যন্ত্রের গঠন অতি সরল। সংলগ্ন চিত্রদৃষ্টে উহা সহজেই বুঝা যাইবে। একটি গোল বাল্‌তির ন্যায় পাত্রের (reservoir) মধ্যে আর একটি ঐরূপ গোল পাত্র উপুড় করা আছে। ভিতরের পাত্রটি বাহিরের পাত্রের মধ্যে অতি সহজে উঠানামা (slide) করিতে পারে। ভিতরের পাত্রটিকে বায়ু-ধারক (gas-holder) বলা যাউক। বায়ুধারকের উপরে একটি বড় ছিদ্র আছে। উহার মধ্যে একটি সচ্ছিদ্র চোঙ্গা (perforated cylinder or basket) পরাইয়া দেওয়া যায় এবং স্ক্রু-বিশিষ্ট ঢাকনি দ্বারা ঐ ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।

বাল্‌তির ভিতরে একটি নল সোজাভাবে আছে এবং ঐ নল বাল্‌তির তলা হইতে

বাহির হইয়া পুনরায় বাল্‌তির গা দিয়া উঠিয়াছে। বাল্‌তির গায়ে একটি পরীক্ষা-নল (test tube) লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষানলের ছিপির মধ্য দিয়া দুইটা সরু নল গিয়াছে; তাহার মধ্যে একটা নল পরীক্ষা-নলের প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অন্যটি সামান্য মাত্র ছিপির মধ্যে প্রবিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত সরু নলের সহিত এক টুকরা রবারের নলদ্বারা বাল্‌তির বহিঃস্থিত গা-নলের যোগ করিয়া দেওয়া যায়। গা-নলে একটি ছিপিও লাগান আছে।
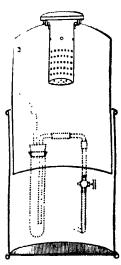
অম্লজন বায়ু প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বাল্‌তি জলে ভরিতে হয়। তাহার পর বায়ুধারকের উপরের স্ক্রুওয়ালা ঢাক্‌নি খুলিয়া সচ্ছিদ্র চোঙ্গার মধ্যে অম্লজনকারক মসলা (oxygen cartridge) রাখিয়া দিবে। স্ক্রু-ঢাকনি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া বায়ুধারকটি বাল্‌তির ভিতর আস্তে আস্তে ভাসাইয়া দিয়া গা-নলের ছিপিটি সামান্য খুলিয়া দিলে বায়ুধারক আস্তে আস্তে নামিবে। ইহার পূর্ব্বে পরীক্ষা-নলে সামান্য জল দিয়া উহা রবারের নলের দ্বারা গা-নলের সহিত জুড়িয়া দিতে হইবে। পরীক্ষা-নলে এতটুকু জল দেওয়া আবশ্যক যে, উহার মধ্যস্থিত লম্বা নলটি এক ইঞ্চি মাত্র জলে ডুবিয়া যায়। বায়ু-ধারক আস্তে আস্তে নামিতে থাকিলে উহার মধ্যস্থিত বায়ু পরীক্ষা-নলে বুদ্‌বুদাকারে বাহির হইতে দেখা যাইবে এবং সচ্ছিদ্র চোঙ্গা বাল্‌তির জলের সংসর্গে আসিবামাত্র মসলা ও জলের রাসায়নিক সংযোগে প্রচুর পরিমাণে অম্লজন বায়ু উদ্ভাবিত হইবে। পরীক্ষা-নলস্থিত অন্য সরু নলের সহিত একটা লম্বা রবারের নল জুড়িয়া দিয়া রোগীর নাকের বা মুখের সম্মুখে ধরিলে রোগী খাঁটি অম্লজন বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত লইতে পারিবে।

এই সময়ে যদি গা-নলের ছিপিটি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ভিতরের অম্লজন বায়ুর চাপে বায়ুধারক আস্তে আস্তে আপনা আপনি ভাসিয়া উঠিবে এবং সেই সঙ্গে সচ্ছিদ্র চোঙ্গাও

জল ছাড়াইয়া উঠিবে। কাজেই আর অম্লজন বায়ু জন্মাইতে পারিবে না। আবার ছিপি খুলিলেই অম্লজন বায়ু পাওয়া যাইবে। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র চোঙ্গায় মসলা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অম্লজন বায়ু পাওয়া যাইবে। পরীক্ষা-নলের ছিপি খোলার তারতম্য অনুসারে কম অথবা বেশী অম্লজন বায়ু পাওয়া যাইবে। পরীক্ষা-নলস্থিত জলের কাজ এই যে, উহা অম্লজন বায়ুকে ধৌত করিয়া পরিশুদ্ধ করিতেছে এবং কি পরিমাণ অম্লজন বায়ু বাহিরে আসিতেছে, তাহাও দেখাইতেছে।

যদি ইথার বা ক্লোরোফরম-মিশ্রিত অম্লজন রোগীকে আঘ্রাণ লওয়াইবার প্রয়োজন হয়, তবে জলের পরিবর্ত্তে তৎপরিমাণ ইথার বা ক্লোরোফরম পরীক্ষা-নলে দিতে হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার*

(Titanium minerals—their estimation and their utilisation)

টাইটেনিয়ামের ইতিহাস ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। রেভারেণ্ড উইলিয়ম গ্রিগর (Rev William Gregor) ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশের মিনাকিন (Menaccin) গ্রামে মিনাকিনাইট নামক লৌহাশ্রিত বালিতে একটি নূতন ধাতুর অবস্থিতি প্রথমে প্রচার করেন। এই ধাতুর নামকরণ হয় মিনাকিন (Kirwan)। তার পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুটিল (Rutile, TiO_2) নামক খনিজ পদার্থে এবং অতঃপর ইউরাল পর্ব্বতশ্রেণীর ইলমেন পর্ব্বতে প্রাপ্ত ইলমেনাইট (Ilmenite, $FeO.\ TiO_2$) নামক খনিজ পদার্থের পরীক্ষার ফলে ক্লেপ্‌রথ (Klaproth) তাঁহার নবাবিষ্কৃত টাইটেনিয়াম ও মিনাকিন একই ধাতু বলিয়া প্রমাণিত করেন।

যদিও মূল টাইটেনিয়ম ধাতুর স্বাভাবিক অবস্থান কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি যৌগিক টাইটেনিয়াম ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানেই দেখা যায়। এমন কি, প্রাণিজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে ও ঝরণার জলে টাইটেনিয়ামের অবস্থান লক্ষিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস এইরূপ যে, কোন কোন মৃত্তিকার উর্ব্বরতা ইহার অবস্থানের ফল। রাজপুতানার কোন কোন অংশের উর্ব্বরতার কারণের মধ্যে ইহাও একটি হইতে পারে। আজমিরের নিকট খারোয়া (Kharwa) একটি ক্ষুদ্র স্থান। সেখানে অভ্রকাশ্রিত টাইটেনিয়াম এবং কয়লাজে প্রোথিত ইলমেনাইট (Platiform ilmenite in quartz) কোথাও কোথাও লক্ষিত হইয়াছে। জায়গাগুলিও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। যৌগিক টাইটেনিয়াম রুটিল (Rutile), ব্রুকাইট (Brookite), এনাটেজ (Anatase) রাসায়নিক হিসাবে দ্বিভাবাপন্ন টাইটেনিয়াম-অক্সিদ। ইলমেনাইট এবং আইছেরিণ (Iserine) রাসায়নিক হিসাবে লৌহক্ষারাশ্রিত টাইটেনিয়াম অক্সাইড ($FeO\text{-}TiO_2$) এবং স্ফিন (sphene) নামক খনিজ $CaO\text{-}TiO_2.\ SiO_2$. ও ইহা ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক জায়গায়ই অল্লাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা, ইউরাল পর্ব্বতশ্রেণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বল সাহেব বাঙ্গালা দেশের মানভূমে এবং রাজপুতনায় আলওয়ার প্রদেশে টাইটেনিয়াম অবস্থান উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে লৌহক্ষারাশ্রিত টাইটেনিয়ম খনির অবস্থান সুবিধামত জানা নাই †

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

† Ball—Economic Geology of India Ed 1881. পৃঃ 323-324.
Ball—Mem. Geol. Sur. India Vol XVIII, 1881 p. 43.
Hacket—Rec. Geol. Sur. India. Vol XIII, (1881) p. 248.

প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব মানভূম, ট্রেভেনকোর, কৃষ্ণগড় (রাজপুতনা) এবং দক্ষিণ-ভারতের অনেক নদীর বালিতে টাইটেনিয়াম অবস্থান সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিয়া বাধিত করিয়াছেন।

পাতিয়ালার ভূ-তত্ত্বসম্বন্ধীয় রিপোর্টে আমি সেই রাজ্যে টাইটেনিয়াম অবস্থানের সংবাদ পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতের কোন স্থানে কোথাও বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম অকসাইড পরিমাণ নিরূপণ কিংবা তাহার ব্যবহারে আনার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানগুলি ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও টাইটেনিয়াম থাকা সম্ভব। আলোয়ার রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত এম, কে, রায় আলোয়ারে ইলমেনাইট আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত রাজ্যে ও অপরাপর স্থানে হেকেট সাহেব রুটিল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার প্রথম এবং অনেক পরীক্ষাই রায় মহাশয়ের প্রেরিত ইলমেনাইট লইয়া আরব্ধ হয়। ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নাগ খারোয়াতে অভ্রকাশ্রিত বালিতে টাইটেনিয়াম আবিষ্কার করিয়াছেন; পরিমাণ হিসাবে তাহা অতি সামান্য। খরোয়ার সন্নিকটে করতজের (quartz) সহিত অবস্থিত আবিষ্কৃত চাটাল ইলমেনাইট এই হিসাবে বেশী মূল্যবান্। কারণ, বিশুদ্ধ ইলমেনাইটে টাইটেনিয়াম অক্‌সাইড পরিমাণ শতকরা কিঞ্চিদধিক ৫২ ভাগ থাকার কথা। খারোয়া ইলমেনাইটে ৫৪—৫৬ ভাগ টাইটেনিয়াম রহিয়াছে। সম্প্রতি যোধপুর হইতে শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নাগ-প্রেরিত কোন কোন খনিজ পদার্থে সামান্য টাইটেনিয়ামের সন্ধান পাইয়াছি। এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, টাইটেনিয়াম-মিশ্রিত বালি অনেক সময় স্বর্ণ অবস্থানের পরিচায়ক। আমরা খারোয়ার কোন কোন স্থানে পূর্ব্বেই স্বর্ণের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, টাইটেনিয়াম-খনি এ দেশে একান্তই বিরল নহে।

টাইটেনিয়াম ধাতু ও তাহার মিশ্র এবং যৌগিক পদার্থগুলির বিরলতার দুইটি কারণ বলা যাইতে পারে। একটি এই যে, খনিজ টাইটেনিয়াম বড় সহজে রাসায়নিকের আয়ত্বে আসে না অর্থাৎ জিনিষগুলি একটু অবাধ্য (refractory)। খনিজ টাইটেনিয়াম হইতে বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম অকসাইড প্রস্তুত করা সময় ও কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয় কারণ, টাইটেনিয়াম অতি অল্প দিন হইতে শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজিও বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম কেহই প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ মোয়সোঁর (Moissan) তাড়িত-চুল্লীর টাইটেনিয়ামই বিশুদ্ধ টাইটেনিয়মের কাছাকাছি। টাইটেনিয়ম ধাতুর পরমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) বহু দিন হইতে ভালরূপ পরীক্ষিত হয় নাই।

টাইটেনিয়ম ধাতু যবক্ষারজন, অম্লজন এবং কারবন (অঙ্গার) ইহার সকলের সঙ্গেই

যৌগিক পদার্থ গঠন করে। সেই হেতু বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম প্রস্তুত এত কষ্টসাধ্য। লৌহখনি কচিৎ সম্পূর্ণ টাইটেনিয়াম-বিরহিত থাকে, তাই যে ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম অংশ কিঞ্চিৎ অধিক, সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেরূপ হাপর চুল্লীতে (Blast furnace) লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবহারে ব্যাঘাত ঘটে। কেন না, এখানে টাইটেনিয়াম অঙ্গার ও যবক্ষারজন—এই দুইএরই সঙ্গে সংযোগে একরূপ অদ্রবণীয় (infusible) পদার্থের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কানাডার কমিশন (Canadian Commission) পরীক্ষার ফলে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এইরূপ লৌহখনি হইতে লৌহ উদ্ধার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়া বিভিন্ন দেশের এইরূপ অপর্য্যাপ্ত লৌহখনি সদ্ব্যবহারে আনিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। তার পর লৌহাশ্রিত খনিজ টাইটেনিয়াম* হইতে শুদ্ধ লৌহ উদ্ধার করাই উদ্দেশ্য রহিয়া যায় নাই। যতই টাইটেনিয়াম লইয়া পরীক্ষা হইতেছে, ততই ইহারও নানারূপ গুণ প্রকাশ পাইতেছে এবং উত্তরোত্তর তাহার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে টাইটেনিয়ম প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে, ইহা একরূপ স্থির-নিশ্চয়।

সকলেরই জানা আছে যে, ভারতীয় ইস্পাত (steel) এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় লৌহ-খনিতে টাইটেনিয়মের অবস্থানই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।* সাধারণ বেসেমার ইস্পাতে সামান্য একটু টাইটেনিয়াম (শতকরা ০.৫ হইতে ১ ভাগ) সংযোগে শতকরা ৬০ হইতে ৭৫ গুণ পর্য্যন্ত সেই ইস্পাতের ভারবহতা (tensile strength) বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। এলুমিনিয়ম ধাতু এইরূপ শতকরা এক কি দুই ভাগ টাইটেনিয়াম সংযোগে ১৮ হইতে ২৬ টন পর্য্যন্ত ভারবহতা লাভ করিয়া থাকে। সামান্য একটু টাইটেনিয়াম এক দিকে অঙ্গার, অক্সিজন এবং যবক্ষারজন ইত্যাদির সঙ্গে সংযোজিত এবং অন্য দিকে লৌহাদি ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া একটি সমভাবাপন্ন (homogeneous) মিশ্রিত এবং যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে বলিয়াই বোধ হয়, এই অসাধারণ গুণ প্রদানে সক্ষম।† এখনও টাইটেনিয়াম ধাতুর প্রস্তুত-প্রণালী ব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা দুর্ম্মূল্যই রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, যৌগিক টাইটেনিয়ামও আজ কাল শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। টাইটেনাম্ ক্লোরাইড ($TiCl_3$) রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অক্সিজন বা তদ্ভাবাপন্ন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সহজেই সংযোজিত হইয়া টাইটেনিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাই ঐরূপ অবস্থাপন্ন কোন কোন দ্রব্যের পরিমাণ নিরূপণে ব্যবহৃত হইতেছে। টাইটে-

* Ball—Economic Geology of India. Ed. 1881. পৃঃ ২২৩।

† Blount and Bloxam—Chemistry for Engineers and Manufacturers, Vol I. Ed 1911, পৃঃ ২০৭, ২০২, ১৯১, ৩৫৩, ৩৫৫।

নিয়ম অক্সাইড (TiO) চিনা বাসনের উপর একরূপ স্থায়ী বাদামি বা হরিদ্রা রং ফুটাইতে সক্ষম, তাই ইহা এই ব্যবসায়েও কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে।

টাইটেনিয়াম সিকতা (Silicon) এবং রাঙ্গের জাতভাই। টাইটেনিয়মের যৌগিক পদার্থগুলি অতি সহজেই জলে বিশ্লেষিত হইয়া টাইটেনিয়াম ক্ষার বা অম্লের (একই পদার্থ দ্বিভাবাপন্ন) সৃষ্টি করে। এই টাইটেনিয়মক্ষার বা অম্ল কলয়ডেল (colloidal) অবস্থাপন্ন। পতনকালে এইরূপ 'কলয়ডেল' অবস্থাপন্ন পদার্থগুলি রং এবং চামড়ার ব্যবসায়ে বিশেষ আবশ্যকীয় এবং অনুকূল। টাইটেনিয়াম ক্ষার বা অম্ল অম্লাত্মক এরোমেটিক (aromatic) পদার্থগুলির ফেনোলিক (Phenolic) OHএর সঙ্গে সংযোজিত হইয়া বাদামি হইতে গাঢ় লাল রংএর সৃষ্টি করে এবং রংগুলিও পাকা। চামড়া পাকা করিতে সাধারণতঃ যে সব গাছের বল্কল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বহুলপরিমাণে অম্লাত্মক এরোমেটিক ফেনোল (aromatic phenols) বর্ত্তমান।

আমাদের দেশে চামড়ার ব্যবসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমি জানি, কোন কোন কারখানায় আজ কাল টাইটেনিয়ামের কোন কোন যৌগিক পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। তাঁহারা আজ কাল যাহার এক হন্দর (cwt) আন্দাজ ছয় কি সাত পাউণ্ড হিসাবে খরিদ করিতেছেন, তাহাতে হয় ত এক পঞ্চমাংশই মাত্র টাইটেনিয়াম ক্ষারভাগ রহিয়াছে। অথচ ইলমেনাইট—যাহাতে শতকরা কিঞ্চিৎ অধিক ৫২ ভাগ টাইটেনিয়াম ক্ষারভাগ থাকার কথা, তাহার দাম বেশী নয়। ফুট মিনারেল কোম্পানী পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এক শত কিলোগ্রাম (অর্থাৎ প্রায় দুই হন্দর) দুই পাউণ্ড চার শিলিং দরে দিবার জন্য মূল্যতালিকা পাঠাইতেছেন। বেশী পরিমাণে নিলে হয় ত আরও কম দরে দিতে রাজী হইবেন। ভারতবর্ষে যদি স্থানীয় ইলমেনাইট ব্যবহার করা যায়, তবে কি ইহা অপেক্ষা কম দরে পাইবার আশা করা যাইতে পারে না? অবশ্য সকল ইলমেনাইট সমান দরের হইতে পারে না। দর টাইটেনিয়াম ক্ষার পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। তার উপর এ ক্ষেত্রে টাইটেনিয়ম ক্ষার লৌহাশ্রিত থাকায় অনেক অসুবিধা এবং যাহাতে টাইটেনিয়মের যৌগিক পদার্থগুলি জলে সহজে গুলিয়া যায়, তাহাদিগকে সেই অবস্থায় আনিতে হইবে। এ সকল ব্যাপারেও খরচা পড়িবে। নিম্নে টাইটেনিয়াম ক্ষার পরিমাণ নিরূপণ এবং ইলমেনাইটকে জলে সহজে গোলা যায় অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগা অবস্থায় আনিবার উপায় দিতেছি।

যে সকল উপায়ে সাধারণতঃ টাইটেনিয়ামের পরিমাণ নিরূপিত হয় এবং টাইটেনিয়ামের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সকল প্রস্তুত করা হয়, তাহা এ প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিলাম না। Roscoe, Schorlemmer, Hall, Crooks, Thorpe প্রভৃতি খ্যাতনামা রাসায়নিকগণের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। পরিমাণ নিরূপণের যতগুলি প্রক্রিয়া দেওয়া আছে, তাহার সকলগুলিই সময়সাপেক্ষ এবং কেমিকেল সোসাইটির জারনালে প্রকাশিত খনিজ পদার্থের

বিশ্লেষণ-ভাগ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, এখনও টাইটেনিয়াম পরিমাণ নিরূপণ-ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আমাদের অজ্ঞাত আছে।

আমি যে প্রণালী অবলম্বনে ফল পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। খুব সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত ছাঁকিয়া-লওয়া ইলমেনাইট সদ্য দ্রবীভূত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম পাইরোসালফেট (Sodium or Potassium. pyrosulphate)এর সঙ্গে একটি প্লেটিনাম বাটীতে অতি আস্তে আস্তে গরম করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, ইলমেনাইট চূর্ণ সম্পূর্ণ গুলিয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহাতে কতটা দ্রবীভূত পাইরোসালফেট ঢালিয়া দিয়া পুনরায় কতক সময় গরম করিয়া দ্রব অবস্থায় রাখিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিবে। এক ভাগ ইলমেনাইট এইরূপ পূর্ণ দ্রবীভূত অবস্থায় আনিতে ২০ ভাগ পাইরো-সলফেট (pyro sulphate) (প্রথমে ১২ কি ১৪ এবং দ্বিতীয় বারে ৮ কি ৬) সংযোগ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তার পর বাটী ঠাণ্ডা হইলে শীতল জলের ধারা দিয়া ঐ সমস্ত বাটীস্থিত পদার্থ একটি কাচভাণ্ডে (beaker) আনয়ন করিতে হইবে। প্রতি একভাগ ইলমেনাইটের জন্য একশত ভাগ পরিশ্রুত জল যোগ করিয়া আস্তে আস্তে নাড়িয়া গরম করিলে সামান্য একটু শাদা বালি ব্যতীত আর সমস্তই জলে গুলিয়া যাইয়া পরিষ্কার দেখাইবে। ক্রমে বেশী গরম করিলে ফুটিতে আরম্ভ করিবার সময়েই জল ঘোলাটে হইতে আরম্ভ করিবে। এই সময় হইতেই টাইটেনিয়ম ক্ষার পতিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময় আস্তে আস্তে দুই একটি করিয়া সোডিয়াম থাওসালফেটের (sodium thiosulphate) দানা উহাতে সতর্কতার সহিত ফেলিয়া দিতে হইবে। জল প্রথমে বেগুনি রং ধরিয়া পরে পরিষ্কার শাদা হইবে। এ অবস্থায় ফিল্টার করিতে গেলে কতকটা টাইটেনিয়াম জলের সঙ্গে নিম্নে চলিয়া যায়, আবার বহুক্ষণ ধরিয়া জল ফুটাইতে গেলে টাইটেনিয়াম ক্ষারের সঙ্গে লৌহক্ষারও পাতিত হয়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যদি সোডিয়াম থাওসালফেট সংযোগ করিয়া দিয়া আবার তখনই তাহাতে অতি সামান্য টেনিক (tannic) অম্ল সংযোগ করিয়া দিয়া জল ফুটাইয়া লইয়া দুই চারি মিনিট রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে টাইটেনিয়াম ক্ষার ও তৎসঙ্গে কিছু গন্ধক সত্বরই কাচ-ভাণ্ডের নীচে একত্র জমাট হয়। এই অবস্থায় উপরোক্ত শুধু জলটুকু ফিল্টার করিয়া লইয়া, তৎপরে পাতিত টাইটেনিয়াম-ক্ষার দুই একবার শতকরা পাঁচ সাত ভাগ এসেটিক (acetic) অম্লযুক্ত জলদ্বারা ধুইয়া ফিল্টার করিয়া সর্ব্বশেষে ফুটন্ত জলদ্বারা ধুইয়া লইতে হইবে। তারপর সেই ভিজা ফিল্টার কাগজ শুদ্ধ টাইটেনিয়াম-ক্ষার প্লাটিনম বাটীতে জ্বালাইয়া লইয়া ওজন করিলে টাইটেনিয়াম-ক্ষার এবং বালির ওজন এক সঙ্গে পাওয়া যাইবে। তৎপর হাইড্রোফ্লোরিক অম্ল (Hydrofluoric acid) এবং একটু গন্ধকাম্ল যোগ করিয়া পুনরায় তাতাইয়া লইলে টাইটেনিয়াম ভাগের ওজন পাওয়া যাইবে।

এই উপায় অবলম্বন করিলে ইলমেনাইট বিশ্লেষণ-কার্য্য তিন ঘণ্টায় সম্পূর্ণ হইতে পারে।

লৌহ-অংশ অবশ্য সাধারণ উপায়েই পরিমিত হইবে। নিম্নে আমার পরীক্ষা-ফলের নমুনা প্রদত্ত হইল।

একটি পরীক্ষার ফল নিম্নে বিবৃত হইল ;—

মিশ্রিত লওয়া হইয়াছিল

TiO_2 —— ০'০৫৬৪৫ ———— ০'০৫৬৪৩

পাওয়া যায়

Fe_2O_3 —— ০'০৪১৬০ ———— ০'০৪১৮৪

আলোয়ার ইলমেনাইট

TiO_2 —— ৫০'০ ———— ৫২'০

SiO_2 —— ০'৬ ———— ১'২

FeO —— ৪৭'০ ———— ৫০'০

MnO ———— যৎসামান্য

খারোয়া চাটান ইলমেনাইট

TiO_2 —— ৫৪'০ ———— ৫৬'০

ইলমেনাইট যৌগিক পদার্থ, কি মিশ্র পদার্থ, তাহাতে মতদ্বৈত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না। আলোয়ার ইলমেনাইট অক্সিজনে কিংবা বাতাসে গরম করিলে শতকরা ৩'৫ ভাগ আন্দাজ ওজনে বৃদ্ধি পায়। আবার ammonium persulphate সংযোগে গরম করিলে শতকরা আন্দাজ ৫'৩ ভাগ ওজন বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে মনে হয়, FeO প্রথমতঃ Fe_3O_4 হয় এবং পরে Fe_2O_3 হয়। কার্য্যতঃ চুম্বকদ্বারা পরীক্ষা দ্বারা ইহাই দেখা গিয়াছে।

ইলমেনাইট ব্যবহারোপযোগী করিবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী আছে। তাহার তালিকা Auskunftsbuch für Chemische Industrieতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি নিম্নলিখিত উপায়ে ফল পাইয়াছি ;—ইলমেনাইট চামড়ার ব্যবসায়ে ব্যবহার করিতে ২০ ভাগ পাইরোসলফেট না লইয়া, ৮—কি বেশী পক্ষে ১২ ভাগ পাইরোসলফেট লইয়া দ্রব করিলেই যথেষ্ট হইবে। তার পর টাইটেনিয়াম ক্ষার পাতিত করিবার জন্য সোডিয়াম থিওসলফেট না দিয়া শুধু জল ফুটাইয়া কিছু বৃক্ষ-বল্কল-নির্য্যাস ঢালিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই চলিবে। এই প্রণালীতে প্রাপ্ত টাইটেনিয়াম-ক্ষার বেতস অম্লে (oxalic acid) সহজেই গলিয়া যায়। এই oxalate বিশুদ্ধ না হইলেও ইহার ব্যবহারে ব্যাঘাত ঘটিবে না। চর্ম্মে লৌহ-ঘটিত দাগ দূরীকরণে oxalic acid একটি অদ্বিতীয় পদার্থ। এমন কি, টাইটেনিয়াম-ক্ষার পাতিত না করিয়া সেই লৌহযুক্ত জলে oxalic acid ফেলিয়া চর্ম্ম রং করিতেও আমরা সফলতা লাভ করিয়াছি। Sodium Thiosulphateও লৌহ-দাগ নিবারণ ও নিরাকরণে সমর্থ। কিন্তু নানা কারণে Titanium oxalate ব্যবহারই প্রশস্ত।

দ্বিতীয় প্রণালী এইরূপ ;—সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত ইলমেনাইট এক, কি দেড় ভাগ সোডা কারবনেটের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আগুনে তাতাইয়া লইতে হইবে। পরে এই মিশ্রিত পদার্থকে চূর্ণ করিয়া জল এবং বেতসাম্লের সঙ্গে রাখিয়া দিলে টাইটেনিয়াম ভাগ সহজেই জলে গুলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সোডার ক্ষারত্ব ধ্বংস করিতে দাহজল ব্যবহার করিলে বেতসাম্লের খরচ আরও কমিয়া যাইবে। কোন্ অম্ল কতটা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা তাহাদের গঠন (formula) হইতে হিসাব করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের চর্ম্ম-ব্যবসায়ীদের একবার এইরূপ ভাবে ইলমেনাইট ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। খরচা হিসাব করিয়া দেখুন, কোন্‌টা সস্তা। আগ্রা তাজের নিকটে বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত শ্রীযুক্ত বি, এ, তাহের মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যে চামড়ার কারখানা আছে, সেখানে আমার প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে। তাই এত সাহস করিয়া এ প্রস্তাব সাধারণের নিকট আনিতেছি।

রেসম এবং সূতার কাপড় রং করিয়াও দেখিয়াছি। তাহাতেও ফল পাইয়াছি। পরিমাণ হিসাবে, বারখানা ভেড়ার চামড়া রং করিতে এক তোলা ইলমেনাইটে গাঢ় লাল রং পাইয়াছি। মরডেণ্ট (mordant) করিতে ইহার এক দশমাংশেও ফল পাইয়াছি।

উপরে লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থ এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত পদার্থগুলি তাহের মহাশয় তাঁহার কারখানায় পরীক্ষায় সুযোগ দিয়া তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধন করিয়াছেন।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া শেষ করিব। আমাদের বিদ্যালয়ে অর্থকরী রসায়নের (economic chemistry) স্থান নাই বলিলেই চলে। আমরা যাহারা নূতন পুস্তক লিখি, তাহাতে যদি অন্ততঃ দেশী জিনিষগুলির কি দাম এবং তাহা হইতে যে সব জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহারই বা কি দাম, কি হিসাবে সেই দাম হয়, এইরূপ ভাবে ছেলেদের শিক্ষা এবং চিন্তা করিবার বন্দোবস্ত করি, তবে বোধ হয়, ভাল হয়।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের ক্রিয়া*

[পূর্ব্ববর্ত্তী সূচনা]

অনুমান করা গিয়াছিল যে, যেরূপে এসিটোনকে কুলহরিণ খাওয়াইলে ক্লোরোফরম হয়, সেইরূপে nitro radical এর সংযোগে এসিটোন হইতে নাইট্রোফরম পাওয়া যাইতে পারে ; যথা,—

$$\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}> CO + HO.NO_2 \longrightarrow CH_3COOH + CH_3NO_2.$$

$$CH_3 NO_2 + HO.NO_2 \longrightarrow CH_2(NO_2)_2 + H_2O.$$

$$CH_2(NO_2)_2 + HO.NO_2 \longrightarrow H(NO_2)_3 + H_2O.$$

এই প্রক্রিয়ায় যে জল উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা মূল কার্য্যের ব্যাঘাত নিবারণার্থ শুষ্ক ডেলা ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করা গিয়াছিল। আরও গন্ধকাম্ল বর্ত্তমানে বিচ্ছেদশীল নাইট্রোফরমের সহিত নেত্রিক অম্লের ক্রিয়ার দ্বারা চারি নাইট্রোমিথেন (nitromethane) গঠনের একটি উপায় আছে এবং পূর্ব্বে প্রয়োজন হইলে এই পন্থায় ইহা প্রস্তুত করা যাইত ; অতএব এ স্থলে অনুমান করা গিয়াছিল যে, যদি গন্ধকাম্লের কার্য্য ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তবে অবশেষে নাইট্রোফরম হইতে চারি নাইট্রোমিথেন প্রস্তুত হইতে পারে। বস্তুতঃ শেষোক্ত পদার্থটি এই অভিনব উপায়ে প্রস্তুত করিবার জন্য এই অনুসন্ধান আরম্ভ করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে জল নিষ্কাশন করিবার জন্য গন্ধক দ্রাবক ব্যবহৃত হইতে পারে না ; আরও আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের পরিবর্ত্তে অপর কোন জলনিষ্কাশনকারী দ্রব্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক হইবে না।

এ বিষয়ে পূর্ব্বানুসন্ধানকারীদিগের গবেষণা পাঠ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটাই ইহার অনুরূপ নহে। ঐ সকল হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল হইবে। আর তাহা ছাড়া তাঁহাদের পরীক্ষাগুলির অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বেয়রেণ্ড এবং প্রিজ্ (১৮৯৩ ব্যারিষ্টে ২৬, ৮২৮) লিখিয়াছেন যে, এসিটোনের উপর ১'৩৭ গুরুত্বের নেত্রিক অম্লের অতি ভীষণ ক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে একটি ক্রমাগত বিচ্ছেদশীল তৈলবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আর প্রভূত পরিমাণে কারবণ এক-অক্সিদ, কারবণ

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

দ্বি-অক্সিদ, নেত্রজন অক্সিদসমূহ, আমোনিয়া, কাঞ্জিকাম্ল (acetic acid) এবং বেতসাম্ল (oxalic acid) জন্মাইয়া থাকে। আরও সেই সমস্ত গবেষণা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কেহই এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হইতে সুযোগ দেন নাই। কারণ, এই দুইটি দ্রব্য একত্র সংযোগ করিলেই যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহার ফলে জল উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা অবশিষ্ট নেত্রিক অম্ল জলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং প্রকৃত ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া উল্লিখিত দ্রব্যগণে পরিণত হয়। উপস্থিত পরীক্ষার মূলে ইহাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে, এসিটোনের উপর ঘন নেত্রিক অম্লের ব্যবহারে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ পদার্থ গঠিত হয়, তাহা চূড়ান্ত করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

একটি এক লিটার (liter) কাঁচ-কুম্ভে কিছু ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ও সামান্য এসিটোন এবং তদপেক্ষা একটু অধিক নেত্রিক অম্ল লইয়া বরফ ও লবণ মিশ্রণের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বেশ নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ অতি তীব্রবেগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। এত তাপ নির্গত হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ বরফ গলিয়া গরম জলে পরিণত হইয়াছিল। ভূরি ভূরি নেত্রিক ধূমে (nitrousfumes) এবং ক্লোরোপিক্রিন (chloropicrin)এর পরিচায়ক গন্ধে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পাঁশুটে বর্ণের সামান্য তৈলবৎ পদার্থ কুম্ভমধ্যে অনবরত বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়বীয় পদার্থসমূহে পরিণত হইতেছিল। কিন্তু প্রক্রিয়ার তীব্রতানিবন্ধন আশানুরূপ তৈলবৎ পদার্থ পাওয়া যায় নাই।

অনন্তর পরীক্ষা অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। কাঁচকুম্ভমধ্যে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ও নেত্রিক অম্ল রাখিয়া একটি ছিপিযুক্ত ফনেল দ্বারা একটু একটু করিয়া এসিটোন দিবার ব্যবস্থা হইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া অতি তীব্রবেগে নেত্রিক ধূম ক্রমাগত নির্গত হয়; ইহাকে কোন মতেই দমন করা যায় নাই। এইরূপে বিফলমনোরথ হইয়া এই পন্থাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় এই প্রক্রিয়ায়ও একটু তৈলবৎ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রকৃতি প্রায় একই রকম, রং লালচে হলুদবর্ণ, স্বচ্ছ এবং অতিশয় ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত। আস্তে আস্তে তাপ দেওয়ায় ১১২-১২০ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে প্রায় $\frac{১}{৬}$ ভাগ পদার্থ চোলাইয়া আইসে। চোলাইয়ের সময় অনবরত নেত্রিক ধূম নির্গত হয় এবং শেষের দিকে অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত হইয়া হঠাৎ সশব্দে বিস্ফোরিত হইয়াছিল।

উক্ত উপায়গুলির দ্বারা চূড়ান্ত নেত্রিক ক্রিয়া (nitration) হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রক্রিয়াগুলি এতই ভয়ানক হয় যে, তাহা সাধারণভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবিক বিপজ্জনক বোধে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। ষাট গ্রাম ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড এবং ৪০ সি সি এসিটোন একটি লিটার কুম্ভমধ্যে লইয়া একটি ছিপিযুক্ত ফনেল ও কাঁচের বাঁকান নলসহ ছিপির দ্বারা আবদ্ধ করিয়া জলের কলের নিম্নে রাখায় ক্রমাগত শীতল জলে ঠাণ্ডা হইতেছিল। সেই অবস্থায় ১০ সি সি সাধারণ নেত্রিক অম্ল ছিপিযুক্ত ফনেলের মধ্য

দিয়া ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ না হয়, মধ্যে মধ্যে ৫ সি সি করিয়া নেত্রিক অম্ল দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ অত অধিক প্রবল হয় নাই, সামান্য নেত্রিক ধূম নির্গত হইতেছিল।

ঠিক এইরূপ প্রবহমান জলে ঠাণ্ডা করাইয়া ১০০ সি সি এসিটোনের সহিত ২০০ সি সি নেত্রিক অম্ল মিশাইয়া দেখা গিয়াছিল যে, প্রক্রিয়া অতিশয় বিষম হয় এবং শেষে একটি উৎকট শব্দে বিস্ফোরিত হইয়া কুম্ভ প্রভৃতি সব একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এত অধিক দ্রব্য লইয়া এইরূপে কার্য্য করা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ লইয়া ১৭ বার পরীক্ষা করা হইয়াছে,—একবারও কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। যতক্ষণ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, বেশ একটু করিয়া নেত্রিক ধূম নির্গত হয়, আর ইহার সহিত কুলহরিণ ও নাইট্রোসিল্ ক্লোরাইডের (nitrosyl chloride) গন্ধও পাওয়া যায়। প্রক্রিয়া শেষ হইলে কুম্ভমধ্যস্থিত দ্রব্য প্রায় নিষ্ক্রিয় হইয়া দুইটি স্তরে বিভক্ত হয়। ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড বহু পরিমাণে দ্রাবণে আসিয়া নিম্ন স্তর গঠন করে এবং উপরে গভীর পাঁশুটে রংএর তরল পদার্থ থাকে। উপর স্তরটি নেত্রিক অম্ল এবং একটি ঝাঝাল তৈলবৎ পদার্থের মিশ্রণ। ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া এক বাটি (beaker) জলে আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিলে একটি অদ্রাবণীয় তরল পদার্থ নিম্নে পড়ে। দুই বার জলে ধুইয়া স্বতন্ত্র করিয়া ডেলা ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড দ্বারা জলশূন্য করা হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন নমুনার দগ্ধ বিশ্লেষণ (combustion analysis) দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এইরূপে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা একের অধিক যৌগিকের মিশ্রণ। ইহাকে চোলাই দ্বারা অংশীভূত করিতে চেষ্টা করায় প্রথমে কতকটা চোলাই হইয়া শেষে উৎকট শব্দে বিস্ফোরিত হইয়াছিল।

যদি নেত্রিক অম্লের মিশ্রিত স্তরটিকে স্বতন্ত্র করার পর জলে না ফেলিয়া পুনরায় নূতন নেত্রিক অম্ল ও ডেলা ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের সহিত রাখা হয়, তবে বেশ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। পূর্ব্ববৎ নেত্রিক ধূম, নাইট্রোসিল্ ক্লোরাইড এবং কুলহরিণ নির্গত হইতে থাকে। কিন্তু প্রক্রিয়া মোটেই তীব্র হয় না। কিছুক্ষণ পরে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড প্রক্রিয়া-সমুদ্ভূত জল নিষ্কাশন করিয়া নিজে দ্রাবিত হইয়া নিম্ন স্তর প্রস্তুত করে। সমস্ত ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড গুলিয়া গেলে আবার যদি উপর স্তরটিকে স্বতন্ত্র করিয়া নূতন নেত্রিক অম্ল ও ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের সহিত রাখা হয়, তবে এইরূপে দুই দিন ধরিয়া ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে নেত্রিক অম্লের প্রয়োগে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে দগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সমস্ত নমুনা প্রস্তুত হয়, তাহাদের পারমাণিক উপাদান (composition) প্রায় এক।

এই তৈলবৎ স্বচ্ছ পদার্থটিতে এক প্রকার অতিশয় তীব্র গন্ধ আছে, ইহার বাষ্প চক্ষে লাগিলে চক্ষু দিয়া জল নির্গত হইতে থাকে। ইহা জলে মিশে না, কিন্তু সুরাসার, ইথর, ক্লোরোফরম, বেন্জিন এবং কার্ব্বন দ্বি-সল্ফিদে অতি সত্বর গুলিয়া যায়। একটি ঘড়ীর

কাঁচের (watchglass) উপর এক ফোঁটা ফেলিয়া রাখিলে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে সমস্ত উড়িয়া ঘরের বাতাসে মিশিয়া যায়।

এই দ্রব্যে শতকরা ৪৮·৩৮ ভাগ ক্লোরিণ, ৮·৩০ ভাগ কার্ব্বণ এবং ১০·১০ ভাগ নেত্রজন আছে; সুতরাং ইহার সাংকেতিক নাম (formula) CCl_3NO_3 হয়। অবশ্য ইহার নির্দ্দেশন-সূত্র সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে কিছু ত্রিক্লোরোনাইট্রোমিথেন (tri-chloronitromethane) আছে; কিন্তু যদি ইহা থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত পারিমাণিক ভাগ (Composition) বজায় রাখিতে হইলে দ্বিক্লোরোনাইট্রোমিথেন (dichloronitromethane) $CCl_2(NO_2)_2$ অথবা দ্বিক্লোরোনাইট্রোমিথিলনাইট্রেট (di-chloronitromethylnitrate) $CCl_2(NO_2).(NO_3)$ এই দুইটি নূতন যৌগিকের একটিকে থাকিতে হয়।

তিন বৎসর অতীত হইল, এই অনুসন্ধানটি গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আজ কএক দিন মাত্র হইল, একটি যুক্তিযুক্ত কল্পনায় উপনীত হইয়াছি। বোধ হয়, তাহাই এই প্রক্রিয়ার সত্য সিদ্ধান্ত। আশা করি, অনতিবিলম্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধানের শেষফল প্রকাশিত করিব।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট

১৩১৭ সালের পৌষ মাসে এলাহাবাদপ্রবাসী পণ্ডিতপ্রবর অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর গৃহে একটি চতুষ্কোণ খোদিত লিপিযুক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। বহু পূর্ব্বে বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, মেজর বামনদাস বসু একখানি অতি প্রাচীন শিলালিপিযুক্ত পাষাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পাষাণখণ্ডের সম্মুখে চিত্রাবলী ও এক পার্শ্বে খোদিত লিপি আছে। সম্মুখে চতুষ্কোণ পাষাণ চারিটি সমান্তরাল সরলরেখা দ্বারা সাতটি অসমী কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে দুইটি প্রস্ফুটিত কমল অঙ্কিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে ও নিম্নে দুইটি দীর্ঘ কক্ষে দুইটি বক্রগতি রেখা অঙ্কিত আছে এবং অবশিষ্ট স্থানে প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্ম খোদিত হইয়াছে। বাম পার্শ্বের দীর্ঘ নাতিপ্রসর কক্ষ, মধ্যভাগে অপর একটি সরল রেখা কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটি কক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে বাম পার্শ্বের কক্ষটি ক্ষুদ্র পুষ্পরাশিতে পরিপূর্ণ এবং দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে কতকগুলি ঋজুগতি সরল রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। পাষাণের সম্মুখভাগের মধ্যদেশে একটি সুবৃহৎ সমচতুষ্কোণ কক্ষ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যদেশে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তমধ্যে একটি বৃহৎ অষ্টদল প্রস্ফুটিত কমল খোদিত আছে। কমলের বৃত্তাকার কোরকমধ্যে কোন মূর্ত্তি খোদিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃত্তের চতুষ্পার্শ্বে চারিটি "ত্রিরত্ন"। স্বর্গগত ডাক্তার জর্জ্জ বুলর[১] মথুরায় আবিষ্কৃত "আর্য্যপট্ট" বা "আয়াগপট্ট" বিবরণকালে এগুলিকে মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট "ত্রিরত্ন" বলিয়াছেন। চতুষ্কোণ কক্ষের প্রতি কোণে এক একটি খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখা অঙ্কিত হইয়াছে। বৃহৎ চতুষ্কোণ কক্ষে দাক্ষণ পার্শ্বের কক্ষটি পাঁচটি ক্ষুদ্র সরল রেখার দ্বারা ছয়টি ক্ষুদ্র সম-চতুষ্কোণ কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পদ্ম অঙ্কিত হইয়াছে।

পাষাণখণ্ডের যে পার্শ্বে খোদিত লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কঙ্করে পরিপূর্ণ ছিল। বালির পাথরে (Sand stone) কঙ্কর থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু কঙ্কর বালির পাথর অপেক্ষা শীঘ্র ক্ষয় হয়, সেই জন্যই প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিটির অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে। পাষাণখণ্ড ডাক্তার বামনদাস বসু কর্ত্তৃক ১৯০৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কোশাম গ্রামে একটি কুটীরের মৃণ্ময় প্রাচীরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোশাম গ্রাম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের স্থাপয়িতা সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ কর্ত্তৃক প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে[২]। অতীত যুগে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বহুপূর্ব্ববিস্মৃত শিবমিত্র নামক

---

১ Epigraphia Indica Vol. II, p. 311, p. I.

২ Cunuinghum's Archacological Survey Reports.

কৌশাম্বীরাজের ১২শ রাজ্যাঙ্কে বলদাস স্থবিরের অনুরোধে শিবনন্দির শিষ্য দেবপালিত নামক জনৈক জৈন অর্হৎগণের পূজার জন্য এই আর্য্যপট্ট স্থাপনা করিয়াছিলেন ;—

(১) সিধ (ং) রাজ্ঞো শিবমিত্রস স (ং) বছরে ১০,২ × × × × থম × × হকিয়ে।

(২) থবিরস বলদাসস নিবতন × × × × শিবন (ং) দিস আ (ং) তেবাসিস × × × ×

(৩) শ (?) দেবপালিতন আয়পটো থাপয়তি × × অরহ (৩) (পুজা) য়ে।

অনুবাদ,—"সিদ্ধ হউক, রাজা শিবমিত্রের দ্বাদশ সম্বৎসরে × × × × × × × × × × স্থবির বলদাসের অনুরোধে × × × × × শিবনন্দির শিষ্য × × × × দেবপালিতের আর্য্যপট্ট অর্হৎগণের পূজার জন্য স্থাপিত হইতেছে।"

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় জৈনগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এইরূপ বহু পাষাণখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ খোদিত লিপিযুক্ত। প্রাচীন খোদিত লিপিসমূহে এইগুলি "আয়াগপট্ট" নামে পরিচিত। এই সময়ে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান কালে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী কালে জৈন ধর্ম্মযাজকগণের সৃষ্টি বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত কোন মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মথুরা ব্যতীত ভারতের অপর কোনও স্থানে "আয়াগপট্ট" বা "আর্য্যাগ্রপট্ট" আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় একটি "আয়াগপট্টে"র বিবরণে ডাক্তার ফুরার (Dr Führer) বলিয়াছেন যে, উহা বেরিলী জেলার রামনগর গ্রামে প্রাচীন অহি-চ্ছত্র নগরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (Vincent A. Smith) বা ডাক্তার হেন্‌রীক্ লুডার্স (Heinrich Lüders) ডাক্তার ফুরারের কোনও কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। শিবমিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌশাম্বীরাজ শিবমিত্র ভারতের ইতিহাসে নূতন নাম। সাহিত্য-পারষদের পক্ষ হইতে ডাক্তার বামনদাস বসুর নিকট শিলাখণ্ডখানি ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। তখন তিনি জানাইয়াছিলেন যে, উহা এলাহাবাদের কোন স্থানে বা বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম-তুলসীর তৈল*

রাম-তুলসীর গাছ নাড়িলে বা হাতে ঘসিলে একটি উগ্র সুগন্ধ বাহির হয়। যাহাতে এত উগ্র গন্ধ, তাহা হইতে তৈল নিশ্চয় পাওয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া আমি ঐ গাছের রাসায়নিক পরীক্ষা আরম্ভ করি এবং ফলে ইহা হইতে অল্প আয়াসেই তৈল পাইয়াছি। গাছের পাতায়, ডালে এবং বীজে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তৈল পাওয়া যায়; তবে বীজে তৈলের পরিমাণ অধিক। এই তৈল কাঁচা গাছ হইতে লইতে হয়, কারণ, শুষ্ক হইয়া গেলে আর পাওয়া যায় না। ইহার দুইটি কারণ;—প্রথমতঃ তৈল অত্যন্ত চঞ্চল (volatile), সেই জন্য গাছ শুখাইবার সময় উহা উড়িয়া যায় এবং দ্বিতীয়তঃ যাহা থাকে, তাহা রঞ্জনজাতীয় একটি পদার্থে পরিণত হয়—উহা বাষ্পের সহিত যাইতে পারে না।

বীজ ঠিক পাকিবার সময় বীজ সমেত গাছ উঠাইয়া তির্য্যক্‌পাতন-যন্ত্রে পুরিয়া বাষ্প দ্বারা পাতন করিলে অতি শীঘ্র (অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই) সমস্ত তৈল বাহির হইয়া আইসে। উহা অতিশয় তরল ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের এবং ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। সরবাণের (lemongrass) তৈলের গন্ধের সহিত উহার গন্ধের অনেক সাদৃশ্য আছে।

২৫.৫° ডিগ্রি উত্তাপে তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৮৮৭২। ২৪.৫ ডিগ্রি উত্তাপে তির্য্যো-বর্ত্তনমান (refractive index) ৪০.°১২′। তৈল ধ্রুবতাপন্ন (polarised) আলোকরশ্মিকে বামধারে ঘুরাইয়া দেয়।—আপেক্ষিক ঘুরাইবার ক্ষমতা (specific rotatory power) ১০°. ১৪ ।

মিথাইল সাভিকল (methyl chavicol) প্রায় সর্ব্বজাতীয় তুলসীর তৈলে পাওয়া যায়। কোন তৈলের সুরাসারের দ্রাবণে লৌহযুক্ত ক্লোরাইড (ferric chloride) দিলে যদি গাঢ় নীল রং হয়, তাহা হইলে উহাতে মিথাইল সাভিকল আছে, বুঝিতে হইবে। এই তৈলে কিন্তু ঐরূপ প্রক্রিয়াতে নীল রং পাওয়া যায় না; অতএব ইহাতে মিথাইল সাভিকল নাই।

সোডিয়াম সালফাইট দ্রাবণ ও এক ফোটা ফিনলথ্যালিন দিয়া তৈল আলোড়ন করিলে গোলাপী রং দেখা যায়; সুতরাং তৈলে এলডিহাইড (aldehyde) আছে।

রসায়নবিৎ জানেন যে, সরবানের তৈলে সাইট্রাল (citral) আছে। সরবান ও রামতুলসীর তৈলের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা হেতু রামতুলসীর তৈলে সাইট্রাল আছে কি না তাহা পরীক্ষা করা হয়। শতকরা ২৫ ভাগ দাহজল মিশ্রিত জলে মারকিউরিক সালফেট দ্রাবণ করিয়া উহাতে এক ফোঁটা তৈল দিয়া জোরে নাড়িয়া দেখা গেল যে, রং লাল হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, রামতুলসীর তৈলেও সাইট্রাল আছে।

পাইরুভিক অম্ল ও বিটা-ন্যাপথলের সহিত তৈলের যে যৌগিক পদার্থ হয়, তাহা হইতে

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

জলে দ্রাবণ-ক্ষমতার তারতম্যানুসারে দুই প্রকারের স্ফটিক (crystal) প্রস্তুত হয়। উহাদের গলনোত্তাপ (melting point) নির্দ্দিষ্ট করিয়া জানা যায় যে, সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল (citronellal) উভয়ই এই তৈলে আছে।

পটাসিয়াম আইওডাইডের ঘন দ্রাবণে আইওডিন দ্রাবণ করিয়া এক ফোঁটা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিলে চক্‌চকে আঁইশযুক্ত আঠার ন্যায় একটা পদার্থ পাওয়া যায়; অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহাতে সিনিয়ল (Cineol) আছে।

চিনা-মাটীর পাত্রে দুই ফোঁটা তৈল, এক ফোঁটা ঘন লৌহদ্রাব ও এক ফোঁটা ঘন ফেরিক ক্লোরাইড দ্রাবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে গোলাপী রং হয়; ইহাই (limonene) লিমনিন থাকার প্রমাণ। ইহাতে অতি অল্প পরিমাণ থাইমলও আছে। ইহাতে কোনও প্রকার অম্ল পাওয়া যায় নাই। উত্তপ্ত করিলে অধিক ভাগ তৈলই ২০৫-২৩০ ডিগ্রির ভিতর পাতিত হয়।

৫ সি সি, তৈল, ১৯ গ্রাম সোডিয়াম সালফাইট ও ৭ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট জলে দ্রব করিয়া গলদেশে মাপ-করা হারসন ভাণ্ডে (Hirschon flask) বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ার পর জল দিয়া তৈল মাঝের দাগের মধ্যে আনিয়া একদিন রাখার পর দেখা যায় যে, ৩.৭৫ সি সি (অর্থাৎ ৭৫ ভাগ) তৈল জলে দ্রব হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তৈলে সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল একত্রে ৭৫ ভাগ আছে। এক্ষণে জলীয় ভাগ একটা অপেক্ষাকৃত বড় পাত্রে লইয়া ইথার ও বৃক্ষক্ষার দ্রবের সহিত নাড়িয়া রাখিলে ইথার উপরে ভাসিয়া উঠে; উহাকে পিপেট (pipette) দিয়া একটা পূর্ব্বতৌলীকৃত চিনামাটীর পাত্রে লওয়া হয়; ইথার তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় ওজন করিলে পূর্ব্বতৌলের সহিত যে পার্থক্য হয়, উহাই সাইট্রালের পরিমাণ।

পাত্রের ওজন	৪৯.৮	গ্রাম
পাত্র ও সিট্রলের ওজন	৫১.৬	"
সিট্রালের "	১.৮	"
উহার পরিমাণ	২.০৫	সি সি

অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ সিট্রাল ও (৭৫-৪১) = ৩৪ ভাগ সাইট্রোনেলাল আছে।

একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সিট্রালের জন্যই সরবানের তৈলের ব্যবসায় এত লাভজনক; আর কৃত্রিম ভায়লেট ফুলের আতর প্রস্তুতের একমাত্র উপাদানই উহা; সেই জন্য উহার মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। সিট্রোনেলালেরও বাজারে বেশ সুবিধা-জনক মূল্য আছে।

রামতুলসীর চাষ করিয়া তৈল প্রস্তুত করা অতি সহজ। ঐ তৈলই চালান দেওয়া যায় কিংবা উহা হইতে সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল প্রস্তুত করিয়াও চালান দেওয়া যায়; আর ইহাতে লাভও বেশ হইবে। কেহ যদি এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের লাভ হইবে এবং দেশেরও উন্নতি হইবে।

শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী

বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ*

ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণে পদবিন্যাস বা Syntaxএর বিশেষরূপ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইংরাজী ভাষায় বাক্য (sentence) রচনাকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট পদসমূহের প্রয়োগ করিতে হয়। পদসমূহের স্থান বিনিময় হইলে অর্থ-বিভিন্নতা ঘটে। "A man killed a tiger" এই বাক্যটির man পদটিকে tiger পদটির স্থানে এবং tiger পদটিকে man পদটির স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থ-বৈপরীত্য ঘটে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় এরূপ হয় না। শব্দসমূহের সহিত যথাবিধি কারক-বিভক্তির যোগ করিয়া এবং ধাতুসমূহের সহিত তিঙ্ বিভক্তির যোগ করিয়া বাক্যমধ্যে তাহাদের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিলেও এত অর্থ-বৈষম্য ঘটে না। "মনুষ্যো ব্যাঘ্রং জঘান," "মনুষ্যো জঘান ব্যাঘ্রম্", "ব্যাঘ্রং মনুষ্যো জঘান," "ব্যাঘ্রং জঘান মনুষ্যঃ," "জঘান মনুষ্যো ব্যাঘ্রম্," "জঘান ব্যাঘ্রং মনুষ্যঃ,"—এই বাক্য-সমূহের মধ্যে বিশেষ অর্থ-বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণে আমরা সাধারণতঃ শুনিতে পাই যে, সংস্কৃতভাষায় পদবিন্যাসের জন্য কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই—সুবন্ত বা তিঙন্ত হইলেই পদ হইল এবং পদের প্রয়োগ বাক্যমধ্যে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই করা যাইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র কতকগুলি সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের প্রয়োগেই অর্থবোধক বাক্য হয় না। অর্থবোধক বাক্য রচনা করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষায়ও কতিপয় নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে,—নতুবা সুচারু অর্থ-বোধ হইবে না। "আসীৎ পুরা মগধেষু পাটলিপুত্রং নাম মহানগরম্"—এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। এই একটি মাত্র বাক্য লইয়া আলোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে, অস্-ধাতু-জাত ক্রিয়াপদের বাক্যারম্ভে প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায় রীতিসিদ্ধ (idiomatic) ; তবে বাক্যারম্ভে প্রয়োগ না করিলে বাক্যান্তেও তাহার প্রয়োগ হইতে পারে ; কিন্তু এইরূপ ক্রিয়া-পদের অন্যত্র প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ (Un-idiomatic)। সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে অধিকরণ-কারকের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং কালবাচক ও স্থানবাচক অধিকরণের মধ্যে কালবাচকেরই প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। ইহারও অন্যথাচরণ সংস্কৃতভাষায় রীতিবিরুদ্ধ। আবার বিশেষ্য-পদের পূর্ব্বে বিশেষণ-পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ধৃত একটি উদাহরণ হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পদবিন্যাসের জন্য সংস্কৃত ভাষায়ও কতিপয় নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য ইংরাজী ভাষায় পদবিন্যাসের জন্য যত নিয়ম, সংস্কৃত ভাষায় তদপেক্ষা অনেক কম। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে পদবিন্যাসের জন্য কোনও বিশেষ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয় না।

অধ্যাপক আর্ল (Earie) লিখিয়াছেন যে, যে ভাষায় পদসাধনের (accidenceএর) জন্য

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Professor Earle has remarked that syntax varies inversely as accidence ; wherever we have an elaborate formal grammar, there we have a corresponding poverty of syntax ;

যত বেশী নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, সে ভাষায় পদবিন্যাসের (syntaxএর) জন্ম সেই পরিমাণে কম নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে এবং যে ভাষায় পদসাধনের জন্ম যত কম নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, সে ভাষায় পদবিন্যাসের জন্ম সেই পরিমাণে বেশী নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ পদসাধন-প্রণালী ও পদবিন্যাস-প্রণালী, এই উভয়ের মধ্যে একতরের যে স্থানে যে পরিমাণে উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে, অন্যতরের সে স্থানে সেই পরিমাণে অপকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। পদসাধন-প্রণালী সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, অন্য কোনও ভাষাতেই বোধ হয়, সেরূপ হয় নাই; সেই জন্যই সংস্কৃত ভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর এত শৈথিল্য। অন্য দিকে ইংরাজী ভাষায় পদসাধন-প্রণালী যেরূপ অপেক্ষাকৃত শিথিল, পদবিন্যাস-প্রণালীও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়। অতঃপর বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালী কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; তবে ইংরাজী ভাষার ন্যায় নহে। কিন্তু অন্বেষণ করিলে "A man killed a tiger"এর সদৃশ বাক্যও বঙ্গভাষায় কচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

"হেরিয়া সেই মুরতি স তী ছাড়ে নিজ প তি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।"—চণ্ডীদাস।

নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের বিবিধ রূপের তুলনা করিলেও বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর অস্তিত্বের উপলব্ধি হইবে।

১। এইখানে গাড়ী আ ব শ্য ক হ ই লে থামিবে (অপেক্ষা করিও) এবং আ ব শ্য ক হ ই লে এইখানে গাড়ী থামিবে।

২। আ মা দি গে র দু র্ভা গ্য ক্র মে অকালে পরলোকগত ৺চণ্ডীচরণের নামে স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল এবং অকালে পরলোকগত ৺চণ্ডীচরণের নামে স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ আ মা দি গে র দু র্ভা গ্য ক্র মে উৎসর্গীকৃত হইল।

৩। করিয়া যাহার না শ, জীবনে না করি আ শ। এবং করিয়া যাহার আ শ জীবনে না করি না শ।—সারঙ্গ-রঙ্গদা। ইত্যাদি।

---

wherever we have little formal grammar, as in Chinese or English, there syntax comes prominently into view. This is only another way of stating the fact that in default of such contrivances as inflections, language has recourse to rules of position in order to denote the grammatical relations of words; and though Greek shows us that a highly developed accidence may exist along with an equally developed syntax, yet it is quite true that a language which makes such a large use of composition, as Sanskrit, must be very poor in the matter of syntax. Composition and syntax are antagonistic to each other, the study of comparative accidence, or, as it is rather loosely called, comparative grammar, is much in advance of that of comparative syntax; indeed it is very lately that comparative syntax has attracted the attention of philologists to any extent.

Sayce's Introduction to the Science of Language Vol II. p. 428.

এই সকল আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গভাষায় বাক্যারম্ভে কালবাচক ও তৎপরে স্থানবাচক অধিকরণ, তৎপরে কর্ত্তৃপদ, তৎপরে সম্প্রদান ও কর্ম্ম এবং তৎপরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ বিশেষ্য ও ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। সম্বন্ধ-পদ বিশেষণ পদের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ভাবের বাচক সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহ সন্নিহিত স্থানে প্রযুক্ত হয়। এই-গুলি বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর সাধারণ নিয়ম। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম রীতিসিদ্ধ নহে। অধিক আলোচনা করিলে বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর জন্য বহু নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যে কয়েকটিমাত্র লিপিবদ্ধ করা হইল। ব্যক্তি-বাচক সর্ব্বনাম (Personal Pronoun) একাধিক হইলে উত্তমপুরুষবাচক সর্ব্বনামের শেষে প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,—"তু মি আ মি হইলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতাম," "তি নি ও আ মি একত্র বাস করি" ইত্যাদি। যৎ শব্দের প্রয়োগ করিলে তৎ শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক,—"যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" যথা,—"তুমি য ত ভাল লোক, তা হা বুঝা গিয়াছে," "তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন, তা হা আমি জানিতাম না," "যা হা তিনি করেন, তা হা তে অন্য কাহারও কথা চলে না," য খ ন বিপদ্ আসে, ত খ ন নানাদিক্ হইতে নানারূপ অসুবিধা আসিয়া জুটে," "যে সকল দিক্ বুঝিয়া কাজ করিতে পারে, সে ই জ্ঞানী" ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়া প্রথমে ও সমাপিকা তৎপরে প্রযুক্ত হয় এবং সাধারণতঃ উভয়েরই এক কর্ত্তৃপদ হয়। * যথা,—"দেখিতে যাইব," "শুনিয়া আসিব" ইত্যাদি। "হইলে," "থাইলে" প্রভৃতি প্রাক্‌কালীনতা-জ্ঞাপক অসমাপিকা ক্রিয়া কর্ত্তৃপদের অব্যবহিত পরে প্রযুক্ত হয়; যথা,—"রাম আসিলে আমি যাইব," "চাঁদ উঠিলে অন্ধকার থাকিবে না," "প্রাণ বাঁচিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে" ইত্যাদি। বাক্যমধ্যে কোনও পদবিশেষ বা বাক্যাংশের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতে হইলে, সেই পদ বা সেই বাক্যাংশ এরূপ স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, শ্রোতার বা পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে; সাধারণতঃ বাক্যারম্ভে বা বাক্যশেষে প্রয়োগ করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যথা,—

"প দ্মে র মৃ ণা ল এ ক সুনীল হিল্লোলে।
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে॥"—হেমচন্দ্র
"যা হা র কু ক্ষি তে বি শ্ব, রহে তিলমানে।
সেই হরি সিন্ধুগর্ভে, তি ল মা ত্র স্থা নে॥"

"প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়,—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে যেন শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই দুঃখ চ ণ্ডী দা সে র ক বি তা য় ছ ত্রে ছ ত্রে।"— বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

---

* এককর্ত্তৃকেষু ক্ত্বমুন্।

অতঃপর নেতিবাচকের কথা। অস্তিত্ববিহীন বস্তু (negation or absence) ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, রসনা দ্বারা আস্বাদন করা যায় না এবং হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করা যায় না। সুতরাং এরূপ বস্তুর উপলব্ধি কেবল মাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হইয়া থাকে। কিন্তু মানসিক কল্পনারও একটা সীমা আছে। আমরা মনে মনে সুবর্ণপর্ব্বত বা অশ্বমুখ নরের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি, কিন্তু নীল-পীতাদি যে আটটি বর্ণের বিষয় আমরা অবগত আছি, তদতিরিক্ত নবম বর্ণের কল্পনা আমাদের সাধ্যাতীত। কারণ, মানসিক কল্পনা উপকরণের সাহায্যের অপেক্ষা করে, উপকরণ না পাইলে মন কিছুই গড়িয়া লইতে পারে না। আমাদের মন সুবর্ণ ও পর্ব্বত উভয় বস্তুর সহিতই পরিচিত; তাই সুবর্ণ-পর্ব্বতরূপ অস্তিত্ববিহীন বস্তুর কল্পনা সম্ভবপর। কিন্তু উপকরণাভাবে অষ্টম বর্ণের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অস্তিত্ববিহীন কোনও বস্তুর কল্পনা করিতে হইলে অস্তিত্ববান্ কোনও বস্তুর কল্পনা আবশ্যক এবং অস্তিত্ববান্ বস্তুর সহিত তুলনা বা বৈপরীত্যের দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিপরীত বস্তুর সহিত তুলনায় আমরা তদ্বিপরীত বস্তুর কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু সে বিষয়েও অনেক বিঘ্ন। সসীমের উপলব্ধি দ্বারা অসীমের কল্পনা সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আজিও ঘোর সন্দেহ। সে যাহাই হউক, অস্তিত্ববান্ বস্তুর কল্পনা না হইলে অস্তিত্ববিহীন বস্তুর কল্পনা সম্ভবপর নহে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না। ভাব বস্তুর উপলব্ধি না হইলে অভাব বস্তুর উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। সৃষ্টির উপলব্ধি না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার উপলব্ধি হয় না; জন্মের উপলব্ধি না হইলে জন্মের পূর্ব্বাবস্থার উপলব্ধি হয় না এবং মৃত্যুর উপলব্ধি না হইলে জীবনেরও সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের সৃষ্টিকাণ্ডে (Genesis) লিখিত আছে, শূন্যমধ্যে ভগবদিচ্ছাক্রমে জল, স্থল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি বস্তু ও মানব প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদেও সৃষ্টির বিষয়ে একই কথা উক্ত হইয়াছে এবং সৃষ্টির পর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সহিত তুলনায় শূন্যের কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে সেই বর্ণনা ও স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥

তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও

ছিল না; রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঋক°, ১০ম°, ১২৯সূ°।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইতেছে যে, অস্তিত্ববান্ বস্তুর উপলব্ধির পর মনুষ্য বৈপরীত্য দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তুর উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই অস্তিত্ববিহীন বস্তুর জ্ঞাপনের জন্য ভাষা নেতিবাচকের (Negativeএর) সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং নেতি-বাচক শব্দটিকে সময়বিশেষে বিপরীতার্থবোধকও বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় নেতিবাচক পদ সাধারণতঃ দুইটি,—ন এবং মা। এই দুইটি নেতিবাচক পদ ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে; যথা,—"ন গচ্ছেৎ,*" "মা কার্ষীঃ" ইত্যাদি। বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদের সহিত তিনটি নেতিবাচক উপসর্গ যুক্ত হইয়া থাকে,—ন, অ এবং অন্। যথা—নক্ষত্র, অদম, অনধিকার। এইগুলিকে ব্যাকরণে নঞর্থ পদ বা নঞর্থ উপসর্গ বলিয়া থাকে। এই নঞের ষড়্‌বিধ অর্থ; যথা,—

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই ষড়্‌বিধ অর্থের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) সাদৃশ্য,—অপদার্থ, অপথ, অমানুষ, অব্রাহ্মণ, অপাত্র। অভাব,—অক্ষুধা, অচিন্তা, অনবকাশ, অনবসর, অনভ্যাস। অন্যতা,—অকৃষ্ণ, অতথ্য, অলোহিত, অযথার্থ। অল্পতা,—অদূর, অনায়াস, অপটী (ক্ষুদ্র যবনিকা), অপূর্ণ। অপ্রাশস্ত্য,—অকথা, অকার্য্য, অকাল, অখাদ্য। বিরোধ,—অকল্যাণ, অকীর্ত্তি, অখ্যাতি, অধর্ম্ম, অনর্থ, অমিত্র, অলক্ষ্মী।

সংস্কৃত ভাষার "ন" বঙ্গভাষায় "না" আকার লাভ করিয়াছে;—কিন্তু প্রাচীন বঙ্গভাষায় "ন"-কারের প্রয়োগ হইত। "মা" অব্যয় বঙ্গভাষায় প্রযুক্ত হয় না। হিন্দী ভাষায় 'মৎ' আকারে ইহার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। পারস্য ভাষায়ও "মা" (ما) অব্যয়ের প্রয়োগ আছে এবং তাহা ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—ما کن (মা কন্), করিও না। সংস্কৃত ভাষার "ন", "অ" বা "অন্" উপসর্গ বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যথা,—

"ন"—নকিঞ্চন (অকিঞ্চন), নকুল (কুলবিহীন, মহাদেব), নক্ষত্র (ক্ষয়বিহীন, তারকা), নগ (গতিশক্তিহীন, পর্ব্বত), নচির, (অচির, শীঘ্র), নচেৎ, নতুবা, নদীন (অদীন, ধনী), নধর (পুষ্ট), নপাৎ (পৌত্র), ন পরাজিৎ (অপরাজিত), নপুংসক, নভ্রাট্ (দীপ্তিহীন মেঘ), নাক (দুঃখবিহীন স্থান, স্বর্গ), নাসত্য (ধ্রুব), নাস্তিক, ইত্যাদি।

"অ", "অন্"—অকড়িয়া (কপর্দ্দকবিহীন), অকথা (কুকথা, মন্দ কথা), অকাট্য,

* কিরাতে—"ন সংহতাস্তেষু নভিন্নবৃত্তয়ঃ প্রিয়াণি বাঞ্ছন্ত্যসুভিঃ সমীহিতুম্।"—১।১৯

(অখণ্ডনীয় 'যুক্তি'), অকাণ্ড (কুকাণ্ড, অঘটনীয় ব্যাপার), অকাজ (অসৎ কার্য্য), অকাল (অসময়, অপ্রকৃত বা অপ্রশস্ত কাল), অকাল কুষ্মাণ্ড (কার্য্যাক্ষম ব্যক্তি), অকাজিয়া, অকেজো (কার্য্যের অনুপযুক্ত), অকূল (কূলহীন), অকূল পাথার (অগাধ জল, অনন্ত সমুদ্র—"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে"), অখ্যাতি (অযশঃ), অঘাটী (নির্দ্দোষ)—"কুলে শীলে রূপে গুণে সকলে অঘাটী"), অঝর, অঝোর (অবিশ্রান্ত), অটুট (অভগ্ন, অক্ষত, সম্পূর্ণ, ত্রুটিবিহীন), অঠেল (প্রচুর), অথই, অথাই (অতলস্পর্শ), অথল (অতলস্পর্শ), অনন্ত (অসীম), অনটন, অনাটন (অপ্রতুল, অভাব), অনামুখ (অপ্রিয়দর্শন), অনাসৃষ্টি (সৃষ্টির বহির্ভূত, অদ্ভুত), অনিমিক, অনিমিখ (নিমেষশূন্য), অনীতি (কুরীতি), (অনুল, অভাব, অপ্রতুল—পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল, মহেশের সে ত নাই সকলি অনুল"), অপয়া (দুর্ভাগ্য, অলক্ষণযুক্ত), অপাক (অজীর্ণ), অফুরন্ত (অপর্য্যাপ্ত), অবুঝ (নির্ব্বোধ), অমানুষ (অতিমানুষ, অলৌকিক), অমায়িক (সরলহৃদয়), অলক্ষণিয়া, অলক্ষুণে (অশুভ লক্ষণবিশিষ্ট), অবেলা (অসময়, শেষ সময়), অসাড় (সংজ্ঞাবিহীন), অস্থির পঞ্চক, অস্থিত পঞ্চক (পাটীগণিতের অঙ্কবিশেষ, ধাঁধা, বিপদ্), অস্বস্তি (অসুস্থতা, অমঙ্গল)।

সংস্কৃত ভাষায় নঞর্থ "অ"-কার বঙ্গভাষায় বহু স্থানে "আ"-কারে পরিণত হইয়াছে;* যথা,—

আকাঁড়া (সতুষ), আকড়িয়া (কপর্দ্দকবিহীন, মূল্যবিহীন), আকাট (অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ), আকাটা (অখণ্ড), আকামা (অমুণ্ডিত, সদন্ত 'সর্প'), আকাল (দুঃসময়, দুর্ভিক্ষ), আক্রা (অক্রেয়, দুর্মূল্য), আগণা (অগণিত, অসংখ্য), আগাছা (ক্ষুদ্র বৃক্ষ), আঘাট, আঘাটা (কুঘাট, স্নানাদির অযোগ্য ঘাট), আচালা (অচালিত, মোটা 'চাউল'), আছোলা (অপরিস্কৃত), আজানা (অজ্ঞাত, অপরিচিত), আঝাল, আঝালা (কটুরসবিহীন), আদেখা (অদৃষ্ট), আধন (অপ্রকৃত ধন, অস্থায়ী,—"নারীর যৌবন কেবল আধন যেমন জলের ফোঁটা"), আধোয়া (অধৌত), আলন, আলুনো, আলোণা (লবণবিহীন)।

পারস্যভাষায় নেতিবাচক "ন" উপসর্গ না (نا) আকারে পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—†

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
نا استاد	না-ওস্তাদ	অনভিজ্ঞ
نا انجام	না-আঞ্জাম	সীমাবিহীন
نا انصاف	না-এন্‌সাফ	অন্যায্য, অভদ্র
نا آهار	না-আহার	অনাহারী

* আমার "প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটি বিশেষত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা।
† এই তালিকার বহু শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত।

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
نا بالغ	ন-বালিঘ্	অপরিণতবয়স্ক। বঙ্গভাষায় এই শব্দ "নাবালক" আকারে বিদ্যমান এবং স্ত্রীলিঙ্গে "নাবালিকা" আকার প্রাপ্ত হয়।
نا پسند	না-পসন্দ্	অপছন্দ, অমনোনীত
نا چار	না-চার্	উপায়বিহীন
نا راض	না-রাজ	অসন্তুষ্ট
نا طلب	না-তলব	অনাহূত
نا قابل	না-কাবেল	অনুপযুক্ত, ন্যূন
نا قبول	না-কবুল	অস্বীকার, পরিত্যাগ
نا لائق	না-লায়েক	অযোগ্য, অনুপযুক্ত
نا مرد	না-মর্দ্	অমনুষ্য, ভীরু। এই শব্দের অনুকরণে প্রাদেশিক "নামানুষ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।
نا مرضي	না-মরজী	অপ্রিয়, অবাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত 'নির্' উপসর্গের অনুকরণে বঙ্গভাষায় নঞর্থ 'নি' উপসর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—

নিকড়িয়া (নির্দ্ধন), নিকন্দিয়া (স্কন্ধবিহীন), নিকাম, নিকামিয়া (নিষ্কর্ম্মা), নিখুঁত (নির্দ্দোষ), নিখরচা (খরচবিহীন, কৃপণ), নিখাটু (নিষ্কর্ম্মা, অলস), নিছল (সরল), নিটুট (সম্পূর্ণ, অভগ্ন), নিটোল (সম্পূর্ণ, অক্ষত), নিদয় (নির্দ্দয়), নিনাড় (নিভৃত, অস্পৃষ্ট), নিবস্ত্র (বিবস্ত্র), নিভাঁজ (বিশুদ্ধ, খাঁটি), নিলাজ (নির্লজ্জ)।

পারস্তভাষায় বৈপরীত্য-অর্থ-বোধক বে بے উপসর্গের প্রয়োগ আছে। যথা,—

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ *
بے آبرو	বে-আব্রু	লজ্জাহীন, শরমহীন
بے إختياري	বে-এখ্তিয়ারী	উপায়হীনতা, অনধিকার
بے ادب	বে-আদব	অভদ্র, শিষ্টাচারবিহীন
بے ارام	বে-আরাম্	অস্বস্তিযুক্ত, অসুস্থ
بے اندازہ	বে-আন্দাজা	বে-আন্দাজ, অপরিমিত

* এই তালিকার অধিকাংশ শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত।

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
بے انصاف	বে-ইন্‌সাফ্	অ-ন্যায়পরায়ণ, অন্যায্য
بے ایمان	বে-ইমান্	অভদ্র, অধার্ম্মিক
بے باق	বে-বাক্	সমগ্র
بے باک	বে-বাক্	নির্ভয়
بے بنیاد	বে-বুনিয়াদ্	ভিত্তিহীন
بے پردہ	বে-পরদা	যবনিকাবিহীন, ঘোমটাবিহীন, নির্লজ্জ
بے پروا	বে-পার্‌ওয়া	নির্ভয়, অদম্য
بے تمیز	বে-তমীজ.	অনভিজ্ঞ, নির্বোধ
بے جواب	বে-জবাব	নিরুত্তর
بے چارہ	বেচারা	নিরুপায়, দরিদ্র, হতভাগ্য
بے حیا	বে-হায়া	নির্লজ্জ
بے خبر	বে-খবর	অজ্ঞ
بے خرچ	বে-খরচ্	যাহার খরচ নাই, দরিদ্র
بے دخل	বে-দখল	অধিকারচ্যুত
بیدستور	বে-দস্তুর	শিষ্টাচারবিহীন
بیزارہ	বে-জ়ারা	প্রতারণা
بے شرم	বে-শরম্	নির্লজ্জ
بے عزت	বে-ইজ্জত	অপমানিত
بے عقل	বে-আকল্	বে-আকেল, জ্ঞানহীন, নির্ব্বোধ
بے قصور	বে-কসুর	নির্দ্দোষ, নিরপরাধ
بیکار	বে-কার	নিষ্কর্ম্মা
بے مالک	বে-মালেক	অধিকারিবিহীন
بے نام	বে-নাম	সংজ্ঞাহীন Anonymous
بے وقوف	বে-ওকুফ্	বেকুব, নির্ব্বোধ
بیهوش	বে-হোশ	বেহুঁশ, সংজ্ঞাহীন

পারস্যভাষায় এই بے বে উপসর্গের সংশ্রবে সংস্কৃত 'বি' উপসর্গ হইতে বঙ্গভাষায় বৈপরীত্যবোধক "বি" উপসর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। উদাহরণ,—

বিকাল (অসকাল, অপরাহ্লসময়), বিগোছ (বিশৃঙ্খল), বিজাতি (কুজাতীয়, বিশ্রী), বিঢপ (বিশ্রী, অসুগঠিত), বিধারা (কুধারা, কুরীতি), বিজোড় (অযুগ্ম)।

উদ্ধৃত উদাহরণসমূহ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, আর্য্যভাষাসমূহে নঞর্থ উপসর্গ-সমূহ (ন, نا, অ, অন্, আ, بے ও বি) যে সকল বিশেষ্য বা বিশেষণের বৈপরীত্য বা অভাব প্রকাশ করে, তাহাদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই উপসর্গসমূহ আর্য্যভাষাসমূহে গুণবাচক শব্দের (qualifying word) ন্যায় ব্যবহৃত হয় *। এই স্থানে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পারস্যভাষায় বিশেষণপদ সাধারণতঃ বিশেষ্যপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং কচিৎ পূর্ব্বেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—

বিশেষণপদের অন্ববস্থানের উদাহরণ (সাধারণ) ;—

মূল পদদ্বয়	উচ্চারণ	অর্থ
مرد نیک	মর্‌দে নেক্	ভালমানুষ
مردان دلاور	মর্‌দানে দিলাবর্	সাহসী মনুষ্যগণ
عمر دراز	উম্‌রে দরাজ্	দীর্ঘ জীবন
عمر هائے دراز	উম্‌র্‌হায়ে দরাজ্	দীর্ঘজীবন সকল
بازوے سخت	বাজুয়ে সখ্‌ত্	শক্তিমান্ বাহু
بازوان سخت	বাজুবানে সখ্‌ত্	শক্তিমান্ বাহুসকল
بندۂ وفادار	বান্দায়ে ওফাদার্	বিশ্বাসী ভৃত্য
بندگان وفادار	বান্দগানে ওফাদার	বিশ্বাসী ভৃত্যসকল

বিশেষণ-পদের প্রাগবস্থানের উদাহরণ (বিরল) ;—

মূল পদদ্বয়	উচ্চারণ	অর্থ
خوب آدم	খুব্ আদম্	উৎকৃষ্ট মনুষ্য
سیاه جامه	সিয়া জামা	কৃষ্ণ পরিচ্ছদ
نیک مردان	নেক মর্‌দাঁ	ভালমানুষ সকল†

ইহা সত্ত্বেও যখন দেখা যাইতেছে যে, পারস্যভাষায়ও নঞর্থ উপসর্গসমূহের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভারতবাসী আর্য্যগণ ও ইরাণীয়গণ যখন একত্র বসবাস করিতেন, সেই অনৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই নেতিবাচকের অগ্রবস্থান ভাষায় প্রচলিত আছে।

* The Aryan began by placing the defining word before the word defined ; the Semite by placing it after ; just as in Burman the defining word precedes, while in Siamese or Tai it follows.

Sayce's Introduction to the Science of Language, Vol I, p. 429.

† J. T. Platt's Persian Crammar. pages 56 & 57, articles 37a & 37b.

অতঃপর ক্রিয়াপদের সহিত নঞর্থের অন্বয় আলোচিত হইবে। আমরা আর্য্যভাষাসমূহে সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে ;—কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহা নহে। বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদের পরে নেতিবাচক অব্যয় প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ নির্ণয়-চেষ্টাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদ হইতে যে সূক্ত ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, নেতিবাচক অব্যয় "ন" বা "নো" ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার অন্যথা হয় নাই। যথা,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥*—গীতা ২।২৩

সংস্কৃত কাদম্বরী হইতে গদ্যে নেতিবাচকের প্রয়োগ উদাহৃত হইল ;—

যত্র চ মলিনতা হবির্ধূমেষু ন চরিতেষু, মুখরাগঃ শুকেষু ন কোপেষু, তীক্ষ্ণতা কুশাগ্রেষু ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতা কদলীদলেষু ন মনঃসু, চক্ষুরাগঃ কোকিলেষু ন পরকলত্রেষু, কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু ন সুরতেষু, মেখলাবন্ধো ব্রতেষু নের্ষ্যাকলহেষু, স্তনস্পর্শো হোমধেনুষু ন বনিতাসু, পক্ষপাতঃ কৃকবাকুষু (ময়ূরেষু) ন বিদ্যাবিবাদেষু, ভ্রান্তিরনলপ্রদক্ষিণেষু ন শাস্ত্রেষু, বসু-সঙ্কীর্ত্তনং দিব্যকথাসু ন ধনতৃষ্ণাসু, গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েষু ন শরীরেষু, মুনিবালনাশঃ ক্রতু-দীক্ষয়া ন মৃত্যুনা, রামানুরাগো রামায়ণেন ন যৌবনেন, মুখভঙ্গবিকারো জরয়া ন ধনাভি-মানেন।—কাদম্বরী, পূর্ব্বভাগ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সংস্করণ, ১২৯২, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

ইংরাজী ও পারস্যভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন বঙ্গভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইত। কতিপয় উদাহরণ সংগৃহীত হইল।

চণ্ডীদাস হইতে,—

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
* * *
গোকুল নগরীমাঝে আর কত রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
বড়ু চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা।

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
কিবা অভিলাষে বাড়ায় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥
হেরিয়া মদন গেল সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে।

---

* বঙ্গানুবাদ,—অস্ত্রে নাহি কাটে অগ্নি না করে দহন।
জলে নাহি পচে আত্মা না শোষে পবন।
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত সারঙ্গরঙ্গদা, ২২ পৃঃ।

দেব উপজিল দেখিতে ন। পা ই ল
সুমতি ন। দি ল সেহ।

ধীরে ধীরে যায় চমকিয়ে চায়
ঘন ন। চা হে লাজে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে,—

ন। বো ল ন। বো ল নাগরী রাধা মোরে হেন দুষ্টবাণী।
ন। ক রি হ গোঠ সঘনে সেহো বোল ন। শু নি ল কানে।
ন। ক র ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলীবরে।
আল হের ন। জা ণো বাঁশীর শুধী।
কথাঁহো ন। পা ঘি ল কাহ্নের দরশনে।
এভোঁ না ই ল সে ত নান্দের পুত।
লাজ ন। বা স বুলিতেঁ হেন বচনে।
তবেঁ তোক ন। ছা ড়ি ব কাহ্নে।
তোরে মো ন। এ ড়ি বোঁ দূতী ল।
হেন কাম করিলেঁ না সি বোঁ* তোর পাশে।

শূন্যপুরাণ হইতে,—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি ছিল রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেউল দেহারা নহি পুজিবার দেহু।
মহাপুন্ন মাঝ পরভুর আর অছি কেউ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
পব্বত পাহাড় নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
সুন্ন থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আধার॥
বার বত্ত ন ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বারানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
সগ্‌গ মত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দস দিগ্‌পাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল যমর তাড়ন॥
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার॥
ছিধম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী॥

বিদ্যাপতি হইতে,—

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন। পা র।
কি কহি কি বলি কিছু বুঝই ন। পা রি।
যত বিছরিয়ে তত বিছর ন। যা ই।
কাঁপই দুরবল দেহ। ধরই ন। পা র ই কেহ।
নব অনুরাগিণী রাধা। কছু না হি মা ন য়ে বাধা।
বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছন না হি হে রি আন।
হাসি সুধামুখি ন। ক র বিজোরি (বিদ্যুৎ)।
ন। বু ঝ য়ে রতি-রসরঙ্গ। খণে অনুমতি খণে ভঙ্গ।
আপন রূপ লখই ন। পা র সু বাইতে পড়ল হোঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু কছু ন। বি চা র সু অব পাছু তরইতে চাই॥

* এইরূপ বহু স্থলে নেতিবাচক "না"র সহিত ক্রিয়াপদের সান্ধ হইয়াছে।

গোবিন্দদাস হইতে,—

ঘরমাহা রহই না পারি। ঘুবত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী॥
অরুণ উদয় ভেল না ভাঙ্গল নিন্দ।
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারই অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ।
বিপুল পুলক পরিপূরিত দেহা। নিজরসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ। কতিহুঁ না পেখনু ঐছন পরবন্ধ॥
গৌর প্রেমভরে চলই না পার।
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস।
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ না কর এমন ঢঙ্গ।

গদ্য সাহিত্য হইতে,—

" * * চন্দ্র কটাল জে জে বহুয়া ঘট দাসী, দুত নহি ডরায় তুমারে দেখিআ।

—শূন্যপুরাণ।

"যদ্যপি কোটি কোটি সাধক বর্ত্তমান তথাপি এমন রসাকর্ষণ শ্রীশ্রীজীউ ব্যতিরেকে অন্য দর্শন নাহয়।"—সহজিয়া সম্প্রদায়ের দাস্যাস্যষ্টভাবার্থ, বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড, ১৯০ পৃঃ।

"জ্বরের লক্ষণ—আগু হাই উঠে কপাল বেথা করে গা ভারি করে কমর অবশ হয় অরুচি হয় ববা (?) হয় কিছুক্রিকেই ইচ্ছা না ক্রিথাকে। জাড় করিতে থাকে। তবে জানিবে যেরূপ করিবেক বার্ত্তিক জ্বরে মহাকম্প হয় মল বন্ধ হয় পেট বেথা করে। নবজ্বরে যেমন যেমন করিব তার নিত—দিবসে নিদ্রা না যাবে। সিনান না করিবে। স্ত্রীসঙ্গ না করিবে। ক্রোধ না করিবে। পাচন ঔষধ না খাইবে সকল জ্বরের উপবাস করিবে। অপরের জ্বরের উপবাস না করিবে। কাম হইতে ভয় হইতে ক্রোধ হইতে ভ্রম হইতে কেবল বাই হইতে এসব জ্বরে উপবাস না করিবে। মুথা গোলঞ্চ বিরতি কন্টিকারী গোমুরি সালপানি চাকুল্যা স্থুন্টি সংপ্রতি ৮ মাসা পদকে ছিচিয়া পাণি দিয়া সানিবে এক মেন বাধিবেক ইহা খাইতে দিবেক। ইহার নাম বাতারি পাচন। পিত্তজ্বরে বেগ হয়। তৃষা হয় অতিসার হয় নিদ্রা না হয় বান্তি হয়ে গলা ওষ্ঠ মুখ যুকাতে থাকে ওষ্ঠে থাকে ঘাম হয়।"—"পাচন-সংগ্রহ" নামক আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধৃত। বিশ্বকোষ, ১৮শ ভাগ, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় বর্ত্তমান কালেও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গভাষা, মরাঠী ভাষা ও কাশ্মীরী ভাষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই তিন ভাষায় নেতিবাচকের অন্ববস্থান হইয়া থাকে। অধ্যাপক গ্রীয়ারসন-সম্পাদিত "Specimen translations in various Indian Language" নামক গ্রন্থ হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে নেতিবাচকের প্রাগবস্থানের উদাহরণ সংগৃহীত হইল। এই গ্রন্থে The parable of the prodigal son নামক বিখ্যাত গল্পের বিবিধ ভাষায় অনুবাদ আছে। নেতিবাচক চারিটি বাক্য উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা (সাহিত্য),—

(১) কেহই তাহাকে কিছু দি ল না। (২) আমি আর তোমার পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবার যোগ্য ন হি। (৩) সে ক্রুদ্ধ হইল এবং ভিতরে যাইতে চা হি ল না। (৪) তোমার কোনও আজ্ঞা লঙ্ঘন ক রি না ই, তথাপি তুমি কখনও আমাকে একটি ছাগবৎসও দা ও না ই, যে আমার বন্ধুগণকে লইয়া আনন্দ করি।

চট্টগ্রামী ভাষা,—

(১) আর কোন মানষ্যে তারে কিছু ন ই দ্দ। (২) আঁই আর আঁওনার পোয়া বুলি কহিত ন অ পা ই র্গ ম। (৩) তে গোস্বা হই ঘরত ন গে ল্। (৪) কোন দিন আঁওনার কথা অমান্য ন ক রি ব, তও আঁওনে আঁয়ার খাতিল্যা হওলের হগে আমোদ আহ্লাদ করনর লাই কোন দিন আঁয়ারে ওগ্‌গা ছাওলর ছা ন হ দে ন।

আসামী ভাষা,—

(১) তাক কেবে কিছু খাবলৈ নি দি লে।* (২) তোমার পুত্র নামেরে মতা হোআর আরু জোগ্য ন হ ওঁ। (৩) তাত পি খঙ্গ করি ভিতরলৈ জাব নু খু জি লে। (৪) কোনো কালত তোমার আগ্যা ভা ঙ্গা না ই, তথাপি সখি বিলাকর লগত রঙ্গ করিবলৈ মোক এটি চাগলি পোআলিও দি য়া না ই।

মৈথিলী ভাষা,—

(১) कोओ न हिं ओकरा किछु दै छ लै। (२) हम फेरि अपनेक बेटा कहाबैक योग्य न हिँ छी। (३) ओ क्रोध कैलन्हि आओर नहिं गैलन्हि। (४) कहिओ अपनेक आज्ञाकेर उल्लंघन न हिं कै ल आओर अपने हमरा कहिओ पाठिओ न हिं दै ल की हम अपना मित्र सभक संग आनंद कहित हुँ।

কনৌজী ভাষা,—

(১) काऊ जने ओरिकाँ न दीन्ह। (२) तोरे पुत्र नामतें परसिद्ध ह्वैबे लाउकु ना हि न आ हि उँ। (३) ओह रिसा नो तौ वा भीतर जान नाओ चह्यो। (४) तोरो हुकुमु कबऊँ ना जी उनाघो अक्याल तोहिं कबऊँ महिँकाँ याक छगल्लो नाओं दीन्ह जो महिं अपने मीतनकेरे संघ खुश्री करौं।

হিন্দী ভাষা,—

(১) कोई न हीं उसको कुछ देता था। (२) आपका पुत्र कहावने के योग्य नहीं हूं। (३) उसने क्रोध किया और भीतर जाने न चाहा। (४) कभी

---

* আসামী ভাষায় ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নেতিবাচক অব্যয় পরবর্ত্তী স্বরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত (umlanted) হইয়া যায়। যথা,—নিদিলে, নুশুনিবা, ন হয়, নুখুজিলে ইত্যাদি। আসামী ভাষায় স্থানে স্থানে নেতিবাচকের অস্বস্থান হয়।

आपकी आज्ञाको उल्लंघन न किया और आपने मुझे कभी एक मेम्ना भी न दिया कि मैं अपने मित्रोंके संग आनन्द करता।

রাজপুতানী ভাষা (বিকানীর),—

(১) कोणा लोग उने न दीना। (२) आवासंसु थारो डावड़ा नामे प्रतापिक होंण लायक न छुँ। (३) उ रीं सीयो वा माय बच्यां न चायो। (४) थारो आग्या कदे न लोपी लेर तें मनें कदे एक बकरीपिण न दीनी कें हुं आपका लंगोट्या मेलो षुसी करुं।

পাঞ্জাবী ভাষা,—

(১) कोइ ऊंकं कुछ नाहिं दान्दा। (२) अतें हुण ऊं लायक निम्हो जो वल तेडा पुत्र असवावां। (३) ऊं खुफा थो कराहो अंदर वंजण ना चाह्या। (४) कडांही तेडे हुकमकनुं बाहिर ना थो युम पिर तौं कड्रां हीं हिक बकरीदा बच्चा मैकूं नहिं डित्ता तांजो मैं आपणे दोस्तां नाल खुशी करां।

উৎকলীয় ভাষার উদাহরণ সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত হইল।*

"লর্ড ক্রান্ ষ্টোনঙ্কর সঙ্গে বিবাহসূত্ররে আবদ্ধ হোই পারু ন থি লে।"

"আঠ দশ জণঙ্কু বেশি ন আ সি ব।"

"অর্থ ন হেলে সম্মিলনী কিছি করি ন পা রে।"

"হিন্দু জাতি তাহা কদাপি সহ্য করি ন থা স্তে।"

উড়িয়া ও আসামী ভাষার ন্যায় গুজরাতী ভাষায়ও নেতিবাচকের উভয়বিধ প্রয়োগ হইয়া থাকে; অর্থাৎ নেতিবাচক অব্যয় কখনও কখনও ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ও কখনও ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল মাত্র বাঙ্গালা, মরাঠী ও কাশ্মীরী ভাষায় নেতিবাচক অব্যয় ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় স্থানে স্থানে পরবর্ত্তী ন-কারের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশ বা পদের অন্বয় হইয়া থাকে। যথা,—

"ন বাধোঽস্যোপজীব্যত্বাৎ প্রতিবন্ধো ন দুর্ব্বলঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্বিরোধো ন নাসিদ্ধিরনিবন্ধনা॥"—কুসুমাঞ্জলি, ৫।১

টীকা,—"ঈশ্বরে ধর্ম্মিণি শরীরবাধাৎ কর্ত্তৃত্ববাধো ন, ইত্যাদি।"

"বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো ন দুঃখৈকফলাপি বা।
দৃষ্টলাভফলা নাপি বিপ্রলম্ভোঽপি নেদৃশঃ॥"—কুসুমাঞ্জলি, ১।৮

টীকা,—'বিশেষাৎ পরলোকার্থিনাং স্বর্গাদ্যর্থং যজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তির্বিফলা ন, ইত্যাদি।"

---

* উৎকলীয় ভাষায় নেতিবাচকের অন্যস্থানও হইয়া থাকে। যথা—"সে অস্ত্র প্রকাশ করিবে নাহিঁ।" "ভয় আউ হোই নাহিঁ।" ইত্যাদি।

"যদুক্তং চৈতন্যস্য নিমিত্তকারণত্বে কার্য্যানুপ্রবেশো ন স্যাদিতি, তন্ন, কারণস্য কার্য্যানুপ্রবেশনিয়মস্য উপাদানকারণত্ববিষয়ত্বেন নিমিত্ত-কারণ-বিষয়ত্বাভাবাৎ, তৎসৃষ্টেত্যাদি শ্রুতেরপ্যুপাদানকারণপরত্বাৎ। যদপ্যুক্তমাত্মন উপাদানকারণত্বে প্রপঞ্চস্যানিত্যত্বং ন স্যাদিতি, ত দ পি ন, তস্য পরিণামবিষয়ত্বেন বিবর্ত্তবিষয়ত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বাৎ।"—বেদান্তসার-টীকা, নৃসিংহসরস্বতীকৃতা, ৪৬।

"ননু অপ্রাপ্তস্য ক্রিয়াসাধ্যস্য বস্তুনো বিদ্যমানাহ্নর্থনিবৃত্তেশ্চ পুরুষার্থত্বং দৃষ্টং তত্র তদভাবাৎ কথং পুরুষার্থত্বমিতি চে ন্ন, অনয়োরেব পুরুষার্থত্বমিতি নিয়মাভাবাৎ।"—ঐ, ১১৯।

"ননু জ্ঞানিনামপি স্বপ্নাবস্থায়াং দেহান্তর-স্বীকারবৎ মুক্তানামপি পুনর্দ্দেহান্তরস্বীকারঃ কিং স্যাদিতি চে ন্ন, কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশদিত্যাদি ব্যাক্যেষু কণ্ঠান্নির্গমনাভাবশ্রবণাৎ, দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তু তদন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যত্র দেহান্নির্গমনশ্রবণাদ্বৈষম্যম্।"—ঐ, ১১৯।

"নন্বেবং স্মৃত্তিসুখাদিস্মরণস্যাপি সুখাস্যংশে প্রত্যক্ষাপত্তিরিতি চে ন্ন। তত্র স্মর্য্যমানসুখস্যাহতীতত্বেন স্মৃতিরূপান্তঃকরণবৃত্তের্ব্বর্ত্তমানতয়া উপাধের্ব্ব্যবচ্ছিন্নকালত্বেন, তত্তদবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োর্ভ্ভেদাৎ।"—বেদান্ত-পরিভাষা।

"নন্বেবমপি স্বকীয়ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বর্ত্তমানৌ যদা শব্দাদিনা জ্ঞায়েতে তদা তাদৃশশব্দজ্ঞানাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, তত্র ধর্ম্মাস্যবচ্ছিন্নতদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যয়োরেকত্বাদিতি চে ন্ন। যোগ্যস্যাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ।"—বেদান্ত-পরিভাষা।

স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়কৃত বেদান্ত-দর্শনের বঙ্গানুবাদ হইতে কতিপয় বাক্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের উপর দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব প্রদর্শিত হইল।

"যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণরূপে কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণদৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এ ম ত ন হে। আত্মা শব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মা শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এ ম ত ন হে। লোক বৃক্ষশাখাতে কখন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎশব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এ ম ত না হ য়। সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এ ম ত ন হে। এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ শব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এ ম ত ন হে। বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এ ম ত ন হে। বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত হয় এ ম ত ন হে। বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এ ম ত ন হে। এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এ ম ত ন হে। বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এ ম ত ন য়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বোধ হয়, সংস্কৃত দর্শনের ভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক অব্যয়ের পরস্পর স্থান-বিনিময় ঘটিয়াছে। মারাঠী, কাশ্মীরী ও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের সম্পদে বিশেষরূপ সম্পন্ন এবং বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়দর্শন ও নবদ্বীপের প্রভাব এককালে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। নবদ্বীপের ভাষা বহুকাল বঙ্গদেশের ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল। নবদ্বীপের প্রভাব যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্যে নেতিবাচক অব্যয়ের অন্বয়স্থান অনুমোদিত হয়*। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক অব্যয়ের পরস্পর স্থানবিনিময়ের অন্য কোনওরূপ কারণ পরিদৃষ্ট হয় না।

অতঃপর অন্যান্য স্থলে নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগের উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। সমাস—নঞর্থ অব্যয়ের সহিত বহু স্থলে ক্রিয়াপদের সমাস পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। যথা—নয়, ন হয়, না হয়, নহে, না হও, নহো, নও, না হই, নহি, নই, না হইলে, নহিলে, নইলে, নারি, না পারি, নার, নারে, নোয়ারোঁ, নারিব, নারিবে, নারিবি, নারিল, নারিলাম, নারিলে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "নাসিবোঁ" (না+আসিবোঁ), "নাইল" (না+আইল) ইত্যাদি যুক্তক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ২। "যেন" বা "যদি" যুক্ত বাক্যে (subjunctive clause এ) ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—"যদি তিনি না আসিতেন, তাহা হইলে বিপদ্ ঘটিত," "তিনি যেন না আসেন"। ৩। অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" ব্যবহৃত হয়। যথা,—না হওয়ায়, না আসিলে ইত্যাদি। ৪। তুমন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বেও "না" ব্যবহৃত হয়। যথা,—"না আসিতে আসিতে", "আসিতে না আসিতে" ইত্যাদি। ৫। নিমিত্তবাচক অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—"না খাইবার উপায় নাই" ইত্যাদি। ৬। সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বাঙ্গালা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—"না মরা না জ্যান্ত" ইত্যাদি। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহু স্থলে পাদপূরণে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—

কত না। (বা) সহিব রে কুসুমশর-জালা।
কত না। রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না। বিহড়াইল।
কে না। বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না। কোন জনা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

* ১১৮১ সালের লিখিত ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ হইতে বিশ্বকোষ-সম্পাদক যে ভাষার আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ক্রিয়াপদের পরে "না" পদের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যথা,—"আকাশ জন্মে না," "মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না," "নতুবা রথমধ্যস্থ সারথির দর্শন বাহন্ন লোকদিগের হয় না।" ভাষাটিও আধুনিক।

১ম পট।

পবন-চক্র—১ম পট।

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

পবন-চক্র—২য় পট।

১
৪
বায়ু
৩
খুঁটী
খুঁটী

৩

নাগর চক্র

৪

নাগরচক্র

৫

শাকুন্ত চক্র

৬

মৎস্য

কপাট

পবনমান

৪র্থ পট।

৫ম পট।

পবন-চক্র—৬ষ্ঠ পট।

পবন চক্র—৭ম পট

Ergraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

পবন-চক্র—৮ম পট।

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros

পদাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

[১ম চিত্র, ৯৭ পৃঃ

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

ড্রু৽৭। .ঙ্ক স্বেকটি কথা। [২য় চিত্র, ৯৮ পৃঃ

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

ভ্রূণাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৩য় চিত্র, ৯৮ পৃঃ।

ভ্রূণাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৪র্থ চিত্র, ৯৮ পৃঃ।

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৫ম চিত্র, ৯৯ পৃঃ।
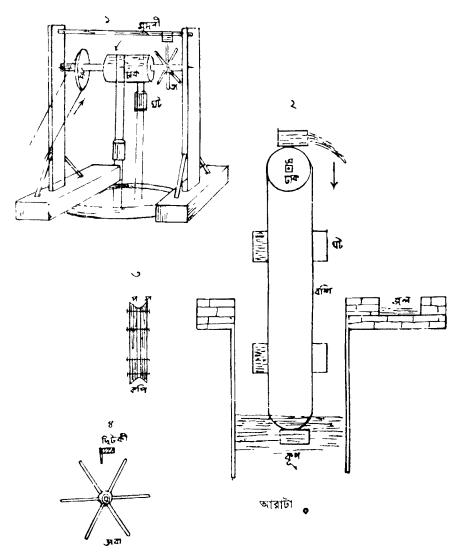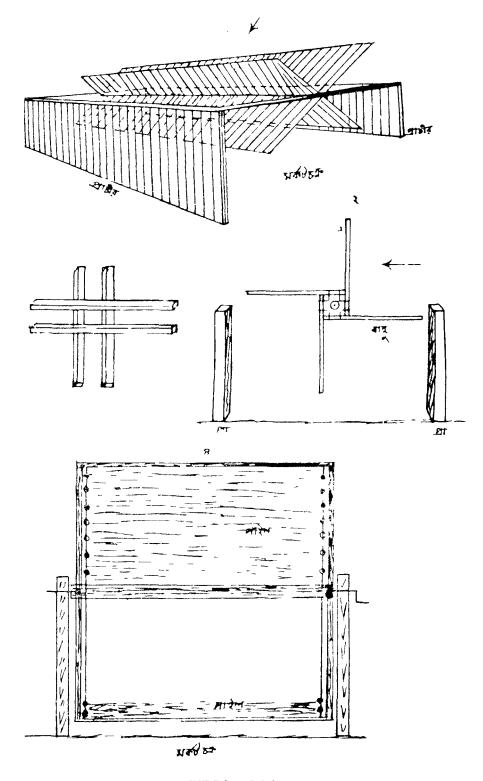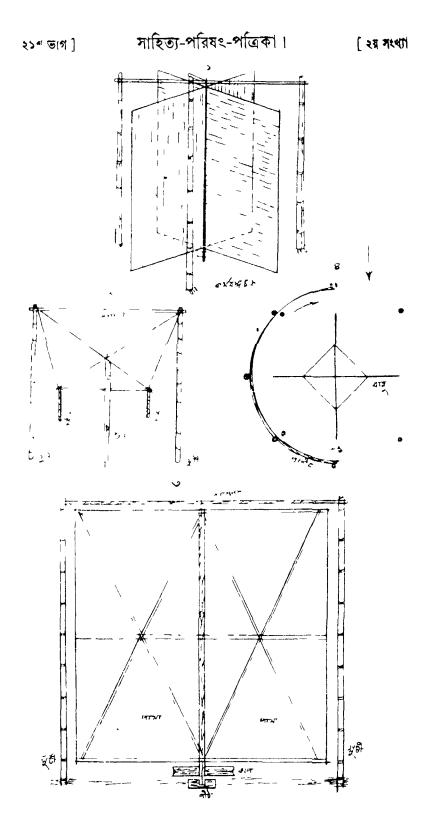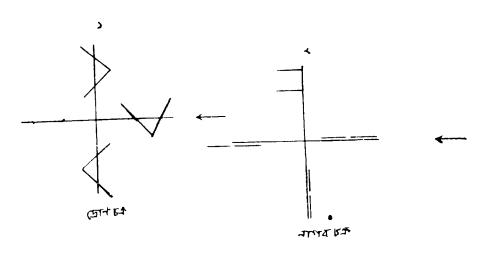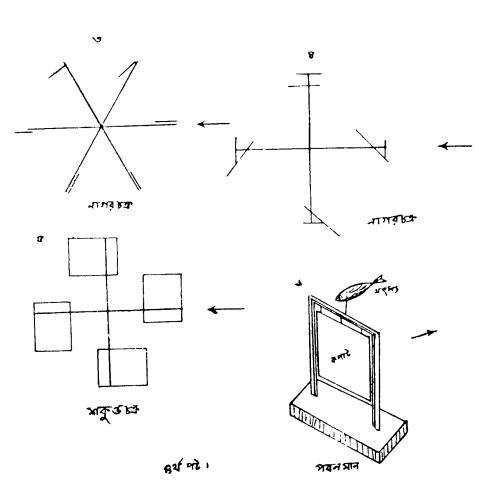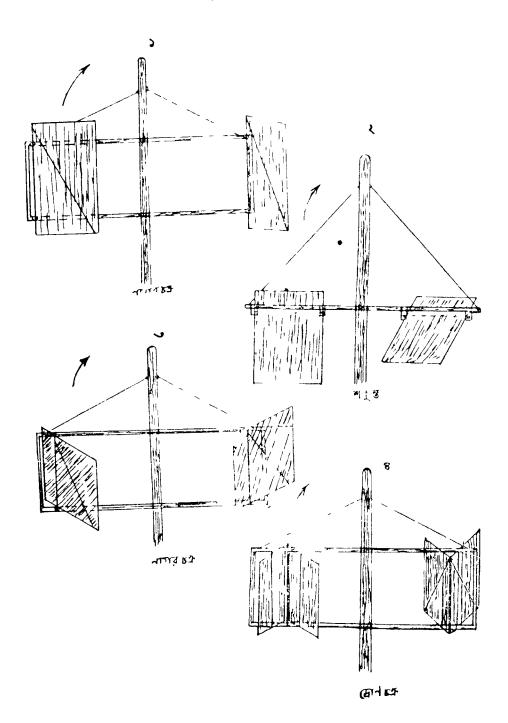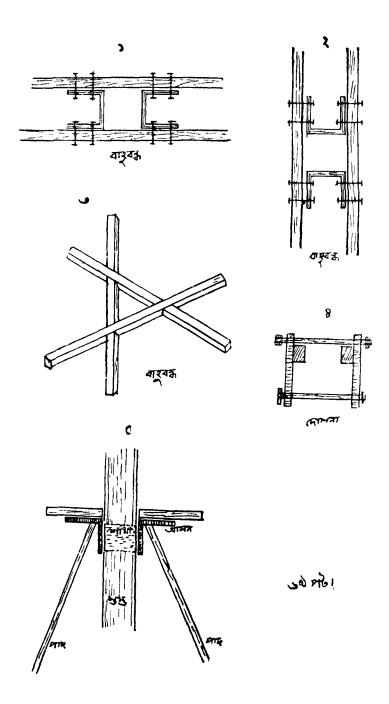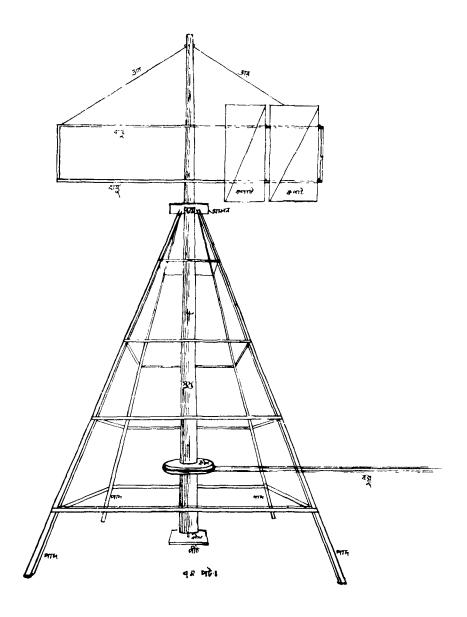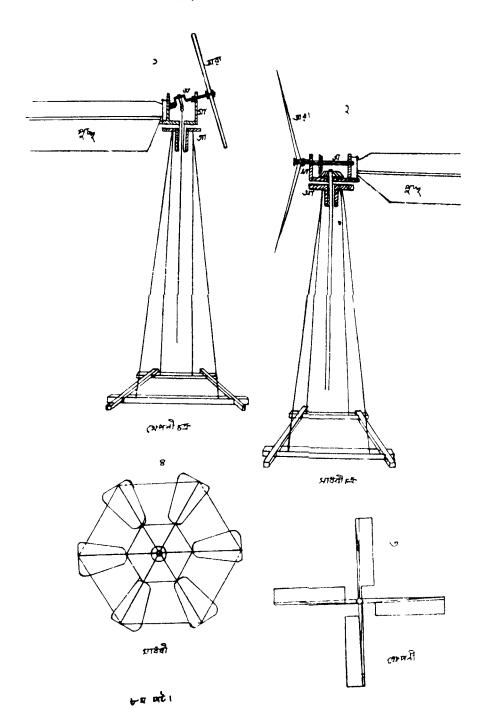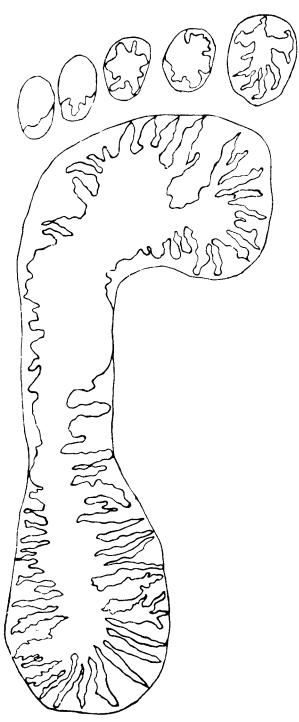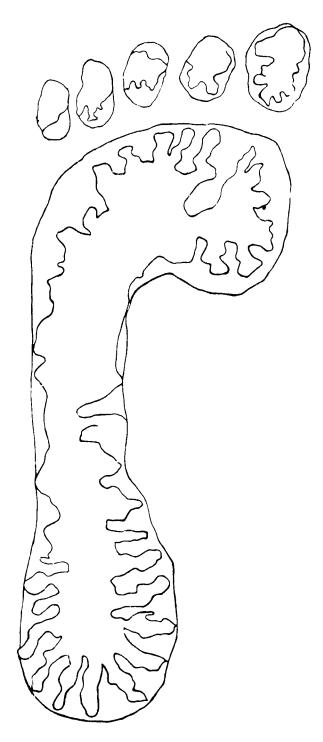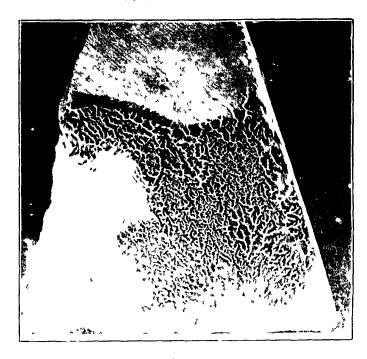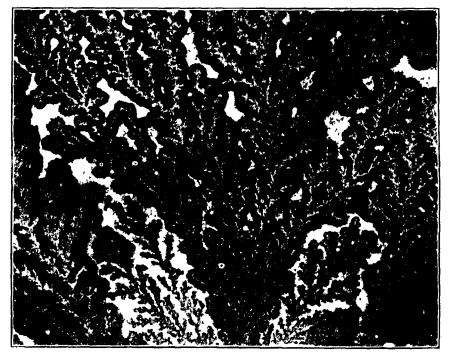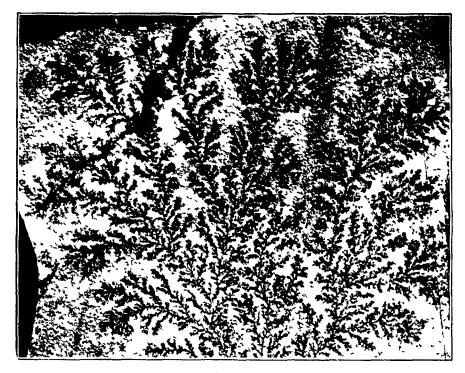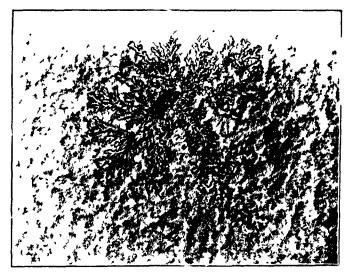
ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৬ষ্ঠ চিত্র, ১০০ পৃ.।

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ।

Engraved and Printed by K. V. Seyne & Bros

(৩)

১। কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট। ২। আর্য্যপট্টের খোদিত-লিপি। ৩। আর্য্যপট্টের মধ্যস্থল।
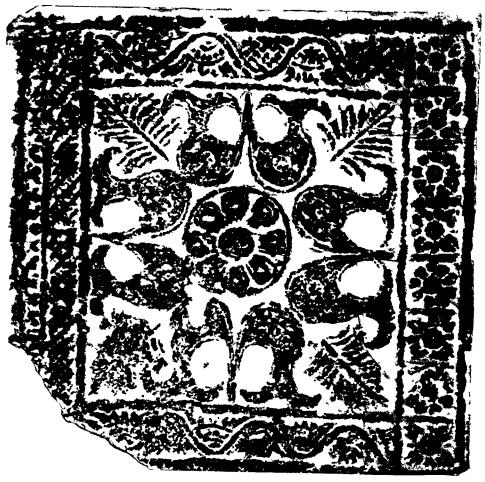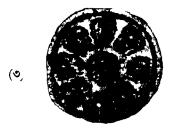
জ্যোতিষিক মানযন্ত্র*

(Universal Observer)

জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিতে বসিয়া পরিমাণগুলি নিজে নিজে করিতে না পারিলে তৃপ্তি লাভ হয় না। দেশে যে দুই একটি মান-মন্দির আছে, তাহা সাধারণের অনধিগম্য। বিশেষতঃ মফস্বলে এ অভাবটি বিশেষ তীব্র বলিয়া বোধ হয়। বিষুবাংশ (right ascension), ক্রান্ত্যংশ (declination), অক্ষাংশ (geographical latitude), দেশান্তর (geographical longitude), দিগংশ (azimuth), উন্নতাংশ (altitude), শরাংশ (celestial latitude), রাশ্যংশ বা ভুক্তি (celestial longitude)—এইগুলিই পরিমাণ করিবার সাধারণ ও প্রধান বিষয়। জ্যোতিষের প্রায় সমস্ত ব্যাপারই ইহাদের উপর নির্ভর করে। এইগুলি ও আনুষঙ্গিক সংস্কারসমূহ যথাসম্ভব শুদ্ধতার সহিত পরিমাণ করিবার জন্য বর্ত্তমান যন্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

সাধারণ জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, একটি যন্ত্র দ্বারা দিগংশ (altazimuth), নাড়ীবলয় (Equatorial), যাম্যোত্তর ভিত্তি (transit circle), থিওডোলাইট (theodolite) প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রের কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। এই জন্য স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার নামকরণ "Universal observer" করিয়াছিলেন। এই দয়ার জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ (right ascension ও declination) পরিমাণের জন্য অন্য যন্ত্রের ন্যায় ইহাতে জ্যোতিষ্কের খমধ্যরেখায় আসিবার অপেক্ষা করিতে হইবে না। মফস্বলে এবং কলিকাতায় ও অনেক কলেজে চৌম্বক ক্ষেপ (magnetic declination) পরিমাণের উপায় নাই ; কারণ, ইহা জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। বর্ত্তমান যন্ত্রদ্বারা তাহাও হইতে পারিবে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ইহা মানমন্দিরের অভাব কখনই মোচন করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্র বলিয়া সমস্ত পরিমাণগুলি করা হইতে সূক্ষ্মতরও হইবে না।

সাধারণের আয়ত্তাধীন হইতে পারিবে বলিয়া ইহার মূল্য যাহাতে অতি অল্প হয়, এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে ; এই জন্য ইহার আয়তনও যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করিতে হইয়াছে। আয়তন ছোট করায় আর এক দিকে উপকার হইয়াছে যে, অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারের জিনিষের মত ইহাকে স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য হইবে।

অবান্তর হইলেও এ স্থলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, আসাম গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ব্যয়ে ইহা

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে ও গৌহাটি সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যন্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে আমি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডি, এন মল্লিক, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট অনেক মূল্যবান্ উপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এ জন্য আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

গৌহাটীতে উপযুক্ত শিল্পীর একান্ত অভাববশতঃ প্রেরিত আদর্শটি নিতান্ত কুশ্রী ও কদর্য্য হইয়াছে। অংশবিশেষের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহ ইহার চিত্র এবং পিত্তল-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ সহ ব্যবহারোপযোগী একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার ভার বেঙ্গল কেমিকাল ফার্ম্মাসিউটিকাল কোম্পানীর উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ভরসা করি, আশানুরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইলে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত পরিমাণগুলি সাধিত হইতে পারিবে ;—

১। ভৌগোলিক যাম্যোত্তর রেখা বা ভূমধ্য-রেখা (geographical meridian)

২। অক্ষাংশ (terrestrial latitude)

৩। অপরত্রাংশ বা দেশান্তর (terrestrial longitude)

৪। দিগংশ (azimuth)

৫। উন্নতি বা উন্নতাংশ (altitude)

৬। বিষুবাংশ (right ascension)

৭। ক্রান্তি বা ক্রান্ত্যংশ (declination)

৮। শর (celestial latitude)

৯। রাশ্যংশ বা ভুক্তি (celestial longitude)

১০। চৌম্বক ক্ষেপ (magnetic declination)

১১। চৌম্বক নতি (magnetic inclination)

এতৎসহ প্রেরিত চিত্রে যন্ত্রের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রেরিত আদর্শের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আশা করি, ইহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। আদর্শে সমস্ত অংশ দিতে পারা যায় নাই। তথাপি যাঁহারা theodolite, altazimuth ও equatorial যন্ত্রাদি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অতি সহজেই বুঝিবেন। নিম্নে চিত্রের অংশগুলির বর্ণনা পার্শ্বে লিখিত অঙ্কসমূহের সাহায্যে বিবৃত হইল।

চিত্র (ক)

১। ত্রিপাদ-পীঠ (tripod stand)

১ক। ত্রিপাদ-পীঠের পায়া—(legs of the tripod stand)

ইহাদের নীচে স্ক্রু (levelling screw) আছে ; তদ্দ্বারা ত্রিপাদ-পীঠকে সমতল করিতে পারা যাইবে। সমতল হইল কি না, দেখিবার জন্য পীঠের উপর দুইটি spirit level পরস্পরের সহিত সমকোণ করিয়া রক্ষিত হইবে। আদর্শে ইহা দেখান হয় নাই।

২-৩। যুক্তপীঠ।

২ ক। কজা; এতদ্দ্বারা ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠদ্বয় সংযুক্ত রহিয়াছে।

২খ। বোল্ট বা কীলক; এতদ্দ্বারা ২ সংখ্যক পীঠের উত্তর দিকের প্রান্ত ত্রিপাদ বা ১ সংখ্যক পীঠে আবদ্ধ করিতে পারা যাইবে। এই কীলক ১ সংখ্যক পীঠের যে ছিদ্রমধ্য দিয়া নীচে গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০° অংশ পরিমিত; (আদর্শে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে)। ২ সংখ্যক পীঠ যখন ঠিক দক্ষিণোত্তর অভিমুখী হইবে, তখন এই কীলক দ্বারা ১ ও ২ সংখ্যক পীঠদ্বয়কে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে।

২গ। এই স্ক্রু দ্বারা ৩ সংখ্যক পীঠকে ২ সংখ্যক পীঠের উপর ক্রমশঃ উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়।

৩ক। ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণের পরিমাপক scale।

২ঙ। ৩ক সংখ্যক scaleএর অণ্বংশমান (Vernier)।

৫। দৃঢ় শূন্যগর্ভ দণ্ড (hollow cylindrical stand) ইহা ৩ সংখ্যক পীঠের উপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ও উহার সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থিত।

৪। একখানি গোল বৃত্তাকার প্লেট (plate), ইহার দুই দিকে ৪ক ও ৪খ সংখ্যক দুইটি দণ্ড। ৪খ অংশ আদর্শে দেওয়া হয় নাই।

৪ক। ইহা ৫ সংখ্যক শূন্যগর্ভ দণ্ডের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট।

৪খ। ৬ সংখ্যক অপর একখানি বৃত্তাকার প্লেটের কৈন্দ্রিক ছিদ্র (Central hole) মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইহাও আদর্শে নাই।

৬। বৃত্তাকার প্লেট; ইহার উপরিভাগ ৩৬০° অংশে বিভক্ত। সহজ করিবার জন্য ইহাও আদর্শে দেওয়া হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে ৪ সংখ্যক প্লেটেই অংশগুলি দেখান হইয়াছে। ৪ বা ৬ সংখ্যক বা উভয়েই ঘুরিবার সময় তদুপরিস্থ অংশাদি সহ ঘুরিবে।

৫খ। ৪ ও ৬ সংখ্যক প্লেটের অংশকলা পরিমাণের জন্য অণ্বংশমান।

৫ক। ৫ সংখ্যক দণ্ডের অভ্যন্তরে ৪ক সংখ্যক দণ্ডকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখিবার জন্য স্ক্রু।

৬গ। ৪ সংখ্যক প্লেটের উপর ৬ সংখ্যক প্লেটকে অতি অল্প পরিমাণে চালিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত।

৭। ৩৬০° অংশযুক্ত বৃত্তাকার প্লেট; ৬ সংখ্যক প্লেটের উপর ইহার সহিত সমকোণ করিয়া দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

৭ক। ৭ সংখ্যক প্লেটের অণ্বংশমান।

৭খ। ৬ সংখ্যক প্লেটের উপর লম্বভাবে অবস্থিত একটি দণ্ড।

৮-৯। ৭ ও ৭খএর মধ্যবর্ত্তী অক্ষ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। (এই দুই অংশ আদর্শে নাই)। ইহার উদ্দেশ্য, আবশ্যক হইলে ৯ সংখ্যক অংশকে ৯ক স্ক্রু দ্বারা স্থির

রাখিয়া ৯খ অংশের সাহায্যে অক্ষের ৮ সংখ্যক অপরাংশকে ধীরে পরিচালিত করা। অক্ষ, ঘুরিবার সময়, তদুপরিস্থ ১০ সংখ্যক দণ্ড, ১১ সংখ্যক প্লেট ও ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণ লইয়া ঘুরিবে। এই ঘুরিবার পরিমাণ ৭ সংখ্যক স্কেলে পাওয়া যাইবে।

১০। ৮ সংখ্যক দণ্ডের উপর লম্বমান ভাবে অবস্থিত দণ্ড।

১১। বৃত্তাকার ও ৩৬০° অংশে বিভক্ত আর একখানি প্লেট; ইহা ১০ সংখ্যক দণ্ডের উপর তাহার সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থিত।

১১ক। ১১ সংখ্যক প্লেটের অংশকলা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করিবার জন্য অনুংশমান (চিত্র খ)।

১২। দূরবীক্ষণ।

১১খ। ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণকে অল্প পরিচালিত করিবার জন্য স্ক্রু বন্দোবস্ত।

স্পিরিট লেভেল (spirit level) ও লেভেল করিবার স্ক্রুসমূহ দ্বারা ১ সংখ্যক ত্রিপাদ-পীঠকে (tripod stand) হরিজতল বা ক্ষিতিজতল (horizontal) করিলে চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায়, ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠ ৪, ৬ ও ১১ সংখ্যক প্লেট, ৮ সংখ্যক অক্ষ ও ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণ (horizontal) থাকিবে এবং ৫, ৪ক, ৭, ৭খ, ও ১০ সংখ্যক অংশসমূহ লম্বভাবে অবস্থান করিবে।

যন্ত্রবিন্যাস ও যাম্যোত্তরদিঙ্‌নির্ণয় (Setting the instrument and determining the Geomeridian) ;—প্রথমতঃ যন্ত্রকে চিত্রানুযায়ী ভাবে আনুমানিক উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী করিয়া বসাইয়া, ৯ক সংখ্যক স্ক্রু উন্মুক্ত করিয়া, ১১ সংখ্যক প্লেটকে ঘুরাইয়া লম্বভাবে এক পার্শ্বে আনয়ন করিতে হইবে। ৭ক সংখ্যক অনুংশমান ইহাতে ৯০ অংশ ঘুরিয়া আসিবে। এই অবস্থায় দুরবীক্ষণ ও ২ সংখ্যক পীঠ এক অভিমুখে থাকিবে। পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রধান প্রধান তারকা-সমূহের খমধ্য-রেখা বা যাম্যোত্তর-রেখায় (Meridian circle) পৌঁছিবার সময় নির্দ্দেশ করা আছে। তাহা হইতে কোন পরিচিত তারকার খমধ্য-রেখায় আসিবার সময় স্থির করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা দুরবীক্ষণের ক্ষেত্র (field of vision) মধ্যে উপস্থিত না হয়, তবে জানিতে হইবে, দুরবীক্ষণ ঠিক দক্ষিণোত্তর অবস্থায় নাই। এরূপ হইলে ২খ সংখ্যক কীলক উন্মুক্ত করিয়া ২ সংখ্যক পীঠকে ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া তারকাটিকে দুরবীক্ষণের ক্ষেত্রের মধ্যে আনিতে হইবে। যখন তারকাটি দুরবীক্ষণের মধ্যে আসিল, তখন বুঝা গেল যে, দুরবীক্ষণ ও ২ সংখ্যক পীঠ উভয়েই ঠিক উত্তর-দক্ষিণ রেখায় আসিয়াছে। এখন ২খ সংখ্যক কীলকটিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় ৭ সংখ্যক scaleএর সম্মুখ-ভাগ ঠিক উত্তর দিকে থাকিবে এবং ১১ সংখ্যক Scaleএর 0°—0° রেখা দক্ষিণোত্তর হইবে।

দিগংশ ও উন্নতাংশ (Azimuth ও Altitude) ;—১১ সংখ্যক প্লেট বা Scale

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও লম্ব অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ৯ক সংখ্যক স্ক্রু দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া ৫ক সংখ্যক স্ক্রু উন্মুক্ত করিতে হইবে। ৪ক হইতে উপরের অংশটুকু এখন অনায়াসে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারিবে। কোন তারকার দিকে এখন লক্ষ্য করিলে ১১ সংখ্যক Scaleএ উহার উন্নতাংশ ও ৬ সংখ্যক Scale উহার দিগংশ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

চৌম্বক ক্ষেপ ও নতি (Magnetic declination ও inclination) ;—১১ সংখ্যক স্কেলকে ক্ষিতিজতল করিলে উহার O°—O° রেখা ভৌগোলিক দক্ষিণোত্তর হইবে। চিত্র (খ)। ইহার উপর ১৩ সংখ্যক (চিত্র গ পৃথক্ একখানি অর্দ্ধবৃত্তাকার পিত্তলফলক স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারা যায়। এই পিত্তলফলকের উপর অপর একটি ৩৬০° অংশে বিভক্ত অংশমান বা scale রহিয়াছে (ইহা আদর্শের সহিত প্রেরিত হয় নাই)। এই Scaleএর O°—O° রেখা ১১ সংখ্যক Scaleএর O°—O° রেখার সমান্তর ; সুতরাং ইহাও ভৌগোলিক বা প্রকৃত দক্ষিণোত্তর-ভাবে অবস্থিত। পিত্তল-ফলকের কেন্দ্রে একটি চুম্বক-শলাকা উপযুক্তভাবে রাখিলে উহা চৌম্বক দক্ষিণোত্তর রেখাতে (Magnetic meridan) স্থির হইবে। ভৌগোলিক ও চৌম্বক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণই চৌম্বক ক্ষেপ। ১৩ সংখ্যক পিত্তলফলক ও তদুপরিস্থ চুম্বক-শলাকা সহ ১১ সংখ্যক scaleকে ৯০° অংশ ঘুরাইলে লম্বাবস্থায় আসিবে। এই অবস্থায় চুম্বক-শলাকা আর ক্ষিতিজের সহিত সমান্তরাল না হইয়া উহা (horizon) সহিত কোণ গঠন করিবে ; এই কোণের নাম চৌম্বক নতি (Magnetic inclination)।

অক্ষাংশ নির্ণয় (Terrestrial latitude) ;—১১ সংখ্যক স্কেলকে লম্বমান ভাবে রাখিয়া উত্তরদিক্‌স্থ কোন পরিচিত তারকার দিকে দূরবীক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক যখন তারকাটি খমধ্য-রেখায় আসিবে, তখন উহার নতাংশ (Zenith distance) বাহির করিতে হইবে। ঐ তারকার ক্রান্ত্যংশ (নাবিক পঞ্জিকায় লভ্য) হইতে ঐ নতাংশ বাদ দিলেই স্থানীয় অক্ষাংশ পাওয়া যাইবে।

দেশান্তর (Terrestrial longitude) ;—খমধ্য-রেখায় চন্দ্রের অবস্থানকালে গ্রীণ-উইচ হইতে উহার ঐ দিনের বিষুবাংশের পার্থক্য পরিমাণ করিয়া দেশান্তর নির্ণয় করিতে হইবে।

বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ (Right ascension ও declination) ;—অক্ষাংশ নির্ণীত হওয়ার পর ২গ সংখ্যক স্ক্রু দ্বারা, ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠদ্বয়ের মধ্যে লব্ধ অক্ষাংশ পরিমাণে অন্তর বা কৌণিক ব্যবধান (angle) করিতে হইবে। এই অন্তরের পরিমাণ ৩ক সংখ্যক Scale হইতে পাওয়া যাইবে। এখন ৭সংখ্যক প্লেট বা Scale বিষুবদ্বৃত্তের সহিত সমান্তরাল বা সমতল হইবে। দূরবীক্ষণ ও ১১ সংখ্যক স্কেল (Scale) সহ ১০ সংখ্যক দণ্ড ৮ সংখ্যক অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে ১১ সংখ্যক স্কেল ভিন্ন ভিন্ন ঘটিকান্তরের (hour angle)এর সৃষ্টি করিবে ; ইহাদের পরিমাণ ৭ সংখ্যক Scaleএ দৃষ্ট হইবে। কোন নূতন বা বিশেষ তারকার বিষুবাংশ

জানিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে কোন একটি পরিচিত তারকার বিষুবাংশ জানা আবশ্যক। তাহার পর ঐ বিশেষ তারকার দিকে ১১ সংখ্যক প্লেট ও দূরবীক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরিচিত তারকার সহিত ইহার ব্যবধান বা ঘটিকান্তর বাহির করিতে হইবে। এই ঘটিকান্তর পরিচিত তারকার বিষুবাংশে অবস্থানবিশেষে যোগ বা বিয়োগ করিলে, বিশেষ তারকাটির বিষুবাংশ নির্ণীত হইবে। ১১ সংখ্যক স্কেলে (Scale) উহার ক্রান্ত্যংশ (declination) পাওয়া যাইবে।

শরাংশ ও রাশ্যংশভুক্তি (Celestial latitude and longitude) ;—এতদ্দ্বারা শরাংশ ও ভুক্তির পরিমাণ কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাজনক। দিনের মধ্যে কেবল দুইটি সময়ে [অর্থাৎ যখন ক্রান্তিপাতদ্বয়—(Equinotial points)—খ-মধ্য-রেখায় আসিবে] ইহা দ্বারা এগুলি পরিমিত হইতে পারিবে। এইজন্য ইহার বিবরণ আর এখানে দেওয়া হইল না।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

———

বাঙ্গালা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা*

অনেক দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-সমিতিতে বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-বিভক্তির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে বাঙ্গালায় প্রচলিত অবিকৃত সংস্কৃত পদের সম্পূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়া, সংস্কৃত শব্দ-বিভক্তির বাঙ্গালা প্রতিরূপকসমূহে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার যে প্রভাব লক্ষিত হয়, সাধারণ ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তির সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনা করিব এবং বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তির নানা রূপে প্রাকৃতভাষার প্রভাবের যে সকল চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদিগের কতকগুলির প্রকৃতি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালা শব্দরূপের কোনও অংশে প্রাকৃতের কোনও প্রভাব আছে কি না, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা উভয়ের বচন ও কারক-বিভক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কয়েকটি প্রধান সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃতের মত প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই। দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ হয়। বাঙ্গালায় দ্বিবচনের পরিবর্ত্তে যে বহুবচন দৃষ্ট হয়, তাহা এই প্রাকৃতেরই অনুসরণে। প্রাকৃতের কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে ;—

অভিজ্ঞানশকুন্তলে শকুন্তলা দুই সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—"তোরা দূর হ! কি একটা মনে মনে মন্ত্রণা আঁটছিস্! তোদের কথা শুনব না"। প্রাকৃতে আছে,—"তুম্হে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং"।

এ স্থলে 'তুম্হে' বহুবচনের পদ। ইহার সংস্কৃত 'যুবাম্' নহে, 'যূয়ম্'। 'বো'তে সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের 'বঃ' স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

এইরূপ উত্তর-রামচরিতে দুই পুত্র কুশ ও লবের কথা স্মরণ করিয়া সীতা বলিতেছেন,—"জানি না, কুশ লব—তারা এত দিনে কি রকম ডাগর হয়ে উঠেছে।"—"দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিকেণ কালেণ কীদিসা বিঅ হোন্তি"। এ স্থলে 'দে', 'কুসলবা' ও 'কীদিসা' বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত পদ।

এইরূপ মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের চেট, বিদূষক ও চারুদত্ত দুই জনকে বসিবার জন্য আসন দেখাইয়া দিয়া কহিতেছে,—"আসনে বসুন, মশাইরা"। "আসণে ণিশীদন্ত অজ্জা"। এ স্থলে 'অজ্জা' বহুবচনের পদ।

মালবিকাগ্নিমিত্রে দুই নাট্যাচার্য্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে বিবাদের প্রসঙ্গে বিদূষক কহিতেছে,—"পরস্পর কলহপ্রিয় মত্ত হস্তীদের একজন নির্জ্জিত না হইলে কিরূপে কলহ-

---

* শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

শাস্তি হয় ?"—"অণ্ণোণ্ণকলহপ্পিআণং মত্তহত্থীণং একদরস্সিং অণিজ্জিদে কুদো উবসমো !" 'প্পিআণং' ও 'হত্থীণং' ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ।

'দ্বি' শব্দের যোগেও এই বহুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; যথা,—

ধারিণী নাট্যাচার্য্যদ্বয়কে কহিতেছেন,—"তা হ'লে (আপনারা) দু'জনেই ভগবতীকে উপদেশ (নাট্যশিক্ষাদান-নৈপুণ্য) প্রদর্শন করুন।"—"তেণ হি দুবে বি উবদেসং ভগবদীএ দংসেধ।"

বিদূষকের উক্তি,—"দুবে বি বগ্গা * * * দূদং পেসঅহ"—"আপনারা দুই পক্ষই দূত প্রেরণ করুন"—ইহাতেও ঐ 'দুবে' (দ্বি) বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওড়িআর মত বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদের বহুবচনে পৃথক্ বিভক্তি নাই। তজ্জন্য কর্ত্তার অথবা কর্ত্তার সহিত সম্বদ্ধ সর্ব্বনামাদির রূপ হইতেই কেবল কর্ত্তার বচন নির্ণয় করা যায়। প্রাকৃতে কর্ত্তার মত ক্রিয়ারও বচনভেদে রূপ-ভেদ হয়। তজ্জন্য উপরের উদাহরণগুলিতে 'অবেধ' (=সং অপেত), 'মন্তেধ' (=সং মন্ত্রয়ধ্বে), 'হোন্তি' (=সং ভবন্তি), 'ণিসীদন্তু' (=সং নিসীদন্তু), 'দংসেধ' (=সং দর্শয়ত) ও 'পেসঅহ' (=সং প্রেষয়ত) এই ক্রিয়াপদগুলি হইতে কর্ত্তৃপদগুলির বহুবচনত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

প্রাকৃতে যেমন দ্বিবচন নাই, তেমনি চতুর্থী বিভক্তিও নাই বলিলেই চলে। কেবল একবচনে তাদর্থ্যে চতুর্থীর প্রয়োগ হয় ; তাহাও আবার বিকল্পে। চতুর্থীর প্রয়োগের উদাহরণ দিতেছি।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ধীবর নাগরিককে কহিতেছে,—"পরে আমি সেটা বিক্রীর জন্য দেখাবার সময় মশাইরা আমাকে ধল্লেন।" "পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিস্সেহিং।"

এ স্থলে 'বিক্কআঅ' (=সং বিক্রয়ায়) চতুর্থীর একবচনের পদ ; অর্থ—বিক্রয়ার্থে।

এইরূপ বিক্রমোর্ব্বশীতে পুরূরবার বীরত্ব ব্যাখ্যা করিয়া মেনকা রম্ভাকে কহিতেছেন,—"যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে (স্বয়ং) ইন্দ্রও পৃথিবী থেকে সাদরে আনিয়ে তাঁকেই দেবতাদের বিজয়ের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করেন !"—"উঅত্থিদসংপহারো মহেন্দো বি মজ্ঝমলোআদো সবহুমাণ-মাণাবিঅ তং জ্জেব বিবুধবিজআঅ সেণামুহে ণিওএদি।"

এ স্থলে 'বিবুধবিজআঅ' (=সং বিবুধবিজয়ায়) চতুর্থীর একবচনের পদ ; অর্থ—বিবুধগণের (দেবতাগণের) বিজয়ের জন্য ; 'বিবুধবিজয়ার্থে'।

মৃচ্ছকটিকে শকার কহিতেছে,—"চারুদত্তকে বধ করিবার জন্য নূতন কপট (কপটবৃত্তি অবলম্বন) করি।"—"চালুদত্তবিণাশাঅ কলেমি কবডং ণবং।" এ স্থলে 'বিণাশাঅ'=সং বিনাশায় ; 'বিনাশার্থে'।

প্রাকৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতে 'পাণীকে যায়' (ডাকের বচন) প্রভৃতিতে তাদর্থ্যে, এক-বচনে, কথনও কখন চতুর্থীর প্রয়োগ মিলে বটে, কিন্তু প্রাকৃতে যেরূপ সাধারণতঃ চতুর্থী

বিভক্তির স্থলে অন্য বিভক্তির ব্যবহার দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। পরে এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে এক একটি করিয়া স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলির উত্তর প্রযুক্ত বিভিন্ন কারকের বিভক্তির প্রাকৃত আকৃতিগুলির বাঙ্গালা প্রতিরূপকের আলোচনা করা যাউক। প্রথমে স্বরবর্ণান্ত শব্দের একবচনে কর্ত্তৃকারকের ও সম্বোধনের রূপ দেখা যাউক।

সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দসকল প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে বিসর্গযুক্ত ও ক্লীবলিঙ্গে 'ম'-কারযুক্ত হয়। 'নর' ও 'ফল' শব্দদ্বয় প্রথমার একবচনে 'নরঃ' ও 'ফলম্' হয়। কিন্তু প্রাকৃতে বিসর্গ নাই ও মকার স্থলে অনুস্বার হয়। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের বিভক্তিস্থানে 'ও'কার, 'এ'কার, 'উ'কার, 'ই'কার প্রভৃতির প্রয়োগ হয়; কখনও কখনও বা বিভক্তির লোপ হয়। তন্মধ্যে শৌরসেনীপ্রকৃতিসম্ভূত মাগধী ও তৎসম্পৃক্ত প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাগুলিতে যে সকল অবয়ব দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালায় তাহাদিগেরই সমধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রাকৃতপ্রকাশের একাদশ পরিচ্ছেদে মাগধী ভাষায় অকারান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারকের প্রথমার একবচনের পদ সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়,—

১। অত ইদেতৌ লুক্ চ। ১১।১০।

অকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচনে ইকারান্ত বা একারান্ত হইয়া থাকে, কখনও কখনও বা বিভক্তির লোপ হয়।

২। ক্তান্তাদুশ্চ। ১১।১১।

ক্তপ্রত্যয়ান্ত অকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচনে 'উ'কারান্তও হইয়া থাকে।

এক্ষণে কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যাউক। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে নাগরিকের সোৎপ্রাসোক্তির উত্তরে ধীবর কহিতেছে,—"যে কর্ম্ম জন্মসিদ্ধ, সে কর্ম্ম বিনিন্দিত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রোত্রিয়েও যাগকালে পশুমারণরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।"—

"শহজে কিল জে বিণিন্দিএ
ণহু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে
অণুকম্পামিদুএবি শোত্তিএ॥"

অধ্যাপক কাউএল্ প্রভৃতি কেহ কেহ এই ভাষাকে মাগধী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ করিবার কারণ বোধ হয় এই শ্লোকার্দ্ধ,—

"ধীবরাস্তিনীচেষু মাগধী বিনিযুজ্যতে।"

কিন্তু বররুচি মাগধীর যে সকল বিশেষত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ধীবরের ভাষায় তন্মধ্যে কতকগুলি লক্ষিত হইলেও অপর কতকগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

মাগধীর কয়েকটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে 'ষ' ও 'স'র পরিবর্তে 'শ' হয় (ষ-সোঃ শঃ। ১১।৩)। অস্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'হকে', 'হগে' ও 'অহকে' (১১।৯) হয়; অকারান্ত শব্দের কর্তৃপদে প্রথমার একবচনে অকারের স্থলে 'ই' বা 'এ' (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত হইলে 'উ'ও) হয়; কখনও বা বিভক্তির লোপ হয় (অত ইদেতৌ লুক্ চ ।১১।১০। ক্তান্তাদুশ্চ ১১।১১)। একবচনের সম্বোধনপদে অকারান্ত শব্দের অকার দীর্ঘ হয় (অদীর্ঘঃ সম্বুদ্ধৌ ।১১।১৩)। ধীবরের ভাষায় এই সকল বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু আবার (জো যঃ ।১১।৪, 'র্যজয়োর্য্যঃ ১১।৭ প্রভৃতি সূত্রানুসারে) 'জ'স্থানে 'য' প্রভৃতি যে সকল পরিবর্তন মাগধীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ধীবরের ভাষায় তাহা দৃষ্ট হয় না; অধিকন্তু 'য' স্থানে 'জ' দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাতে শৌরসেনী ও মাগধী উভয়বিধ প্রাকৃতেরই অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য ইহাকে কেহ কেহ মিশ্রমাগধী বা অর্দ্ধমাগধী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। "মহারাষ্ট্রীমিশ্রার্দ্ধমাগধী।" "শৌরসেনীমিশ্রার্দ্ধমাগধী।" পূর্ব্বে চেট, শকার, সংবাহক প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির প্রাকৃতি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রাকৃতের সহিত ধীবরের প্রাকৃতের কি সম্পর্ক, ইহাকে অপভ্রংশ বলা চলে কি না, সে সকলের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ধীবর, চেট, শকার, সংবাহক প্রভৃতি সকলেরই ভাষা পরস্পর ও মাগধীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ এবং প্রত্যেকটির সহিত বাঙ্গালার অনেক বিষয়ে সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাকৃত-প্রকাশে আলোচিত ভাষাচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্য কোনও ভাষাই মাগধীর মত উহাদিগের সহিত সম্বদ্ধ নহে।

মাগধী বা অপর যে নামেই অভিহিত হউক, উদ্ধৃত প্রাকৃত শ্লোকটিতে 'শহজে', 'জে', 'বিণিন্দিএ', 'শে', 'কম্ম', 'বিবজ্জনীঅএ', 'দালুণে', 'মিহুএ', 'শোত্তিএ' পদগুলি প্রথমার একবচনের পদ; সংস্কৃতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে—সহজম্, যৎ, বিনিন্দিতম্, তৎ, কর্ম্ম, বিবর্জ্জনীয়কম্, দারুণঃ, মৃদুকঃ, শ্রোত্রিয়ঃ।

ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, এই প্রাকৃতে কেবল (সংস্কৃত) পুংলিঙ্গের নহে, (সংস্কৃত) ক্লীবলিঙ্গের ও কর্তৃকারকের প্রথমার একবচন স্থলে 'এ'কার প্রযুক্ত হয়। (বস্তুতঃ প্রাকৃতে ঐ শব্দগুলি পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে।)

মৃচ্ছকটিকের তৃতীয়াঙ্কে চারুদত্তের চেট কহিতেছে,—"প্রভু যদি সুজন হন ও ভৃত্যের প্রতি যদি তাঁহার অনুকম্পা থাকে, তবে তাঁহার নির্দ্ধনত্বও শোভা পায়। আর প্রভু যদি দুর্জ্জন ও ধনগর্ব্বিত হয়, তাহা হইলে তাহার সেবা দুষ্কর ও পরিণাম-দারুণ।

"শুঅনে কখু ভিচ্চণুকম্পকে
শামিএ ণিদ্ধণকে বি শোহদে।
পিশুণে উণ দব্বগব্বিদে
দুক্কলে কখু পলিণামদালুণে ॥"

এ স্থলে সুজনঃ, ভৃত্যানুকম্পকঃ, ধার্মিকঃ, নির্দ্ধনকঃ, পিশুনঃ, গর্ব্বিতঃ, দুষ্করঃ ও দারুণঃ, এই সংস্কৃত পদগুলি মাগধী-প্রাকৃতে একারান্ত আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

মৃচ্ছকটিকের দ্বিতীয়াঙ্কে দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ সংবাহক 'কত্তা'-শব্দে মুগ্ধ হইয়া কহিতেছে,—"কোকিলের ন্যায় মধুর পাশার শব্দে মন হরণ করে।"—"কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।" এ স্থলে 'মধুর' ও 'শব্দ' শব্দদ্বয়ের প্রথমার একবচনে মাগধী-প্রাকৃতে 'মহুলে', 'শদ্দে' রূপ হইয়াছে।

মৃচ্ছকটিকের মাগধীভাষী সংবাহক এবং চেটগণের উক্তি হইতে এবং অপভ্রংশভাষী শকার ও চাণ্ডালদ্বয়ের উক্তি হইতে ঐ 'এ'কারের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ঐ সকল দৃষ্টান্তের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাকৃতের উক্ত এ-কার ও বাঙ্গালার প্রথমার একবচনের বিভক্তি এ-কার পরস্পর অভিন্ন। সর্ব্বনাম শব্দ যদ্, তদ্, কিম্ প্রভৃতির প্রথমার একবচনে যে জে, শে, কে প্রভৃতি রূপ মাগধী-প্রাকৃতে বর্ত্তমান, ব্যঞ্জনান্ত শব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে পরে তাহার আরও উদাহরণ দেওয়া যাইবে। বাঙ্গালায় যে, সে, কে, মানুষে, লোকে, ইতরে, চাষারে প্রভৃতি অসংখ্য পদে কর্ত্তৃকারকের এই চিহ্ন বর্ত্তমান। এই সকল লিখিত পদে বর্ত্তমান যুগে বিভক্তির এই একার ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে মাগধী প্রাকৃতের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত না হইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে সংস্কৃতের প্রভাববশতঃ যে, সে, মানুষে, ব্রাহ্মণে প্রভৃতি লিখি বটে, কিন্তু উচ্চারণকালে প্রাকৃতের মত জে, শে, মানুশে ও ব্রাম্হনে প্রভৃতি বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে এই শ ও জএর প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

"গুরুপদ জুগ বন্দো পরম শন্তোশে।
তান প্রিয়া প্রণমোহ মনের হাবশে॥"—রামজীবনের শুর্য্যের পাঞ্চালি।

এই পংক্তি দুইটিতে শৌরসেনীর ন্যায় "আদের্যো জঃ" ও মাগধীর ন্যায় "শষোঃ সঃ" দৃষ্ট হয়। এই উচ্চারণ উপরের উদাহরণের প্রাকৃতের অনুরূপ।

এইরূপ—

"জলের ত্রিষ্টাএ শব আকুল হইআ।
শর্প্য শনে ধাই জাএ জলঃউদ্দেশিআ॥
রাজার প্রতিজ্ঞা হৈছে কন্যা বিহা দিতে।
জেই শেই জন মাত্র মিলএ প্রভাতে॥"

পুঁথির এইরূপ বর্ণ-যোজনাকে কেহ কেহ বর্ণাশুদ্ধি বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, সকল স্থলে বর্ণাশুদ্ধি বলিয়া বিষয়টিকে সহজ করিয়া লওয়া ঠিক নহে। কারণ, কেবল এই জে, শে প্রভৃতিতে নহে—আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতি ও ত্রিষ্টাএ (তৃষ্ণায়), বির্খ (বৃক্ষ) প্রভৃতিতে প্রাকৃতের অন্যাধিক চিহ্ন বর্ত্তমান।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল স্থলে বিভক্তির লোপ করিয়া থাকি, সেরূপ অনেক স্থলেও প্রাচীন পুথিতে কর্ত্তায় (এবং কর্ম্ম প্রভৃতিতেও) বিভক্তির এই একার দৃষ্ট হয় ; যথা,—

"রাম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে ;
তুমি জান সীতা আমার নিল কোন জনে ॥"—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

আমরা সাধারণতঃ এরূপ স্থলে 'অবধান' ও 'জন'—এইরূপ বিভক্তিচিহ্নহীন পদের ব্যবহার করি।

এইরূপ—

"নন্দে বোলে এই দেখ রাধিকার ঘর।"—কৃষ্ণরাম দাসের রাধিকা-মঙ্গল।

"ব্রহ্মাএ বর্ণিতে নারে যার যত ধর্ম্ম।"—ছুটিখাঁর মহাভারত।

ঐরূপ স্থলে আমরা নন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতি রূপের ব্যবহার করি।

এ-কারের কথা হইল ; এক্ষণে ই-কারের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয়াঙ্কে চারুদত্তের চেট কহিতেছে,—"স্বভাবের যে দোষ, তা কোনও রকমে বারণ মানে না।"—"জে বি শহাবিঅ দোশে ন শক্কি বালিদুং।" সংস্কৃত 'শক্যঃ' মাগধী-প্রাকৃতে 'শক্কি' হইয়াছে।

বাঙ্গালায় আমরা 'সাধ্যি', 'নৈরাশ্যি', 'উপহাস্যি', 'হবিষ্যি', চৈত্রি', 'মিশ্রি' (মিশ্র), মিষ্টি, বীচি প্রভৃতি পদে, কথোপকথনে এবং আপনি, আমি, তুমি প্রভৃতি পদে এই 'ই'-কারের প্রয়োগ দেখিতে পাই।

মৃচ্ছকটিকে মাথুর, সংবাহক প্রভৃতির উক্তিতে প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারকের একবচনে (এবং সম্বোধনের একবচনে) অনেক স্থলে 'উ'-কার দৃষ্ট হয়। 'ক্তান্তাদুশ্চ' সূত্রানুসারে তাহা ক্তান্ত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ব্যঞ্জনান্ত (অকারোপধ) সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে যখন অকারান্ত শব্দে পরিণত হয়, তখনও প্রথমায় এই 'উ'-কার দেখা যায়।

মাথুর কহিতেছে,—"ওরে, উল্টো পায়ের দাগ, দেউল ঠাকুরশূন্য। 'ধুত্তু' জুয়ারি উল্টো পা ফেলে দেউলে ঢুকেছে।"—"অলে বিপ্পদীবু পাহ্, পড়িমাশুন্নু দেউলু। ধুত্তু জুদ-কক্ক বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্ঠো।"

মাথুরের উক্তিকে "ঢক্ক বিভাষা" বলিয়া ধরিলেও মাগধী প্রাকৃতে সংবাহকের উক্তিতে ঐ 'উ'-কারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সংবাহক কহিতেছে,—"মাথা (ট'লে) পড়ছে।"—"শিলু পড়দি"=শিরঃ পততি।

আমরা ধুত্তু (=ধূর্ত্ত), মুক্খু (=মূর্খ), কুণ্ডু (=কুণ্ড), মুণ্ডু (=মুণ্ড), জাদু (=জাত, আদরবাচক) প্রভৃতি অনেক পদে, কথোপকথনে এই 'উ'-কারের আজিও ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু কি লিখিত সাধুভাষায়, কি 'চলিত' কথোপকথনে, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালায় 'লুক্ চ' এই সূত্রাংশেরই অধিক প্রসার দৃষ্ট হয়। 'ই'কারান্ত, 'এ'কারান্ত বা 'উ'কারান্ত রূপ পরিগ্রহণ না করিয়া শব্দগুলি অপরিবর্ত্তিত আকারেই প্রথমান্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়। রাম, শ্যাম

প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণিবাচক, জল গৃহ প্রভৃতি বস্তুবাচক, মহত্ত্ব, বিনয় প্রভৃতি গুণবাচক, রক্ষণ, দর্শন প্রভৃতি ভাব বা ক্রিয়াবাচক—সর্ব্বপ্রকার অকারান্ত শব্দসমূহের প্রথমার একবচনের রূপেই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তৃকারকের রূপের আলোচনা হইল। এক্ষণে সম্বোধনের রূপের আলোচনা করা যাউক।

সম্বোধনের একবচনে অকারান্ত শব্দসমূহের রূপ প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় প্রায়ই সংস্কৃতের মত অকারান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় 'আ'কারান্ত ও 'উ'কারান্ত রূপও দেখা যায়। অবজ্ঞা বুঝাইলেই এইরূপ প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কের প্রবেশকে সূচক জানুককে সম্বোধন করিতেছে,—'জাণুঅ' (জানুক); কিন্তু তস্কর-বোধে ধৃত ধীবরকে অবজ্ঞার সহিত তাড়না করিয়া 'কুম্ভিলআ' (কুম্ভিলক, চোর), 'পাড়চ্চলা', পাটচ্চর, চোর প্রভৃতি বলিতেছে।

এই সকল পদে মাগধী প্রাকৃতের 'অদীর্ঘঃ সম্বুদ্ধৌ' (১১।১১) সূত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শব্দের অন্তস্থিত 'অ'কার সম্বোধনে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'আ'কার হইয়াছে। 'ওরে রামা, ওরে শ্যামা' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে বাঙ্গালায় আমরা প্রাকৃতের ঐ 'আ'কার দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় কথোপকথনে মুকুণ্ড, ধুন্ড প্রভৃতি উকারান্ত রূপও সম্বোধনে দৃষ্ট হয়।

বররুচির এই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেহ কেহ এইরূপ মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'আমরা যে অবজ্ঞা করিয়া হরিকে 'হরে', মধুকে 'মধো', যদুকে 'যদো' বলি, তাহা বোধ হয়, হরিআ, মধুআ, যদুআ ইত্যাদি বহুবচনমূলক। কারণ, শাকারী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় অবজ্ঞা বুঝাইলে একবচন স্থলেও বহুবচন দৃষ্ট হয়। যথা,—"অলে চালুদত্তা" ইত্যাদি।'

"অলে চালুদত্তা" বহুবচনের পদ নহে, একবচনের পদ। উল্লিখিত সূত্র হইতেও তাহা যদি প্রতীত না হয়, নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না।

"আঅচ্ছ লে চালুদত্তা। আঅচ্ছ ইমং ঘোষণটঠণং।" —আয় রে চারুদত্ত, এই ঘোষণা স্থানে আয়। এই স্থলে 'আঅচ্ছ' একবচনের ক্রিয়াপদ। সম্বোধন-পদ বহুবচনের হইলে ক্রিয়াও বহুবচনের হইত। কেবল চাণ্ডালের মুখের অপভ্রংশ ভাষায় নহে, শকারের ভাষায় (শাকারী)ও এইরূপ একবচনের ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়; যথা,—

"হংহো চালুদত্তা বড়ুকা ভণাহি, মএ বশন্তশেণা মালিদেত্তি।"—ওরে বেটা চারুদত্ত, বল যে, আমি বসন্তসেনাকে মেরেছি। "ভণাহি" একবচনের ক্রিয়াপদ।

সম্বোধনের পদ বহুবচনের হইলে ক্রিয়া যে বহুবচনের হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তবে সহজে প্রতীতির জন্য দুই একটির প্রয়োজন।

"হংহো চাণ্ডলা তা জদি ণ পত্তিআঅধ তা পিশ্টিং দাব পেক্খধ।"—শকার কহিতেছে,—ওরে চাঁড়ালরা, তা যদি প্রত্যয় না করিস্, তবে পিঠটাহ দেখ। এ স্থলে "পত্তিআঅধ" ও "পেক্খধ" বহুবচনের ক্রিয়াপদ।

ঐরূপ "অলে চাণ্ডালা, কিং বিলম্বেধ ? মালেধ এদং"—ওরে চাঁড়ালেরা, কেন দেরি করিস্, মেরে ফেল একে—এ স্থলে "বিলম্বেধ" ও "মালেধ" বহুবচনের ক্রিয়াপদ।

সাধারণতঃ প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের বিভক্তির (জস্ ও শস্ এর) লোপ হয় [প্রাকৃত-প্রকাশ ৫।২] ও অকারের দীর্ঘ আ হয় [জশ্‌শস্-ঙস্ত্যাংসু দীর্ঘঃ। ৫।১১]। কিন্তু তজ্জন্য 'আ'কার মাত্রই শকারের ভাষায় বা কোনও প্রকারের প্রাকৃতে বহুবচনের বিভক্তিমাত্রেরই চিহ্ন নহে।

বস্তুতঃ "রামা", "বাম্না" (ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি যেরূপ অবজ্ঞাসূচক একবচনের সম্বোধন-পদ, হরে, মতে, মধো, যদো প্রভৃতিও সেইরূপ অবজ্ঞাসূচক একবচনের সম্বোধন-পদ। তবে অকারান্ত শব্দগুলির বিভক্তি প্রাকৃতের, ইকারান্ত এবং উকারান্ত শব্দগুলির বিভক্তি সংস্কৃতের।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" প্রথমা বিভক্তির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

দীনেশ বাবু তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে (৪২ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত; অনুস্বার কি বিসর্গ-বর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতের কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়।"

কেবল এই স্থলে নহে, 'বাঙ্গালা বিভক্তি' প্রসঙ্গে এবং বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই সেন মহাশয় যেরূপ ভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যেন ভিত্তি এবং শৃঙ্খলার একটু অভাব আছে বলিয়া মনে হয়; সকল স্থলে তাঁহার মত বেশ সুব্যক্ত ও সুপরিস্ফুট হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত; অনুস্বার ও বিসর্গবর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ।'—প্রথমা বিভক্তি বলিলে প্রথমার একবচনের ও বহুবচনের বিভক্তি, দুই-ই বুঝায়। অথচ সেন মহাশয়ের উক্তি বোধ হয়, বহুবচনের বিভক্তির সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাহার পর একবচনের প্রথমা বিভক্তি 'সংস্কৃতের মত' হওয়ার অর্থ অধিকাংশ স্থলেই পুংলিঙ্গে বিসর্গযুক্ত হওয়া এবং ক্লীবলিঙ্গে 'ম'কারযুক্ত হওয়া (বাঙ্গালা ও প্রাকৃতে 'ম'কারযুক্ত হওয়ার অর্থ অনুস্বারযুক্ত হওয়া)। অতএব বাঙ্গালার প্রথমার একবচনের বিভক্তি অনুস্বার ও বিসর্গবর্জ্জিত হইলে ফলতঃ বিভক্তির লুপ্তিধান হইল, বলিতে হইবে। অকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে মাগধীতে এই লুক্ বিহিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অতঃপর দীনেশ বাবুর উক্তিতে 'কিন্তু তথাপি উহা' (প্রথমা বিভক্তি) 'যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে', এই স্থলে 'কিন্তু তথাপি' এই দুইটি কথার কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আর দীনেশ বাবুর উক্তির যদি এই অর্থ করিয়া লইতে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমা বিভক্ত্যন্ত একবচনের পদ অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত হয় এবং 'উহা' কথাটির অর্থ 'প্রথমা বিভক্তি' না হইয়া 'প্রথমা বিভক্ত্যন্ত' পদ হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার প্রথমার বিভক্তি যে স্থলে 'সংস্কৃতের মত', তথায় বাঙ্গালায়

অনেক সময় 'সংস্কৃতের মত' ব্যঞ্জনান্ত শব্দের বিসর্গান্ত (বিসর্গ-বর্জ্জিত নহে) রূপ দৃষ্ট হয়। যথা,—হবিঃ, আয়ুঃ, স্রোতঃ, পয়ঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি। দীনেশ বাবুর উক্তি হইতে হঠাৎ মনে হয় যে, যে 'এ'-সংযুক্ত পদের কথা তিনি বলিয়াছেন, সেই প্রাকৃত পদের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় অনুস্বার ও বিসর্গ-বর্জ্জিত 'সংস্কৃতের মত' প্রথমান্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সেরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengali Language and Literature গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে (১০৬ পৃঃ) বাঙ্গালা কারকবিভক্তি-সমূহের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"The case affix in Bengali of the nominative (first person, singular) is generally formed by omitting the aspirate or the nasal ং of Sanskrit. The affix এন of the Sanskrit instrumental nominative is reduced to এ in Prakrita and used in active forms; as 'শুঅনেহু ভিচ্ছাণকম্পকে শামীএ নিব্বনকেবি শোহেদি (Mricchakatika Canto III) Instances of this এ forming the affix of nominatives in active forms are numerous in old B. Mss."

উদ্ধৃত অংশের 'শামীএ' পদের 'এ' সম্বন্ধে সেন মহাশয় যে অদ্ভুত মত প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, তাহা প্রাকৃতের প্রথমা বিভক্তির পদ। তদ্ব্যতীত উদ্ধৃত অংশে আরও কতকগুলি স্থলে সংশোধনের প্রয়োজন আছে। 'first person singular'এর স্থলে বোধ হয়, third person singular বা first case-ending, singular, এই দুইটির একটি লিখাই সেন মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল। আর মৃচ্ছকটিক প্রকরণ; সুতরাং Canto না লিখিয়া Act লিখাই সেন মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ত্রুটি পুস্তকখানির বহু স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত কোনও পুস্তকে ঈদৃশ ত্রুটির বাহুল্য থাকা অসঙ্গত।

উপরে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে যে স্থলটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়; যথা,—ভঅবদি তমসে অঅংদাব পরিসো জাদো দে উণ ণ আণামি কুশলবা—উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক। কহিং মে পুত্তআ"—উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক।

ইহার পর ৪০ পৃষ্ঠায় আছে—"প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনবোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায়। যথা,—'নয়া, গঙ্গা, বিশে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বলদা তের ছাগলা।—খনা।"

পূর্ব্বেই উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কেবল প্রথমার শব্দরূপে নহে, অন্যান্য

বিভক্তিতেও এবং শব্দ ও ধাতু উভয়েরই রূপে প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই। দ্বিবচনের স্থলে সর্ব্বত্রই বহুবচন হয়। প্রাকৃতপ্রকাশ-কার বররুচি তজ্জন্য "দ্বিবচনস্য বহুবচনম্" এই সূত্র (৬।৬৩) করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু যে দুইটি প্রাকৃত উদাহরণ উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রথমটি একটি অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ। "পরিসো" পাঠ দীনেশ বাবু কোনও পুস্তকে পাইয়াছেন কি না, জানি না। স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়-দ্বয়ের সংস্করণে ঐ পাঠ প্রদত্ত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধৃত পাঠ এই,—

"ভঅবদি তমসে অহং দাব এরিসো জাদো দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিএণ কালেণ কেরিসা বিঅ হোন্তি।"

দীনেশ বাবুর পুস্তকে উদ্ধৃত প্রাকৃত বাক্যাংশসমূহে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি মুদ্রাকর-প্রমাদাদির যে বাহুল্য দৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

যাহা হউক, প্রাকৃতে দ্বিবচনের কথা অসঙ্গত। সংস্কৃত দ্বিবচন ও বহুবচনের স্থলে প্রাকৃতে যে বহুবচন হয়, তাহা অভিন্ন; পূর্ব্বে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। নরা, গজা, বলদা, ছাগলা প্রভৃতি বহুবচনবোধক শব্দ বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃতে জাতি বুঝাইবার জন্য জাতিবাচক শব্দের একবচনে প্রয়োগের বিধান দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতে এরূপ একবচন না হইবার কোনও বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয় না। "শেষং সংস্কৃতবৎ" সূত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রাকৃতেও জাতি বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ হয়। বচন বিষয়ে প্রাকৃতের অনুসারী বাঙ্গালায় ঐ বিধানানুসারে কার্য্য না হইবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নরা, গজা প্রভৃতি শব্দের আকার প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আকার প্রাকৃত হইতে আসিলেও, তাহা প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি না হইতেও পারে। 'মানুষ কতদিন বাঁচে', 'মানুষে কত দিন বাঁচে', 'ছাগলে কি না খায়', এই সকল স্থলে মানুষ, মানুষে, ছাগলে প্রভৃতি যদি একবচনের পদ হয়, তাহা হইলে ছাগলা, নরা প্রভৃতিকে বহুবচনের পদ বলিবার কারণ কি? বস্তুতঃ উহারা যে বহুবচনের পদ নহে, তাহা 'হয়' কথাটি হইতে বেশ বুঝা যায়। নরা, গজা, বলদা, ছাগলার মাঝখানে 'হয়া' না হইয়া 'হয়' হইল কেন? 'সয়'এর সহিত মিল থাকিবে না বলিয়া?—বোধ হয় তাহা নহে। 'হয়' কথাটিতেও "জাতৌ একবচনম্", অন্যগুলিতেও তাহাই। নর, গজ, বলদ, ছাগল শব্দগুলির উত্তর প্রাকৃতের পূর্ব্বালোচিত অবজ্ঞাসূচক 'আ'কার প্রযুক্ত হইয়া নরা, গজা প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

শিশুদিগের ভোজনকালে 'কাগা আয়, বগা আয়, কাগা বগা চিলে, টপ করে নিলে, কে খেলে, কে খেলে' প্রভৃতি যে পুরাণ ছড়ার আবৃত্তি এখনও সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কাগা, বগা প্রভৃতি সম্বোধনে ও কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় সম্বোধন

স্থলে যখন ব্যক্তির নামের প্রথমার্দ্ধের ব্যবহার করা হয়, তখনও অবজ্ঞা (বা কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি) বুঝাইলে এই আকার (এবং উকারও) দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—নরেন্দ্র (নর) নরা, নরু; গজেন্দ্র (গজ) গজা; পঞ্চানন (পঞ্চ) পঞ্চা, পঞ্চু (পাঁচু); বলরাম (বল) বলা; নৃপেন্দ্র (নৃপ) নেপা, নেপু; ব্রজকিশোর (ব্রজ) ব্রজা প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ঘোষজ ও বসুজ প্রভৃতির সম্বোধনাদিতে ঘোষজা ও বসুজা প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালায় অন্য অনেক কারণেও একবচনে আকারযোগ দেখা যায়। যথা,—পদ্যে 'কায়' প্রভৃতি শব্দের উত্তর; চলিত ভাষায় 'জন' প্রভৃতি শব্দের উত্তর। ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণিবাচক শব্দে ইহা প্রাকৃতের স্বার্থে 'ক' প্রভৃতির পরিণতির চিহ্ন।

দীনেশ বাবুর পুস্তক হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার এইরূপ সমালোচনা করিতেছি বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, তাঁহার পুস্তকের কোনও সারবত্তা নাই। তাঁহার গ্রন্থ যে আয়াস ও একাগ্রতার ফল, তাহা কেবল আমার কেন, সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তবে—"যত্নেন গচ্ছতঃ কাপি স্খলনং স্যাৎপ্রমাদতঃ। হসন্ত্যসাধবস্তত্র সমাদধতি সজ্জনাঃ॥" এবং এই প্রবন্ধের মধ্যে যে সমালোচনা আছে, তাহা যদি দীনেশ বাবুর পুস্তকদ্বয়ের পরবর্ত্তী সংস্করণে বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে ত্রুটির লাঘব সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তজ্জনিত শ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

উপসংহারে প্রথমার একবচনের বিভক্তিযুক্ত আর একটি শব্দের কয়েকটি রূপের আলোচনা করিব। প্রাকৃতে পিতৃবাচক বপ্প (=সং বপ্র) শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেমন প্রা° অজ্জ (=সং অদ্য) হইতে বাঙ্গালায় আজ হয়, প্রা° মজ্ঝ (=সং মধ্য) হইতে বা° মাঝ হয়, প্রা° মচ্ছ (=সং মৎস্য) হইতে বা° মাছ হয়, প্রা° কণ্ণ (=সং কর্ণ) হইতে বা° কাণ হয়, প্রা° কজ্জ (=সং কার্য্য) হইতে বা° কাজ হয়, প্রা° সপ্প, শপ্প (=সং সর্প) হইতে বা° সাপ (উচ্চারণ শাপ) হয়, সেইরূপ প্রা° বপ্প (=সং বপ্র, পিতা) হইতে বা° বাপ হয়। এই বাপ শব্দের উত্তর প্রথমার একবচনে কোনও বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত না হইয়া প্রাকৃতের মত "লুক্ চ" সূত্রানুসারে বিভক্তির লুক্ বিহিত হইলে 'বাপ' রূপই থাকিয়া যায়। বাঙ্গালায় এই পিতৃবোধক 'বাপ' পদের সুবহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই রূপ ব্যতীত শব্দটির আরও কয়েকটি রূপ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়,—বাপা, বাপু, বাবা, বাবু। তন্মধ্যে বাপা ও বাবা পদদ্বয়ে প্রাকৃতের আকার এবং বাপু ও বাবুতে উকার বর্ত্তমান। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে এবং বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'বাপা' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণ যথা,—

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥"

বিজয় গুপ্তের পুস্তকে মনসা দেবী তাঁহার পিতা শিবকে 'বাপা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। বর্গের প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য 'বাপা' 'বাবাতে' এবং 'বাপু' 'বাবুতে'

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তুলনা করুন,—শাক, শাগ, কাক, কাগ, কাগা, বক, বগা, কার্পাস কাপাস, কাবাস, ঘটিকা, ঘড়ি, ঘটিকা, ঘড়ি প্রভৃতি। বাপা পদটি (স্নেহবোধক ভাবে) এখনও পূর্ব্ববঙ্গীয়গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। বাবা পদটি পিতা বুঝাইতে এবং স্নেহ-প্রয়োগে পুত্র বুঝাইতে বা পুত্রকল্প বা পিতৃকল্প ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'বাপু' পদটি সমাজের নিম্ন স্তরের ব্যক্তির প্রতি, শ্লিষ্ট প্রয়োগে সমকক্ষের বা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি ব্যবহৃত হয়; 'পিতা' বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বাবু পদটির গৌরববোধক নামনির্দ্দেশার্থে ব্যবহার শব্দটির আদরসূচক বিভক্তিযুক্ত (উকারান্ত) রূপের একটি বিশিষ্ট রূঢ় প্রয়োগ। পিতা বুঝাইবার জন্য বা পিতৃকল্প (শ্বশুর প্রভৃতি) ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যও শব্দটির ঐ রূপের কখনও কখনও প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। তবে সম্বোধনে গৌরব বুঝাইবার জন্য নামের প্রথমাংশের শেষে (যথা,—রবি বাবু, আশু বাবু, দেব বাবু প্রভৃতি) এবং স্বামী, প্রভু বা উপরিতন কর্ম্মচারীকে (মনিবকে) বুঝাইবার জন্যই সাধারণতঃ বাবু পদটির ব্যবহার হয়। বাপ্পারাও, বাপুদেব, বাবুলাল প্রভৃতি নামে বাপ্পা, বাপু এবং বাবু শব্দগুলি মূলতঃ অভিন্ন। 'মাম' শব্দনিষ্পন্ন মামা এবং মামুতেও এই 'আ' ও 'উ' দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে এই "বপ্প" শব্দের প্রসঙ্গে আর একটি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। শব্দটি বাঙ্গালা সাধুভাষার নহে, উহা গ্রাম্য অপভাষার; কিন্তু ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর অনালোচ্য নহে। 'বাবাকেলে' জিনিষের কথা বোধ হয়, বাঙ্গালায় অনেকেই কলহপ্রবণ অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে কখনও কখনও শুনিয়া থাকিবেন। কথাটি শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে, বাবার কালের (সময়ের) কোনও বস্তুর কথা হইতেছে। বস্তুতঃ কিন্তু শব্দটি প্রাকৃত "বপ্পকেলকে" হইতে আগত; প্রাকৃতে 'কেলক'= 'কেরক' শব্দ সম্বন্ধবাচী; আমার সম্বন্ধি বস্তু প্রাকৃতে 'মম কেলকে'; তোমার সম্বন্ধি বস্তু 'তুহ কেলকে'; বাবার সম্বন্ধি বস্তু 'বপ্প কেলকে'। এই কেরক বা কেলক শব্দের প্রাকৃতে ব্যবহার সংস্কৃত ছ (=ঈয়) প্রত্যয়ের মত। যথা,—স° মদীয়=প্রা° মমকেলক, স° আত্মীয় =প্রা° অত্তণকেরক (কেলক) ইত্যাদি। এই কেরক বা কেলক শব্দের সংস্কৃত প্রতি-শব্দের সহিত সংস্কৃত সময়বাচক 'কাল' শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। মৃচ্ছকটিকের অষ্টমাঙ্কে শকারের 'তুহ বপ্পকেলকে পবহণে'—তোমার বাবার গাড়ী ?—উক্তিটির এবং কেরক (কেলক) শব্দের অন্যত্রকৃত প্রয়োগগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না।

বাঙ্গালায় শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। ভবিষ্যতে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মপূজাবিধি*

আমাদের পুথির এই ধর্ম্মপূজাতেই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ, এ কথা আর আজ নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; এই কথা লইয়া আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিচার-বিতর্ক চলিতেছে।

সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ইহার, কিন্তু, কোন সম্পর্কই নাই; তাহার কথা ত কেবল "শীলরক্ষা"; উহা পূজা-পাঠের কোন ধার ধারে না।

মনে করিবেন না, ইহা মহাযানের সেই অদ্ভুত "ধর্ম্ম ধাতু"—সেই জগতের সনাতন পদ্ধতি, যাহার বশে জগৎ চলে। যে ধর্ম্মধাতুতে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আঁকাশ,—সমস্ত জড় জগৎ, সমস্ত জীবজগৎ—একাকার, আর এই একাকারকে অনন্ত কোটি ভাগে ভাগ করে যে অহঙ্কার, তাহাও যাহাতেই ডুবিয়া যায়, আমাদের এ পূজা সে ধর্ম্মধাতুর পূজা নয়। তাহাতে আবার পূজাপাঠ কোথায়? কে কাহার পূজা করে? তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা সেই ধর্ম্মেরই শেষ পরিণাম। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সঙ্কীর্ণ দেশের সঙ্কীর্ণ লোক-সমাজে পড়িয়া সেই ধর্ম্মেরই ইহা শেষ দশা। ইহাতে "নাস্তিরূপ" ধর্ম্ম ক্রমে কচ্ছপরূপে দাঁড়াইয়াছেন।

> নাস্তি রূপং নাস্তি দেহং নাস্তি কায়ো নিনাদম্।
> নাস্তি জন্ম নাস্তি মূর্ত্তিস্তস্মৈ শ্রীধর্ম্মায় নমঃ॥
> কচ্ছপরূপধরং মহী (মহিং) মনোহরম্।
> নির্ল্লেপনিরঞ্জনং শ্রীধর্ম্মায় নমঃ॥

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "Worship of mud turtles" প্রবন্ধ পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, কেমন করিয়া চারি কোণে ও মাঝখানে দাবা ধর্ম্মের স্তূপটি দেখিতে কাছিমের মত বলিয়া ক্রমে ধর্ম্মও কাছিম হইয়া গেলেন।

যাহা হউক, এখন শুনা যাইতেছে যে, কেহ কেহ ধর্ম্মের পূজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ বলিয়া মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মের পূজা শিবেরই পূজা। এই পুথিতে প্রমাণ করিবে, তাঁহাদের ধারণা ভুল। কেন না, ধর্ম্মপূজাতে অনেকগুলি আবরণ-দেবতার পূজা করিতে হয় ও শিব সেই আবরণ-দেবতাদেরই একজন মাত্র। ধর্ম্মের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাদের পূজার ক্রম দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং এই জন্যই "ধর্ম্মপূজাবিধি" পুথি-খানি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে ইহার সঙ্গে আরও দুইটি কথা বলিবার আছে, তাহা শেষ করিয়া পূজার কথা ধরা যাইবে।

১। প্রথম কথা—এই ভাবে ধর্ম্মের পূজা কবে আরম্ভ হইল? কবে ধর্ম্মদেব হিন্দুয়ানীর গহ্বরে পড়িয়া গেলেন? এখন আমাদের এই ধর্ম্মপূজার বক্তা শ্রীরঘুনন্দন।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং গোবিন্দং জগতাং গুরুম্।
ধর্ম্মপূজাবিধানঞ্চ বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ॥

বলা বাহুল্য, রঘুনন্দন কখনও ধর্ম্মের পূজা-পদ্ধতি লিখিবেন, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। ধর্ম্মপূজাকে হিন্দুয়ানীর ভিতরে লইবার জন্যই রঘুনন্দনের নাম লওয়া হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, রঘুনন্দনের অনেক পরে, যখন লোকে তাঁহাকে শাস্ত্রকার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, ইহা তখনকার কথা।

২। আর এক কথা—ধর্ম্মপূজা প্রথমে কোথায় উঠিল? বল্লুকার তীরেই এই পূজার কথা প্রথমে শুনিতে পাই।

ওঁকার শব্দে পণ্ডিত বেদ বৈশস্তি কোন কোন বেদ।
ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্ব আগমবেদ, শুনাইতে শুনিতে পাপ হয় ছেদ॥
সত্য যুগে॥ শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।
ব্রহ্মা হরিহর আছেন গোসাঞির বরাবরে॥
সাটি সহস্র ঋষি আছেন যত সকল মুনি।
চারি ঘাট দাসী আছেন চারি বাহিনী॥—ইত্যাদি

এখন পূজা-পদ্ধতি দেখা যাউক। সকলের আগে গণেশের পূজা। গণেশের ধ্যানে কিছু নূতনত্ব আছে। ধ্যানটি এই;—

স্থূলং সিন্দূরবর্ণং গগনঘনঘটাটোপসৌন্দর্য্যরূপং
খর্ব্বং মূষিকবাহনং ত্রিনয়নং নাগোপবীতং শুভম্।
শ্রীমন্মত্তগজেন্দ্রবক্ত্রমমলং দন্তদ্বয়ং কামদং
বন্দে হস্তচতুষ্টয়ং শশিধরং বিঘ্নেশ্বরং সুন্দরম্॥

এই ভাবে গণেশের পূজা চলিতে লাগিল। তাহার পর বেদির উপরে অষ্টদল পদ্ম বা ষোড়শদল পদ্ম, তাহার উপরে সিংহাসনে ধর্ম্ম বসিলেন। পরে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ির মণ্ডল আঁকা হইল ও সেই মণ্ডলে আবরণ-দেবতারা নিজ নিজ স্থানে বসিলেন। কামিনাদেবী ঈশান কোণে বসিলেন। কোন্ দেবতা কোন্ স্থানে বসিলেন, লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তাহার পর ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ধর্ম্মের ডাক আরম্ভ হইল।

কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন।
দানপতিকে আশীর্ব্বাদ কর অনুক্ষণ॥

তাহার পর কোন্ দেবতা কোন্ ফুলে তুষ্ট, বলা আছে। কামিনা ওড্র ফুলে তুষ্ট, শিব বিল্বপত্রে তুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ তুলসীপত্রে ও ধর্ম্মদেব পদ্মপুষ্পে তুষ্ট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধর্ম্মের সম্মুখে চণ্ডীপাঠ চলিতে লাগিল। ভক্তগণের পূজা আরম্ভ হইল। কলিযুগের ভক্তগণের নাম—কপিলা, নারায়ণ, মণিরাজভট্ট, মুণ্ডির ঘোষ, পূর্ব্বদত্ত, ভীমক, কৌতুক, বিশ্বেশ্বর, আসারা চাণ্ডাল, বরুণ, সগর, মনোরথ পণ্ডিত, পঞ্চসায়েব, সাধুপুর দত্ত ও

ধনকুবের। তাহার পর আসিলেন দ্বারপালগণ। তাহার পর সকলের প্রণাম আরম্ভ হইল। ইহাদের মধ্যে কায়স্থ শঙ্করকে প্রণাম করার কথা আছে। তাহার পর ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম প্রভৃতি। তাহার পর কত রকমের ছড়া আরম্ভ হইল, গায়ন বরণ হইল, যাহার রচিত ধর্ম্মের পালা গাইবে, সংকল্পে তাহার নাম উল্লেখ হইল।

পুথির এক হইতে কুড়ি নম্বর পাতা পর্য্যন্ত এই সকল কথা হইল। ২১ নং পাতার অপর পৃষ্ঠ হইতে আবার এক দুই করিয়া নূতন নম্বর আরম্ভ হইয়া ৯৬ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এইখানে যথাবিধি আবরণ-দেবতাগণের সহিত ধর্ম্মের পূজা আরম্ভ হইল। সঙ্কল্প হইল।

"কাশ্যপগোত্রাণাং দ্বিজসজ্জনানাং মেলকৈর্গণপত্যাদি কামিনাদেবী শ্রীশ্রীধর্ম্মনিরঞ্জনভট্টারক পূজাকর্ম্ম কর্ত্তুং সঙ্কল্পমহং করিষ্যে।" তাহার পর আবার ভূতশুদ্ধি। সমস্ত দেহকে বর্ণময় ভাবা হইল।

আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে
দ্বে পত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।
বাসান্তে বালমধ্যে ডককটসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি ॥

এইবার বিশেষভাবে আবরণ-দেবতাদের সহিত ধর্ম্মের প্রকৃত পূজা আরম্ভ হইল। গণেশের পর আসিলেন সূর্য্য, সূর্য্যের পর বিষ্ণু, বিষ্ণুর পর আসিলেন শিব। ধ্যান সেই "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং"। তারপর নিরঞ্জনের পূজা।

ওঁ যস্যান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্ব্বসঙ্কল্পহীনং
তত্রৈকোঽপি নিরঞ্জনোঽমরবরদঃ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥

এইরূপে অতিদীর্ঘ দীর্ঘ ধ্যান, মন্ত্র ও স্তোত্র সকল আরম্ভ হইল। ইনি শূন্যরূপ, কিন্তু কচ্ছপাকার ও উলুকবাহন। যাহা হউক, অনেক ক্ষণ তাঁহার পূজাতে গেল। পরে তাঁহার বাহন উলুকের পূজা। তাহার পর এখন কামিনাদেবীর অতি সংক্ষেপে একবার পূজা হইল। তারপর ক্রমে লক্ষ্মী, বসুমতী, বিশালাক্ষী ও বিষহরীর পূজা।

বিশালাক্ষী ও বিষহরীর ধ্যান ;—

ওঁ প্রাতঃকালে কুমারী কুমুদকলিকয়া জাপ্যমালাং জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা বিশালা।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালা পতাকা
সা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগতজননী যোগিনী যোগমুদ্রা ॥

ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ।

ওঁ বিশালবদনা দেবী বিশালনয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্যমাংসস্পৃহে দেবি বিশালাক্ষি নমোস্তু তে॥

ততো বিষহরীং পূজয়েৎ।

ওঁ কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং মহিমন্নীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্ব্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমধিপং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্করপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাগুলীম্॥ (?)

ওঁ বিষহার্য্যৈ নমঃ।

ওঁ ফণিফণ-মণিগণ-ভূষিত-মস্তে
খরতর-বিষধর-কঙ্কণ-হস্তে।
বহুজন জনিত-জয়ধ্বনি-তুষ্টে
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে॥

তাহার পর বটুকনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি ভৈরবগণের পূজা। তাহার পর আসিলেন—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা দেবী। তাহার পর বাশুলীর পূজা।

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ও বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্॥
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ইত্যাবাহনম্।

এইরূপে বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডিকার পূজা হইল। পরে সরস্বতী, কুবের, ক্ষীরসমুদ্র, ষষ্ঠী ও ভগবতার পূজা।

ভগবতীর ধ্যান;—

ওঁ গৌরাঙ্গীং বৃষবাহনাং স্মিতমুখীং পীতাম্বরধারিণীং
কেয়ূরাঙ্গদকুণ্ডলোজ্জ্বলতনুং গোগোপীবৃন্দৈঃ স্তুতাম্।
ষষ্ঠীং পাশবরাভয়ানি দধতীং সাম্যং চতুর্ভির্ভুজৈঃ
গোধূলীপরিধূসরাং ভগবতীং গাম্ভারয়ন্তীং ভজে॥

ভগবতীর পর ব্রহ্মা, গরুড় ও বিশ্বকর্ম্মার পূজা। তাহার পর দ্বারীদের পূজা—পূর্ব্বদ্বারে আছেন সূর্য্য, দক্ষিণদ্বারে হনুমান্, পশ্চিমদ্বারে চন্দ্র ও উত্তরদ্বারে গরুড়। তাহার পর নন্দী, কামদেব, বাণেশ্বর ও পণ্ডাসুরের পূজা আছে। তাহার পর দশ দিক্‌পালের পূজা। তাহার পর অস্ত্রসকল ও নবগ্রহের পূজা। তাহার পর পাটপূজা। এই পাটপূজার মধ্যে শ্বেতপণ্ডিত, নীলপণ্ডিত, কংসারি পণ্ডিত ও রামাই পণ্ডিতের পূজা হয়। তাহার পর দণ্ডপূজা ও নবাগ্নি-পূজা—কপিলাগ্নি, পিঙ্গলাগ্নি, ধূম্রাগ্নি, জঠরাগ্নি, শিখিনামক অগ্নি, হাটকাগ্নি, মহাতেজোঽগ্নি, হুতাশনাগ্নি ও রৌদ্রাগ্নি—এই নয়টি অগ্নির পূজা হয়। তাহার পর সূর্য্যার্ঘ ও সূর্য্যের বিস্তৃত পূজা।

তাহার পর নানা দেব-দেবীর, ভক্তবৃন্দের ও নানা দেশের নাম করিয়া এক একটি ফুল দিতে হইবে। ইহার মধ্যে কালু ঘোষ, মণ্ডির ঘোষ, সাধুপুর দত্ত, তাম্বুলি, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বটগ্রাম ও রাজা গৌড়েশ্বরকে ফুল দিবার কথা আছে।

তাহার পর কামিনাস্থাপন ও কামিনা দেবীর বিশেষভাবে পূজা। কামিনা দেবীকে ধর্ম্মেরই শক্তি বলিয়া মনে হয়। কেন না, ধর্ম্মের ধ্যানে কামিনা-সহিতই তাঁহাকে ধ্যান করিবার কথা।

কামিনা দেবীর ধ্যান

ধ্যাত্বা নীলোৎপলাকারাং নীলাঞ্জনসমপ্রভাম্।
আদিত্যস্বাস্তনয়নাং মৌলিচন্দ্রবিভূষিতাম্॥
কামচারুমুখাং দেবীং সদা মদনবিহ্বলাম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্॥
ওঁ নমস্তে কামিনাকুণ্ডে ত্রিদশৈঃ পরিসেবিতে।
অন্ধং কুষ্ঠং হরেদ্দেবী কামিনায়ৈ নমোঽস্তু তে॥
ওঁ নীলজীমূতসঙ্কাশাং সর্ব্বসৌন্দর্য্য-সুপ্রভাম্।
পূর্ণেন্দুসূর্য্যনয়নাং মৌলিচন্দ্র-বিভূষিতাম্॥
সুচারুবদনাং দেবীং সদা মদনবিহ্বলাম্।
সর্ব্বকামেশ্বরীং দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্॥

তাহার পর গাম্ভারী বৃক্ষের পূজা। তাহার পর ভোজ্যোৎসর্গ, পাত্রভোগ প্রভৃতির পর প্রকাণ্ড দিগ্‌ডাক আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে গঙ্গার দুই কূল, বর্দ্ধমান, তমলুক, বিক্রমপুর, বড়গ্রাম, ছোট ভেট্ ও বড় ভেটের ডাক হয়। তাহার পর কামিনা বিসর্জ্জন হইয়া গেলে রমাই পণ্ডিতের নানা রকমের ছড়া আরম্ভ হইল। তাহার পর ছাগবলির ব্যাপার। ইহাতেও রমাই পণ্ডিতের ছড়া আছে। ক্রমে যথাবিধি দক্ষিণান্ত হইল।

অতি সংক্ষেপে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি দেওয়া হইল। দেখা গেল, নানা দেবদেবীর মধ্যে বসিয়া ধর্ম্মঠাকুর কেমন পূজা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যেন আর কেহ ধর্ম্মঠাকুরকে শিব বলিয়া তাঁহার অপমান না করেন।

ওঁ নিরঞ্জনায় ধর্ম্মায় সর্ব্বায় সর্ব্বসাক্ষিণে।
সমস্ত-দেবতা-মৌলিপ্রপূজ্যায় নমো নমঃ॥

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষার উৎপত্তি*

বর্ত্তমান যুগেও এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা লিখিতে বা পড়িতে জানেন না; লিখিত পত্র আসিলে তাঁহারা লেখা-পড়া-জানা লোকের নিকট তাহা পড়াইয়া লয়েন। লিখিত ভাষা উচ্চারণ করিয়া পড়িয়া দিলে, তাহা তাঁহারা বুঝেন অর্থাৎ বাচনিক ভাষা তাঁহারা বুঝেন; কিন্তু লিখন-পদ্ধতির সহিত তাঁহারা পরিচিত নহেন। কারণ, লিপিবিদ্যা শিখিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে নাই। এইরূপ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। শত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন; দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। এইরূপ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ তিন বা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনৈতিহাসিক যুগে মনুষ্য-সমাজে লিপিবিদ্যা একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিই লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। অর্থাৎ জগতে যে কাল হইতে মনুষ্য-জাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে, সে কাল হইতে লিপিবিদ্যার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, জগতে এমন একটা যুগ ছিল, যখন মনুষ্য-জাতি লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন না। দূরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তির নিকট কোনও সংবাদ প্রেরণ অভিপ্রেত হইলে, হয় স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে হইত, আর না হয়, কোনও বিশ্বাসী ভৃত্য বা বন্ধুকে সে স্থানে পাঠাইতে হইত। কাজটা যে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিক সময় নষ্ট হইত, অধিক অর্থ ব্যয় হইত, প্রেরিত ভৃত্যও সময়ে সময়ে পথিমধ্যে দস্যুদল কর্ত্তৃক বা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইত। আবার বিদ্যার প্রসারও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, যাহা কিছু স্মৃতিমধ্যে গ্রথিত থাকিতে পারে, তদতিরিক্ত কিছুরই আলোচনা সম্ভবপর ছিল না। এই সমস্ত অসুবিধা সকলেই অনুভব করিতেন, সুতরাং প্রতিবিধানেরও যথেষ্ট চেষ্টা হইত। এই চেষ্টার ফলে কোনও মনস্বী ব্যক্তি লিপিবিদ্যার আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের পর সকলেই সে বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাটার অত্যন্ত আদর হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বিবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই বহুকাল আবিষ্কৃত লিপিবিদ্যার সহিত আধুনিক যুগের যে সকল ব্যক্তি পরিচিত নহেন, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলে সুকবি গ্রে-লিখিত সুপরিচিত কবিতাবিশেষের দুইটি পংক্তি স্মৃতিপথে উদিত হয়;—

"But knowledge to their eyes did ne'er unroll
Her ample page, rich with the spoils of time."

অর্থাৎ আবহমান কালের ধ্বংসের পরিণতিতে মনুষ্য জাতি যে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

হইয়াছেন, অশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় নাই। কালের বিবর্ত্তনে সম্প্রদায়-বিশেষের তিরোধান হইতেছে ও সম্প্রদায়ান্তরের আবির্ভাব হইতেছে। এই তিরোধান ও আবির্ভাবের মধ্যে মনুষ্য জাতি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। এই সঞ্চিত জ্ঞান সমগ্র মনুষ্য জাতির সম্পত্তি। কিন্তু যাঁহারা এই মহামূল্য সম্পত্তির অংশলাভে বঞ্চিত, তাঁহারা হতভাগ্য।

এইরূপ চিন্তা করিলে আমরা এরূপ একটা অনৈতিহাসিক পর অনুমান করিতে পারি, যখন মনুষ্য কথা কহিতে পারিত না, যখন মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর মধ্যে ভাষাগত কোনও প্রভেদ ছিল না। পরে প্রয়োজনবশতঃ ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে মনুষ্য ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে।

এখানে একটা বক্তব্য আছে। ভাষা শব্দ দ্বারা আমরা কি বুঝি, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক। আচ্ছা, ভাষা দ্বারা আমরা কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। ভাষা দ্বারা আমাদের দুইটি কার্য্য হয়। ভাষা দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে মনোগত ভাবের আদান প্রদান করিয়া থাকি। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলিতে গেলে কথাটা এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়;—যেমন দাত্র দ্বারা ছেদন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, লেখনী দ্বারা লিখন-কার্য্য সমাধা হয়, খনিত্র দ্বারা খনন-কার্য্য হইয়া থাকে, তেমনি ভাষা দ্বারা মনোগত ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। অর্থাৎ দাত্র যেরূপ ছেদন-কার্য্যের সাধনস্বরূপ, লেখনী যেরূপ লিখন-কার্য্যের সাধনস্বরূপ, যষ্টি যেরূপ প্রহার-কার্য্যের সাধনস্বরূপ, ভাষা সেইরূপ মনোভাব প্রকাশ কার্য্যের সাধনস্বরূপ। মনোভাব প্রকাশ ব্যতীতও ভাষার একটি কার্য্য আছে, ভাষা ব্যতীত চিন্তা-বৃত্তির অনুশীলন হয় না। যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা মনে মনে একটা প্রশ্ন করি এবং মনে মনেই তাহার সমাধানের চেষ্টা করি। সুতরাং চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন এক প্রকার কথোপকথন; ইংরাজী ভাষায় বলিলে এ প্রকার কথোপকথনকে dialogue না বলিয়া monologue বলিতে হয়।

এই আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, ভাষা দ্বারা আমরা দুইটি কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকি,—মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন। সুতরাং যে প্রকার মুখোচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর, সেই ধ্বনি বা Articulate soundকে আমরা ভাষা শব্দ দ্বারা বুঝিব। ইংরাজী, বাঙ্গালা বা অন্য কোনও ভাষাবিশেষ মাত্রকে ভাষা শব্দ না বুঝিয়া ভাষা শব্দের দার্শনিক অর্থ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইবে।

কি কি কারণে ও কি কি উপায়ে এই মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তানুশীলনের সাধনীভূত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আলোচ্য। আপনারা বলিতে পারেন, ভগবান্ যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহাকে বিবিধ জ্ঞান ও ভাষার অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, বিশ্বসৃষ্টির নিয়ম এ প্রকার নহে। ভগবান্ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাকে হস্ত-পদাদি ও বুদ্ধিবৃত্তি দান করিয়াছেন। এই সকলের ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য নিজে নিজেই বিবিধ জ্ঞান অর্জ্জন ও স্বীয় জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়া লয়

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজ্যে পূর্ণ থালা তিনি আমাদের মুখের সম্মুখে আনিয়া দেন না; আমরাই তাহা স্ব স্ব উদ্যম ও চেষ্টা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লই। বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা-শক্তি ও চেষ্টা-বৃত্তি আমাদের মধ্যে সংক্রমিত আছে। সৃষ্টি-শক্তির কিয়দংশ তাঁহার সৃষ্ট জীবসমূহকে, বিশেষতঃ মনুষ্যকে তিনি দান করিয়াছেন। সেই শক্তি-প্রভাবেই তৎপ্রদত্ত অন্যান্য উপকরণাদির সাহায্যে মনুষ্য বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় যান, তাড়িত বার্ত্তা, ছায়াচিত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মনুষ্য জাতি কি প্রকারে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে এই জগতে আদিম মনুষ্যগণের আবির্ভাবের চিত্র কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া দেখিতে হয়। মনে করুন, এই পৃথিবীতে ভগবান্ একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মন—এই যাবতীয় ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদিগের কোনও রূপ জ্ঞান নাই। এরূপ অবস্থায় তাহারা কি প্রকারে বিবিধ জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা যাউক। মনে করুন, সেই প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াই ক্ষুধা বা উদরমধ্যে অসহ্য জ্বালা-বিশেষ অনুভব করিল। কারণ, তাহার জ্ঞান না থাকিলেও ক্ষুধা না থাকিবার কোনও কারণ নাই। এই স্থানে দৈব তাহার সহায়তা করিল। বৃক্ষশাখা হইতে তাহার সম্মুখে একটি পক্ক ফল পতিত হইল। সে দেখিল, বৃক্ষশাখায় বসিয়া একটি পক্ষী সেইরূপ ফল খাইতেছে। তাহা দেখিয়া অনুকরণপ্রবৃত্তি বশতঃ মনুষ্য ফলটি খাইয়া ফেলিল। ফলটি খাওয়ায় তাহার উদরমধ্যে যন্ত্রণাবিশেষের অবসান হইল। আবার যখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল, তখন সে পুনরায় ফল ভক্ষণ করিল এবং জ্ঞান লাভ করিল যে, ফল খাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। মনুষ্য কি প্রকারে এই জ্ঞান লাভ করিল, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এখানে প্রয়োজন ও দৈব, এই দুইটি মাত্র কারণের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ক্ষুধার নিবারণ করা তাহার প্রয়োজন হইল এবং ফলভোজী পক্ষী দর্শন ও ভোজনার্থ ফলপ্রাপ্তি দৈবরূপে তাহার সহায়তা করিল এবং অনুকরণ-প্রবৃত্তিবশতঃ মনুষ্য তাহা খাইয়া ক্ষুন্নিবারণের উপায়স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিল। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের কারণ দুইটি বলা যাইতে পারে;—প্রয়োজন ও দৈব। বিনা প্রয়োজনে জ্ঞানার্জ্জন হয় না এবং বিনা দৈব সাহায্যেও জ্ঞানার্জ্জন হয় না। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পণ্ডিতগণ যে মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মূলে এই দেখা যায় যে, জগদীশ্বর প্রথমে জীবের জীবন ধারণের উপযোগী বস্তুজাতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই সকল বস্তুজাতের ব্যবহার করিতে সমর্থ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবী, তৎপরে বৃক্ষ-লতাদি, পরে কীট-পক্ষী প্রভৃতি জীব ও সর্ব্বশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে স্বকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভগবৎ-সৃষ্ট বস্তুসমূহের ব্যবহার করিয়া বিবিধ জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে।

অতঃপর ভাষার কথা। মনুষ্য জাতি পরস্পর একত্র বাস করিতে ভালবাসে। নির্জ্জন-

বাস বা নির্ব্বাসন মনুষ্য জাতির পক্ষে দুঃসহ শাস্তিবিশেষ। এই সামাজিকতাবশতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিবে। অবশ্য মনুষ্য যদি সামাজিক জীব না হইত বা যদি জগতে একটি মাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন হইত না এবং তাহা হইলে ভাষার সৃষ্টিও হইত না। অর্থাৎ মনুষ্য জাতির সামাজিকতাই ভাষা সৃষ্টির প্রধানীভূত কারণ।

যখন মনুষ্য জাতি কোনও ভাষার সহিত পরিচিত ছিল না, তখন কি উপায়ে পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদানপ্রদান সম্ভবপর হইয়া থাকিতে পারে, তাহা আলোচ্য। আমরা দেখি যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিদ্বয় একত্র হইলে সাধারণতঃ অঙ্গ-সঞ্চালন ও মুখভঙ্গির দ্বারা অর্থাৎ বিবিধ সঙ্কেতের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। একটা কল্পনার চিত্র সম্মুখে ধরিয়া কথাটা একটু পরিস্ফুট করিতে হয়। মনে করুন, এক জন সাহেব ডাক্তার ইংলণ্ড হইতে সদ্য আসিয়াছেন। তিনি বঙ্গভাষা জানেন না। দুই জন বাঙ্গালী কৃষক গোশকটারোহণে তাঁহার নিকট আসিল। তন্মধ্যে এক জনের পদ-যষ্টি ক্ষত হইয়াছে। তাহার সঙ্গী সাহেবকে সেলাম করিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালনপূর্ব্বক অপর কৃষকের পদক্ষত প্রদর্শন করিল এবং বঙ্গভাষায় কি বলিল। সাহেব বঙ্গভাষা না বুঝিলেও এই বুঝিলেন যে, লোকটার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে। সাহেব অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা ক্ষত প্রদর্শনপূর্ব্বক ইংরেজী ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক তাহা না বুঝিয়াই একটি বৃক্ষ প্রদর্শন করিয়া তাহার উচ্চ শাখার দিকে অঙ্গুলি উত্তোলনপূর্ব্বক পরে অঙ্গুলি নামাইয়া ভূমি প্রদর্শন করিল এবং বঙ্গভাষায় কি বলিল। সাহেব ভাষা না বুঝিয়াও বুঝিলেন যে, বৃক্ষশাখা হইতে ভূপতনই তাহার এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ। তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

আর একটি বিষয় আমাদের এই উপলক্ষে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশু কি প্রকারে প্রথম ভাষা শিক্ষা করে? সদ্যোজাত শিশু কেবল রোদনের দ্বারাই দুঃখাদির জ্ঞাপন করিয়া থাকে। হর্ষ হাস্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। কিছু কাল পরে সে আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ বিবিধ অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে। সে শব্দের অর্থ বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। তাহার মনোভাব তখনও রোদনাদির দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আরও কিছু কাল পরে অস্ফুট শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে কর-প্রসারণাদি সঙ্কেতের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং পরে "মাম্মা", "দাদ্দা", কাক্কা" প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করে। আরও কিছু কাল পরে এই সকল শব্দের এক একটা অর্থ সে অনুভব করিতে শিখে অর্থাৎ এক একটা শব্দের সহিত এক একটা বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। মাতা, ভগিনী বা অন্যান্য যে সকল আত্মীয়ের মধ্যে শিশু বাস করে, তাঁহারাই এই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া থাকেন। অতঃপর শিশু বিবিধরূপ ধ্বনির উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে। শিশু শুনিল,—বিড়াল ম্যাও

ম্যাও করিতেছে—সেও ম্যাও উচ্চারণ করিল। কুকুর বুক্‌বুক্ করিতেছে শুনিয়া শিশুও উচ্চারণ করিল "বুবু"। কিন্তু এই সময়ে শিশু ভাষা সৃষ্টি করিবার শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। 'ম্যাও' শব্দ তাহার নিকট বিড়ালবাচী, 'বু' শব্দ কুকুরবাচী। এইরূপ অন্যান্য বহু শব্দেরও সে সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মনুষ্য জাতিও সেইরূপই করিয়া থাকিবে। যখন পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইল, তখন সঙ্কেতাদি দ্বারা ভাবপ্রকাশ কার্য্য চলিতে লাগিল এবং সঙ্কেত ও অঙ্গ সঞ্চালনাদির সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা কতিপয় অস্ফুট ধ্বনির উচ্চারণ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহারা বক্তৃতা-কালে হস্তপদাদি সঞ্চালন ও বিবিধরূপ মুখভঙ্গী দ্বারা স্ব স্ব মনোভাবের অর্দ্ধেক প্রকাশ করিয়া ফেলেন। অবশ্য মুখোচ্চারিত ভাষা দ্বারাই মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই-রূপ অতীত কালে মুখোচ্চারিত ভাষা যখন মনুষ্য জাতির অধিগত হয় নাই, তখন অঙ্গ-সঞ্চালনাদির দ্বারা ভাষার কার্য্য চলিত বটে, কিন্তু জিহ্বা নিশ্চেষ্ট থাকিত না। কিরূপ ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বা করিত, তাহার অনুমান করা সহজ নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মনোভাব-জ্ঞাপন যখন উদ্দেশ্য, তখন জিহ্বা বা বাগিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকিত না। আপনারা বলিতে পারেন যে, যদি অঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে মানব দ্বিগুণ পরিশ্রম করিবে কেন? যদি একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ হয়, তবে অন্য ইন্দ্রিয় বৃথা খাটিয়া মরিবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, মনোভাব প্রকাশ করিবার সময়ে বাগিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। কারণ, ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল এইরূপ যে, জিহ্বায় শব্দ করিবার জন্য একটা শক্তি সঞ্চিত থাকে; সেই সঞ্চিত শক্তি-প্রভাবে শিশু আবোল-তাবোল বকিতে থাকে; না বকিলে তাহার জিহ্বা সুড়্‌সুড়্ করে। হর্ষ উপস্থিত হইলেই যেমন হাসি পায়, মনোভাব প্রকাশের ইচ্ছা হইলেই তেমনি বাগিন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। আপনারা বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, প্রসবের পর গোবৎস পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে শুইয়া থাকে। তৎপরে অকস্মাৎ ছুটাছুটি আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আবার শুইয়া থাকে। সদ্যোজাত গোবৎসের এই ছুটাছুটির কারণ কি? কারণ এই যে, গোবৎসের শরীরে ছুটাছুটি করিবার জন্য একটা শক্তি সঞ্চিত থাকে, সেই শক্তির অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত গোবৎস ছুটাছুটি করিতে বাধ্য। ছুটাছুটি না করিলে তাহার পা সুড়্‌সুড়্ করিতে থাকে। এই সুড়্‌সুড়ি নিবারণের জন্য সে ছুটাছুটি করে।

মনোভাব প্রকাশের জন্য অঙ্গসঞ্চালনাদির সহিত যে সকল অব্যক্ত ধ্বনি মনুষ্য উচ্চারণ করিত, সেই ধ্বনিসমূহের কোনও রূপ অর্থ ছিল না। কিন্তু বিবিধরূপ ভাব প্রকাশের জন্য বিবিধরূপ অঙ্গচালনা ও সঙ্গে সঙ্গে বিবিধরূপ ধ্বনির উচ্চারণ হইত। ক্রমে ক্রমে সেই উচ্চা-রিত ধ্বনিসমূহ এক একটা ভাব প্রকাশের শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই ধ্বনিসমূহ ক্রোধ, হর্ষ, বিস্ময়, লজ্জা প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার উপযোগী ভাষা অর্থাৎ বাক্যে পরিণত হয়। সেই

বাক্যসমূহ ক্রমে ক্রমে ক্রোধাদিজ্ঞাপক অব্যয় পদে পরিণত হইয়াছে। ভাষার উৎপত্তির পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, সর্ব্বপ্রথমে অব্যয় পদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এই পদসমূহ সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক এক একটি বাক্য ছিল। ভাষার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে বাক্য, পরে পদ ও সর্ব্বশেষে প্রাতিপদিক উদ্ভূত হইয়াছে। অব্যয় পদসমূহে পদত্ব ও বাক্যত্ব উভয়ই আছে। এখানে বাক্য শব্দ আমি ইংরেজী Sentence অর্থে ব্যবহার করিলাম।

ভাষার ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে আমরা কতিপয় অব্যয় পদ বা বাক্য পাইলাম। দ্বিতীয় স্তরে আমরা ধ্বনির অনুকরণজাত কতিপয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদ্ভব লক্ষ্য করিতে পারি। শিশুর ভাষায় যেমন আমরা বিড়ালবাচী "ম্যাও" শব্দ ও কুকুরবাচী "বুবু" শব্দ লক্ষ্য করিয়াছি, আদিম মনুষ্যগণের ভাষার দ্বিতীয় স্তরে আমরা সেইরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহের উৎপত্তি দেখিতে পাই। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের "শব্দতত্ত্ব" নামক অমূল্য গ্রন্থে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত বহু ধ্বন্যাত্মক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। পৃঃ ২০—২৮।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। ধ্বনির অনুকরণে শব্দের সৃষ্টি সকল জাতি সমান ভাবে করে না। একই ধ্বনির অনুকরণে বিবিধ জাতি বিবিধ শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অম্ল রসের আস্বাদনে জিহ্বা এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। সেই শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে বঙ্গভাষায় "টক" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দী ভাষায় একই কারণে "খাট্টা" শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, বঙ্গভাষায় সাধারণতঃ শব্দের প্রথম অক্ষর উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দী ভাষায় দ্বিতীয় অক্ষর সাধারণতঃ প্রাধান্যের সহিত উচ্চারিত অর্থাৎ accented হয়। ফলে অনেক সময় প্রথম অক্ষর লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন শিশুপালের রাজধানী 'সুপোল', উপাধ্যায় শব্দজ 'ঝা' ইত্যাদি।

ভাষার উৎপত্তির তৃতীয় স্তরে আমরা স্বেচ্ছাকৃত শব্দ-সৃষ্টি দেখিতে পাই। এই স্তরে মনুষ্য এক একটা বস্তুর এক একটা নাম রাখিয়াছে। এক একজন মানুষের যেমন এক একটা নামকরণ হয়, এক একটা বস্তুরও তেমনি এক একটা নামকরণ হইয়াছে। তাই পুষ্প-বিশেষকে আমরা বলি—"গোলাপ," ইংরাজেরা বলেন—"Rose"।

চতুর্থ স্তরে সমাসের উদ্ভব উল্লেখযোগ্য। দুইটি শব্দ একত্র করিয়া একটি শব্দের সৃষ্টিকেই সমাস বলে। আর্য্যভাষায় (Aryan stock এ) সমাসের উদ্ভব বিষয়ে পণ্ডিতদিগের পরি-গৃহীত মত এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। বিবিধ আর্য্য-ভাষাসমূহের পর্য্যালোচনায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম আর্য্য-ভাষায় 'মি' বা 'ম' শব্দ বা পদের অর্থ ছিল "আমি"; 'সি' বা 'হ' শব্দের অর্থ 'তুমি' এবং 'তি' বা 'ত' শব্দের অর্থ "সে"। ম ও সি (আমি ও তুমি) একত্র হইয়া 'মসি' বা আমরা সৃষ্ট হয়। আবার এই সকল ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম-পদ ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ অর্থবোধক সমাপিকা ক্রিয়া বা বাক্য সৃষ্টি করে; যথা—যামি, যাসি,

যাতি, যাযসি প্রভৃতি। ক্রমে ক্রমে এইরূপে প্রত্যয় ও উপসর্গাদির সৃষ্টি হইয়াছে। সে সকল সমাসেরই পরিণতি মাত্র।

অতঃপর একবচন, দ্বিবচন, ত্রিবচন বা বহুবচন; স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ; গুণবাচক ও ভাববাচক পদের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।*

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শতাধিক-পঞ্চবিংশতিতম সূক্তের পঞ্চম সংখ্যক ঋকে বাগ্‌দেবী বলিয়াছেন ;—

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

অর্থাৎ আমি বাগ্দেবী স্বয়ং এই ব্রহ্মাত্মক বেদবাক্য কহিতেছি এবং ইহা দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধার সহিত সেবিত হইয়া থাকে। আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র করিয়া থাকি, তাহাদিগকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পদে উন্নীত করিয়া থাকি, তাহাদিগের অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শন (ঋষিত্ব) লাভ হয় এবং তাহারা অত্যন্ত প্রজ্ঞাশালী হইয়া থাকে।—খাঁটি কথা। ভাষার শক্তি অসীম। ভাষার প্রভাবেই মনুষ্য-সমাজের গঠন, ভাষাই সমাজের বন্ধন এবং ভাষাতেই মনুষ্য ও পশুর পার্থক্য। ভাষা দ্বারাই চিন্তা ও ভাষা দ্বারাই চিন্তার অভিব্যক্তি। সুতরাং চিন্তা দ্বারা মনুষ্য যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, তাহার মূলে ভাষা। জলদচারিণী চপলা এখন ঘরে ঘরে পাখা ঘুরাইতেছে, বিনা তৈলে গৃহে দিবালোক দান করিতেছে এবং পথে ট্রামগাড়ি টানিতেছে। বারিদ-ভোজ্য বাষ্প ষ্টীমার ও রেলগাড়ী চালাইতেছে। গ্রন্থসমূহে আমাদিগকে বিংশতি বৎসরে বিংশ শতাব্দীর অর্জ্জিত জ্ঞান দান করিতেছে। এ সকলের মূলে ভাষা ও ভাষার সাহায্যে চিন্তা। বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি-প্রভাবেই মানুষ ফটো, বায়োস্কোপ, সচল পুত্তলিকা প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তির অংশ গ্রহণ করিয়াছে: তাড়িত বার্ত্তা, ষ্টীমার ও রেলগাড়ীর প্রভাবে আজ মানুষ মহাশক্তিমান্; বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রভাবে অতীন্দ্রিয়দর্শী এবং গ্রন্থাদিতে সঞ্চিত বিদ্যার প্রভাবে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান্।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

ঠাকুর-মা'র ইতিহাস *

"সেই মামা সেই মামী সেই পুকৈর[১] পার ঘর তখন কেন গো মামী হাতে রাখ্ছিলা সর ॥" এই শ্লোকটি পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রচলিত আছে। অনেক লেখক ইহার মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন। আমি ইহার বিস্তৃত বিবরণ আপনাদিগকে উপহার দিতে প্রয়াস পাইব।

শুনিতে পাই যে, বল্লালী আমলে এক এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ প্রায় শতাধিক বিবাহ করিতেন। তাঁহারা প্রথম বিবাহের স্ত্রীরই ভরণ-পোষণ-ভার গ্রহণ করিতেন, তাঁহার আর আর স্ত্রীকে স্ব স্ব পিত্রালয়ে বাস করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে যে সকল স্ত্রী রূপবতী হইত, তাহাদের ভিন্ন অবশিষ্ট স্ত্রীর নাম-মালা স্বামীর 'বিবাহ-বিল-ই" সুশোভিত করিত। কুরূপা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেও সুরূপা স্ত্রীর সংখ্যা একেবারে কম হইত না; অন্ততঃ শতার্দ্ধ। এই শতার্দ্ধ স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে চেনাও পিতার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিত। আর এই সকল পুত্র-কন্যাকে পিতাকেই লালন-পালন করিতে হইত না, তাহারা বাধ্য হইয়া স্ব স্ব মাতুলালয়ে বাস করিত।

ইহাতেও এক বিপদ্ ছিল। যে সকল ছেলে মেয়ে মাতুলালয়ে বাস করিত, তাহাদের মাতুলবর্গ যদিও তাহাদিগকে চক্ষুলজ্জায় কিংবা ঠিক স্নেহ না হউক, অন্য যাহা হউক, একটার জন্য তেমন একটা কিছু বলিতে পারিতেন না—যেমন তেমন করিয়াই হউক, ভাগিনেয়দিগকে ভরণ-পোষণ করিতেন, পরের ঝি (কন্যা) মামী তাহা পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদা ভাগিনেয়দিগের উপর রণোন্মত্তা অসুরনাশিনীর ন্যায় বহ্নিশিখা সম দৃষ্টিবাণ বর্ষণ করিতেন; সময় সময় স্বামীকে দেখাইয়া, কখনও কখনও "ঠাকুরঝির" সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে তাহাদিগকে "কিলটা চাপড়টা" মারিতেন। হয় ত লাঠি উঠাইয়া আসিতেন। সেই কালে সেই সকল মাতুল-পালিত পুত্রকন্যারা ঐ গান গাহিত এবং আরও গাহিত,—

"মামায় দিল চিড়া কলা
দুয়ালে বইয়া খাই—
মামী আইল ঠেঙ্গা লইয়া
দৌল দিয়া যাই।"

এই অবস্থায় সমাজের কর্ত্তারা যখন দেখিলেন যে, যত দিন কৌলিন্য-প্রথা দেশে প্রচলিত থাকিবে, তত দিন জঠর-জ্বালায়ই হউক, কুলরক্ষা করিবার জন্যই হউক, অর্থ-লোভেই

---

* বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি কোনও বৃদ্ধার সহায়তায় লিখিত বলিয়া "ঠাকুর-মা'র-ইতিহাস"—এই নাম দিয়াছি।—লেখক।

১। পুকৈর—পুকুর, পুষ্করিণী।

হউক, আর যাহার জন্যই হউক, কুলীনেরা বহু-বিবাহ ত্যাগ করিবে না, পুত্রকন্যাদিগকেও মাতুল-অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মাতুলানীদিগের সম্মার্জ্জনী, লগুড়াঘাত এবং তীব্র ভৎর্সনায় নিষ্পেষিত এবং খর দৃষ্টিতে ম্লান হইয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, তখন তাঁহারা রমণীদিগের মধ্যে "ক্ষেত্রপাল" নামক এক দেবপূজার প্রচলন করিয়া দিলেন। রমণী-হৃদয় ভক্তিপ্রবণ; তাঁহারা ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে প্রতি বৎসর "ক্ষেত্রপালে"র পূজা করিতে লাগিলেন। এই পূজা অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের যে কোন রবিবার ও বৃহস্পতি বারে হইয়া থাকে। এই সময়ে গৃহস্থের ঘর নূতন "দিঘা" ও "লক্ষী-দিঘা" ধানে পরিপূর্ণ থাকে। এই নূতন ধানের চাউলের "ছাতু", "মূলা," নূতন "গুড়" (খেজুরে গুড়) ও নারিকেলই এই পূজার প্রধান উপকরণ। "ডালায় ডালায়" ছাতু দিতে হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নফর, রাইয়ত, ধোপা নাপিতের নামেও ডালার মধ্যে শক্ত দ্বারা পুত্তলী আঁকিতে হয়। তারপর পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসিলে, আমন ধান্যের সাত একুশ গাছ "মুড়ী" পুড়িতে হয়। পূজা অবসানে পূজার কথা কহিতে হয়। সাধারণতঃ ঠাকুর-মা'রাই সাজাইয়া গুছাইয়া, কথায় রঙ্গ দিয়া পূজার কথা কহিয়া থাকেন—আর তরুণীরা দূর্ব্বা ও ফুল হাতে করিয়া একমনে বসিয়া শুনে। কোন রমণী প্রয়োজনবশতঃ কথা শুনিতে না পারিলে নখ দিয়া তাহার নামে মাটিতে পুত্তলী আঁকিয়া, তার উপর সাত গাছ দূর্ব্বা রাখিয়া দিয়া প্রতিনিধি রাখিয়া যায়। পাঠকগণ পূজার কথা পাঠ করিলেই পূজা-প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নে পূজার কথা ঠাকুর-মা'র ভাষায় অবিকল লিখিত হইল।

এক ব্রাহ্মণ, তার অনেক বিবাহ। আগের বিবাহের যে স্ত্রী, সে-ই ব্রাহ্মণের সংসারে থাকিতে, আর সবই বাপের বাড়ী, ব্রাহ্মণের এক ভগ্নীও ছিল। সে এক পোলা রাখিয়া মরিয়া গিয়াছে। পোলার নাম ভিখারী। মামা তারে "ভিখা ভাইগ্‌না" বলিয়া ডাকিত। ভালও যে না বাস্‌ত, তাও নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণী ভিখারীকে মোটেই ভাল বাসিত না, ব্রাহ্মণী ভিখারে জ্বালা দিত, যন্ত্রণা দিত, খাইতে দিত পোড়া ভাত, পোড়া চাঁছি[১]। কোন কোন দিন ব্রাহ্মণের তাড়নায় ছিটা ফোটা দুধও দিত। কিন্তু সর তুলিয়া রাখিত। ভিখার আছিল বুদ্ধি, আর "ক্ষেত্রপাল" ঠাকুরের উপর খুব বিশ্বাস, সে মামীর রাগে হুঁ-হাঁ কিছুই করিত না, নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইত, হয় তো কান্‌ত[২] আর মনে মনে বল্‌ত—ক্ষেত্তর ঠাকুর! তুমি জান। ভিখা মামীর দেওয়া পোড়া ভাত, পোড়া চাঁছিই ক্ষেত্রপাল ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া খুব খুসী হইয়া খাইত।

ভিখা একটু বড়-সড় হইল। আগে আছিল এক গরু, মামী আর এক গরু রাখিল।

১। চাঁছি—ভাত পোড়া লাগিয়া যাহা বাসনে লাগিয়া থাকে।

২। কান্‌ত—ক্রন্দন করিত।

মামী দুই গরু দিয়া কাউয়া[1] মাটিতে পড়্‌তে না পড়্‌তেই ভিখারে মাঠে পাঠাইয়া দিত। ভিখা দুইটি গরুই চড়াইত।

ভিখা মামীর কাছে যত নরম হইত, মামী ভিখারে ততই আঁটিয়া ধরিত। এক দিন মামী বলিল,—অরে ভিখা! অখন আর গরু লইয়া বাড়ীতে আইথে পারবি না। মাত্র দুইটা গরু, তাগই পেট বরাইতে পারছ না! একেলে ঘোর সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আবি, নইলে রক্ষাও রাখুম[2] না। ভিখাও বিনা ওজরে সেই দুব্বার[3] আগ হইতে শিশির ঝড়তে না ঝড়তেই মাঠে যাইত, আর ঘোর সন্ধ্যার সময় ক্ষুধায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে[4] গরু লইয়া বাড়ী আসিত। মামী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিদিনই বলিত,—"এ্যাঃ। আইছে[5] বড় কাম[6] কইর‍্যা[7]। গরুর না বরছে[8] পেট, না বরছে কিছু! নে গরু গরে[9] নে।"

ভিখা আর কি করে, সে ক্ষেত্রপাল ঠাকুর, তুমি জান, বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কোন প্রকারে হৃদয়ের ভার পাতলা করিয়া লইত। যায়—এমন ভাবে অনেক দিন যায়, ভিখা প্রতি দিনের মত গরু লইয়া মাঠে গেছে। দুই প্রহর বেলা; ঝাঁ ঝাঁ করা রৌদ্র, মাঠে পক্ষীটিও নাই, সব নিঝুম্। ভিখা ক্ষুধায় রৌদ্রে কাতর হইয়া একটা ঝাকড়া হিজোল গাছের ছায়ায় যাইয়া অস্থির হইয়া পড়িল। হিজোল পাতার ফাঁক দিয়া রৌদ্র আসিয়া ভিখার চ'খে মুখে পড়িতেছে দেখিয়া একটা সাপ তার ফণা মেলিয়া ভিখার মুখে ছায়া করিয়া রহিল। এর মধ্যে এক কাণ্ড হইল। এক দেশের রাজা মরছে, পাটহস্তী ঘুরতে আছে, যার কপালে রাজদণ্ড দেখিবে, তারেই নিবে। এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ইহার কিছুই জানে না। সত্য সত্যই পাটহস্তী ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ভিখার কাছে আসিল। পাটহস্তী ভিখার সারা গায়[10] তরল শ্বেতচন্দন-ভার ঢালিয়া দিয়া ভিখারে শুঁড় দিয়া পিঠে উঠাইয়া লইয়া গেল। কেহ দেখিলও না। পাটহস্তী ভিখারে রাজসিংহাসনে বসাইল।

এ দিকে ব্রাহ্মণ ভিখারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ। ব্রাহ্মণের প্রতিবাসীরা বলিতে লাগিল,—"তোর ভিখা জানি কই[11] চইলা গ্যাছে। অলক্ষ্মী বউটা যেমন কষ্ট দিত, হেমন[12] তার আক্কল! দেখ্‌বি হয়!" হাটে মাঠে ঘাটে কেবল কাণাকাণি হইতে লাগিল,—আহা! বেচারী ভিখারে কতই না কষ্ট দিত! ও প্রাণ লইয়া বাচ্‌ছে। যে দিন হাতী ভিখারে নিয়া রাজসিংহাসনে বসাইল, সে দিন হইতে ব্রাহ্মণের ঘরের চালের খড় বিনা বাতাসেই ঝুর ঝুর করিয়া পড়্‌তে লাগিল। ঘরের বেড়া উই পোকায় কাটিয়া

১। কাউয়া—কাক। ২। রাখুম—রাখিব। ৩। দুব্বার—দূর্ব্বার। ৪। কাঁপিতে কাঁপিতে।
৫। আইছে—আসিয়াছে। ৬। কাম—কর্ম্ম। ৭। কইর‍্যা—করিয়া। ৮। বরছে—ভরিয়াছে।
৯। গরে—ঘরে, গোশালায়। ১০। সারা গায়—গায়ের সর্ব্বত্র। ১১। কই—কোথায়।
১২। হেমন—তেমন।

"থার-দরথার" করিয়া দিল ; ব্রাহ্মণের গরু মরিল ; ব্রাহ্মণের দুঃখু, দারিদ্রতা, রোগ শোক, থৈটপাচড়া জড়াইয়া ধরিল। এক দিন খায় ত পাঁচ দিন উপাস করে। ঘরের পাছে এক পুকুর ছিল, তার মধ্যে কল্মীদল উঠ্লো। ব্রাহ্মণের ঘরে বাতি জ্বলে না। উঠানে গোবরছড়া পড়ে না, উঠানে ঘাস, দুব্বা, সেগুলা উঠিয়া গিয়াছে, ঘরের পিড়া ভাঙ্গাচুড়া। একেবারে—উড়ি পুড়ি দক্ষিণ দুয়ারী—হইয়াছে।

দিন যায়—রাত্র আসে, রাত্র যায়—দিন আসে, ব্রাহ্মণের দুঃখু আর ঘোচে না, বরং বাড়ে। এ দিকে ভিখাও রাজা হইয়া পালঙ্কের উপর মহা সুখ-শান্তিতে আছে। কিন্তু সময় সময় মামা মামীর কথা মনে পড়িয়া তাহার সুখ-শান্তি, দালান, বালাখানা, সব যেন মুহূর্ত্তে কালিমাখা হইয়া যায়। মামাবাড়ীর কথা ছাড়া তারা কোথায় থাকে, কিলেন-কি-বৃত্তান্ত, ভিখার কিছুই মনে নাই। কি প্রকারে মামা মামীর সন্ধান পাইবে, সেই চিন্তায় ভিখাও বড় কাতর হইয়া পড়্ল।

ভিখার পাত্রমিত্রেরা বলিতে লাগিল,—"আপনি নতুন রাজা অইছেন, একটা পুকৈরও কাটাইলেন না।" ভিখা বলিল,—"আচ্ছা, বেশ ত, কাটাও।" ভিখা এখন রাজা, যেই কথা, সেই কাজ। ভিখা ঢোল দেওয়াইয়া প্রচার করিল,—"যে এক ওরা[১] মাটি কাট্বে, সে পাঁচ পণ কড়ি পাইবে।"

কথাটা বাতাসের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীও কথাটা শুনিল। ব্রাহ্মণী বলিল,—"যাউক না কেন! কষ্ট করিয়া গেলেও কিছু পাওয়া যাইবে। এম্নে আর কত দিন বাচুম্।"

ব্রাহ্মণীর তাড়নায়, দারুণ পেটের জ্বালায়, ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ কয়েক ওড়া মাটি কাটিয়া কড়ি চাহিল। সকলেই কড়ি লইয়া যায়, ব্রাহ্মণের কথায় কেহই কাণ দেয় না। ভিখা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পুকুর কাটা দেখিতেছিল, এমন সময় মামার প্রতি ভিখার দৃষ্টি পড়িল। ভিখা মামার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ দেখিয়া প্রথমটা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে না পারিলেও শেষে চিনিয়া ফেলিল। ভিখা তাহার একজন চাকরকে বলিল,—দেখ্, ঐ বামনেরে হলদি দিয়া নাওয়াইয়া, খুব ভাল কাপড় পরাইয়া, বেশ করিয়া খাওয়াইয়া এখানে নিয়া আয়।

সকলে ব্রাহ্মণকে হল্দি দিয়া স্নান করাইতে দেখিয়া, নূতন কাপড় পরাইতে দেখিয়া কণাকাণি করিতে লাগিল,—ওরে নিশ্চয়ই নূতন পুকৈরে জল ওঠানের[২] লাইগ্গা[৩] বলি দিবে। এই কথা ব্রাহ্মণীর কাণেও পৌছিল। ব্রাহ্মণীও কান্দিয়া ধূলায় লুটিপুটি হইতে লাগিল। আর ব্রাহ্মণ? তার প্রাণ ত হাওই বাজীর মত উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

১। ওরা—ঝুড়ি। ২। ওঠানের—উঠার জন্ত অর্থাৎ জল আসার জন্ত। ৩। লাইগ্গা—জন্ত।

ব্রাহ্মণের নাওয়া খাওয়া শেষ হইলে, চাকর ব্রাহ্মণকে ভিখার কাছে যেই আনিয়াছে, অম্‌নিই ত ব্রাহ্মণ ভিখারে চিনিয়া ফেলিল। ভিখার ও ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মামায় ভাগিনায় কোলাকুলি হইল। শেষে মামা জিজ্ঞাসা করিল,—তুই এমন অইলি[১] কেম্‌নে[২] ?

ভিখা বলিল,—ক্ষেত্তর ঠাকুরের দয়ায়। ইস্! ক্ষেত্তর ঠাকুরের এত দয়া আইচ্ছা, চখের পলকে যদি এইখান থাইকা[৩] বাড়ী পর্য্যন্ত পাকা সড়ক,[৪] এইখান থাইকা বাড়ী পর্য্যন্ত দুধের নদী, রাস্তার দু'ধারে সারি সারি কলাগাছ উঠে, তবে বুঝুম[৫] তোর ক্ষেত্রপাল দেবতা।

চ'খের পলকে তাই হইল। ব্রাহ্মণও অবাক্। ভিখা বলিল,—"চলেন মামা, মামীকে দেইখা[৬] আসি। ভিখার কথায় হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, লোক-লস্কর[৭] সব সাজিল। শেষে ত মেলা[৮] করিল। এর[৯] মধ্যে ব্রাহ্মণীর কাছে খবর গেল,—বাম্‌নি ল, তোর বাম্‌নেরে ত কাটছেই[১০] তোরেও লোকজন কাট্‌তে আস্‌ছে।"

মামা ভাইগ্‌নার দেখিতে দেখিতে বাড়ী আসিয়া পড়িল। মামী ঢেকি-লতাবনে লুকাইয়া ছিল, দূরে ব্রাহ্মণকে ও ভাইগ্‌নাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল। ভিখারে কোলে লইয়া শত শত চুমা দিল। মামী ভাইগ্‌নার চক্ষু দিয়া ছল ছল জল পড়্‌তে লাগল।

তার পর দিন ভিখা এক মস্ত বড় নিমন্ত্রণ দিল। কথা হইল, মামী পরিবেশন করিবে। ভিখা সভার মধ্যে মামার কাছে খাইতে বসিল। আজ কিন্তু মামী ভাল ভাল জিনিষ সব ভিখার পাতে দিতে লাগিল। শেষে যখন দুধের উপর একখানা মস্ত সর দিয়া ভিখারে দুধ খাইতে দিলেন, তখন সে বলিল,—

"সেই মামা সেই মামী, সেই পুকৈরপার ঘর।
তখন কেন গো মামী হাতে রাখছিলে সর ?"

মামী ত জিহ্বায় কামড় দিল—সে যেন সভার মধ্যে সরমে মরিয়া গেল।

ভিখার মামা বলিল,—"আমার ভিখা ক্ষেত্তরপাল ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জাস্ত না—তাঁরেই পূজা কর্‌ত, তাঁরেই মান্‌ত, তাঁরেই চিন্‌ত। তার লাইগা[১১] ভিখার অবস্থা ফিরছে। সভার লোক বলিল,—"এমন দেবতা নি ঘরে রাখে ? পৃথিবী ভইরা আড়াই

১। অইলি—হইলি। ২। কেম্‌নে—কি প্রকারে, কেমনে। ৩। থাইকা—হইতে।
৪। সড়ক—রাস্তা। ৫। বুঝুম—বুঝিব। ৬। দেইখা—দেখিয়া।
৭। লোক লস্কর—সৈন্য সামন্ত। ৮। মেলা—যাত্রা। ৯। এর—ইহার।
১০। কাটছেই—কাটিয়াছেই। ১১। লাইগা—জন্য।

অক্ষর লেইখা[1] দেও—যে এই পূজা করবে, তার ধন দৌলত ঐশ্বর্য্য অইবং[2] দুঃখু দারিদ্র সারবও[3], সুখে শান্তিতে থাক্‌বে।

আড়াই অক্ষর লেইখা দিল। দেশে দেশে এইপ্রকার প্রচার হইল। মামা মামী ভিখারে বিবাহ করাইয়া স্বর্গে গেল। সুখে শান্তিতে রাজত্ব করিতে লাগিল।*

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১। লেইখা—লিখিয়া। ২। অইব—হইবে। ৩। সারব—সারিবে।

* তখন হইতেই নাকি—

"মামা ভাইগ্‌না যেইখানে, আপদ্ নাই সেইখানে" এই কথার উৎপত্তি।—লেখক।

একখানি খোদিত তাম্রফলক*

রঙ্গপুর, নাওডাঙ্গানিবাসী যাজনিক ব্যবসায়ী স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন প্রায় সমচতুষ্কোণ এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রদান করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথায় কিরূপ ভাবে উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ফলকখানির অবস্থা দেখিয়া উহা যে বহু দিন অযত্নে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল, তাহা বেশ অনুমান হইয়াছিল। তাম্রফলকখানির এক পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম খোদিত। প্রতি দলে যথাক্রমে মৎস্যাদি দশাবতার-মূর্ত্তি অঙ্কিত। তাম্রফলকখানি বহু কাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায়, মূর্ত্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও বেশ চিনিতে পারা যায়। মৎস্য ও কূর্ম্মের মূর্ত্তি সাধারণ নরমূর্ত্তির ন্যায়। ধ্যানের সহিত উক্ত চিত্রদ্বয়ের আদৌ মিল নাই। কিন্তু বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী মূর্ত্তি অনেকটা ধ্যানানুরূপ। মূর্ত্তি-সমাবেশে শিল্পী প্রচলিত শাস্ত্রীয় নিদেশ লঙ্ঘন করিয়া রামের পর পরশুরামের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপ শাস্ত্র-বাক্যের বিরুদ্ধাচরণের কারণ শিল্পীর অনভিজ্ঞতা, না অন্য কিছু, ঐতিহাসিকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। দশাবতারের মূর্ত্তি-খোদিত পদ্মটি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত একটি বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। চারি কোণ চারিটি লতা-পল্লবযুক্ত সুশোভন চিত্রে সমলঙ্কৃত। ফলকখানির অপর পৃষ্ঠে নয়টি প্রকোষ্ঠ। মধ্য প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্ত্তি শতদল পদ্মের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট। ঊর্দ্ধের দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে চক্র, নিম্ন হস্তদ্বয় জানূপরি উত্তানভাবে সংবিন্যস্ত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে চামর ও পদ্মধারিণী লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং বাম প্রকোষ্ঠে বীণাবাদনশীলা সরস্বতী-মূর্ত্তি খোদিত। শ্রীমূর্ত্তির শীর্ষদেশে একটি কমলাসনা স্ত্রীমূর্ত্তি আসীনা; দ্বিভুজা, কি চতুর্ভুজা, ঠিক বুঝা যায় না। দেবীকে উভয় পার্শ্ব হইতে দুই করিকরোত্থিত পূর্ণকুম্ভে অভিসিক্তি হইতে দেখিয়া দশ-মহাবিদ্যার শেষ মহাবিদ্যা কমলা মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। নিম্নের মধ্য প্রকোষ্ঠে যুক্তকর গরুড়-মূর্ত্তি অঙ্কিত। চারি কোণের চারিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি পঞ্চদল পদ্মে পরিশোভিত। ফলক-খানির চারি ধারে প্রথম জাফরী কাটা। চিত্রগুলি ভাস্কর্য্য শিল্পের অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন। দেখিলেই কোন অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার "দশ অবতার প্রস্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত এইরূপ চিত্রাঙ্কিত যে কয়েকখানি প্রস্তর-ফলকের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১নং প্রস্তর-ফলকখানির সহিত আমার এই তাম্রফলক-খানির বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৩১৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে তাঁহার "উত্তর-বঙ্গে পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কতিপয় অক্ষত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি-চিহ্নের সহিত এইরূপ একখানি প্রস্তর-ফলকের চিত্র প্রকাশ করিয়া উহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সমন্বয়-চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর নিজের কথা এই ;—"বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম (বগুড়া জেলায়)। তথায় কতকগুলি পুরাতন দেব-মন্দির বর্ত্তমান আছে। * * যেখানে *মন্দির ছিল, সেখানে এখনও ইষ্টক-প্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।* তথায় অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় সমচতুষ্কোণ ;—তাহার উভয় পৃষ্ঠে নানা মূর্ত্তি খোদিত আছে।"

"এক পৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত আছে। তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠে একটি যোগাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্ত্তি,—উপরের দুই হস্তে গদা, পদ্ম, নীচের দুই হস্ত জানু-বিন্যস্ত,—দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোজনা করিয়া তাহাকে শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির পদতলের প্রকোষ্ঠে যে সকল বিচিত্র কারুকার্য্য খোদিত ছিল, তাহারই অংশবিশেষ পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি গরুড়-মূর্ত্তির আভাস প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বের বা শীর্ষদেশের প্রকোষ্ঠগুলির অন্যান্য খোদিত মূর্ত্তির কোন পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রস্তর-ফলকের বৌদ্ধ কীর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। শ্রীমূর্ত্তির শীর্ষদেশে আর একটি যোগাসনে উপবিষ্ট দ্বিভুজ মূর্ত্তি, দুই দিক্ হইতে দুইটি হস্তী তাহার মস্তকে জলসেক করিতেছে। ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাঁচি স্তূপের পূর্ব্বদ্বারে সংযুক্ত আছে। সুতরাং ইহা যে বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে সমন্বয়-যুগে নারায়ণ-বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যথাসাধ্য রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অপর পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম—তাহার প্রতি দলে বিষ্ণুর দশাবতারের এক একটি চিত্র খোদিত করা হইয়াছে। * * * * । উভয় পৃষ্ঠের শিল্প-কৌশলের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—দশাবতার অঙ্কণের শিল্প-কৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত যে দুইখানি অতিরিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার শিল্প-কৌশলও তদ্রূপ। ইহাতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। পাল নরপালগণের শাসন সময়ে ধর্ম্ম-সমন্বয় সাধিত হইবার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই। তাঁহারা মহাভারত পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিতেন, মহাসামন্তাধিপতির আবেদনে শ্রীমন্নারায়ণ-বিগ্রহ স্থাপনার জন্য ভূমিদান করিতেন ;—এইরূপ নানা প্রমাণ তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সহিত অগ্নি ও তরবারির আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য নাই।"

অক্ষয় বাবুর এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ ভট্টশালী মহাশয়ের "দশ অবতার প্রস্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা। সত্য বটে, বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ লীলাক্ষেত্র উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়-চেষ্টার প্রমাণ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিম্ন স্তরে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রবেশ-লাভের নিদর্শনও উত্তরবঙ্গে বিরল নহে। বৌদ্ধ দেবতা গোরক্ষনাথ অদ্যাপি

হিন্দু দেবতারূপে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ আজও সর্ব্বাগ্রে গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে দেবী বুড়েশ্বরীর পূজা প্রচলিত। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে বুড়েশ্বরী পূজার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধ সাধিকা রাণী ময়নামতী বুড়েশ্বরীর আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিঙ্গে যে শিবলিঙ্গ হিন্দুর নিকট দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিব নামে অভিহিত, বৌদ্ধ লামাগণকে আবার সেই হিন্দুর দেবতাকেই মহাকালরূপে অর্চ্চনা করিতে দেখিয়াছি। বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের এরূপ বহু দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হইলেও আলোচ্য ফলকগুলিকে পরিবর্ত্তিত বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নলিনী বাবু তাঁহার প্রবন্ধে অক্ষয় বাবুর সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, নানা স্থানে একইরূপ চিত্রাঙ্কিত তাম্র ও প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাঁহার সেই যুক্তিগুলি আরও দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বহু বাসুদেব-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় সকল মূর্ত্তিরই বামে দক্ষিণে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি খোদিত। শ্রীমূর্ত্তির পদতলস্থ গরুড়ের চিত্র অন্ততঃ আমাদের আলোচ্য এই তাম্রফলকখানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট; উহা কারুকার্য্যের অংশবিশেষ পরিবর্ত্তনের দ্বারা গরুড়-মূর্ত্তির আভাস মাত্র নহে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলেও দ্বিভুজ মূর্ত্তির সহিত অতিরিক্ত হস্তদ্বয় সংযোজনার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। উভয় পৃষ্ঠের মধ্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পেরও কোনরূপ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা অনুভব করা যায় না। শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তির মস্তকোপরি পদ্মাসনা নারীমূর্ত্তিটি যে দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত কমলা-মূর্ত্তি, সে বিষয়েও সংশয় করিবার কিছুই নাই। অপরিপক্ক শিল্পীর রচনায় দেবীর চতুর্ভুজ সুস্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ না হইলেও দ্বিভুজা পরিকল্পনা সুসঙ্গত নহে। তবে সমস্যা এই যে, ফলকগুলি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত? নলিনী বাবু তৎসম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখা যায় যে, চণ্ডীর মন্দিরে সিংহমূর্ত্তি উপহার দেওয়া, শিবের মন্দিরে বৃষ উপহার দেওয়া, বিষ্ণু-মন্দিরে গরুড়মূর্ত্তি উপহার দেওয়া বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত।...এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিও হয় ত বিষ্ণুমন্দিরে মানসিক করিয়া উপহার প্রদত্ত হইত। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নিদেশ খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ পাইয়া থাকিলে জানাইলে বাধিত হইব। * * * *

এ প্রস্তরগুলির গঠনভঙ্গি ও অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিয়া এগুলি আর এক ব্যবহারে লাগিত বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মী পূজার সময় আজ কাল একটি মৃত্তিকার শরায়ও পূজা দেওয়া হয়। এই শরার পৃষ্ঠে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবী-মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মী পূজার সময় কুম্ভকার ও নগ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা হাজার হাজার বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া আসে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একখানা করিয়া এই শরা কিনিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা ৴০ আনা বা ।০ আনা করিয়া বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক

হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য ক্রেতব্য বলিয়া লক্ষ্মী পূজায় হাটে উহার মূল্য সময় সময় ১৲—১।০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

এই চিত্রাঙ্কিত শরাগুলি সাধারণতঃ "লক্ষ্মী শরা" নামে অভিহিত হয়। আমার মনে হইতেছে যে, এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি হয় ত প্রাচীন কালে লক্ষ্মী শরার কাজ করিত। *প্রমাণ কিছুই নাই, তবে সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ মনে হয়, এই মাত্র।"*

ইহা সিদ্ধান্ত নহে, অনুমান মাত্র। আমরাও দেখিতে পাই, কোন কোন ব্রতে স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত লক্ষ্মী-জনার্দ্দন-মূর্ত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। অবস্থা-ভেদে অসামর্থ্য স্থলে তৎপরিবর্ত্তে তাম্র বা প্রস্তর-ফলকোৎকীর্ণ মূর্ত্তি প্রদত্ত এবং তাহাকে অধিকতর সুশোভন করিবার জন্য অন্যান্য চিত্র খোদিত হইত কি না, বলিতে পারি না। ফলতঃ যে উদ্দেশ্যেই হউক, এক কালে এইরূপ ফলক যে বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বিভিন্ন স্থানে একই প্রকারের চিত্রাঙ্কিত প্রস্তর ও তাম্রফলক আবিষ্কৃত হওয়ায়, দ্বিভুজ বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত অতিরিক্ত হস্ত সংযোজনা পূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর সিদ্ধান্ত কত দূর অভ্রান্ত বলিয়া পরিগ্রহণযোগ্য, অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণকে তাহার আলোচনা করিয়া সত্য নিষ্কাষণ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ যে তাম্রপট্টখানি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে প্রস্তরে এই জাতীয় প্রস্তর-মূর্ত্তি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা মিউজিয়ামে, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নিকটে ও তাঁহার এক বন্ধুর নিকটে অনেকগুলি এই জাতীয় প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতেও এই জাতীয় দুই একখানি মূর্ত্তি আছে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বগুড়া জেলায় বেল-আমলা গ্রামে আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মূর্ত্তির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (প্রবাসী ৮ম ভাগ, ৩৭ পৃষ্ঠা)। মৈত্রেয় মহাশয় উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই এই জাতীয় মূর্ত্তিকে "শ্রীমন্নারায়ণ মূর্ত্তি" নামকরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩২১ সালে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তির বিবরণ দিয়া ইহার "দশ অবতার প্রস্তর" নাম দিয়াছিলেন। "শ্রীমন্নারায়ণ" নামের কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। কোন মূর্ত্তির ধ্যানোল্লিখিত নাম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার যথেচ্ছ নামকরণ বিজ্ঞানসম্মত নহে। ভট্টশালী মহাশয়ের প্রদত্ত নাম 'Tentative nomenclature' হিসাবে চলিতে পারে, কিন্তু ইহাতেও দুইটি বিশেষ আপত্তি আছে ;—

১। প্রস্তরে খোদিত এক পঙ্‌ক্তিতে সজ্জিত বহু দশাবতার-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকেও কি কারণে "দশাবতার প্রস্তর" বলা যাইবে না? নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে

দশাবতার-মূর্ত্তি ব্যতীত পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। সুতরাং দশাবতার-প্রস্তর বলিলে নামকরণ সম্পূর্ণ হয় না।

২। এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তি যখন ধাতুতেও নির্ম্মিত হইত, তখন ইহাকে কেমন করিয়া "দশাবতার প্রস্তর" বলা যাইতে পারে?

এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে এক পৃষ্ঠে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকে; ইহার মধ্যের প্রকোষ্ঠে নারায়ণ-মূর্ত্তি ও তাহার পার্শ্বের দুই প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি, উপরের প্রকোষ্ঠে কমলাত্মিকা মূর্ত্তি ও নিম্নের প্রকোষ্ঠে গরুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত বা খোদিত থাকে। ভট্টশালী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূর্ত্তিদ্বয়ের চিত্রে এই পাঁচটি ব্যতীত আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে এবং প্রতি প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরমূর্ত্তি বা দেবমূর্ত্তি আছে। তাম্রপট্টে অবশিষ্ট চারিটি প্রকোষ্ঠে এক একটি চতুর্দ্দল পুষ্প বা পদ্ম আছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে একটি দশদল পদ্ম খোদিত থাকে এবং প্রত্যেক দলের উপরে দশাবতারের এক এক অবতারের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাবধি দশাবতারের যত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রথম অবতারদ্বয়ের স্থানে মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি খোদিত থাকে, কিন্তু এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে মৎস্য ও কূর্ম্মের পরিবর্ত্তে পদ্মের প্রথম দুইটি দলে দুইটি চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ভট্টশালী মহাশয়ের প্রকাশিত চিত্রদ্বয় অস্পষ্ট, কিন্তু তাহাতেও বোধ হয়, মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নারায়ণ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় মূর্ত্তিতে মৈত্রেয় মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত বৌদ্ধমূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ বলিয়াছেন,—"চিত্রগুলি ভাস্কার্য্য শিল্পের অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন। দেখিলেই কোন অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলিয়া প্রতীতি জন্মে।" অর্চ্চনাকালে জলধারা-বর্ষণে এবং ভূগর্ভে প্রোথিত থাকার জন্য মূর্ত্তিটি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেহানবীশ মহাশয় সেই জন্যই বোধ হয়, শিল্পীর কলানৈপুণ্য লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এমন সুন্দর ধাতুমূর্ত্তি অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। গঠনপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে, তাম্রপট্টখানি খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দশাবতারের যে সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটিতে রামের পূর্ব্বে এবং কোনটিতে রামের পরে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত থাকে, সুতরাং এই বিষয়ে নূতন জাতীয় মূর্ত্তির কোন বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতার চিত্রশালায় এক খণ্ড প্রস্তরের দুই দিকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি খোদিত অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। কোনটিতে এক দিকে বিষ্ণু ও অপর দিকে সূর্য্য, কোনটিতে এক দিকে বিষ্ণু ও অপর দিকে শিব-দুর্গা, কোনটিতে বা এক দিকে কার্ত্তিকেয় ও অপর দিকে গণেশের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই অজ্ঞাতনামা নূতন জাতীয় মূর্ত্তি বোধ হয়, এই দ্বিবিধ মূর্ত্তিযুক্ত নিদর্শন জাতীয়। গৌড়, বঙ্গ ও মগধে আবিষ্কৃত কতকগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রতিমার চালে দশাবতারের দশবিধ মূর্ত্তি খোদিত

দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য পরিসরের মধ্যে সানুচর চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি এবং দশাবতারের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই কি এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল? শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি মূর্ত্তির চিত্রে অর্দ্ধোপবিষ্ট (অর্থাৎ অর্দ্ধ-পর্য্যঙ্ক-নিষণ্ণ, ইহাই ধ্যান বা সাধনার লক্ষ) নারায়ণের মূর্ত্তি আছে। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী অর্দ্ধপর্য্যঙ্ক-নিষণ্ণ আর একখানি মাত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অষ্টধাতুনির্ম্মিত এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘির নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা পরিষদে আনীত হইয়াছে[১]।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

---

১ A Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, 1911. pp. 5-6, no. 22,

সুবর্ণবিহারের স্তূপ*

নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে নবদ্বীপের পথে সুবর্ণবিহার একটি প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত পল্লী। এই সুবর্ণবিহার নবদ্বীপপরিক্রমায় উক্ত প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত 'গোক্রমদ্বীপে' অবস্থিত। বর্তমান 'গা(ই)দগাছা' 'গোক্রমদ্বীপে'র অবশেষ মাত্র। গ্রামের আধ মাইল পশ্চিমে সুবর্ণবিহারের স্তূপ। ইহাকে এখন 'মে(ই)-দের বনের ঢিপি" বলে।' স্তূপের চতুর্দ্দিকের ভূমি ক্ষুদ্র ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডে ব্যাপ্ত। মাঠে বা গ্রামে অন্য ঢিপি দেখা যায় না। স্তূপটি লালচে মাটি, ছোট ছোট পাতলা ইট ও পাথরের টকরায় গড়া। ইট বা পাথরগুলির উপরে নক্সা কচিৎ দেখা যায়। সে দিন স্তূপে দুইখানি ইট পাইয়াছি; তাহার উপরে পুষ্পচিহ্ন বা শৃগালের পদচিহ্ন রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে একখানি ইট খুব কালো; তাহার উপরের চিহ্ন অন্যটির উপরের চিহ্ন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। মধ্যে স্তূপের মাঠে একখানি নক্সা-কাটা ইট পাইয়াছি। স্তূপে মাটির কালো বাসনের খণ্ড পাইয়াছি। এইরূপ মাটির বাসনের খণ্ড 'বল্লালঢিপি'তেও পাওয়া গিয়াছে। এ খণ্ডগুলি স্থূল মৃৎপাত্রের; বল্লালঢিপিতে প্রাপ্ত খণ্ড সুবর্ণবিহার-স্তূপে প্রাপ্ত খণ্ড অপেক্ষা কিছু পাতলা। গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, গ্রামের মধ্যে বাগদীপাড়ায় মাটির নীচে একটি প্রাচীর পাওয়া গিয়াছিল। ঢিপির কাছে লাঙ্গল চষিবার সময়ে কতকগুলি ভাঁজ করা জীর্ণ রেশমী বা তসরের কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি তুলিবার সময়ে গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ কাপড় বল্লাল-ঢিপিতেও পাওয়া গিয়াছিল। সে স্থানের মোল্লা সাহেব কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েকখানি বারকোস, কয়েকটি মুদ্রা ও কাপড় খুঁড়িয়া পাইয়াছিলেন (Hunter's Statistical Account of Bengal)। শুনিলাম, জমিদার পালচৌধুরী মহাশয় খনন করিয়া এই ঢিপি হইতে তিন খণ্ড প্রস্তর পাইয়াছিলেন। ইহাদের একটি আমঘাটাতে, আর একটি মহেশগঞ্জে আছে ও অন্যটি সুবর্ণবিহার গ্রামে দেখিলাম। তাহার উপরে অস্পষ্ট চিহ্নাদি উৎকীর্ণ দেখিলাম। কথিত আছে, সুবর্ণবিহারের স্তূপের ইষ্টকে গঙ্গাবাসের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে প্রাসাদ এখন ভগ্ন ও জঙ্গলময়। কথিত আছে যে, সুবর্ণরাজার সময়ে কৃষ্ণনগরের অদূরবর্ত্তী 'চাম্‌টার বিল', সুবর্ণ-বিহারের সান-বাঁধার ঘাট ও গঙ্গাবাস-কাশীবাস দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল।

মে'দের বনের ঢিপির বেষ্টনী প্রায় ৪৮০ হাত, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ হাত, প্রস্থ প্রায় ১২৫ হাত ও খাড়াই প্রায় ১০ হাত। স্তূপের পশ্চিমভাগে একটি গর্ত্ত আছে। সেটির বিস্তার প্রায় ২৫ হাত ও গভীরতা প্রায় ১১ হাত। গর্ত্তের জল-নিকাশের কোন নালা নাই। নদীও

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এখান হইতে এক মাইল দূরে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, অত্যধিক বারিপাতেও গর্ত্তে দুই ঘণ্টার বেশী জল জমিয়া থাকিতে দেখা যায় না।

সুবর্ণবিহারের স্তূপ খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রায় চারি মাইল উত্তরে জলঙ্গী (খড়িয়া) নদীর অপর পারে বল্লালঢিপি (দমদমা) প্রায় ইহার দ্বিগুণ উচ্চ। উক্ত ঢিপিকে লোকে রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলে। স্তূপটি ছোট পাহাড়ের মত প্রায় গোলাকার। এখানেও কালো পাথরের কুচি ও ইট দেখা যায়। ইহার উত্তর দিক্ দিয়া গঙ্গার খাল বাহিত। ইহার কিঞ্চিদধিক এক মাইল দক্ষিণে বল্লালদীঘির অবশেষ প্রায় এক মাইল জুড়িয়া রহিয়াছে। তাহার দূরপ্রান্তে চৈতন্যের জন্মভূমি মায়াপুর বামনাকুলায় দিয়া আমরা দেখিলাম। দীঘির ধারে উচু-নীচু জমি কোন অতীত দুর্গের অবশেষ বলিয়া বোধ হইল। স্থানটির অতীত সমৃদ্ধির ছায়া যেন চতুর্দ্দিকের বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ, বাগবাগিচা ও গ্রামসন্নিবেশকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। ঢিপিটার উত্তর দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর বিস্তৃত রহিয়াছে। অদূরে নবদ্বীপের কোণে ভাগীরথীর তটদেশের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। বল্লালঢিপির নিকটে চাঁদকাজীর কবর এখনও আছে।

এখন সুবর্ণ রাজার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কিংবদন্তী আছে, সুবর্ণরাজা বর্গির আক্রমণে পাতালপুরীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাতালের দেউড়িতে পাথর চাপাইতে ও তুলিতে রাজার ভৃত্য এক সন্ন্যাসীই কেবল জানিত। রাজার সপরিজনে ও সধনে পাতাল-প্রবেশের পর সে দেউড়িতে পাথর দিয়া বাঁশী হাতে গাছে লুকাইল। পরে সে মৃত্যুতাবশে আক্রমণকারীদের হস্তে নিপাতিত হইল, আর রাজা সেই পাতাল-ভবনে জীবন্ত সমাধি লাভ করিলেন। এই হইল সুবর্ণ-রাজার সকরুণ জীবনান্ত-কাহিনী।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রবাদ এক নদীয়া জেলাতেই আমদহ, বল্লালঢিপি প্রভৃতি পাঁচটি স্থানের পুরাতন বংশের অধঃপতনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। বল্লালঢিপিতে সেনবংশের পতনের সহিত বর্গির হাঙ্গামার সম্বন্ধটা নিতান্ত হাস্যজনক। বর্গির হাঙ্গামাজনিত দেশব্যাপী আতঙ্ক এখন কালের অস্পষ্ট ছায়াতে অনেক বংশেরই পতন ঐ বর্গির ঘাড়ে আরোপ করিতে চলিয়াছে।

প্রাচীন কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণনা হইতে সুবর্ণ-বিহারে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও কোন রাজার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আছে,—

সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এ গ্রামে যে বিলাস॥

গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে রাজার এক স্বপ্ন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে,—

ভকতবৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
স্বপ্নযোগে লীলাশ্চর্য্য দেখায় রাজায়॥

চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বাজে নানা বাদ্য গানে মোহয়ে ভুবন ॥
সে সবার মাঝে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দর কায় যেন সুধারাশি ॥

* * * * *

সেই ক্ষণে দেখে তাঁরে সুবর্ণবরণ।
সুবর্ণবিগ্রহের বিচার হৈল ধ্যান ॥
এই হেতু সুবর্ণবিহার নাম স্থান।

গ্রামের নামে 'বিহার' শব্দের যোগ থাকাতে অনেকে অনুমান করেন যে, সুবর্ণ রাজা বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন ও সুবর্ণবিহার বৌদ্ধ মঠ ছিল। বাঙ্গালা দেশে অনেক স্থানের নামের সঙ্গে 'বিহার' শব্দের যোগ আছে। অনেক স্থলে এরূপ নামধারী গ্রামে বিহারের ধ্বংসাবশেষও আছে। বগুড়া জেলায় ভাসুবিহার ও রাজসাহী জেলায় হলুদবিহার নামক স্থান পরিচিত, পূজ্যপাদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পত্রে লিখিয়াছিলেন।

পাল রাজারা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের অধীশ্বর হন, সুবর্ণ-বিহারের বর্ত্তমান অবস্থান তখনকার পাল-রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে নবদ্বীপ-বল্লাল-ঢিপিতে সেন-রাজধানী স্থাপিত হয়। সুবর্ণবিহারের রাজার পতনের সহিত বল্লালঢিপির রাজার অভ্যুদয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না*। (এক জনের মুখে শুনিয়াছি যে, সুবর্ণবিহারে লক্ষ্মণ সেনের সুবর্ণা নামে উপপত্নী ছিল)।

সুবর্ণ-বিহারের স্তূপের খনন ব্যতীত সত্য নির্ণয় দুরূহ। সে জন্য আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি। শুনিলাম, মূর্ত্তি ও খোদিত চিত্রাদিযুক্ত কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল। সেগুলি

---

* সুবর্ণ নামে যে বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে কোন রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বাবু পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বৌদ্ধ নরপতি সুবর্ণচন্দ্র (যশ্চন্দ্রোপপদো বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ), রাধাগোবিন্দ বাবুর আলোচিত রোহিতগিরি বর্ত্তমান রোটাস্‌গড়ের মৃগলাঞ্ছন বৌদ্ধ সুবর্ণচন্দ্র (রোহিতগিরিভূজাং বংশে ভাৎ বিশালশ্রিয়াং) এবং দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রগীতে' গোবিন্দ-চন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ও ধর্ম্মপালের আত্মীয় মহারাজা সুবর্ণচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রগীতে লিখিত আছে,—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা খাড়ীচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥

এই মহারাজা সুবর্ণের রাজত্বকাল দশম শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী।

বস্তায় মাটিতে নাকি চাপা পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সুবর্ণবিহারের স্তূপ খনন করিলে ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। গর্ত্তে প্রোথিত চক্রাকার প্রস্তর পাতাল-পুরীর কোন স্তম্ভের অগ্রভাগ হইলেও হইতে পারে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

বৌদ্ধ ন্যায়*

ত্রিপিটকে ন্যায়ের উল্লেখ

অনুমান খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব হয়। তেপিটক বা ত্রিপিটক ঐ সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়-প্রতিপাদ্য বিষয়ের আশানুরূপ উল্লেখ নাই। ত্রিপিটকে ন্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

ত্রিপিটকে "গোতমক" বা "গৌতমক" নামক একটি সম্প্রদায়ের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা ন্যায়শাস্ত্র-প্রণেতা গোতমের শিষ্যপরম্পরা কি না, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ত্রিপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তরনিকায়, ধম্মসঙ্গণী প্রভৃতি গ্রন্থের মতে বিজ্ঞান ছয় প্রকার; যথা,—(১) চক্ষুর্বিজ্ঞান, (২) শ্রোত্রবিজ্ঞান, (৩) ঘ্রাণবিজ্ঞান, (৪) রসনাবিজ্ঞান, (৫) কায়-বিজ্ঞান ও (৬) মনোবিজ্ঞান। মহর্ষি গোতমকৃত ন্যায়সূত্রেও এই ছয় প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি যেরূপ এই সকল জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তর্কবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ত্রিপিটকে সেরূপ কোন উদ্যোগ করা হয় নাই।

ব্রহ্মজালসুত্তে 'তর্ক" ও "মীমাংসা" এবং "তর্কী" ও "মীমাংসী"র উল্লেখ আছে; যথা,—বুদ্ধ বলিতেছেন,—"ইধ ভিক্খবে একচ্চো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা তক্কী হোতি বীমংসী। সো তক্কপরিয়াহতং বীমংসানুচরিতং সয়ংপটিভানং এবং আহ অধিচ্চ-সমুপ্পন্নো অত্তা চ লোকো চাতি।"—ব্রহ্মজালসুত্ত, ১-৩২।

হে ভিক্ষুগণ! একদিকে কোন কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি তর্কী ও মীমাংসী। তিনি স্বকীয় তর্কের আশ্রয়ে ও মীমাংসার অনুসরণে বলিয়া থাকেন, "আত্মা ও জগৎ অকারণে উৎপন্ন হইয়াছে।"

আবার উদান গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—"যাব সম্মাসম্বুদ্ধা লোকে নুপ্পজ্জন্তি ন তক্কিকা সুজ্ঝন্তি ন চাপি সাবকা। দুদ্দিট্ঠী ন দুক্খা পমুচ্চরেতি।"—উদান ৬-১০।

যত দিন সংসারে সম্যক্ সম্বুদ্ধগণের আবির্ভাব না হয়, তত দিন তার্কিক ও শ্রাবকগণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না এবং দুর্দ্দৃষ্টিবশতঃ উহারা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় না।

ব্রহ্মজালসুত্ত ও উদান, উভয় গ্রন্থই ত্রিপিটকের অন্তর্গত; সুতরাং খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে রচিত। এই দুই গ্রন্থে যে তার্কিকগণের উল্লেখ আছে, তাঁহারা কে, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইহাঁরা মহর্ষি গোতম-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতেন।

অশোকের সময়ে ন্যায়ের অস্তিত্ব

মোগ্গলিপুত্ত তিস্স মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৫ অব্দে কথাবত্থুপ্পকরণ নামে একখানি পালিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে পটিঞ্ঞা (প্রতিজ্ঞা), উপনয়, নিগ্গহ

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০শ, ৪ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(নিগ্রহ) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। উহার প্রথম অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদের নাম "নিগ্গহচতুক্কম্" ও অপর একটি পরিচ্ছেদের নাম "উপনয়চতুক্কম্"। উহাতে যে প্রতিজ্ঞা ও নিগ্রহ শব্দের ব্যবহার আছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। যথা—"নো চ মযং তয়া তৎথ হেতায় পটিঞ্ঞায় হেবং পটিজানন্তা হেবং নিগ্গহেতব্বা।" কথাবৎথুপ্পকরণ, শ্যামদশীয় সংস্করণ ৩ পৃঃ।

এই বাক্যের টীকায় "ছল" শব্দেরও উল্লেখ আছে, যথা—এবং তেন ছলেন নিগ্গহে আরোপিতে ইদানি তস্সেব পটিঞ্ঞায় ধম্মেন সমেন অত্তবাদে জয়ং দস্সেতুং অনুলোমনয়ে পুচ্ছা সকবাদিস্স অত্তনো নিস্সায় পটিঞ্ঞাং পরবাদিস্স লদ্ধিয় ওকাসং অদত্বা (কথাবৎথুপ্পকরণ, অট্ঠ কথা)।

উল্লিখিত স্থল দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে ন্যায়-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দসমূহ বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল। আমরা অধুনা "ন্যায়সূত্র"গ্রন্থ যে ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তৎকালে উহা ঐ ভাবে ছিল কি না, বলা যায় না।

পরবর্ত্তী পালিগ্রন্থে ন্যায়ের মত

"মিলিন্দ পঞ্হ" নামে একখানি পালি গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়। উহাতে "নীতি" এই নামে ন্যায়দর্শনের উল্লেখ আছে। যথা,—"বহূনি চস্স সৎথানি উগ্গহিতানি হোন্তি, সেয্যথাদং—সুতি সম্মুতি সংখ্যা যোগা নীতি বিসেসিকা গণিকা গন্ধব্বা তিকিচ্ছা চাতুব্বেদা পুরাণা ইতিহাসা জোতিসা মায়া হেতু মন্তণা যুদ্ধা ছন্দসা মুদ্দা, বচনেন একুনবীসতি।"—মিলিন্দপঞ্হ, পৃঃ ৩।

রাজা মিলিন্দ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যথা—শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, গণিত, গন্ধর্ববিদ্যা, চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, মায়া, হেতু, মন্ত্রণা, যুদ্ধ, ছন্দঃ ও মুদ্রা—এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত উনবিংশতি বিদ্যা।

সে কালে কি প্রকারে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বাদ-বিচার নির্ব্বাহিত হইত, তাহারও পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল ;—

রাজা আহ—"ভন্তে নাগসেন সল্লপিস্সসি ময়া সদ্ধিন্তি। সচে ত্বং মহারাজ পণ্ডিতবাদা সল্লপিস্সসি সল্লপিস্সামি, স চে পন রাজবাদা সল্লপিস্সসি ন সল্লপিস্সামিতী। কথং ভন্তে নাগসেন পণ্ডিতা সল্লপন্তীতি। পণ্ডিতানং খো মহারাজ সল্লাপে আবেঠনং পি করিয়তি, নিব্বেঠনম্ পি করিয়তি, নিগ্গহো পি করিয়তি, পটিকম্মম্ পি করিয়তি, বিসেসো পি করিয়তি, পটিবিসেসো পি করিয়তি। ন চ তেন পণ্ডিতা কুপ্পন্তি, এবং খো মহারাজ পণ্ডিতা সল্লপন্তীতি। রাজানো খো মহারাজ সল্লাপে একং বৎথুং পটিজানন্তি যো তং বৎথুং বিলোমেন্তি তস্স দণ্ডং আণাপেন্ত ইমস্স দণ্ডং পণেথাতি এবং খো মহারাজ রাজানো সল্ল-পন্তীতি।"—(মিলিন্দ পঞ্হ, পৃঃ ২৮)

রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভদন্ত, আমার সহিত বাদবিচার করিবেন? হে মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতের মত বাদবিচার করেন, করিব। আর যদি রাজার মত বাদবিচার করেন, করিব না। হে ভদন্ত, পণ্ডিতেরা কিরূপভাবে বাদবিচার করেন? হে মহারাজ, পণ্ডিতগণের বাদবিচারে বিচার্য্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা করিতে হয়, এক পক্ষ নিগৃহীত হন ও তিনি নিগ্রহ স্বীকার করেন। বিষয়কে বিশেষভাবে বিভাগ ও প্রতিবিভাগ করিতে হয়। তাহাতে পণ্ডিতেরা কুপিত হন না। হে মহারাজ, পণ্ডিতেরা এইরূপে বাদবিচার করেন। আর হে মহারাজ, যখন রাজারা বাদবিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা একটি বিষয় নির্দ্দেশ করেন। যিনি তাহার প্রতিকূলে কথা বলেন, তাঁহারা তাহার দণ্ডবিধান করেন এবং বলেন, এই লোক দণ্ডার্হ। মহারাজ, রাজগণ এইরূপে বাদবিচার করেন।

মহাযান গ্রন্থে ন্যায়ের পরিভাষা

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃত-গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়। এই সকল গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্র "হেতুবিদ্যা" নামে উক্ত হইয়াছে। যথা,—"নির্ঘণ্টৌ, নিগমে, পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, নিরুক্তে, শিক্ষায়াং, ছন্দসি, যজ্ঞকল্পে, জ্যোতিষি, সাংখ্যে, যোগে, ক্রিয়াকল্পে, বৈশেষিকে, বৈশিকে, অর্থবিদ্যায়াং, বার্হস্পত্যে, আশ্চর্য্যে, আসুরে, মৃগপক্ষিরুতে, হেতুবিদ্যায়াং, জতুযন্ত্রে—সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম।"—ললিতবিস্তর, ১২ অঃ।

আর্য্য নাগার্জ্জুনকৃত মাধ্যমিক সূত্র একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহা অনুমান খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রে প্রচলিত অনেক পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। যথা,—

> বিগ্রহে যঃ পরীহারং কৃতে শূন্যতয়া বদেৎ।
> সর্ব্বং তস্যাপরিহৃতং সমং সাধ্যেন জায়তে ॥—মাধ্যমিক সূত্র, ৪ অঃ।

এই কারিকায় "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাগার্জ্জুনকৃত যুক্তিষষ্টিকা কারিকা, বিগ্রহ-ব্যাবর্ত্তনী কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়ের অনেক পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যদেব নাগার্জ্জুনের প্রধান শিষ্য। ইঁহার প্রণীত শতক-শাস্ত্র, ভ্রম-প্রমথনযুক্তি, হেতুসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

"লঙ্কাবতার-সূত্র" নামে একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা অনুমান খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে নৈয়ায়িক ও তার্কিক উভয়েরই উল্লেখ আছে,—

> "নৈয়ায়িকাঃ কথং ব্রূহি ভবিষ্যন্তি অনাগতাঃ ॥"—লঙ্কাবতার, ২ অঃ।

মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভবিষ্যৎ কালে নৈয়ায়িকগণ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন, বলুন।

"কৃতকস্য বিনাশঃ স্যাৎ তার্কিকাণাময়ং নয়ঃ।"—লঙ্কাবতার, ১০ অঃ।

উৎপাদশীল বস্তু মাত্রেরই ধ্বংস হয়, ইহা তার্কিকগণের সিদ্ধান্ত।

"কথং হি শুধ্যতে তর্কঃ কথং তর্কঃ প্রবর্ত্ততে।"—লঙ্কাবতার, ২ অঃ।

মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিরূপে তর্ক শুদ্ধ হয় এবং কেমন করিয়াই বা তর্ক প্রবর্ত্তিত হয়।

যদিও প্রাচীন বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে ন্যায়ের অনেক পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎকালের কোন নৈয়ায়িক বা তার্কিকের নাম বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দ হইতে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ স্থলে কতিপয় প্রধান নৈয়ায়িকের সমুল্লেখ করিতেছি।

মৈত্রেয় (খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দ)

মৈত্রেয় একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি মহাকাশ্যপ-প্রণীত প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক "অভিসময়ালঙ্কার" নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোধ হয়, চীন ভাষায় এই গ্রন্থই "মহাসময়সূত্র" নামে পরিচিত। মৈত্রেয়-প্রণীত অপর দুই খানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। উহার একখানির নাম বোধিসত্ত্ব-চর্য্যানির্দ্দেশ ও অপরখানির নাম সপ্তদশভূমিশাস্ত্রযোগাচার্য্য। প্রথম পুস্তকখানি ৪১৪ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়খানি ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। কথিত আছে, মৈত্রেয় বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ৯০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী।

সপ্তদশ-ভূমিশাস্ত্র-যোগাচার্য্য গ্রন্থে অনেক ন্যায়সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম শুনিলেই উহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যথা—(১) বাদের বিভাগ, (২) বাদের কাল, (৩) বাদীর গুণ, (৪) নিগ্রহস্থান ইত্যাদি।

মৈত্রেয়ের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ। তাঁহার মতে একটি হেতু ও দুইটি উদাহরণ ব্যতীত কোন প্রতিজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাঁহার যুক্তির প্রণালী এই;—

শব্দ অনিত্য (প্রতিজ্ঞা)।

উহা উৎপন্ন (হেতু)।

ঘটের ন্যায়, কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে (উদাহরণ)।

ঘটের ন্যায় উৎপন্ন বস্তু মাত্রই অনিত্য এবং আকাশের ন্যায় নিত্য-বস্তু কখনও উৎপন্ন হয় না (উপনয়)।

অতএব শব্দ অনিত্য (নিগমন)।

আর্য্য অসঙ্গ (৪৫০ খৃষ্টাব্দ)

অসঙ্গ গান্ধার (বর্ত্তমান পেশোয়ার) প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ মহীশাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বৈভাষিক দর্শনে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বলা বাহুল্য, বৈভাষিক মত হীনযান-পন্থিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে তিনি মৈত্রেয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক মহাযান-মার্গে প্রবেশ করেন এবং যোগাচার-দর্শনে তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস জন্মে। তিনি কিয়ৎকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে, অযোধ্যায় অবস্থিতিকালে আর্য্য অসঙ্গ স্বীয় গুরু মৈত্রেয়ের নিকট সপ্তদশ-ভূমি-শাস্ত্র-যোগাচার্য্য, সূত্রালঙ্কার-টীকা ও মধ্যান্ত-বিভাগ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন। অসঙ্গ অনুমান ৪৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত মহাযান-সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র ৫৩১ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনূদিত হয়, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্গ কৌশাম্বী ও অযোধ্যা নগরীর যে সঙ্ঘারামে অসঙ্গ বাস করিতেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। অসঙ্গ বারখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার অধিকাংশই চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে অসঙ্গের তর্ক ও অনুমান-প্রণালীর অনেক আভাস পাওয়া যায়। অসঙ্গের অনুমান-প্রণালী এইরূপ ;—

১। শব্দ অনিত্য,

২। কারণ, উহা উৎপাদশীল,

৩। যথা ঘট,

৪। ঘট উৎপাদশীল, এই হেতু অনিত্য ; শব্দও উৎপাদশাল হওয়ায় অনিত্য হইবে।

৫। অতএব স্থির হইল—শব্দ অনিত্য।

এ স্থলে আমরা দেখিলাম, মৈত্রেয়ের অনুমান-প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া অসঙ্গ স্বীয় প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মৈত্রেয় একটি (ঘট) দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদশীলতা ও অনিত্যতা এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা বিপজ্জনক ; কারণ, একটি দৃষ্টান্তে যে সম্বন্ধ আছে, অন্য দৃষ্টান্তে সে সম্বন্ধ না থাকিতে পারে। কিন্তু অসঙ্গ "কারণ" এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া "উৎপাদশীলতা" ও "অনিত্যতার" মধ্যে যে অচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখাইলেন। অতএব অসঙ্গের অনুমান-প্রণালীতে সাধ্য ও হেতুর পরস্পর সম্বন্ধব্যঞ্জক শব্দ প্রযুক্ত থাকায় উহা মৈত্রেয়ের অনুমান-প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

বসুবন্ধু (৪৮০ খৃষ্টাব্দ)

বসুবন্ধু গান্ধার (পেশোয়ার) দেশে জন্মগ্রহণ করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গান্ধার দেশে বসুবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পান। বসুবন্ধুর পিতার নাম

কৌশিক। বসুবন্ধু প্রথমতঃ সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ও বৈভাষিক দর্শনে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর অসঙ্গ কর্ত্তৃক মহাযান-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া যোগাচার-দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি বহু বৎসর শাকল, কৌশাম্বী ও অযোধ্যা নগরীতে বাস করেন। অযোধ্যা নগরীতে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বৈভাষিক শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মনোরথ খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। বসুবন্ধু তাঁহার বন্ধু। সঙ্ঘভদ্র নামে আর একজন বৈভাষিক অধ্যাপক বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিভাষা-বিনয় নামক গ্রন্থ চীন-ভাষায় অনুবাদিত করেন। বসুবন্ধু তাঁহার সমসাময়িক। অতএব বসুবন্ধু অনুমান খৃষ্টীয় ৪৮০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পরমার্থ নামক একজন বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধুর জীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। উহা ৫৫৭—৫৬৯ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। বসুবন্ধু অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তর্কশাস্ত্র তাহাদের অন্যতম। এই তর্কশাস্ত্র ৫৫০ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। উহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। তাঁহার মতে পক্ষ, সাধ্য ও হেতু—এই তিনের দ্বারাই অনুমান নিষ্পন্ন হয়, উদাহরণের কোন প্রয়োজন নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে জৈন নৈয়ায়িক সিদ্ধসেন-দিবাকর বসুবন্ধুর মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ;—

অন্তর্ব্যাপ্ত্যৈব সাধ্যস্য সিদ্ধের্ব্বহিরুদাহৃতিঃ।
ব্যর্থা স্যাত্তদসদ্ভাবেঽপ্যেবং ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥ ২০ ॥—ন্যায়াবতার।

সাধ্য ও হেতুর পরস্পর ব্যাপ্তি দ্বারাই সাধ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অতএব উদাহরণ প্রয়োগ নিষ্ফল। যদি সাধ্য ও হেতুর পরস্পর ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে উদাহরণ প্রয়োগ করিলেও সাধ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণের এই মত।

সিদ্ধসেন-দিবাকর এই শ্লোকে যদিও বসুবন্ধুর নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু "নৈয়ায়িকগণ" এই শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

বসুবন্ধু-কৃত আরও তিনখানি ন্যায় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার অনুমান-প্রণালী এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ;—

১। শব্দ অনিত্য,

২। কারণ, উহা হেতু হইতে সমুৎপন্ন,

৩। হেতু হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য মাত্রই অনিত্য, যথা ঘট (ঘট হেতু হইতে সমুৎপন্ন ও অনিত্য),

৪। শব্দ এই প্রকারের দ্রব্য,

৫। অতএব শব্দ অনিত্য।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ (৫০০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

দিঙ্‌নাগ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগরীর সন্নিহিত সিংহবক্ত্র গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে দিঙ্‌নাগের জন্ম হয়। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নাগদত্ত নামক বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাগদত্ত বাৎসীপুত্রীয় নামক হীনযান-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দিঙ্‌নাগ এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়া মহাযান-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি আচার্য্য বসুবন্ধুর নিকট সমগ্র মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে, মহাযান-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঞ্জুশ্রী স্বয়ং অলৌকিক ভাবে স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার কৃপায় দিঙ্‌নাগ সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এক সময়ে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হইয়া সুদুর্জ্জয় নামক ব্রাহ্মণ দার্শনিককে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ তার্কিককে পরাজিত করিয়া লোক-সমাজে তর্কপুঙ্গব নামে পরিচিত ছিলেন। উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগ অনেক তীর্থকরের মত খণ্ডন করেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে তিনি যে বিহারে বাস করিতেন, উহা "আচার্য্য-বিহার" নামে পরিচিত ছিল। উড়িষ্যা প্রদেশে তিনি ভদ্রপালিত নামক রাজমন্ত্রীকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় দিঙ্‌নাগ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীর্য্য-পারমিতা, দানপারমিতা প্রভৃতি দ্বাদশ পারমিতা অর্থাৎ বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট দ্বাদশ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে দিঙ্‌নাগ সকল দার্শনিককে পরাস্ত করিয়া জয়সূচক একটি অপূর্ব্ব শিরোভূষণ লাভ করেন। ইহার নাম পণ্ডিতোষ্ণীষ। অন্ধ্র দেশের এক নির্জ্জন বিহারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দিঙ্‌নাগ ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সকল স্থলেই তাঁহাকে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি প্রতিপক্ষকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিতেন, প্রতিপক্ষগণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে আক্রমণ করিত। তাঁহার সমস্ত জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতেও উহার অবসান হয় নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু পণ্ডিত ঐ সকল গ্রন্থের মত নিরাকরণ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যে দিঙ্‌নাগের "স্থূলহস্ত" পরিহার করিবার জন্ত মেঘকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর স্বীয় ন্যায়-বার্ত্তিকের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগকে "কুতার্কিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগকে "ভ্রান্ত ভদন্ত" নামে উল্লিখিত করিয়া উঁহার "ভ্রান্তি" নিরাকরণের জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মল্লিনাথ

দিঙ্‌নাগকে "অত্রিকর", এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট ও পার্থসার মিশ্র দিঙ্‌নাগের উদ্দেশে অবাধ বাণ বর্ষণ : করিয়াছিলেন। সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিক ও প্রভাচন্দ্র বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জৈন দার্শনিকগণ দিঙ্‌নাগের মত লুপ্ত করিবার জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। এমন কি, উত্তরকালে কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকও দিঙ্‌নাগের গ্রন্থের কোন কোন মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগ যথার্থই বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসামান্য মনোবল ও দৈহিক তেজ ছিল। তাহা না হইলে নানা দিক্ হইতে এত আঘাত সহ্য করিয়া দিঙ্‌নাগ এতকাল জীবিত থাকিতে পারিতেন না। দিঙ্‌নাগের গ্রন্থ ভারত হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। নেপালেও উহা রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পৃথিবী হইতে উহা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। তিব্বত দেশে দিঙ্‌নাগের গ্রন্থসমূহ অতি যত্নে সুরক্ষিত হইয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি দিঙ্‌নাগ-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তাঁহার আবির্ভাব-কাল

দিঙ্‌নাগ অনুমান খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গুরু আচার্য্য বসুবন্ধু ৪৮০ খৃষ্টাব্দের লোক। দিঙ্‌নাগের দুইখানি গ্রন্থ ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। দিঙ্‌নাগ যে সময়ে অন্ধ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন, বোধ হয়, ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে পল্লব-বংশের আধিপত্য ছিল। পল্লব-বংশীয় রাজগণের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতেন।

দিঙ্‌নাগের প্রমাণ-সমুচ্চয়

প্রমাণ-সমুচ্চয় দিঙ্‌নাগের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। তিনি অন্ধ্র দেশের বেঙ্গী নগরীতে একটি নির্জ্জন পর্ব্বতের উপর অবস্থানকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। দিঙ্‌নাগ প্রমাণ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে সকল শ্লোক বিরচন করিয়াছিলেন, ঐ সকল শ্লোক একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহারই নাম প্রমাণ-সমুচ্চয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সহিত বিরোধ

যখন দিঙ্‌নাগ প্রমাণসমুচ্চয়ের প্রথম শ্লোক লিপিবদ্ধ করেন, কথিত আছে, সেই সময়ে মহা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। অন্ধ্রদেশ আলোকে সমুজ্জ্বল হয় এবং চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল আরম্ভ হয়। তদনন্তর একদিন ঈশ্বরকৃষ্ণ নামে একজন ব্রাহ্মণ দার্শনিক দিঙ্‌নাগের শৈল-বিহারে আগমন করেন। দিঙ্‌নাগ বিহারে উপস্থিত ছিলেন না; এই অবসরে ঈশ্বরকৃষ্ণ দিঙ্‌নাগের লিখিত প্রমাণ-সমুচ্চয়ের শ্লোকটি নষ্ট করিয়া চলিয়া যান। দিঙ্‌নাগ বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্লোকটি পুনরায় লিপিবদ্ধ করেন। ঈশ্বর-কৃষ্ণ পুনরায় আসিয়া শ্লোকটি নষ্ট করেন। তৃতীয় বার দিঙ্‌নাগ ঐ শ্লোকটি লিখিয়া

যাহাতে উহা নষ্ট না হয়, তাহার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে উপদ্রবকারীকে সাবধান করিয়া যান,—"আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, কেহ যেন ক্রীড়াচ্ছলেও আমার এই শ্লোকটি নষ্ট না করেন। অর্থগাম্ভীর্য্যে ইহা অতুলনীয়। যদি এই শ্লোকের ভাব সম্বন্ধে কেহ আমার সহিত বিবাদ করিতে চাহেন, তিনি স্বয়ং আমার সমক্ষে উপস্থিত হউন। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি যেন কাপুরুষতা প্রকাশ না করেন।"

দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিয়মানুসারে ভিক্ষা সংগ্রহে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার বিহারে আসিয়া তথায় যাহা লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া তাঁহার মনে সাধু ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ বিহারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ঈশ্বরকৃষ্ণের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি যাহার নিকট পরাজিত হইবেন, তিনি বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ পণ হইল। ঈশ্বরকৃষ্ণ তর্কে পরাজিত হইলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। যখন দিঙ্‌নাগ তাঁহাকে পণের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন ঈশ্বরকৃষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগের বিহারে অগ্নিসংযোগ করিলেন। দিঙ্‌নাগের দ্রব্যসমূহ দগ্ধ হইয়া গেল। দিঙ্‌নাগ মহাচিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"আমি এক ব্যক্তিকে সৎপথে আনিতে পারিলাম না, কি করিয়া অন্য লোকের মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিব?" তিনি নিজের প্রতি ধিক্কার করিয়া প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিবার কল্পনা ত্যাগ করিলেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব-মঞ্জুশ্রী তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বৎস, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। তুমি যে শাস্ত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছ, উহা কেহই নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমার শিক্ষাগুরু। জগতের সমস্ত তীর্থকর আসিয়াও তোমার মত নিরাকরণ করিতে পারিবে না। তুমি যে শাস্ত্র রচনা করিতেছ, উহা সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃ। উহা বহু লোককে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে।" এই বলিয়া মঞ্জুশ্রী অন্তর্ধান করিলেন। এই সময়ে দিঙ্‌মণ্ডল মহা আলোকে আলোকিত হইল। অন্ধ্রদেশের রাজা দিঙ্‌নাগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হেতুবিদ্যাশাস্ত্র সমাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দিঙ্‌নাগ প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন।

প্রমাণসমুচ্চয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রমাণসমুচ্চয় অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। হেমবর্ম্ম নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত সে-প-শে-রব নামক তিব্বতীয় রাজ-লামার সহযোগিতায় প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিব্বতের শে-পই-গে-নে নামক বিহারে এই অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় "ছে্-ম-কুন্তুই" নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন,—

"যিনি জগতের হিতসাধক ও প্রমাণের অবতারস্বরূপ, সেই সর্ব্বশরণ্য মহাগুরু জগতের

চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রমাণবিষয়ক বিক্ষিপ্ত বচনসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ বিরচন করিতেছি।"

গ্রন্থের শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সর্ব্বদেশীয় তার্কিকগণের পরাভবকারী ও হস্তীর ন্যায় বলসম্পন্ন দিঙ্‌নাগ স্বরচিত শ্লোকসমূহ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ ছয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান (৩) পরার্থানুমান, (৪) ত্রিরূপ হেতু, (৫) প্রত্যক্ষ উপমান ও শব্দখণ্ডন এবং (৬) জাত্যুত্তর-বিচার।

প্রত্যক্ষ

দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতম্‌ ॥"—(প্রমাণসমুচ্চয়, ১ম পরিচ্ছেদ)।

প্রত্যক্ষ কল্পনা-বিরহিত এবং নাম জাতি প্রভৃতির সহিত অসংবদ্ধ। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। ইহা কল্পনাশূন্য এবং নাম ও জাতি প্রভৃতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং নৌযানে গমনকালে বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই সকল কল্পনা-বিরহিত। প্রত্যক্ষের সহিত নামের কোন সম্বন্ধ নাই। মনে করুন, আমি একটি গো দর্শন করিলাম। আমার দৃষ্ট "গো"তে যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, অন্য 'গো'তে অবিকল ঐ সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। কোনও না কোন বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব আছে অতএব যদি আমার দৃষ্ট 'গো' "ধবলা", "পিঙ্গলা" ইত্যাদি কোন নাম দিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলে উহাতে কোন বিশিষ্ট 'গো' ব্যক্তির প্রকাশ হইবে না, কিন্তু এক শ্রেণীর গো বুঝাইবে। প্রত্যক্ষ দ্বারা অনন্তধর্ম্মবিশিষ্ট যে বস্তু আমরা উপলব্ধি করি, ঐ বস্তু নাম দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান জাতিবোধক নহে, উহা ব্যক্তিবোধক। আবার অনুমান হইতে উপলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিবোধক নহে, উহা জাতিবোধক। অনুমানলব্ধ জ্ঞান নাম দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু অন্যকে বুঝান কঠিন, কিন্তু অনুমান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু অন্যাকে বুঝাইতে পারা যায়।

দিঙ্‌নাগ ও বাৎস্যায়ন

দিঙ্‌নাগ অনেক স্থলে বাৎস্যায়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। মনঃ ইন্দ্রিয় কি না, এ বিষয়ে মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই। বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে (১-১-৪) লিখিয়াছেন,—"মনঃ ইন্দ্রিয়, মহর্ষি গৌতম মনঃকে ইন্দ্রিয়ের তালিকাভুক্ত করেন নাই বলিয়া কোন দোষ হয় নাই, অন্য দর্শনে মনঃ ইন্দ্রিয়মধ্যে পরিগণিত

হইয়াছে, মহর্ষি যখন এই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খণ্ডন করেন নাই, তখন মনঃকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ, যদি আমি পরের মত প্রতিষেধ না করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমি ঐ মতের অনুমোদন করি। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।"

মনসশ্চ ইন্দ্রিয়ভাবান্ন বাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি। তন্ত্রান্তরসমাচারাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ।—(ন্যায়-ভাষ্য, ১-১-৪)।

বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে যাইয়া দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন,—

অনিষেধাদুপাত্তং চেৎ অন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা।

—(প্রমাণ-সমুচ্চয়, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

"নিষেধ না করিলেই যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অন্য ইন্দ্রিয়ের কথা বলিলেন কেন?"

দিঙ্‌নাগ বলেন,—গৌতম চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মনঃ ইন্দ্রিয় কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, গৌতমের মতে মনঃ ইন্দ্রিয় নহে। গৌতমের মৌন ভাব হইতে বাৎস্যায়ন কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনঃ ইন্দ্রিয়? মৌন ভাবই যদি সম্মতির চিহ্ন হয়, তাহা হইলে গৌতম অন্য পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন না কেন? যদি গৌতম চক্ষুঃ কর্ণাদিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার মৌন ভাবেই বুঝা যাইত যে, উহারা ইন্দ্রিয়। চক্ষুঃ কর্ণাদির সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—ইহারা ইন্দ্রিয়, আর মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না কেন?

অনুমান

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে আমরা ধূম হইতে বহ্নির অনুমান করি এবং অপরের মতে ধূম হইতে পর্ব্বত ও বহ্নির মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের অনুমান হইয়া থাকে; যথা,—

কেচিৎ ধর্ম্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ।
সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাদ্ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ॥
লিঙ্গং ধর্ম্মে প্রসিদ্ধং চেৎ কিমন্যৎ তেন মীয়তে।
অথ ধর্ম্মিণি তস্যৈব কিমর্থং নানুমেয়তা॥
সম্বন্ধেঽপি দ্বয়ং নাস্তি ষষ্ঠী শ্রূয়েত তদ্বতি।
অবাচ্যোঽনুগৃহীতত্বান্ন চাসৌ লিঙ্গসঙ্গতঃ॥

—(প্রমাণ-সমুচ্চয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যাহার সহিত হেতু অব্যভিচরিতভাবে সম্বদ্ধ, হেতু দেখিয়া সেই সাধ্যরূপ ধর্ম্মের অনুমান করা যায়, আবার কেহ বলেন যে, পক্ষ এবং সাধ্য উভয় ই

জ্ঞাত (সুতরাং তাহারা অনুমানের বিষয় নহে)। কিন্তু পক্ষের সহিত সাধ্যের যে সম্বন্ধ, তাহাই অনুমানের বিষয়। (এই দুইটি মত বিষয়ে বক্তব্য এই যে), ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক, ইহা যদি পূর্ব্বেই জানা থাকে, তাহা হইলে আর জানিবার বিষয় কি অবশিষ্ট রহিল, যাহার জন্য অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে? যদি বল, পক্ষে ধর্ম্মের অর্থাৎ সাধ্যের সম্বন্ধই অনুমেয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এইরূপ স্থলে পক্ষকে অনুমেয় বলা যায় না কেন.? সম্বন্ধে সাধ্য ও হেতুর স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু সম্বন্ধ বিশিষ্টেরই বোধ করাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি শ্রুত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধবান্‌কেও অনুমেয় বলা যায় না, কারণ, তাহা গৃহীত এবং তাহার সাধনের সম্বন্ধ (ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব) পূর্ব্বে জ্ঞাত নহে।

উপমান ও শব্দ

উপমান পৃথক্ প্রমাণ নহে। যখন কোনও বস্তুর সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপর বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তখন এই জ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যক্ষমূলক। শব্দও পৃথক্ প্রমাণ নহে। "শব্দ প্রামাণিক", এ কথার অর্থ কি? যে ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তিনি প্রামাণিক, অথবা শব্দ দ্বারা যে বিষয় প্রকাশিত হইল, উহা প্রামাণিক? যদি ব্যক্তিকে প্রমাণ বলিয়া ধর, উহা কেবল অনুমান হইবে। আর যদি বিষয়কে প্রমাণ বলিয়া ধর, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ হইবে। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিরিক্ত শব্দ বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই।

দিঙ্‌নাগের ন্যায়-প্রবেশ

দিঙ্‌নাগ-প্রণীত "ন্যায়-প্রবেশ" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার সম্পূর্ণ নাম "ন্যায়প্রবেশো নাম প্রমাণপ্রকরণম্"। এই গ্রন্থ কাশ্মীরীয় পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরক্ষিত ও তিব্বতীয় লামা ডাক্-পা-গাল্-ছেন্-পাল্-জাং এতদুভয়ের সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ "ছে-মা-রিগ্-পার্-জুগ্-পই-গো" নামে প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন,—"অন্যের সহিত তর্ক করিতে হইলে সাধন ও দূষণ এবং সাধনাভাস ও দূষণাভাসের নিয়ম জানা আবশ্যক। স্বয়ং কোনও বস্তুর জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং প্রত্যক্ষাভাস ও অনুমানাভাসের নিয়ম জানা প্রয়োজনীয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমি এই ন্যায়প্রবেশ শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছি।"

ন্যায়াবয়ব

অনুমান মাত্রেই পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দুইটি দৃষ্টান্ত থাকে। পক্ষের অপর নাম ধর্ম্মী এবং সাধ্যের অপর নাম ধর্ম্ম। হেতুকে লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্ত অন্বয়-ব্যতিরেক-ভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বা অন্বয়ী দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্ম্য বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। অনুমানের প্রণালী এইরূপ;—

১। পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট।

২। হেতু উহাতে ধূম আছে।

৩। যেখানে যেখানে ধূম আছে, তাহাই বহ্নিবিশিষ্ট। যথা,—রন্ধনশালা এবং যাহা বহ্নিবিশিষ্ট নহে, তাহাতে ধূম নাই, যথা—হ্রদ।

এ স্থলে "পর্ব্বত" পক্ষ, "বহ্নিমান্" সাধ্য, "ধূম" হেতু, "রন্ধনশালা" স্বাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত এবং "হ্রদ" বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত।

প্রতিজ্ঞা

সাধ্যযুক্ত পক্ষের নাম প্রতিজ্ঞা, যথা—পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট। অনেক প্রতিজ্ঞা প্রমাণবিরুদ্ধ। ইহাদিগকে প্রতিজ্ঞাভাস বলে। প্রতিজ্ঞাভাস নয় প্রকার; যথা,—

১। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা— শব্দ অশ্রাব্য।

২। অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—ঘট নিত্য।

৩। সাধারণমতবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—ধন ঘৃণিত পদার্থ।

৪। স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও বৈশেষিক দার্শনিক বলেন, "শব্দ নিত্য", তাহা হইলে উহা তাঁহার স্বমতবিরুদ্ধ হইবে।

৫। স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—আমার মাতা বন্ধ্যা।

৬। অপ্রসিদ্ধপক্ষপ্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও বৌদ্ধ সাংখ্য-দার্শনিককে বলেন, "শব্দ ধ্বংসশীল", তাহা হইলে উহা অপ্রসিদ্ধপক্ষ হইবে। কারণ, শব্দের ধ্বংসশীলতা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক মীমাংসকেরা করিয়া থাকেন, কিন্তু সাংখ্যেরা ও বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন না।

৭। অপ্রসিদ্ধসাধ্যপ্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও সাংখ্য দার্শনিক কোনও বৌদ্ধকে বলেন যে, আত্মাই জীবন, উহা অপ্রসিদ্ধসাধ্য হইবে। কারণ, বৌদ্ধেরা আত্মার জীবনত্ব সম্বন্ধে কোন বিচার করেন নাই।

৮। উভয়াপ্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও বৈশেষিক-দার্শনিক কোনও বৌদ্ধকে বলেন, আত্মার সুখাদি বেদনা আছে, তাহা হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা অপ্রসিদ্ধপক্ষ ও অপ্রসিদ্ধসাধ্য হইবে। কারণ, বৌদ্ধেরা আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব বা উহার পৃথক্ বেদনা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই।

৯। সর্ব্ববাদিস্বীকৃত প্রতিজ্ঞা, যথা—অগ্নি উষ্ণ। উষ্ণত্ব ব্যতীত অগ্নিই হয় না, অতএব অগ্নি উষ্ণ, এ প্রতিজ্ঞা স্থাপনের প্রয়োজন কি ?

হেতুর ত্রিবিধ রূপ

১। পক্ষ হেতু দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, যথা—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল,

ঘটের ন্যায়, কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে।

এই অনুমানে "শব্দ" পক্ষ ও "উৎপাদশীল" হেতু। উৎপাদশীলতা সমগ্র শব্দে বিদ্যমান আছে।

২। সমগ্র হেতুর সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকা আবশ্যক; যথা,—

পূর্ব্বোক্ত অনুমানে উৎপাদশীল বস্তু মাত্রই অনিত্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উহার সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে।

৩। কদাপি হেতুর সহিত সাধ্যের বৈয়ধিকরণ্য হইবে না, যথা—উৎপাদশীল বস্তু কখনও অনিত্য না হইয়া পারে না।

ব্যাপ্তি

উল্লিখিত ত্রিবিধ রূপ হইতে জানা যায় যে, হেতু সাধ্য দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ হেতু ব্যাপ্য ও সাধ্য ব্যাপক। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, উহাকে ব্যাপ্তি বলে।

হেত্বাভাস

হেতুর যে ত্রিবিধ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার কোনটির ব্যত্যয় ঘটিলেই হেতু দুষ্ট হইয়া পড়ে। এই দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস চতুর্দ্দশ প্রকার। উহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে,—

ক। অসিদ্ধ হেতু (চতুর্বিধ)।

১। যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই কোন হেতুর দোষ অনুভব ও স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ হেতু অসিদ্ধ হইবে; যথা,—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা দর্শনীয়।

শব্দ কখনই দর্শন-যোগ্য নহে। বাদী ও প্রতিবাদী কেহই উহাকে দর্শনীয় বলেন না।

২। যদি বাদী ও প্রতিবাদী এতদুভয়ের মধ্যে এক পক্ষ হেতুর দোষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ হেতু অসিদ্ধ হইবে। যথা,—

শব্দ অভিব্যক্ত হয়,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল।

এ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কোনও পক্ষে যদি মীমাংসক থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, "শব্দ উৎপাদশীল নহে", অতএব হেতু অসিদ্ধ।

৩। যখন হেতুতে ব্যাপ্তির সন্দেহ থাকে, তখন সেই হেতু সন্দিগ্ধ। সন্দিগ্ধ হেতু যথা,—

পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট,

যে হেতু উহাতে বাষ্প আছে।

বাষ্প অগ্নিসম্ভূত হইতেও পারে, নাও পারে; অতএব এই হেতু অসিদ্ধ।

৪। যখন পক্ষে হেতুর অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ঐ হেতু অসিদ্ধ হইবে। যথা,—

আকাশ একটি দ্রব্য,
যে হেতু উহা গুণবিশিষ্ট।

এ স্থলে "আকাশ" পক্ষ এবং "গুণ" হেতু। আকাশে গুণ আছে কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়। অতএব এই হেতু অসিদ্ধ।

খ। অনিশ্চিত হেতু (ষড়্‌বিধ)।

৫। যখন হেতু সাধ্য ও সাধ্যাভাব উভয়ের সহিত বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ হেতুকে সাধারণ বলে। ইহা দুষ্ট হেতু। যথা,—

শব্দ নিত্য,
যে হেতু উহা জ্ঞেয়।

জ্ঞেয় এই হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুতে বিদ্যমান আছে। অতএব এই হেতু দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না।

৬। যখন হেতুর সাধ্য ও সাধ্যাভাব, ইহার কোনটির সহিতই উভয়বাদীর নিশ্চিত বিদ্যমানতা থাকে না, তখন উহাকে অসাধারণ বলে। ইহাও দুষ্ট হেতু। যথা,—

শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা শ্রবণযোগ্য।

শ্রবণযোগ্য এই হেতুবাদী প্রতিবাদীর নিশ্চিত নিত্য বা অনিত্য কোন বস্তুতেই বিদ্যমান নাই।

৭। যখন হেতু সাধ্যের সমানাধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের ব্যধিকরণ সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ হেতু দুষ্ট হইবে। যথা,—

শব্দ প্রযত্নকৃত নহে,
যে হেতু উহা অনুৎপন্ন।

এ স্থলে অনিত্য এই হেতু কোন কোন অপ্রযত্নকৃত বস্তুতে (যথা বিদ্যুতে) এবং প্রযত্ন-কৃত সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান আছে। অতএব এই হেতু দুষ্ট।

৮। যখন হেতু সাধ্যের ব্যধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের সমানাধিকরণ সকল বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ হেতুও দুষ্ট হইবে। যথা,—

শব্দ প্রযত্নকৃত,
যে হেতু উহা অনিত্য।

অনিত্যতা প্রযত্নকৃত সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান আছে এবং অপ্রযত্নকৃত কোন কোন বস্তুতে (যথা বিদ্যুতে) বিদ্যমান আছে। অতএব এই হেতু দুষ্ট।

৯। যখন হেতু সাধ্যের সমানাধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের ব্যধিকরণ কোন কোন বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তখন উহা দুষ্ট হেতু হইবে। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা অমূর্ত্ত।

কোন কোন অমূর্ত্ত বস্তু নিত্য, যথা—আকাশ এবং কোন কোন অমূর্ত্ত বস্তু অনিত্য, যথা—বুদ্ধি। অতএব অমূর্ত্ত এই হেতু দুষ্ট।

১০। বিরুদ্ধাব্যভিচারী অর্থাৎ যে হেতু দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনকালে তুল্যবল অপর হেতু দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থিত হয়, ঐ হেতু দুষ্ট। যথা,—

এক পক্ষে বৈশেষিক মীমাংসককে বলেন,—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল।

পক্ষান্তরে মীমাংসক বৈশেষিককে বলেন,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা সর্ব্বদা শ্রবণযোগ্য।

এ স্থলে উভয় হেতুই সঙ্গত। কিন্তু নিগমনদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এরূপভাবে বিন্যস্ত ঐ হেতুদ্বয়কে অনিশ্চিত বলিতে হইবে।

গ। বিরুদ্ধ হেতু (চতুর্ব্বিধ)।

১১। সাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। যখন হেতু সাধ্যের বিরুদ্ধ হয়, তখন ঐ হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইবে। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা উৎপাদশীল।

উৎপাদশীল, এই হেতু নিত্যত্বের বিরোধী। অতএব ঐ হেতু দুষ্ট হেতু।

১২। ব্যঙ্গ্যসাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। যখন হেতু ব্যঙ্গ্য-সাধ্যের বিরুদ্ধ হয়, তখন ঐ হেতু দুষ্ট হইবে। যথা,—

চক্ষুরাদি কাহারও উপকারক,

যে হেতু উহারা সংঘাতপদার্থ;

যেমন শয্যা, আসন ইত্যাদি।

এ স্থলে "কাহারও" এই শব্দের প্রতীয়মান অর্থ শরীর, কিন্তু উহার ব্যঙ্গ্যার্থ আত্মা। যদিও সংঘাত-পদার্থ শরীরের উপকারক, কিন্তু উহা আত্মার উপকারক নহে। কারণ, সাংখ্যের মতে আত্মা নির্গুণ। অতএব হেতু ব্যঙ্গ্য সাধ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা দুষ্ট হইয়াছে।

১৩। পক্ষবিরুদ্ধ হেতু। যে হেতু পক্ষের বিরুদ্ধ হয়, উহা দুষ্ট হেতু। যথা,—

সামান্য পদার্থ দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া নহে।

যে হেতু উহা এক দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে এবং উহার গুণ ও ক্রিয়া আছে।

এ স্থলে বস্তুতঃ "সামান্য" পদার্থ এক দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে না। পক্ষের বিরুদ্ধ হওয়ায় হেতু দুষ্ট হইয়াছে।

১৪। ব্যঙ্গ্যপক্ষবিরুদ্ধ হেতু। যে হেতু ব্যঙ্গ্য-পক্ষের বিরুদ্ধ, উহাও দুষ্ট হেতু। যথা,—

অর্থ ক্রিয়ার সাধনকারক,

যেহেতু উহা চক্ষুরাদির গ্রহণ-যোগ্য।

'অর্থ' শব্দে বস্তু ও অভিপ্রায় উভয়ই বুঝায়। বস্তু চক্ষুরাদির গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু অভিপ্রায় চক্ষুরাদির গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব হেতু ব্যঙ্গ্য পক্ষের বিরুদ্ধ হওয়ায় দুষ্ট হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত

দিঙ্‌নাগ দৃষ্টান্তের অর্থ বিশদ করিয়া উহা দ্বারা হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-নৈয়ায়িকগণ দৃষ্টান্তের এরূপ ব্যবহার করেন নাই। যথা,—

পর্ব্বত বহ্নিমান্,

যে হেতু উহাতে ধূম আছে,

যাহাতে যাহাতে ধূম আছে, তাহাই বহ্নিমান্, যেমন রন্ধনশালা (সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত)।

যাহা বহ্নিমান্ নহে, তাহাতে ধূম নাই, যেমন হ্রদ (বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত)।

যাহাতে যাহাতে ধূম আছে, তাহাই বহ্নিমান্, এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া দিঙ্‌নাগ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব দেখাইলেন। হেতু ও সাধ্যের এইরূপ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। দিঙ্‌নাগের সময় হইতেই ব্যাপ্তিবাদের সম্যক্ পরিপুষ্টি আরম্ভ হয়।

সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তাভাস

সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ। সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত দুষ্ট হইলে উহাকে সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তাভাস বলে। ইহা পাঁচ প্রকার। নিম্নে উহা প্রদর্শিত হইতেছে,—

১। যে দৃষ্টান্ত হেতুর সহিত সমানাধিকরণ নহে, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা অমূর্ত্ত, তাহাই নিত্য, যেমন পরমাণু।

এ স্থলে পরমাণু দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা অমূর্ত্ত নহে।

২। যে দৃষ্টান্ত সাধ্যের সহিত সমানাধিকরণ নহে, উহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা—

শব্দ নিত্য,

যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহাই অমূর্ত্ত, তাহা নিত্য, যেমন জীব-বুদ্ধি।

এ স্থলে জীব-বুদ্ধি দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা নিত্য নহে।

৩। যে দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য কাহারও সহিত সমানাধিকরণ নহে, তাহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা অমূর্ত্ত, তাহাই নিত্য, যেমন ঘট।

এ স্থলে ঘট দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা অমূর্ত্তও নহে, নিত্যও নহে।

৪। অনন্বয়-দৃষ্টান্তাভাস। যে স্থলে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি না থাকে, সেই স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, উহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

এই পুরুষ রাগী,

যে হেতু ইনি বক্তা,

যিনি বক্তা, তিনি রাগী, যেমন কোন মগধদেশীয় লোক।

এ স্থলে বক্তা ও রাগী, এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। যদিও মগধ-দেশীয় কোন লোক একাধারে রাগী ও বক্তা হইতে পারে, তাহা হইলেও উহাকে দুষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে।

৫। বিপরীতান্বয়-দৃষ্টান্তাভাস। যে স্থলে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপরীতভাবে থাকে, সেই স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, উহাকে বিপরীতান্বয়-দৃষ্টান্তাভাস বলে। যথা,—

শব্দ অনিত্য,

যে হেতু উহা প্রযত্নকৃত,

যাহা যাহা অনিত্য, তাহাই প্রযত্নকৃত—যেমন ঘট।

এ স্থলে ঘট দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপরীতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা যাহা অনিত্য, তাহাই প্রযত্নকৃত, এ কথা বলা ঠিক নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা যাহা প্রযত্নকৃত, তাহাই অনিত্য, এইরূপ বলিলে ঠিক হইত।

বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাস

বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাসও পাঁচ প্রকার। যথা,—

১। যে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত হেতুর বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা নিত্য নহে, তাহা অমূর্ত্ত নহে, যেমন বুদ্ধি।

এ স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা দুষ্ট। কারণ, বুদ্ধি অমূর্ত্ত বস্তুর বিপরীত বস্তু অর্থাৎ মূর্ত্ত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ।

৭। যে দৃষ্টান্ত সাধ্যের বিপরীত ব হইতে ব্যধিকরণ, তাহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা নিত্য নহে, তাহা অমূর্ত্ত নহে, যেমন পরমাণু।

এ স্থলে পরমাণু দুষ্ট দৃষ্টান্ত। কারণ, উহা নিত্য বস্তুর বিপরীত বস্তু অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর ব্যধিকরণ হইয়াছে।

৮। যে দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য, এতদুভয়ের বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ, উহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা নিত্য নহে, তাহা অমূর্ত্ত নহে, যেমন আকাশ।

এ স্থলে 'আকাশ' দুষ্ট দৃষ্টান্ত। কারণ, উহা অনিত্য ও মূর্ত্ত, এতদুভয়ের বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ।

৯। অনন্বয়-বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাস। যে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য, এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করে না, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

এই পুরুষ রাগী,

যেহেতু ইনি বক্তা,

যিনি রাগী নহেন, তিনি বক্তা নহেন, যেমন পাষাণখণ্ড।

এ স্থলে 'পাষাণখণ্ড' দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা রাগী ও বক্তা, এতদুভয়ের পরস্পর ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছে না।

১০। বিপরীতান্বয়-বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাস। যে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপরীত ভাবে প্রদর্শন করে, উহা দুষ্ট দৃষ্টান্ত। যথা,—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা উৎপাদনশীল,

যাহা উৎপাদনশীল নহে, তাহা অনিত্য নহে, যেমন আকাশ।

এ স্থলে দৃষ্টান্তটি বিপরীতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ ভাব এইরূপ হইবে ;—যাহা অনিত্য নয়, তাহা উৎপাদনশীল নহে।

দূষণ ও দূষণাভাস

পক্ষাভাস, হেত্বাভাস এবং দৃষ্টান্তাভাস, এ সকলকেই দূষণ বা অনুমানের দোষ বলে। প্রতিপক্ষের অনুমানে বা যুক্তিতে উদ্ভূত আভাসত্রয়ের কোন একটি উদ্ভাবন করার নাম

দূষণ। যে অনুমান বা যুক্তিতে আভাস বা দোষ নাই, তাহাতে আভাস বা দোষ আরোপ করার নাম দূষণাভাস।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান

স্বার্থজ্ঞান দ্বিবিধ ;—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ইন্দ্রিয়সমুৎপন্ন কল্পনারহিত এবং নাম-জাত্যাদির সহিত অসংসৃষ্ট জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অনুমান। প্রত্যক্ষ ও অনুমানে দোষ থাকিলে উহারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষাভাস ও অনুমানাভাস নামে অভিহিত হয়।

দিঙ্‌নাগের হেতুচক্রহমরু

তিব্বতে দিঙ্‌নাগকৃত অপর একখানি ক্ষুদ্র ন্যায়-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার নাম "হেতুচক্রহমরু"। হমরু শব্দের অর্থ কি, ঠিক বলা যায় না। তিব্বতীয় অনুবাদকগণ উহা "ব্যবস্থা" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মাশোক নামে এক ভিক্ষু এবং জহোরনিবাসী বোধিসত্ত্ব নামক এক পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া হেতুচক্রহমরু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন ;—

"যিনি জগতের ভ্রমজাল ধ্বংস করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞকে নমস্কারপূর্ব্বক আমি হেতুর ত্রিবিধ রূপ ব্যাখ্যা করিতেছি।"

হেতুর ত্রিবিধ রূপ ন্যায়প্রবেশ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেতুচক্রহমরু গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ দেখাইয়াছেন যে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নয় প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে দুইটি সম্বন্ধ ন্যায্য। অপর সাতটি সম্বন্ধ ব্যভিচারী। হেতুচক্রের রূপ পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল ;—

হেতুচক্র

(হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নয় প্রকার সম্বন্ধ)

১ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা জ্ঞেয়। যেমন আকাশ এবং যেমন ঘট। এ স্থলে আকাশ নিত্য হইয়াও জ্ঞেয় এবং ঘট অনিত্য হইয়াও জ্ঞেয়। অতএব "জ্ঞেয়"—এই হেতুর সহিত "নিত্য"—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। এইটি সাধারণ হেতুর উদাহরণ।	২ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। ঘটের ন্যায় কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে। এ স্থলে অনিত্য ঘট উৎপাদশীল, কিন্তু নিত্য আকাশ উৎপাদশীল নহে। অতএব "উৎপাদশীল"—এই হেতুর সহিত "অনিত্য"—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে। এই অনুমান নির্দ্দোষ হইয়াছে।	৩ শব্দ প্রযত্নকৃত, যেহেতু উহা অনিত্য। যেমন ঘট, যেমন বিদ্যুৎ এবং যেমন আকাশ। এ স্থলে ঘট অনিত্য ও প্রযত্নকৃত, বিদ্যুৎ অনিত্য, কিন্তু প্রযত্নকৃত নহে এবং আকাশ অনিত্যও নহে, প্রযত্নকৃতও নহে। অতএব "অনিত্য"—এই হেতুর সহিত "প্রযত্নকৃত"—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত।
৪ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। যেমন আকাশ এবং যেমন ঘট। এ স্থলে আকাশ নিত্য, কিন্তু উৎপাদশীল নহে এবং ঘট উৎপাদশীল, কিন্তু নিত্য নহে। অতএব উৎপাদশীল—এই হেতুর সহিত নিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। বিরুদ্ধ হেতু।	৫ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা শ্রবণযোগ্য। যেমন ঘট এবং যেমন আকাশ। এ স্থলে ঘট অনিত্য, কিন্তু শ্রবণযোগ্য নহে এবং আকাশ অনিত্যও নহে, শ্রবণযোগ্যও নহে। অতএব শ্রবণযোগ্য—এই হেতুর সহিত অনিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। সাধ্যবিশিষ্ট ও সাধ্যশূন্য হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় হেতু অসাধারণ হইয়াছে।	৬ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নকৃত। যেমন আকাশ, যেমন ঘট এবং যেমন বিদ্যুৎ। এ স্থলে আকাশ নিত্য কিন্তু প্রযত্নকৃত নহে, ঘট প্রযত্নকৃত কিন্তু নিত্য নহে এবং বিদ্যুৎ নিত্যও নহে প্রযত্নকৃতও নহে। অতএব প্রযত্নকৃত—এই হেতুর সহিত নিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। বিরুদ্ধ হেতু।
৭ শব্দ অপ্রযত্নকৃত, যেহেতু উহা অনিত্য। যেমন বিদ্যুৎ, যেমন আকাশ এবং যেমন ঘট। এ স্থলে বিদ্যুৎ অনিত্য ও অপ্রযত্নকৃত, আকাশ নিত্য ও অপ্রযত্নকৃত এবং ঘট অনিত্য কিন্তু অপ্রযত্নকৃত নহে। অতএব অনিত্য—এই হেতুর সহিত অপ্রযত্নকৃত—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত।	৮ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নকৃত। ঘটের ন্যায় কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে। এ স্থলে ঘট প্রযত্নকৃত ও অনিত্য এবং আকাশ অনিত্যও নহে, প্রযত্নকৃতও নহে। অতএব প্রযত্নকৃত—এই হেতুর সহিত অনিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে। অনুমান নির্দ্দোষ হইয়াছে।	৯ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা মূর্ত্ত। যেমন আকাশ, যেমন পরমাণু, যেমন ক্রিয়া এবং যেমন ঘট। এ স্থলে আকাশ নিত্য, কিন্তু মূর্ত্ত নহে, পরমাণু মূর্ত্ত ও নিত্য, ক্রিয়া মূর্ত্তও নহে নিত্যও নহে এবং ঘট মূর্ত্ত কিন্তু নিত্য নহে। অতএব মূর্ত্ত—এই হেতুর সহিত নিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত।

দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি

দিঙ্‌নাগ স্বয়ং প্রমাণসমুচ্চয়ের এক বৃত্তি প্রণয়ন করেন। উহা বসুধর রক্ষিত নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ হেমবর্ম্ম নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সাহায্যে পুনরায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে ;—

"বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঞ্জুনাথের আদেশে পরিচালিত হইয়া কুশাগ্রীয়বুদ্ধি মহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।"

দিঙ্‌নাগের প্রমাণশাস্ত্রপ্রবেশ

প্রমাণশাস্ত্রপ্রবেশ নামে দিঙ্‌নাগকৃত অপর একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা প্রথমতঃ চীন-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। পরে চীনদেশ হইতে উহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তিব্বত দেশে উহার অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

দিঙ্‌নাগের আলম্বণপরীক্ষা

আলম্বণপরীক্ষা নামে দিঙ্‌নাগকৃত অপর একখানি গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে উহার তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

দিঙ্‌নাগের আলম্বণপরীক্ষাবৃত্তি

দিঙ্‌নাগ স্বয়ং আলম্বণপরীক্ষাবৃত্তি নামে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। উহার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

দিঙ্‌নাগের ত্রিকালপরীক্ষা

দিঙ্‌নাগ ত্রিকালপরীক্ষা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। শান্তকর গুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

শঙ্করস্বামী (৫৫০ খৃষ্টাব্দ)

দিঙ্‌নাগের প্রধান শিষ্যের নাম শঙ্করস্বামী। ইনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের লোক। দিঙ্‌নাগ-প্রণীত তর্কশাস্ত্র শিষ্যপরম্পরাক্রমে এগার পুরুষের পর শীলভদ্র নামক পণ্ডিতের হস্তে উপস্থিত হয়। শীলভদ্র ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। শঙ্করস্বামি-রচিত ন্যায়প্রবেশ

তর্কশাস্ত্র এখনও চীন-ভাষায় বিদ্যমান আছে। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং নামক চীন পরিব্রাজক এই গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীন-ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল (৬৫০—৬৩৫ খৃষ্টাব্দ)

ধর্ম্মপাল দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাঞ্চীপুরের রাজ-মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চীপুরের রাজা ও রাজ্ঞী ধর্ম্মপালকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একদিন উঁহারা ধর্ম্মপালের অভ্যর্থনার নিমিত্ত এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। নগরে মহা আনন্দ-কোলাহল হইতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মপালের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি ভিক্ষুর বেশ পরিধান করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। সমস্ত বৌদ্ধ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি উহাতে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। ধর্ম্মপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রত্ন ছিলেন। কথিত আছে, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অধিনায়কত্ব-পদ পরিত্যাগ করেন। তিনি কবি ভর্ত্তৃহরির সহিত মিলিত হইয়া পাণিনি ব্যাকরণের বেড়াবৃত্তি প্রণয়ন করেন। ধর্ম্মপাল যোগাচার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তাঁহার শতশাস্ত্র-বৈপুল্য-ব্যাখ্যা ৬৫০ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। কৌশাম্বী নগরে ধর্ম্মপাল বহু তীর্থিককে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া কৌশাম্বী নগরীতে যে বিহারে ধর্ম্মপাল বাস করিতেন ও যেখানে বসিয়া তীর্থিকগণকে পরাজিত করেন, উহা পরিদর্শন করেন।

আচার্য্য শীলভদ্র (৬৩৫ খৃষ্টাব্দ)

শীলভদ্র সমতট প্রদেশের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে বর্ত্তমান কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমতট প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। শীলভদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মপালের নিকট নানা বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ধর্ম্মপালের অবসর গ্রহণের পর শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শীলভদ্র অসাধারণ নৈয়ায়িক ও অশেষশাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি (৬৩৫-৬৫০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

ধর্ম্মকীর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের চূড়ামণি প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ "চূড়ামণি" চোল দেশের নামান্তর মাত্র। কোন কোন গ্রন্থে ত্রিমলয় প্রদেশ ধর্ম্মকীর্ত্তির জন্মভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছে। ত্রিমলয়ও বোধ হয়, চোল দেশের অন্তর্গত। ধর্ম্মকীর্ত্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম পরিব্রাজক করুণানন্দ। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। নানা শিল্পবিদ্যা, ষড়ঙ্গ বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং সমস্ত তীর্থিক-দর্শনে ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি তীর্থিক-দর্শনের পারগামী হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি বৌদ্ধ কথকগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, বুদ্ধের উপদেশ নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। তিনি বৌদ্ধ উপাসকের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করায় সমাজচ্যুত হইলেন। তদনন্তর তিনি মগধে আগমন করিয়া ধর্ম্মপালের সম্প্রদায়ভুক্ত হন। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তিনি ত্রিপিটকে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং পাঁচ শত সূত্র ও ধারণী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইল। ব্রাহ্মণগণের গুহ্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি আত্মগোপন পূর্ব্বক ভৃত্যের বেশে দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করেন। ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্টের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন। কুমারিল ভট্ট স্বদেশীয় রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার বহু ধান্যক্ষেত্র ও দাস-দাসী ছিল। ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের গৃহে ভৃত্যের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসামান্য পরিশ্রম ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কুমারিল ভট্ট তাঁহাকে গুহ্য শাস্ত্র শ্রবণ করিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণগণের গুহ্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিলের গৃহ পরিত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ভৃত্যত্ব গ্রহণের পর অবধি তিনি যে বেতন পাইয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রীত্যর্থে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি যে দিন কুমারিলের গৃহ ত্যাগ করেন, সেই দিন এই ভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি তীর্থিক দার্শনিকগণের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কণাদ-দর্শনের মতাবলম্বী কণাদ গুপ্তের সহিত তাঁহার প্রথম তর্ক হয়। তিনি সমস্ত বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া উহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কণাদ গুপ্তের পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া কুমারিল ভট্ট অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং পাঁচ শত ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি বিন্ধ্য পর্ব্বতে নিগ্রন্থ, রাহুব্রতী ও অন্যান্য পরিব্রাজক-সম্প্রদায়কে পরাজিত করেন। দ্রাবিড় প্রদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ঢক্কা-নিনাদে সকলকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করেন। অনেক তীর্থিক ভয়ে পলায়ন করেন এবং অনেকে স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত তর্কে অগ্রসর হইতে অক্ষম। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বহু উন্নতি সাধন করিয়া দ্রাবিড়ের নির্জ্জন বনে বাস করেন। তিনি কলিঙ্গদেশে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু তীর্থিককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কলিঙ্গ দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন তাঁহার অসংখ্য শিষ্য দাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যান।

কথিত আছে, তথায় আকাশ হইতে মহাপুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি নিনাদ হয়। সমস্ত দেশ সাত দিন পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও দুন্দুভি-ধ্বনিতে নিনাদিত হইয়াছিল।

আবির্ভাব-কাল

কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্র। লামা তারানাথ বলেন, তিব্বতীয় দেশে প্রচলিত এই প্রবাদ সমূলক নহে, কারণ, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার প্রমাণক কোন বচন নাই। লামা তারানাথের মতে আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি ও তিব্বত দেশের রাজা স্রোঙ্-চন্-গম্-পো সমসাময়িক। উক্ত রাজা ৬২৭ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অতএব ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্ যখন নালন্দা পরিদর্শন করেন, তখন ধর্ম্মকীর্ত্তির কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয় নাই। হুয়েন-সাঙ্ ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু ৬৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ই-চিঙ্ ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, দিঙ্নাগের পর ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়শাস্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মকীর্ত্তি ধর্ম্মপালের শিষ্য। ধর্ম্মপাল ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কত্ব-পদ পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, তখনও ধর্ম্মকীর্ত্তি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অথবা তাহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ন্যায়বার্ত্তিক-প্রণেতা ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদ্দ্যোতকর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রায় সমসাময়িক। ন্যায়-বিন্দু ও বাদন্যায় গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তি উদ্দ্যোতকরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও আবার ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় বা বাদবিধি পুস্তক উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—

যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্ (ন্যায়বার্ত্তিক, ১অঃ, ৩৩সূ)।

ধর্ম্মকীর্ত্তিও "শাস্ত্র" ও "শাস্ত্রকার" এই দুই নামে যথাক্রমে ন্যায়বার্ত্তিক ও উদ্দ্যোতকরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—

স্বয়মিতি বাদিনা যস্তদা সাধনমাহ। এতেন যদপি কচিৎ শাস্ত্রে স্থিতসাধনমাহ, তচ্ছাস্ত্র-কারেণ তস্মিন্ ধর্ম্মিণি অনেকধর্ম্মাভ্যুপগমেঽপি যস্তদা তেন বাদিনা ধর্ম্মঃ স্বয়ং সাধয়িতুং ইষ্টঃ স এব সাধ্যো নেতর ইত্যুক্তং ভবতি।—(ন্যায়বিন্দু, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

মীমাংসক সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকে এবং দিগম্বর জৈন বিদ্যানন্দ অষ্টসাহস্রিকা গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা;—

ত্রিষ্বেব স্বাবিনাভাবাদিতি যদ্ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।

প্রত্যজ্ঞায়ি প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েতাসৌ ন সংশয়ঃ।—(বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টীকায় ধর্ম্মকীর্ত্তির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা ;—

যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ

তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাদ্বহুষপি ন সম্ভবঃ॥—(ভামতী, ২।২।২৮)।

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা

ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত বহু ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রমাণবার্ত্তিককারিকা অন্যতম। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে প্রমাণবার্ত্তিককারিকা হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈঃ দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে।—(প্রমাণ-বার্ত্তিক-কারিকা)।

প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তী তিব্বতীয় গ্রন্থে বিদ্যমান আছে ;—ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। একদিন ঈশ্বর সেন নামক এক অধ্যাপকের গৃহে প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ পঠিত হয়। ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ স্থানে ঐ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন। তিনি শ্রবণমাত্রেই ঈশ্বর সেনের ন্যায় ঐ গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর সেন বহু বর্ষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পর প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ দ্বিতীয় বার শ্রবণ করিয়া ঐ গ্রন্থ-প্রণেতা দিঙ্নাগের সমকক্ষ হইয়া পড়েন। তৃতীয় বার শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিলেন যে, প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে ভ্রান্তি আছে। ঈশ্বর সেন তাঁহার কথায় বিরক্ত হইলেন না। বরঞ্চ বলিলেন,—"আপনি প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর এক বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া দিঙ্নাগের সমস্ত ভ্রান্তি প্রদর্শন করুন।" এই অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি অনুষ্টুপ্ ছন্দে প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা নামে প্রমাণসমুচ্চয়ের এক টীকা রচনা করেন।

মূল সংস্কৃত প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ বিদ্যমান আছে। সুভূতিশ্রীশান্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতের লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা,—

১। স্বার্থানুমান।
২। প্রমাণসিদ্ধি।
৩। প্রত্যক্ষ।
৪। পরার্থবাক্য।

গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে যে, যিনি জগতে অপ্রাতদ্বন্দ্বী ও যাঁহার যশঃ সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূরিত করিয়াছে, সেই দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপণ্ডিত শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তি এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি

ধর্ম্মকীর্ত্তি নিজেই প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকার উপর এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে ;— ধর্ম্মকীর্ত্তি মহাপণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন। তাঁহার যশে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত হইয়াছিল। তার্কিকগজকেশরী ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রতিপক্ষগণের মস্তক বিচূর্ণ করিয়াছিলেন।"

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয়

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নিম্নলিখিত কারিকা কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা,—

নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ॥
সহোপলম্ভনিয়মাৎ অভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ ॥
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥

—(প্রমাণবিনিশ্চয়, ১ম পরিচ্ছেদ।)

এই কয়েকটি কারিকা ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বিদ্যমান আছে। মূল প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য্যের সময়ে উহা নষ্ট হয় নাই। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরহিতভদ্র তিব্বতীয় লামার সাহায্যে প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রমাণ-বিনিশ্চয় তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা,—(১) প্রত্যক্ষব্যবস্থা, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে,—"ধর্ম্মকীর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের মহাপণ্ডিত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না।"

ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু

ন্যায়বিন্দু ধর্ম্মকীর্ত্তির অপর একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একখানি তালপত্র-লিখিত প্রতিলিপি গুজরাটের শান্তিনাথ নামক জৈনমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ অধ্যাপক পিটারসন্ সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাবলীমধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। "এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা,—

(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান ও (৩) পরার্থানুমান।

প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বপুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়। সম্যক্ জ্ঞান দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কল্পনাবিরহিত ও ভ্রান্তিশূন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ চতুর্ব্বিধ।

স্বার্থানুমান

স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান দুই প্রকার। লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা অনুমেয়ের জ্ঞানের নাম স্বার্থানুমান। লিঙ্গ বা হেতুর ত্রিবিধ রূপ; যথা,—

(১) পক্ষে লিঙ্গের সত্তা অবশ্যই থাকিবে।

যেমন পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট। যে হেতু উহাতে ধূম আছে, যেমন রন্ধনশালা। এ স্থলে "ধূম" লিঙ্গ বা হেতু। উহা পর্ব্বতে অবশ্যই থাকিবে, নতুবা অনুমান হইবে না।

(২) কেবল সপক্ষেই লিঙ্গের সত্তা থাকিবে।

যেমন ধূম রন্ধনশালায় থাকে। রন্ধনশালা বহ্নিবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেরই সপক্ষ।

(৩) অসপক্ষে লিঙ্গের সত্তা থাকিবেই না।

যেমন হ্রদ বহ্নিবিশিষ্ট বস্তুর অসপক্ষ। হ্রদে ধূম থাকে না।

লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা,—

(১) স্বভাব, (২) কার্য্য ও (৩) অনুপলব্ধি।

১। স্বভাবের উদাহরণ,—
এইটি বৃক্ষ,
যে হেতু ইহা শিংশপা।

২। কার্য্যের উদাহরণ,—
এইটি বহ্নিমান্,
যে হেতু ইহাতে ধূম আছে।

৩। অনুপলব্ধির উদাহরণ,—
এখানে ধূম নাই,
যে হেতু উহা উপলব্ধ হইতেছে না।

অনুপলব্ধি

অনুপলব্ধি একাদশ প্রকার। যথা,—

১। স্বভাবানুপলব্ধি—এখানে ধূম নাই, যে হেতু উহা উপলব্ধ হইতেছে না। উপলব্ধ হওয়া ধূমের স্বভাব, তথাপি ইহা উপলব্ধ হইতেছে না।

২। কার্য্যানুপলব্ধি—এখানে ধূমের কারণসমূহ অপ্রতিবদ্ধ সামর্থ্য, যেহেতু এখানে ধূম নাই।

৩। ব্যাপকানুপলব্ধি—এখানে শিংশপা নাই, যে হেতু এখানে বৃক্ষের অভাব।

৪। স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে শীতস্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে।

৫। বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি—এখানে শীতস্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে ধূমের অভাব।

৬। বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি—ভূতভাবেরও বিনাশ নিশ্চিত নহে, যে হেতু উহা হেত্বন্তরাপেক্ষী।

৭। কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে শীতকারণসমূহ অপ্রতিবদ্ধসামর্থ্য নহে, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে।

৮। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে তুষারস্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে।

৯। কারণানুপলব্ধি—এখানে ধূম নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি নাই।

১০। কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি—ইঁহার রোমহর্ষাদি বিশেষ লক্ষণ নাই, যে হেতু ইনি অগ্নি-বিশেষের সন্নিকটে বর্ত্তমান।

১১। কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি—এই প্রদেশে রোমহর্ষাদিযুক্ত পুরুষ নাই, যে হেতু এখানে ধূম আছে।

পরার্থানুমান

ত্রিরূপবিশিষ্ট লিঙ্গ বা হেতুর আখ্যান বা কথনের নাম পরার্থানুমান। পরার্থানুমান এক প্রকার জ্ঞান। আখ্যান বা কথন এই জ্ঞানের কারণ। এ স্থলে কারণে কার্য্যের উপচার করিয়া আখ্যান বা কথনকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে। পরার্থানুমান দুই প্রকার;—সাধর্ম্ম্যবৎ ও বৈধর্ম্ম্যবৎ। সাধর্ম্ম্যবৎ পরার্থানুমান যথা,—

শব্দ অনিত্য,
যে হেতু উহা উৎপাদশীল।
সমস্ত উৎপাদশীল বস্তুই অনিত্য, যেমন ঘট।

বৈধর্ম্ম্যবৎ পরার্থানুমান যথা,—

শব্দ অনিত্য,
যে হেতু উহা উৎপাদশীল।
অনিত্য নয়, এমন কোন বস্তুই উৎপাদশীল নহে, যেমন আকাশ।

পক্ষ

যাহাতে সাধ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহাই পক্ষ বা ধর্ম্মী। যথা,—পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, এ স্থলে 'পর্ব্বত' পক্ষ।

কোন কোন পক্ষ দুষ্ট। ইহাদিগকে পক্ষাভাস বলে। পক্ষাভাস চতুর্ব্বিধ। যথা,—(১) প্রত্যক্ষনিরাকৃত, যেমন শব্দ অশ্রাবণ। (২) অনুমাননিরাকৃত, যেমন শব্দ নিত্য। (৩) প্রতীতিনিরাকৃত, যেমন শশী অচন্দ্র। (৪) স্ববচননিরাকৃত, যেমন অনুমান প্রমাণ নহে।

হেতু

দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বা সাধনাভাস বলে। হেত্বাভাস তিন প্রকার, যথা,—অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক এবং বিরুদ্ধ।

(ক) অসিদ্ধ,—

(১) শব্দ অনিত্য, যে হেতু উহা চাক্ষুষ। এ স্থলে 'চাক্ষুষত্ব' নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের হেতু না হওয়ায় উভয়াসিদ্ধ হইয়াছে।

(২) তরু চেতন, যেহেতু সর্ব্বত্বগপহরণে ইহার মৃত্যু হয়। এ স্থলে ত্বগপহরণে বৃক্ষের মৃত্যু প্রতিবাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় অসিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, যে হেতু উহাতে বাষ্প আছে। এ স্থলে বাষ্প বহ্নির কার্য্য কি না, সন্দেহ হওয়ায় হেতুটি সন্দিগ্ধ হইয়াছে।

(৪) আত্মা সর্ব্বগত, যেহেতু উহা সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয়। এ স্থলে হেতু ধর্ম্মাসিদ্ধ হইয়াছে।

(খ) অনৈকান্তিক,—

(৫) শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রমেয়। এ স্থলে প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম নিত্য অনিত্য উভয় বস্তুতে বিদ্যমান থাকায় হেতু অনৈকান্তিক বা অনিশ্চিত।

(৬) কোন পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি বক্তা। এ স্থলে বক্তৃত্বধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব কোনটিরই কারণ না হওয়ায় হেতুটি অনৈকান্তিক বা অনিশ্চিত হইয়াছে।

(গ) বিরুদ্ধ,—

(৭) শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। এ স্থলে উৎপাদশীল—এই হেতু, নিত্য—এই সাধ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায়, হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়াছে।

(৮) শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। এ স্থলে উৎপাদশীল—এই হেতু অনিত্যের অসমানাধিকরণ না হওয়ায় হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তি কর্ত্তৃক দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন

সাধ্য ও হেতুর পরস্পর বিরোধ হইলে যে বিরুদ্ধ হেতু হয়, এ কথা দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি উভয়েই স্বীকার করেন। কিন্তু দিঙ্‌নাগ অপর এক প্রকার বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করেন, উহার নাম ইষ্টবিঘাতকৃৎ বিরুদ্ধ। যথা,—

চক্ষুরাদি পরের প্রয়োজনসিদ্ধকারক,
যেহেতু উহারা সংহত পদার্থ।
যেমন শয্যা, আসন ইত্যাদি।

এ স্থলে 'পর' শব্দের শরীর বা আত্মা উভয় অর্থই হইতে পারে। সাধ্য যদি এইরূপ ভাবে দ্ব্যর্থক হয়, তাহা হইলে ইষ্টার্থ লক্ষ্য করিয়া সাধ্যের সহিত হেতুর বিরোধ দেখাইলেও উহা বিরুদ্ধ হেতু হইবে। ইহা দিঙ্‌নাগের মত। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন,—ইষ্টবিঘাতকৃৎ বিরুদ্ধ নামে অপর একটি বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করার কোনই প্রয়োজন নাই। যদি সাধ্যের বাচক অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহার সহিত হেতুর বিরোধ না থাকায় হেতুটি বিরুদ্ধ হইল না। আর যদি কেবল ইষ্টার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে হেতুটি বিরুদ্ধ হেতু

হইল। যে স্থলে বাচকার্থ ও ইষ্টার্থের সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে স্থলে হেতুটি অনৈকান্তিক হইবে। অতএব ইষ্টবিঘাতকৃৎ নামে অপর এক প্রকার বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

দিঙ্‌নাগ বিরুদ্ধাব্যভিচারী নামে এক প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, ওরূপ হেত্বাভাস স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। দিঙ্‌নাগ বলেন, যদি বাদীর হেতু স্বশাস্ত্রসম্মত হইয়া প্রতিবাদীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় অথবা যদি প্রতিবাদীর হেতু তাঁহার নিজের শাস্ত্রসম্মত হইয়া বাদীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে ব্যভিচারী হেতু বলা যায় না। অতএব বাদী ও প্রতিবাদীর নিগমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয়ের হেতু স্ব স্ব শাস্ত্রসম্মত হওয়ায় হেতুটি বিরুদ্ধাব্যভিচারী হইবে। বিরুদ্ধাব্যভিচারী হেতু সংশয়ের কারণ বলিয়া উহা হেত্বাভাস নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বিরুদ্ধাব্যভিচারী হেতু আগম বা শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমানের প্রস্তাবে পরিগণিত হইতে পারে না।

ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, অনুমান প্রয়োগে উদাহরণ নিষ্ফল। কারণ, উদাহরণে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা হেতুমধ্যে পূর্ব্বেই নিহিত আছে। যথা,—

পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট,
যে হেতু উহা ধূমবিশিষ্ট,
যেমন রন্ধনশালা।

এ স্থলে রন্ধনশালা এই উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ধূমবিশিষ্ট বস্তু মাত্রই যদি বহ্নিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে রন্ধনশালাও যে বহ্নিবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? উদাহরণের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন যে, হেতুতে যাহা সামান্য ভাবে উক্ত হইয়াছে, উদাহরণে তাহা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করা যায়। ধূমবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বহ্নিবিশিষ্ট, এই কথা বিশেষ ভাবে দেখানের জন্য, 'রন্ধনশালা' এই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রন্ধনশালায় ধূমও আছে, বহ্নিও আছে।

সাধর্ম্ম্য উদাহরণাভাস

উদাহরণ দুই প্রকার। সাধর্ম্ম্য উদাহরণ ও বৈধর্ম্ম্য উদাহরণ। উদাহরণ দুষ্ট হইলে উহাকে উদাহরণাভাস বলে।

সাধর্ম্ম্য উদাহরণাভাস যথা,—

১। শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,
যেমন ক্রিয়া।

এ স্থলে 'ক্রিয়া' উদাহরণাভাস, কারণ, ক্রিয়া অমূর্ত্ত হইলেও নিত্য নহে। এইটি সাধ্য বিচ্যুত উদাহরণ।

২। শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,
যেমন পরমাণু।

এ স্থলে 'পরমাণু' উদাহরণাভাস। কারণ, উহা নিত্য হইলেও অমূর্ত্ত নহে। এইটি হেতু-বিচ্যুত উদাহরণ।

৩। শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,
যেমন ঘট।

এ স্থলে 'ঘট' উদাহরণাভাস। কারণ, উহা নিত্যও নহে, অমূর্ত্তও নহে। এইটি সাধ্য ও হেতু উভয় বিচ্যুত উদাহরণ।

৪। এই ব্যক্তি রাগী,
যেহেতু ইনি বক্তা,
যেমন একটি রথ্যাপুরুষ।

এ স্থলে 'রথ্যাপুরুষ' উদাহরণাভাস। কারণ, তিনি রাগী কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি সাধ্যসংশয় উদাহরণ।

৫। এই ব্যক্তি মরণধর্ম্মবিশিষ্ট,
যেহেতু ইনি রাগী,
যেমন একটি রথ্যাপুরুষ।

এ স্থলে 'রথ্যাপুরুষ' উদাহরণাভাস। যেহেতু তিনি রাগী কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি হেতুসংশয় উদাহরণ।

৬। এই ব্যক্তি অসর্ব্বজ্ঞ,
যেহেতু ইনি রাগী,
যেমন একটি রথ্যাপুরুষ।

এ স্থলে 'রথ্যাপুরুষ' উদাহরণাভাস। যেহেতু ইনি একাধারে রাগী ও অসর্ব্বজ্ঞ কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি সাধ্য ও হেতু উভয় সংশয় উদাহরণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

———

চিত্র (ক)

জ্যোতিষিক মানযন্ত্র।—পৃঃ ১৩১।

চিত্র (গ)

জ্যোতিষিক মানযন্ত্র।—পৃঃ ১৬১।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা একখানি খোদিত তাম্রফলক।—১৯৯ পৃঃ। প্রথম পৃষ্ঠা

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ।

উপরে আচার্য্য দিঙ্‌নাগের যে মূর্ত্তি প্রদত্ত হইল উহা তিব্বতীয় তেঙ্গ্যুর গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। তেঙ্গ্যুর গ্রন্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বুতোন নামক কোন তিব্বতীয় পণ্ডিত কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। বুতোন তাসিলুম্পোর সন্নিকটস্থ শালু নামক বিহারে বাস করিতেন। তেঙ্গ্যুরে যে সকল পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহা অবশ্য বুতোনের বহু পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। অতএব এই মূর্ত্তিটি কত কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। কোন ভারতীয় মূর্ত্তির অনুকরণে তিব্বত দেশে এইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দিঙ্‌নাগের মস্তকে যে উষ্ণীষ দৃষ্ট হইতেছে, উহাকে তিব্বতীয় ভাষায় "পাঞ্চেন্ শোয়া-মার" অর্থাৎ "পণ্ডিতের লোহিত শিরোভূষণ" বলে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, দিঙ্‌নাগ যে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন, উহা রক্তবর্ণ ছিল। বিক্রমশিলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "পণ্ডিত" এই উপাধি লাভ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "পণ্ডিতোষ্ণীষ"ও প্রাপ্ত হইতেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত তিব্বতে "পণ্ডিতোষ্ণীষের" প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ ভারতের নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইহার প্রথম প্রচলন হয়। দিঙ্‌নাগ নালন্দায় বহু তার্কিককে পরাভূত করিয়া "পণ্ডিতোষ্ণীষ" লাভ করিয়াছিলেন।

দিঙ্‌নাগের শরীরে যে শাল দৃষ্ট হইতেছে, উহা দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন হস্তে বজ্র ও মস্তকের চতুর্দ্দিকে যে আভামণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, ঐ সমস্ত তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের দ্বারা সন্নিবেশিত, উহার সহিত দিঙ্‌নাগের প্রকৃত মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধ নাই।—পৃঃ ২১৫।

সভাপতির সম্বোধন*

আপনারা বর্ত্তমান সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শুনিলেন। যিনি এই অভিভাষণ পড়িলেন, তিনি বর্দ্ধমানবাসী—বর্দ্ধমানের রাজা, সুতরাং বর্দ্ধমানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একা বর্দ্ধমানের নহেন, তিনি সারা বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আদর করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা মহারাজাধিরাজ বলিয়াই জানি। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের পরেই তিনিই বাঙ্গালীর নেতা। তাঁহার আহ্বানে বাঙ্গলা সাহিত্য কৃতার্থ হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছে। সংসারে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা তাহার অনুরূপ অভিভাষণ হইয়াছে। এ অভিভাষণের বিশেষত্ব এই যে, উহা অল্প, সংক্ষেপ। লোকে বলে "রসের সার চুট্‌কী"—উহাতে বাগাড়ম্বর নাই, বর্দ্ধমানের ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই, বাঙ্গলারও ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই। উহার প্রধান চেষ্টা—আমাদের সম্বর্দ্ধনা। সে সম্বর্দ্ধনা যে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এখন আমার কথা। আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন, আমি কিরূপে আপনাদের মনোরঞ্জন করিব অনেক দিন ভাবিয়াছি। শেষে স্থির করিয়াছি, আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব। পুরাণ কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। সে পুরাণ কথা যদি আবার আপনাদের হয়, তাহা হইলে আরও ভাল লাগে। আবার যদি এখন আমাদের গৌরব কিছুই না থাকে এবং পূর্ব্বকালে অত্যন্ত অধিক থাকে, তাহা হইলে সে আলোচনা লোককে মাতাইয়া তুলিতে পারে। সেই জন্যই, সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, সুখের স্মৃতি সকল সময়ই মধুর।

আমার এ সম্বোধনে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ আছে। আমি পরিচ্ছেদ শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার জায়গায় গৌরব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি,—যেমন প্রথম গৌরব, দ্বিতীয় গৌরব ইত্যাদি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা বাঙ্গলার গৌরবের কথা বলিয়া মনে হইয়াছে, সেই গুলিকেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি।

---

* অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

প্রথম গৌরব

হস্তি-চিকিৎসা

বেদের আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্য্য জাতির প্রধান কীর্ত্তি ঋগ্বেদে "হস্তী" শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটি জায়গা এই :—

"মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বং ॥" ১।৬৪।৭

'হে মরুৎগণ, তোমরা বড় লোক, জ্ঞানবান; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণ-বর্ণ দিক্‌সমূহে তোমার বল যোজনা কর।'

"সূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ ॥" ৪।১৬।১৪

'হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্য্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ঙ্কর হও।'

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, "মৃগা ইব হস্তিনঃ", "মৃগো ন হস্তী" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উঁহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ায় ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপীয়েরা যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরও নানা রকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চিঁ-হি-হিঁ শূয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শূয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শূয়ার। আর্য্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেন না তাঁহারা শীকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতীর আসল বাসস্থান বাঙ্গলা, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্য্যন্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে মহিসুর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী

দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভালও নয়। সুতরাং বৈদিক আর্য্যেরা যে হাতীর বিষয় অল্পই জানিতেন, সে কথা এক রকম স্থির।

ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুই বার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, "হাতওয়ালা" মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া "শুঁড়ওয়ালা" বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে :—করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ—ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই, এমন কি ঐরাবতের নাম পর্য্যন্তও নাই। যাহারা কাল হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে?

ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন দেবতাকে কোন জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগার জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল; কোন কোন মতে বলিল, "না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলায়ও সেইরূপ।" এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা :—

রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজাকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই দিতে হইবে, বনের রাজা শার্দ্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষিরাজকে বর্ত্তক পাখী দিতে হইবে, নীলঙ্গু সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধিদের রাজা সোমকে কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

ঋগ্বেদে হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়—ঐ পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য হস্তী, এখন আর্য্যগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এক কালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ সোমলতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।" তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, "যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তী করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড়

ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

এই যে হাতী ধরা ও পোষমানান, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের এক দিকে হিমালয়, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি এক রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেই খানেই যাইতেন। কোন দিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোন দিন নদীর চড়ায়, কোন দিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার জোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতীর উপরে চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজাশ্রিত", "পুণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি হস্তিসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ মত হাতীশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারিদিকে খুজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক দিন খুজিয়া খুজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানা রূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা

করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না; রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পালকাপ্য"। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। অনেক জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্র সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীন সূত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে "ব্যাখ্যাস্যামঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত "পালকাপ্যের" প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা হইয়াছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন একখানি প্রাচীন হস্তিসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, ঋষি বলিলেন, "কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম।" কিন্তু চেন্তসাল রাও সি, আই, ই, যে "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন, কিরূপেই বা তাঁহাকে আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, আশ্বলায়নবোধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্য্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাঙ্গলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পা-নগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা

করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গ-রাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "হস্তিপ্রচার" অধ্যায়ে হস্তি-চিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতীর কোন অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্ব্বে যে হস্তি-চিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমূলার যাহাকে "Suttra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গোতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র-রচনার কাল আর ও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

দ্বিতীয় গৌরব

নানা ধর্ম্ম-মত

পূর্ব্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য্য জাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি পূর্ব্ব-ভারতে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের

নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বৌদ্ধেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্ম্মের কথা। এক ভাগ সূত্রের নামই ত গৃহ্যসূত্র। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনেরই কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ কর। গৃহস্থ আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ—এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। আর তাহা নাশ করিতে গেলে "আমি কে?", "কোথা হইতে আসিলাম?", "কেন আসিলাম?"—এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে "কেবল" হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সংস্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহঙ্কার থাকে না; যখন তাহার অহঙ্কার থাকে না, তখন সে সর্ব্বব্যাপী হয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ সকল কথা বেদ, ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্য্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনেরা বলেন, উলঙ্গ থাক, গায়ের মলা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া "মলধারী" এই উপাধি ধারণ করিতেন। আর্য্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন; তাহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্য্যগণ সর্ব্বদাই ক্ষেউরি হইতেন। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় একেবারে ক্ষেউরি হইত না। তাহাদের নখ চুল কখন কাটা হইত না। আর্য্যেরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকী রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্য্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধেরা বেলা ১২টার মধ্যে আহার করিত; ১২টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সে দিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না খাট ছাড়া আর্য্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন, মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, তাহারা মাটীতেই শুইয়া থাকিত। আর্য্যগণ সংস্কৃতে লেখা পড়া করিতেন, অন্য সকল ধর্ম্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখা পড়া করিত।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্য্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্য্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেন না উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার

কোন প্রমাণ নাই; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালির জৈন-মন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বার বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্ব্বের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেই খানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্ব্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের উপনিষৎ ও মনু প্রভৃতি কয়েক জন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শঙ্কর উহার খণ্ডন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছে, শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন না,—বলেন ও সকলের অর্থ অন্যরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ীও পূর্ব্বাঞ্চলে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে যে, পঞ্চশিখ জনক রাজার রাজসভায় আসিয়া রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্য-মত যে পূর্ব্বাঞ্চলের, এ কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাই আর এখানে বেশী করিয়া বলিব না।

তৃতীয় গৌরব

রেসম

বাঙ্গলার তৃতীয় গৌরব রেসমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেসমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেসমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চীনই রেসমের জন্ম স্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খৃষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাণী তুঁত গাছের চাস আরম্ভ করেন। রেসমের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখা পড়া আছে। চীনেরা রেসমের চাস কাহাকেও শিখিতে দিত না। উহা তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল।

জাপানীরা অনেক কষ্টে খৃষ্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেসমের চাস শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাস আরম্ভ করেন। ইউরোপে খৃষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থল-পথে চীনের সহিত রেসমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেসমের ব্যবসার জন্যই পঞ্জাবের শকরাজারা বেশী করিয়া সোণার টাকা চালান। ইউরোপে রেসমের চাস ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাস খুব হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের রেসম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেসম বাহির হইত, তাহার রঙ গমের মত, বকুলের *রেসমের রঙ সাদা, বট ও আর আর গাছের রেসমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে* সুবর্ণকুড্যের "পত্রোর্ণ" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্ট বস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জ্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম "কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা।" এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরৎ নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট, সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেসমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জ্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ-বেহার আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণ-কুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদা-বাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটী সোণার মত রাঙ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণ-সুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাস হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগ-কেশরের গাছ। নাগকেশর বাঙ্গলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদারগাছ। মাদারগাছেও রেসমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গলার রেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন

প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গলার রেসমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে, রেসমের চাস চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার যো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেসমের চাস বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেসমের চাস চীন হইতেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে, রেসমের চাস ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলায় ও মগধেই রেসমের চাস ছিল। কারণ, পৌণ্ড্র ও বাঙ্গলায়, সুবর্ণকুড্যও বাঙ্গলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেসমের চাস হইত। কারণ, মান্দাসোরে খৃঃ ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাঁহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে এক দল রেসম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেসমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাঙ্গলার বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাস আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব্ব প্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেসমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা ত আর তুঁতপাতা হইতে রেসম বাহির করিতেন না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা চাসে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেসম বাহির করিতেন। চীনের রেসম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাঙ্গলার রেসম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সূতা হইত। আর এ বিদ্যা বাঙ্গলার নিজস্ব—ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

চতুর্থ গৌরব

বাকলের কাপড়

বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও দু এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর এক খানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিংএর চারি দিকে বড় বড় ফটক আছে। দুই দুইটি থামের উপর এক একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের

কাপড় পরার ধরণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; শণ, পাট, ধঞ্চে—এমন কি আতসী গাছের ছাল হইতেও সূতা বাহির করিত। এখন এই সকল সূতায় দড়ী ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম", উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকূল"। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে "দুকূল" হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রে ও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকূল হইত, তাহার বর্ণ সূর্য্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্রদেশের ক্ষৌমের কথা "ব্যাখ্যা" করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং "দুকূল" একমাত্র বাঙ্গালাতেই হইত। সুতরাং ইহা আমরা বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে শুধু বাঙ্গলাতেই ভাল হইত, এমন নয়—মথুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশের কাপড়ও বেশ হইত। মথুরা পাণ্ড্যদেশ, মহিষ দেশ নর্ম্মদার দক্ষিণ, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাঙ্গলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটীর ভিতর দিয়া এক থান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাঙ্গলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাঙ্গলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়ীতে যত মাপদহের রেসমী কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে যোগাইতে হইবে।

পঞ্চম গৌরব

থিয়েটার

প্রাচীন বাঙ্গলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম "প্রেক্ষাগৃহ" বা "পেকৃখা ঘরঅ"। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচ-ঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের নিজ গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছি। পরনিন্দায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরের ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নীচে দেবতার দল আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, "বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এই রকম অভিনয় করিতে হইবে।" অসুরেরা বলিল, "বা! আমাদের ছোট করিবার জন্য তোমরা একটা নূতন কীর্ত্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।" এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙ্গিয়া দিবার যোগাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল "জর্জ্জর"। জর্জ্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জ্জর পুতিতে হইত, নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জ্জরের পূজা করিতে হইত। জর্জ্জরের ছয়টি পাপ ছয় রকম নেকড়া দিয়া জড়ান থাকিত। ছয় জন বড় বড় দেবতা উহাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের ছয় জনেরই পূজা করিতে হইত। থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত:—এক রকম টামা—অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা, ইহা ১০৮ হাত লম্বা, এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত; আর একরূপ ঘর চৌকোণা—৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল—ইহা রাজাদের জন্য; আর সাধারণ ভদ্র লোকেদের বাড়ীতে যে থিয়েটার হইত, তাহা তেকোণা, সমবাহু-ত্রিভুজ—প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ ৩২ হাত। থিয়াটার করিবার সময় কানা, খোড়া, কুজা, কুরূপ কোন লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না, এমন কি মজুরী করিতেও ঐরূপ লোক লওয়া হইত না; সন্ন্যাসী, ভিখারীকেও সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না। ঘর করিবার সময় ঠিক মাঝখানে জর্জ্জর পুতিয়া রাখিতে হইত। থিয়াটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্দ্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়াটারও দোতালা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতালা হইত। দোতালা ষ্টেজ (রঙ্গ) পৃথিবীর আর কোন দেশে এখনও নাই। পৃথিবীর ব্যাপার একতালায় হইত, স্বর্গের ব্যাপার দোতালায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্দ্ধেকটা স্থান থাকিত; তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদের জন্য, সেখানকার

থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান, সেখানকার থামগুলি রাঙ্গা। তাহার পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম কাল ও হলদে। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—এইরূপে গেলারি করা ছিল। দোতালার অবস্থাও এইরূপ। ষ্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রামঘর, তাহারও পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। ষ্টেজে চিত্র থাকিত; কিন্তু সেগুলি নড়ান যাইত না। ষ্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ী, কোথাও শোবার ঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্ব্বত আঁকা থাকিত। ষ্টেজের উপরে জর্জ্জরের পূজা হইত ও নান্দী পাঠ হইত। ষ্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত।

যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। ঋষিদের উপর কটাক্ষ করিয়া কয়েকখানি প্রহসন করায় ঋষিরা শাপ দেন—'তোমরা শূদ্র হইয়া যাইবে।' সেই অবধি উঁহারা শূদ্র হইয়া যান। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে উঁহাদিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে।

থিয়েটারের কথা বলিতে গিয়া ভরত মুনি উহার কতকটা ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের নটসূত্র ছিল। প্রত্যেক সূত্রেরই ভাষ্য ছিল, বার্ত্তিক ছিল, নিরুক্ত ছিল, সংগ্রহ ছিল, কারিকা ছিল। এই সমস্ত সূত্র একত্র করিয়া ভরত-নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। এই নাট্য-শাস্ত্রখানি বোধ হয় খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কারণ, উহাতে শক, যবন ও পহ্লব এই তিনটি জাতির নাম একত্র পাওয়া যায়। জার্ম্মান পণ্ডিত লোলকি বলেন, যে কোন পুস্তকে শক, যবন,পহ্লব এই এই তিনটি নাম একত্র পাওয়া যাইবে, সেই পুস্তক খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২০০ শত বৎসর পর, ইহার মধ্যে লেখা। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু পহ্লব শব্দ উহার অতি প্রাচীন আকারে আছে, অর্থাৎ পাথ্রব এই আকারে আছে। পার্থিব বা পারদ নামে এক জাতি কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে আজার-বিজানের পাহাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ হইতে খৃষ্টের পর ২১২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া ছিল। তাহাদের এক দিকে রোম, অন্য দিকে ভারত—দুই দিকেই তাহারা আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিত। ভারতবাসীরা তাহাদের শেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পহ্লব বলিত; প্রথম প্রথম উঁহাদের নাম ছিল পাথ্রব। এখন, ঐ প্রাচীন জাতিকে পুরাণে পারদ বলে। ভরত-সূত্র যদি খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্ব্বে অনেক নাট্য সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা ২ খানি নটসূত্রের নাম পাই, এক খানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্ব্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া ছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ওড্রমাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে

নাটকে নৃত্য, গীত, বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভাল বাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভাল বাসিত, কিন্তু উহা চতুর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ত্তক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভাল বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল বাসিত, পূর্ব্বরঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভাল বাসিত, কথোপকথন ভাল বাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভাল বাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এ সব ভাল বাসিত না। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, অমৃতবাবুর মুখে শুনিতে পাই, এখনও বাঙ্গালীরা নাচ-গান তত পছন্দ করে না। তবে এখনকার থিয়েটারে যে নাচ-গান হয়, সে কেবল বড়বাজারের খাতিরে।

খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ গৌরব

নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন কালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, ছুলি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ুরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে এক জন রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অতি দুষ্ট ছিল। সে একবার পলাইয়া গিয়া মগধ-যাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু রাজকন্যা সিংহের পিছু লইলেন। তিনি সিংহকে সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মত হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহবাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলে মেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া

দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়া ছেলে মেয়েদের না পাইয়া বড়ই কাতর হইল। সেও খুঁজিতে খুঁজিতে বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজা ঢেঁটরা দিলেন, যে সিংহ মারিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট বকসিস দিবেন। কেহই তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, "তুমি যদি সিংহ ধরিয়া দিতে পার, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।" সে সিংহ মারিয়া আনিল ও রাজা হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।" রাজা ১০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও এক খানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীদ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যে দিন লঙ্কাদ্বীপে নামে, সে দিন বুদ্ধদেব কুশীনগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

যে তিনখানি নৌকায় সিংহবাহু বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল। ১০০ লোক যে নৌকায় যায়—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের এক খানি ছবি অজন্ত-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যে সব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখন ও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়া ছিলেন।

বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। বোম্বাইএর কাছে, ভরুকচ্ছ বা ভড়োচ একটি বড় বন্দর ছিল। সেখান হইতে বড় বড় জাহাজ ববেরু বা বাবিলন যাইত। সুপারা হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে ১০০ লোক যাইবার কথা

অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাঙ্গলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার "নাবধ্যক্ষ" থাকিতেন, তিনি "সমুদ্রসংযানের"ও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতে ছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূক ছিল।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীন-যাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চীন-সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে, জাহাজ ডুবু ডুবু হয়, ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছু দিন পর হইতেই সুমাত্রা, জাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়ার সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ডুসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্ব্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরাজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করেন, এ কথাও কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল

খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি জাহাজ এক জন সদাগর এক জন মাঝীর অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে ১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলারাশির মত ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদসদাগর কাঁদিয়াই আকুল,—"আমার যথাসর্ব্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের এক খানিও দেখিতে পাই না। আমার নিজের প্রাণও যায়।" তিনি মাঝীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,—"তুমি ইহার একটা উপায় কর।" মাঝী তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন পারিলেন না, তখন মধুকর হইতে কতকগুলা তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল; দূরে দূরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল। চাঁদসদাগর ত আহ্লাদে আট খানা। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা বাঙ্গলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙ্গালী মাঝী দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

সপ্তম গৌরব

বৌদ্ধ শীলভদ্র

অভিধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। এ কথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত এসিয়ার পক্ষে য়ুয়াং চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়া ছিলেন, য়ুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া ছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়া ছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন,

তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে—পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। য়ুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এ ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড় বড় মহাযানবিহারের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত, কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। য়ুয়াং চুয়াংএর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, য়ুয়াং চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা য়ুয়াং চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্ম্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারত-বর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ধর্ম্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র

বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন ?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন,—"এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে ?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব ?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইবে ? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

যুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি দশ কুড়ি খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

যুয়াং চুয়াংএর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল। ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় কিনা, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

অষ্টম গৌরব

বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তি-দেবের বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবনচরিত-খানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাঁহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া দিয়াছে,—এমন করিয়া কাটিয়াছে যে, পড়িবার যো নাই। কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ী হইতে বাহির হন, তাঁহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জু-বজ্রসমাধিকে গুরু করিবে।" সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুশ্রীর প্রাদুর্ভাব বড় শোনা যায় না। সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবই বড় কম ছিল।

তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটী' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন,

তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন শয়ন করিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত ; সেইজন্য :—

"ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ
কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।"

এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "ভুসুকু"। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি "রাউতের" কার্য্য করিতেন। এমন কতগুলি বাঙ্গলা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।" এখন এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কিনা, ইহা ভাবিবার কথা। তিন জনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন :—

(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষাসমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্য্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুসুকুর লেখা। উপরের দুই খানির মত এই খানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুই খানির মধ্যেও আবার শিক্ষা-সমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা। এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইখানিই মহাযানের বই ; শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় বজ্রযানের, না হয় সহজযানের। এক লোক কি দুই যানের পুস্তক লিখে ? এ সম্বন্ধে বেন্ডল সাহেব বলেন যে, শিক্ষা-সমুচ্চয়েও তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরাও দেখিয়াছি যে, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান ছাড়া নয়। এই সকল যানের লোকেরা মনে করিত যে, "আমরা মহাযানেরই লোক, কেবল আমরা মহাযানকে সহজ করিয়া তুলিয়াছি ও উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি। এখনও নেপালী বৌদ্ধেরা বলে, "আমরা মহাযান বৌদ্ধ।" কিন্তু তাহারা বাস্তবিক বজ্রযান বা সহজযানের উপাসক।

বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই—সে কথাটি 'গূথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে,—

"আজ ভুসুকু তু ভেলি বঙ্গালী। নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥"

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিস ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি। তেঙ্গুর গ্রন্থে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্যক।

নবম গৌরব

নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এ দেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণালের পুরাণ-পর্য্যায়ে ১৬শ খণ্ডে হজ্‌সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে, নাথ-পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের "হঠযোগপ্রদীপিকায়" যে চৌদ্দ জন নাথের নাম করা আছে, তাঁহারা সকলেই কবীরের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবার্ত্তা লইয়া কবীর-পন্থীদিগের একখানি বই আছে, সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্তু বাসিলীফ তিব্বতীয়-গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খৃষ্টের আট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমণবজ্র কি অনঙ্গবজ্র। ক্রমে খুজিতে খুজিতে "কৌলজ্ঞানবিনিশ্চয়" নামে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছন্দপাদের "অবতারিত" একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে লেখা, সে অক্ষর খৃষ্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথের একটি বাঙ্গলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে, নাথেরা না-হিন্দু, না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে স্বর্গ-অপবর্গের দিকে তত ঝোঁক ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেল্কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূল নাথেরা কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্তু এখন অনেকে

নাথেরা ভেল্কী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়সেবায় নাথেদের কোন আপত্তি নাই। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটি প্রধান স্থান। নাথজী খুব বড় মানুষ। তাঁহার মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা। নাথজীদের মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, নাথজীরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাথেদের পদচিহ্ন পূজা করেন। লোকে নাথজীদের দেবতা বলিয়া মনে করে। তাঁহারা বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইবার কোন আপত্তি নাই, মদ্যমাংসেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। নাথজীর এক ভাঁটি মদ নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়।

নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্ব্ব-ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ—মীননাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাঙ্গলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়াদেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছন্দরনাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি বাঙ্গলার নবম গৌরব বলিয়া মনে করি।

দশম গৌরব

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙ্গলা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখা পড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ছিলেন। বিক্রমশীল-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন।

প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল-বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অসম্মত হইলেও, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজ অনেক লোকজন দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েক দিন নেপালে স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লজিকাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার কর্ম্মক্ষেত্র সকল বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান-মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীয়া বিশুদ্ধ মহাযানধর্ম্মের অধিকারী নয়; কেন না, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গলার গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?

একাদশ গৌরব

জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পুথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউ-নিভার্সিটীকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয় নামে একখানি পুথি থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঙ্গলা। বেণ্ডল সাহেব যখন এই পুথিগুলির ক্যাটালগ করেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খৃষ্টের জন্মের ১৪ শ বা ১৫ শ বছর পরে লেখা। তাহার পর তিনি যখন উহা ছাপান, তখন তিনি ভূমিকায় লিখেন, "না, আর এক শ বছর আগাইয়া যাইতে পারে, কাগজ কি এর চেয়েও পুরাণ হ'বে?" বেণ্ডল সাহেব একজন বড় লোক। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব ছিল; তিনি ও আমি দুই জনে একবার নেপাল গিয়াছিলাম। তথাপি এ জায়গায় আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমি নেপালে এর চেয়েও পুরাণ কাগজের পুথি দেখিয়াছি এবং দুই একখানি আনাইয়াছি। সুতরাং কাগজ বলিয়া যদি পুথিখানি নূতন হয়, তাহা হইলে আমি তাহাতে রাজী নই। ডাঃ হার্ণলি সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, অনেক পূর্ব্বে নেপালে 'কায়গদ' ছিল। 'কায়গদ' শব্দটি চীনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, কেন না আমরা উহা সরাসর চীন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসলমানেরা চীন হইতেই পাইয়াছিল। মুসলমানেরা কায়গদ শব্দটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে।

পুথিখানির শেষে লেখা আছে :—"দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো **জাগদ্দল**পণ্ডিত-**বিভূতিচন্দ্রস্য**" ইত্যাদি।

বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন, "মহাযানপন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।" ১৯০৭ সালে আমি আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই; কিন্তু আমিও তখন সে মহাবিহার কোথায়, কি বৃত্তান্ত জানিতাম না। সেই বারে আমি বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি "অমৃতকর্ণিকা" নামে "নামসংগীতির" একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।

তাহার পর রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জাগদ্দল মহাবিহার" তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না—পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময় বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি এ কথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক-

বিহার, কনখোতে যেমন দীপঙ্কর বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলায় মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাঙ্গলায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব্ব-ভারতে।

যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া ছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছেন। জগদ্দলের আর একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সময় জগদ্দল-ভিক্ষুদের উপর অনেকটা নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি তেঙ্গুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটীর' লামা বলেন, সে পুস্তকখানি হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১০২৭ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল উহা তর্জ্জমা করেন। এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদ্দল বিহারও পুরাণ, বিভূতিচন্দ্রও পুরাণ, আর বেণ্ডল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও তিন চারি শত বৎসর পুরাণ। তাই বলিতেছিলাম, জগদ্দল বিহার ও বিভূতিচন্দ্র বাঙ্গলার গৌরবের জিনিস।

দ্বাদশ গৌরব

লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

বাঙ্গলার দ্বাদশ গৌরব লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ। লুইপাদের কথা পূর্ব্বে দুই এক বার বলিয়াছি। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। অনেক জায়গায় তাঁহাকে আদি-সিদ্ধাচার্য্য বলিয়াছে। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল। রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ুরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে। তিনি অনেক বাঙ্গলা গান লিখিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে।

সিদ্ধাচার্য্যগণ এককালে যে বাঙ্গলায় ও পূর্ব্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন, তাহার আমরা একটি প্রমাণ পাইয়াছি। খৃষ্টের জন্মের ১০ শত বৎসর পরে হরিসিংহ নামে একজন

রঘুবংশী মিথিলার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি এক সময় নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে বাঙ্গলা ও দিল্লীর মুসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে তাঁহারই বংশের সন্তান নেপালে রাজা হন। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর অনেকগুলি স্মৃতির পুস্তক লেখেন। তাঁহার সভায় একজন কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে বেশ প্রহসন লিখিতেন। ইঁহার নাম জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি বোধ হয় বাঙ্গলাতেও কবিতা লিখিতেন। ইঁহার আধা-বাঙ্গলা, আধা-সংস্কৃত একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক আছে, তাহার নাম বর্ণনরত্নাকর। কবিতা লিখিতে গেলে কাহার কিরূপ বর্ণনা করিতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া পুস্তকের উদ্দেশ্য। তিনি ঐ পুস্তকে চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ৭৬ জনের নামমাত্র করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে লুইএর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের সময় পর্য্যন্ত লুইএর দল যে চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয় যে, লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

তেঙ্গুরে লেখা আছে যে, লুইকে মৎস্যান্নাদ বলিত, অর্থাৎ—তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। (কোন্ বাঙ্গালীই বা না বাসেন!) তেঙ্গুরে আবার সেইখানেই লেখা আছে, "তাই বলিয়া লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহা-যোগীশ্বর।"

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাড়ক,—এই কয়জনের "চর্য্যাপদ" বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষের কথা বাঙ্গালী কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এটা বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিদ্ধাচার্য্যগণের কথা, তাঁহাদের গানের কথা, তাঁহাদের দোহার কথা, তাঁহাদের ধর্ম্মের কথা, আগেও দুই একবার বলিয়াছি, আবার ত খুলিয়া বলিতে হইবে, তাই এইখানেই এবারকার মত বিশ্রাম।

ত্রয়োদশ গৌরব

ভাস্করের কাজ

বাঙ্গলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্ত্তি, কখন শান্তমূর্ত্তি, কখন করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্ত্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬৮ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্ত্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম "Iconography"। সে দিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্ত্তিই যে ছিল, আর কত মূর্ত্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র-রিসার্চ্চ-সোসাইটী অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদেও অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্ত্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে, জঙ্গলে, পুরাণ গ্রামে, পুরাণ নগরে এখনও গাড়ী গাড়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল মূর্ত্তির এখন আর পূজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়মই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে সকল মূর্ত্তির এখনও পূজা হয়, তাহাই বা কত সুন্দর! এক একটি কৃষ্ণমূর্ত্তির ভাব দেখিলে সত্য সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। তাম্রপত্রলেখা, শিলালেখ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশী—গহনা, ফুল, সাজ—ইহাতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে, সে ভাব কেবল বাঙ্গলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় যেন উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা যেন সে বাঁশীর

আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনায় ফল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়, সোণায়, অষ্টধাতুতে—যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটীর মূর্ত্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা, কহিতেছেন, ঠোঁটদুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীর্ত্তনমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটীর গড়া মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

চতুর্দ্দশ গৌরব

বাঙ্গলায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ বার খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

লোকে বলে বাঙ্গলায় বেদের চর্চ্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙ্গালীরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহম্মুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত, অর্থ করিয়া পড়িত; নিজের কর্ম্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার, সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। হুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইঁহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও বেশ সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী, মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে

স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা উঁহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খৃঃ ১১৪৫ সালে কাপি করা। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধকারের ও জোগ্লোক, অহ্ক ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্ব্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এক খানি দানসাগর ও আর একখানি অদ্ভুতসাগর। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

পঞ্চদশ গৌরব

বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাঙ্গলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে ছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গলায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতে ছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান—সব ভাসিয়া, ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী ও বেহারী শিল্পের ভাল ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, দেবমূর্ত্তি, মনুষ্যমূর্ত্তি, ক্রোধমূর্ত্তি, শান্তমূর্ত্তি, হিন্দুমূর্ত্তি, বৌদ্ধমূর্ত্তি, তালপাতের পুথি, ভূর্জ্জপত্রের পুথি, ছালের পুথি, তেড়েতের পুথি, নানারূপ চিত্র, নানারূপ কারুকার্য্য, সব নাশ হইয়া গেল। ওদন্তপুরে মুসলমানেরা সিপাই বলিয়া হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়া মহাবিহারটিকে সমভূম করিয়া দিল, বৌদ্ধমূর্ত্তি ও যাত্রার সাজসজ্জা সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোণারূপার মূর্ত্তিগুলি গলাইয়া ফেলিল, পুথিগুলি পুড়াইয়া ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদন্তপুরের বিহার এখনও চেনা যায়, সে জায়গাটা এখনও তিরিশ ফুট উচু; নালন্দার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, পাশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে "বড়গাঁয়ের ঢিবি"; বিক্রমশীলার সন্ধানও পাওয়া যায় নাই; জগদ্দল খুজিয়া মিলিতেছে না; মুসলমানেরা এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই এত দিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে ইংরাজ রাজা হইয়াছেন, তাই খুজিয়া খুজিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল, শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম্ম পূর্ব্ব-ভারতে অক্ষুন্ন ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্ত্বেও যে ধর্ম্ম

চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—এক মুসলমান-আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাঙ্গলারই হইয়া গেল!

দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই শত বৎসর নিরন্তর মারা-মারি কাটাকাটির পর একবার এক জন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা হইয়া ছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুই জনে মিলিয়া অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পুরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

ষোড়শ গৌরব

ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান-আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও বাঙ্গলা ভুলিয়া যান, তথাপি বাঙ্গালী দেখিলেই আবার তাঁহাদের দুটা বাঙ্গলা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কাশ্মীর যাও, পঞ্জাব যাও, নেপাল যাও,

হিন্দুস্থান যাও, রাজপুতানা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহিসুর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে দুচারিটি বাঙ্গলা কথা শুনিতেই পাইবে। বাঙ্গালীর এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্ত যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বা তাঁহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। ইঁহার বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত সূক্ষ্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার তত্ত্বচিন্তামণির টীকাই লোকে বেশী জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন, এমন নহে,—তিনি মহারাষ্ট্রদেশে যাইয়া রামেশ্বরের নিকটও পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র যে শুধু বাঙ্গলা দেশেই ছিল, এমন নহে—দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পর আমাদের দেশের লোক হরিরাম, জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইঁহাদের টীকা-টিপ্পনী পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুন্তাম-কর ভবানন্দের টীকারই টীকা লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনও দুই চারি জায়গায় চলে। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টী, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

সপ্তদশ গৌরব

চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি দশা হইল? পাদরী না থাকিলে খৃষ্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবী না থাকিলে মুসলমানদের যে দশা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য কৃষক, বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে বড় বড় বিহার

ছিল, অনেক নিষ্কর জমী বিহারওয়ালারা ভোগ করিত। মুসলমানেরা সে সমস্ত জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান সিপাহীদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমী লইয়া মল্লিক নামে এক মুসলমান-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গলার বিহারের খবর জানি না, তবে একটা খবর জানি বলিয়া বোধ হয়। বালাণ্ডা পরগণায় খুব ভাল মাদুর হয়, তখনও হইত, এখনও হয়। সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পূজা হইত। বালাণ্ডার একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালাণ্ডার বৌদ্ধ কীর্ত্তির এই মাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে। এখন সেই বালাণ্ডায় সব মুসলমান। মুসলমানেই মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাঙ্গলায় অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার পরিকরও প্রায় সবই বাঙ্গালী। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী পর্য্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলার ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন গোস্বামী পর্য্যন্ত কত কত বৈষ্ণব লেখক বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি—কীর্ত্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্য্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্ত্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০।৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানা রূপ 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—মনোহরসাহী ও রেণেটি। ভক্তিরত্নাকরে

লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্ত্তন জমিলে সেখানে চৈতন্য সপরিকর আবির্ভূত হন। বাঙ্গলার কীর্ত্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্য-দেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

অষ্টাদশ গৌরব

তান্ত্রিকগণ

তন্ত্র বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্ধেরা বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীরী শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। নাথ-পন্থের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। অন্যান্য শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র। আবার শাক্তদের সব গ্রন্থও তন্ত্র। এখন আবার বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তন্ত্র আছে। এরূপ অবস্থায় তন্ত্র বলিলে হয় সব বুঝায়, না হয় কিছুই বুঝায় না।

অনেক তন্ত্রে বলে, বেদে কিছু হয় না বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন, অথর্ব্ববেদই তন্ত্রের মূল। মূলতন্ত্রগুলি হয় বুদ্ধদেবের মুখ হইতে উঠিয়াছে, না হয় হরপার্ব্বতী-সংবাদরূপে উঠিয়াছে। যেগুলি হরপার্ব্বতী সংবাদ, সেগুলি কেহ না কেহ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে "অবতারিত" করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহা জানিবে কিরূপে? একজন বৌদ্ধ তন্ত্রকার বলিয়াছেন, "আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নহি। আমরা সোজা-কথায় লিখি। যে ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবে, আমরা এমন ভাষায় লিখি।" মূল তন্ত্রে ব্যাকরণের বড় ধার ধারে না। কিন্তু মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই চারিখানি মূলতন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বড় শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একটু নূতন। উহা ব্রাহ্মণদের কোন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু এখন বাঙ্গলার লোকে ঐরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়াই জানে। সংগ্রহকারেরা মূলতন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মার্জ্জিত করিয়া লইলেও তাঁহাদের গুহ্য উপাসনা বড় সুবিধার নয়। আমার বিশ্বাস

তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জ্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজ-নীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়া ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পুস্তকে অক্ষোভ্য, বৈরোচন প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। অক্ষোভ্য এখানে ঋষি হইয়াছেন, বৈরোচন দেবতা হইয়াছেন। যে তারামন্ত্র সাধনের জন্ত বশিষ্ঠদেবকে চীনে যাইয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ সেই তারার পূজারই রহস্য লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে তারা অক্ষোভ্যেরই শক্তি। বৌদ্ধ মতে তারা, একজটা, নীলসরস্বতীর উপাসনা আছে, তারারহস্তেও তাই। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী, তারারহস্যেও শূন্তের উপর শূন্য, তাহার উপর শূন্য, এইরূপে ষষ্ঠ শূন্য পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বৌদ্ধমতে এই সকল দেবীর ধারণী আছে, সাধন আছে, তারারহস্যে তাঁহাদের গায়ত্রী আছে। বোধ হয় ঐ অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই উপায়েই ব্রহ্মানন্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহগুলি আরও মার্জ্জিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য।

রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জ্জিত। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্চমকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাঁহার বড়ই আদর। কিন্তু তাঁহারও গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। মঞ্জুঘোষ যে একজন বোধিসত্ত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাঙ্গালার একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রাম-প্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব—অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অপেক্ষা স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইঁহারা যদিও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্ত যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

একোনবিংশ গৌরব

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, শুধু বাঙ্গলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরবের স্থল। বিদ্যা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেই ন্যূন নহেন, বরং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে তাঁহাদের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু আমরা এখন সে সকল গৌরবের কথা এখানে বলিব না। তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার গৌরব বলিয়াছি, বাঙ্গলায় তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহাই দেখাইব এবং সেই জন্য তাঁহাদের গৌরব করিব।

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য্য আচারে, আর্য্য বিদ্যায়, আর্য্য ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এ প্রশ্নের ত এক উত্তর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাঙ্গলার রাজশক্তি ত তাঁহাদের অনুকূল ছিল না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকূলই ছিল। এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আর এমনি ভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আরও একটা প্রবল ধর্ম্ম ছিল। মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কিরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

এইরূপ করায় তাঁহাদের দুই কাজই হইয়াছিল। লোকের দৃষ্টি বৌদ্ধের দিক হইতে হিন্দুর দিকে পড়িয়াছিল এবং মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার হইবার একটা বেশ যত্ন হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ মুসলমানেরাও একথা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঘরের পয়সা দিয়া বাঙ্গলা লেখায় সাহায্য করিতেন। বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই

সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমার হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার মূলে ব্রাহ্মণ। এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথায় আসিয়াছিল এবং তাঁহারাই আগ্রহসহকারে এই কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ গৌরব

কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। উঁহারা পূর্ব্বেই বোধ হয় একটু দোটানায় ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেন না, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপালের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত তেঙ্গুরে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে পাই। পরে, যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাঁহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। গুণরাজখাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—বাঙ্গালী হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু-বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এ দেশের অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমীদারভাবে ও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাঙ্গালায় সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া মুসলমান সত্বেও বাঙ্গলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

এমন সময় মোগলেরা বাঙ্গলায় আসিল। মোগলদের সঙ্গে অনেক বিদেশী হিন্দু এ দেশে আসিয়া বড় বড় চাকরী ও বড় বড় জমিদারী পাইতে লাগিলেন। পাঠানের সহায় বলিয়া কায়স্থদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু রাগও হইল, অনেক কায়স্থের জমীদারী গেল। তাঁহাদের জায়গায় হয় ব্রাহ্মণ, না হয় কোন বিদেশী আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও বিদেশী জমীদারই বেশী হইয়া গেল। বিদেশীদের মধ্যে প্রধান হইলেন মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান; ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইলেন কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর ও মুক্তাগাছা। ব্রাহ্মণের ঘরগুলি ক্রমে ভাগ-বাঁটোয়ারায় ও অন্যান্য কারণে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছেন। তাঁহারা এই তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভস্বরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রতিপালন করেন, বাঙ্গলা লেখায়

কত উৎসাহ দেন, তাহার সীমা নাই। হরিহর-মঙ্গলের লেখক মহারাজাধিরাজেরই আত্মীয় ও তাঁহারই উৎসাহে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম মহারাজাধিরাজের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভাল কবি হইলে যত দিন বর্দ্ধমানে মুজরা না পাইতেন, তত দিন তিনি কবি বলিয়াই গণ্য হইতেন না। ভাল কথক বর্দ্ধমানে বৎসরে এক দিন মাত্র কথা কহিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিতেন। ভাল যাত্রার, বর্দ্ধমানে না গাইলে, পসার হইত না। বর্দ্ধমানও ভাল জিনিসের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, বৃত্তি দিতেন, বার্ষিক দিতেন। এ পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজেরা বাঙ্গলার সাধারণ সভায় কখন যোগ দিতেন না। তাঁহাদের যেরূপ পদমর্য্যাদা ও গৌরব, সেরূপ সাধারণ সভা বোধ হয় হইত না বলিয়াই তাঁহারা যোগ দিতেন না। আমাদের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সকল গৌরবই বজায় রাখিয়াছেন, তাহার উপর আবার সে দিন বীরের ন্যায় নিজের জীবন দিয়া বঙ্গেশ্বরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া পূর্ব্বপুরুষের "মহারাজাধিরাজ" এই উপাধির উপর আবার "বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পথ ত্যাগ করিয়া একটি সৎকার্য্য করিয়াছেন,—তিনি এখন বাঙ্গলার সাধারণ সভায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা ও নীতিবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে যাইবামাত্র তাঁহারা ইঁহাকে সভাপতি করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি দেশের যত হিতকর সভাসমিতি আছে, সর্ব্বত্রই মহারাজাধিরাজ। এত দিনে সত্য সত্যই তিনি বাঙ্গলার মহারাজাধিরাজ হইয়াছেন। বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই এখন হইতে তাঁহার মুখাপেক্ষা করিবে। তিনিও বাঙ্গালীকে আপন করিয়া লইবেন। মহারাজ বাঙ্গলার নূতন সাহিত্যের দিকে মন দিয়াছেন, নিজে কবিতা লিখিতেছেন, নাটক লিখিতেছেন এবং মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা আজ এইখানে দেশশুদ্ধলোক মিলিয়াছি, ইহা সেই মহারাজাধিরাজেরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ফল। বাঙ্গলা সাহিত্য যেন কখনও মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে বঞ্চিত না হয়। তিনি আমাদের গৌরবের স্থল, আমরা তাঁহার গৌরবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন

আজ আমরা মহা সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শন ভাল বাসেন, আজ তাঁহারা আমাদের এখানে আসেন নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র বাঙ্গলা-সাহিত্যসেবী, তাঁহারাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমরা মন খুলিয়া কথা কহিতে পারি। এখানে সকলেই এক ব্যবসায়ী, সকলেরই সুখ ও দুঃখ এক। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বাদ দিলে বাঙ্গলা সাহিত্যে আর কি আছে? আছে পদ্য, কাব্য, নাটক, নবেল, রচনা, জীবনচরিত, কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে আমরা এত দিন কি করিয়া আসিয়াছি, তাহার একটা বিবরণ চাই। সেই সংক্ষেপ বিবরণ পাইলে, তাহার কোথায় কি ভাল আছে ও কোথায় কি মন্দ আছে, তাহা দেখিতে পাইব, দেখিতে পাইলে মন্দটি ছাড়িয়া ভালটি লইতে পারিব এবং ভালকে আরও ভাল করিতে পারিব।

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকের বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই তাঁহারা অনেক লোক। দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, ~~তাহা~~ বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যে সকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদ্‌লাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবারে উন্টাইয়া পান্টাইয়া দেয়। এই-রূপে গোবিন্দচন্দ্রের গীত ও মাণিকচন্দ্রের গীত এত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্য্যদের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সে কালের ভদ্র-লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। সুতরাং উহার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সেকালে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ গতি ছিল, তাহা আমরা

বেশ বুঝিতে পারি। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল হইয়া গেলেও উহাও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে লেখা। তখন লোকে কিরূপে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিস বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভাল বাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রামরসায়ন" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়" পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা

অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই ? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয় ? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই ? ও পথটা যেন লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু চারটা গান লিখিয়া চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে ? বড় জিনিস কি আর হইবে না ? আমাদের সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত। বাঙ্গলায় যত বই বাহির হয়, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষায় তত হয় না। এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। বাঙ্গলায় যত বই অন্ত ভাষায় তর্জ্জমা হয়, এত ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় হয় না। ইহাও আমাদের আনন্দের বিষয়। রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙ্গলা ভাষার জয় জয়কার হইল ; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে ? ঝোঁক যদি চুট্‌কীর উপর হয়, ক্রমে সে চুট্‌কীও যে খারাপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কী আরম্ভ হইয়াছিল ; কেন না, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী—এই সব ত চুট্‌কী-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমার ভয় হয় পাছে বাঙ্গলায় কাব্যটা চুট্‌কীতেই অবসান হইয়া যায়।

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথিগণ একে একে

অন্তর্গত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাহারাও প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি ঐ ব্যাপার—লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না। বই পড়িলেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইয়া নাম লইবার চেষ্টা। একজন প্রাচীন নাটককার বলিলেন, "আমি দশ বৎসর ধরিয়া 'রত্নাবলী'খানিকে বাঙ্গলা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক মনের মত হইয়া উঠিতেছে না।" কিন্তু আবার দেখিতেছি অনেকে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া নাটক থিয়েটারে জোগান দিতেছেন। এক একবার মনে হয় যেন, কিছুদিন নাটক লেখা বন্ধ করিলে ভাল হয়।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলের ইতিহাসও বেশী প্রাচীন নয়। কিন্তু এখানেও ঐ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমুল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব তত দিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এ রকম ত চুট্‌কীতে হয় না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্‌স সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদের সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র।* কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির

হইল না! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া, অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ, মানুষ থাকিলেই তাঁহার সম্বন্ধে 'সুবিধা', 'কুবিধা' দুই থাকে। যাহারা সুবিধা তাহারা শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, যাহারা কুবিধা তাহারা শতমুখে নিন্দা করিবে—দোষ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবার বিশ ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আর এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরও দুইখানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেব-বাবু এ বিষয়ে দু চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মস্ত অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার ভার একা দীনেশবাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই দেশের ভাল কাজ করিতে পারেন। কিন্তু নির্ভয়ে দোষগুণ দুইই দেখাইয়া দেওয়া দরকার। বঙ্কিমবাবু "বঙ্গদর্শনে" একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পর সে চেষ্টা আর দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে যে সব দোষগুণ-পরীক্ষা হয়, সেটা যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত। "ওগো অমুক এই বই লিখিয়াছেন, তোমরা কেন'।"—এই যেন সে বিচারের মানে। অনেক মাসিকপত্র ও সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা বলেন, "আমাদের পড়িবার সময় নাই। গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থের দোষগুণ দেখাইয়া দিলে আমরা ছাপাইতে পারি।" এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এরূপ দোষগুণ-বিচার আমরা চাহি না। আসামী জজ হইয়া বিচার করিবে, এটা বোধ হয় কেহই চাহিবেন না?

বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম দেখাইয়া দিলাম। কোথায় কি গুণ আছে, কোথায় কি অভাব আছে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কোন্ মন্দ জিনিস ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাল জিনিস আরও ভাল করিতে হইবে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কথা আছে—সেটা বাঙ্গলা ভাষার গতি।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাতকর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের গতি একরূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি,

তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটেনা, ছি!—ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল", তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে। যথা—

"শিক্ষিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।"

"সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরা নিজ অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি।"

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি সমসাময়িকগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।"

"দেশের লোকের চিন্তা তাহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাদবর্ত্তী ছিল।"

"দেখিলাম গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে।"

"হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।"

আর অধিক তুলিয়া ফিরিস্তি কথা ভারি করিব না। মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া লেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে? নহিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গলা—এই

বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব ? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্ত বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন ?

দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সব কথা ভদ্র লোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে। "গালগল্প" লিখিতে আপত্তি কি ? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয় "স্বকপোলকল্পিত" বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে ? সুতরাং এই সকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন—অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার ? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত ! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে ? পোকায় ত কাটিবে ?" বাস্তবিকই বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গলা বই পোকাতেই কাটে !

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন ? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে ? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে ?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব ; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি

বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। "রেলওয়েকে" "লৌহবর্ত্ম" করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাস্তাকে "রাজমার্গ" ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে "বংশপরিচালনা" লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে "শ্বশ্রূ মহাশয়" লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্‌ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাদুঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন "পর্য্যবেক্ষণিকা"। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না,—তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর", মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা", "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা

করা উচিত ; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কটকটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত ; নহিলে কথায় সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।*

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

---

* বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায়,সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা

আমাদের দেশে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন, তাঁহাদের সংস্কার এ দেশে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায় না। ইতিহাস কাহাকে বলে, এ দেশের লোক তাহা জানিত না। এ দেশে কখন ইতিহাস লিখিত না। এ পৃথিবীটাকে তাহারা অসার, অপদার্থ মনে করিত বলিয়া, এ পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহাদের মনে লাগিত না। তাহারা পরকালের জন্তই ব্যস্ত থাকিত, পরকালের চিন্তাতেই জীবন কাটাইয়া দিত।

এ দেশের লোকের এতটা নিন্দা করা উচিত কিনা জানি না। ইহারা বড় বড় ইতিহাসের বই লেখে নাই সত্য, কিন্তু ছোটখাট বই যে একেবারে লেখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। হর্ষচরিত পাকা ইতিহাস, রামচরিত পাকা ইতিহাস, ব্যাশ্রয়কোষ পাকা ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণীও পাকা ইতিহাস। খুঁজিলে আরও মিলে, নবসাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমার্কচরিত ইত্যাদি পুস্তক কাব্য হইলেও এই পৃথিবীর ঘটনা লইয়াই লেখা। ইহারাও ইতিহাস। খুঁজিলে যে আরও ইতিহাস মিলিবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। নেপালের যে চলিত বংশাবলী আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া রাইট সাহেব তাঁহার বই লিখিয়া গিয়াছেন, নেপালে যত পুথি আছে তাহার পুষ্পিকা ধরিয়া দেখা গেল যে, সে বংশাবলী এখন হইতে ৩০০।৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক হইলেও, তাহার আগে সব ভুল। তখন পুথির পুষ্পিকা হইতেই প্রথম রাজাবলী ও পরে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হইল। রাজাবলীটা এক রকম তৈয়ার হইয়াও গেল। চলিত বংশাবলীতে বলে যে, হরিসিংহ ১৩২১ খৃঃ অব্দে নেপাল আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন ও সেই অবধিই তাঁহার বংশধরেরা নেপালের রাজা। কিন্তু পুষ্পিকায় রাজাবলী আর একরূপ হইয়া গেল। হরিসিংহের পর জন কতক নেপালী রাজার নাম পাওয়া গেল। তাহার পর দুজন রাণীর নাম, তাহার পর মল্লগণের অর্থাৎ হরিসিংহের বংশধরগণের নাম। পুষ্পিকার কথাই আমরা বিশ্বাস করিলাম। নেপালীরা চটিয়া গেল। বেশ গোলযোগ চলিতে লাগিল। তাহার পর ১৮৯৮।৯৯ সালে খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি তালপাতের লেখা ছোট বংশাবলী পাইলাম। উহার শেষ রাজা প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বংশাবলীখানি প্রাচীন বলিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া পড়া গেল। পড়া বড় কঠিন, সেকালের কথাবার্ত্তার ভাষায় লেখা। সে ভাষা কেহই জানে না। যাহা হউক তাহা হইতে জানা গেল যে, হরিসিংহ একবার মাত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, দেশ দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায় ৫ পুরুষ পরে বিবাহসূত্রে তাঁহার বংশে নেপাল রাজ্য যায়। পুষ্পিকার ইতিহাস ও বংশাবলীর ইতিহাস মিলিয়া গেল। এখনকার বংশাবলী ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। বাঙ্গলারও এইরূপ নূতন বংশাবলী দুই শত, আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। তাহার আগে গেলেই একটু গোলমাল, নবাব

যত দিন এক ভাবে রয়, তত দিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু একটা যদি বিপ্লব হইয়া যায় তাহা হইলে কের বংশাবলীও গোলমাল হইয়া যায়। আবার সেই কালের বংশাবলী খুজিতে হয়, তবে ঠিক কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র অনেক দিনের, প্রায় বার শত বৎসরের। ইহার মধ্যে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে সুতরাং অনেক জায়গায় গোল আছে। বিশেষ যত্ন করিয়া বহুকাল ধরিয়া খুজিয়া, খুব মন দিয়া পড়িয়া, তবে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, স্থির করা যাইতে পারে। সেইটা যখন হইবে, তখন বার শত বৎসরের একটা ইতিহাসের আদরা তৈয়ার হইবে।

অতি পুরাণ কালের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুদের বই পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু মুসলমান-বিজয় হইতে এই যে আট শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য সত্য সত্যই কি মুসলমানদের লেখা ছাড়া আর কোনও ইতিহাস নাই? অন্তত ইতিহাসের মালমসলাও কি একেবারে পাওয়া যায় না? যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলঙ্কের কথা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস খুব বড় বই না থাকুক, ছোট ছোট রাজাদের ছোট ছোট ইতিহাস আছেই আছে এবং খোজ করিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয় আরঞ্জেবের রাজত্ব সম্বন্ধে মুসলমানদের দিক হইতে যত সংবাদ পাওয়া যায়, সব সংবাদই দিয়াছেন। তাঁহার আরঞ্জেবের ইতিহাস অতি সুন্দর গ্রন্থ। লোকে আরঞ্জেবকে যত মন্দ বলে, তিনি যে ততটা ছিলেন না, সেটা উনি বেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। উনি আরও দেখাইয়াছেন যে, আরঞ্জেব একজন খুব ভাল রাজা ছিলেন। প্রজা হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক, প্রজার উন্নতিতে যে রাজার উন্নতি, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সেই মত কার্য্যও করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বে প্রজা বেশ সুখে ছিল। তাঁহার সুবেদারেরা গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহারা টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় করাইতেছেন। কিন্তু আমি বলি, হিন্দুর দিক হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া কি আরঞ্জেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? এত বড় ভারতবর্ষটা,—এ দেশের নানা ভাষা, নানা সাহিত্য রহিয়াছে, সমস্ত একত্র করিয়া খুজিলে কি আরঞ্জেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? আমার বিশ্বাস যায়। কেন বিশ্বাস ক্রমে বলিতেছি।

ইতিহাসে বাঙ্গলাই সকলের পিছনে পড়িয়াছে। এইখান হইতে আরঞ্জেবের ইতিহাসের কোন খবরই পাওয়া যাইবে না, লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি কিন্তু জানি, এখান হইতেও গোটা কতক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া খুজিতে হয়। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মল্লিক দুইখানি সংস্কৃত পুথি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এই দুইখানি কি?" আমি দেখিলাম, এক খানি ১৬২৯ শকে লেখা, আর তাহার পাশে লেখা আছে 'সাহারং দেবস্ত পঞ্চাব্দে।' ব্রজমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রাজাটি কে? সাহারং দেব কে?" আমি ত প্রথমে ভাবিয়াই আকুল। হঠাৎ ১৬২৯ শকে ৭৮ যোগ করিয়া দেখিলাম ১৭০৭ হয়। তখন আমি বলিলাম, "সাহারং দেব—সাহা আরঞ্জেব। কারণ,

তিনি ১৭০৭ অথবা ১৭২৯ শকে মরেন।" আমরা সেই কালের লোকের হাতের একটা প্রমাণ পাইলাম যে, আরঙ্গজেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মরেন। অথচ এটা এক জন পাকা হিন্দুর হাতের লেখা পুথি হইতে।

বুদ্ধচরিত নামে এক অদ্ভুত পুথি আছে, পুথি এক খানি বৈ লেখা হয় নাই। নাথুরাম নামে যোশীমঠে এক পণ্ডিত কাশীতে রামাপুরায় বাস করিতেন। তিনি মারাঠী, মৈথিলি, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী জন কতক বিদ্যার্থী লইয়া বুদ্ধচরিত নামে এক প্রকাণ্ড পুথি লেখান, পুথির আগাগোড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে এক টুকরা ওখানে এক টুকরা পাওয়া যায়। বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ দুবে মহাশয়ের নিকট যে অংশ আছে, সেটা প্রায় এক শত পাতা। কিসের জন্য সে পুথি লেখা হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ফরুখসিয়রের রাজত্বকালে লেখা হয়। তাহাতে সব মোগল বাদসাদের নাম পাইলাম এবং কাহার পর কে রাজা হইয়াছেন, তাহাও পাইলাম।

ত্রিপুরা ও কুচবিহারে হাতের লেখা যে সকল রাজাবলী আছে, তাহাতে অনেক জায়গায় আরঙ্গজেবের সহিত যে তাঁহাদের সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল, তাহা লেখা আছে। কুমায়ুন-গড়োয়ালের রাজাবলীতেও তাহাই আছে। আরঙ্গজেবের সময় কুমায়ুনে বাজবাহাদুর চন্দ্র নামে এক জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহাসমারোহে আরঙ্গজেবের সহিত দেখাও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ আদর পান নাই। তাঁহার ঠাকুরদাদা আকবরের কাছে যে আদর পাইয়াছিলেন, তাহার দশভাগের এক ভাগও তিনি পান নাই। সুতরাং দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি আরঙ্গজেবের অনেক বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। বাজবাহাদুর চন্দ্র এক জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি আপদেবের পুত্র অনন্তদেব নামে একজন মাহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্র হইতে আনাইয়া কাশীতে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটা স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়া ছিলেন। আরঙ্গজেবের সময় অনেক রাজপুত রাজা তাঁহার চাকরী করিতেন, কেহ কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই ইতিহাস আছে। কাহারও দপ্তরখানায় যাইবার প্রয়োজন হয় না; ভাট ও চারণের পুথি হইতেই অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গজেবের একজন প্রধান সেনাপতি যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহের প্রধান মন্ত্রী মুতা নয়ানসী রাজপুতানার একখানি মস্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম খ্যাত নয়ানসী। রাজপুতেরা বলে, খ্যাত নয়ানসী তাহাদের যথার্থ ইতিহাস। কিন্তু নয়ানসীর কথা তাহার পূর্ব্বের দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক। তাহার আগে গেলেই শিলালেখের সহিত তফাৎ হইয়া পড়ে। নয়ানসীর পর অনেক মযের লেখা হইয়াছে। সেই সময়ের কথা যাহা লিখিয়াছে, তাহাই ঠিক, তাহার আগের কথা একটু একটু বেঠিক।

নয়ানসী যে শুধু একখানি খ্যাত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নয়। আমি তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত রাজপুত রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বিবরণও লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস যেমন প্রসিদ্ধ, এ আয়-ব্যয়ের বিবরণটা তত প্রসিদ্ধ নয়।

কিন্তু এ বিবরণ খুব বিস্তৃত, ইহাতে মোগল-সাম্রাজ্যের আরঙ্গেবের সময়ের একটা প্রকাণ্ড দেশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

আরঙ্গেবের মৃত্যুর ২০ বৎসরের মধ্যে যোধপুরের রাজা অভয়সিংহ গুজরাটের সুবাদার হন। তিনি একজন পোকর্ণা ব্রাহ্মণকে হিসাবের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে ব্রাহ্মণের বংশ এখনও আছে। তাহাদের বলে খ্যাতবালা জোষী। তাহাদের বাড়ীতে গুজরাট সুবার অনেক দিনের হিসাবপত্র মজুত আছে, ইহাতেও আরঙ্গেবের আর একটি সুবার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

যোধপুরের কেল্লায় পুস্তকপ্রকাশ নামে একটি পুথিখানা আছে। উহাতে সংস্কৃতে লেখা ২ খানি মহাকাব্য আছে, এক খানির নাম অজিতোদয় ও আর এক খানির নাম অভয়োদয়। অজিতোদয়ে অজিতসিংহের বাল্যকাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মোগলদের সহিত তাঁহার যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সমস্ত ইতিহাস আছে। বাস্তবিকই আরঙ্গেব অজিতসিংহের উপর যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি ৪।৫ বার অজিতসিংহকে আপন দরবারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অজিতসিংহ কিছুতেই যান নাই। যোধপুরের সিংহদের বাড়ীতে আরঙ্গেবের পাঞ্জাওয়ালা ঐ সকল চিঠিপত্র আছে। যশোবন্তসিংহ যখন মরেন, তখন অজিতের বয়স ৫ বৎসর। অজিতের একটি ভাই ছিল, তাহার বয়স ৩ বৎসর। উহাদিগকে দিল্লীতে আটক করিয়া আরঙ্গেব সমস্ত মাড়বার রাজ্য দখল করিয়া লন। দিল্লীতে উহাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া দুর্গাদাস রাঠোর ও মুকুন্দ খীচী উহাদিগকে লইয়া পলায়ন করেন। চারিদিকে পাহারা, দিল্লী সহর, তাহার ভিতর হইতে পলায়ন—অতি অদ্ভুত ব্যাপার। শিবাজী সন্দেসের গুড়ায় পালাইয়া ছিলেন। মুকুন্দ খীচী এবার সাপুড়ে সাজিলেন, জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলেন; কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই দিকে সিকে, প্রত্যেক সিকের ৩টি করিয়া সাপের পেঁড়ি। উপরের পেঁড়িতে গোখরো সাপ, মাঝের পেঁড়িতে অজিত; নীচের পেঁড়িতে আবার গোখরো সাপ। এইরূপ আর এক সিকের মাঝখানে অজিতের ভাই। মুকুন্দ খীচী জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া যাইয়া যমুনা পার হইয়া, কিছু দূরে ঘোড়া তৈয়ার ছিল, তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। অজিতের প্রাণরক্ষা হইল। দুর্গাদাস রাণীকে লইয়া ক্রমে দিল্লী ত্যাগ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্গাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন। অজিত তাঁহার চেলা হইলেন। অজিতের ভাই মরিয়া গেল। দুর্গাদাস ক্রমে রাঠোরদিগকে একত্র করিয়া অনেকগুলি পরগণা ও শেষে যোধপুরের কেল্লাটি পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। মেড়তা ও তাহার নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি দিল্লীর হইয়া গেল। ১০।১২ বৎসর পরে রাঠোরেরা যখন দুর্গাদাসকে ধরিয়া বসিল, "আমরা কাহার জন্ত যুদ্ধ করিতেছি? আমাদের রাজা কোথায়?", দুর্গাদাস বলিলেন, "৩০ দিন পরে তোমাদের রাজা আসিবেন ও এখানে দরবার করিবেন।" দরবার হইল, সব রাঠোর আসিয়া জুটিল, কেহই রাজাকে চেনে না। রাজা

কিন্তু সকলকেই চিনেন এবং যে যে উপকার করিয়াছে এবং যে স্থানে যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তিনি সব জানেন। দুর্গাদাসের চেলাভাবে তিনি সব চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। রাঠোরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রাজার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা অদম্য উৎসাহে মোগলের অধিকৃত সকল যায়গা দখল করিতে লাগিল।

আরঙ্গেব আবার অজিতকে ভুলাইয়া দিল্লী লইবার চেষ্টা করিলেন, হইল না। তিনি এক নূতন কল করিলেন, তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীতে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে যোধপুরের পাট্টা লিখিয়া দিলেন। মনে করিলেন, ইহাতে অজিত ও দুর্গাদাস—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস হইবে। কিন্তু দুর্গাদাসেরও প্রভুভক্তি টলিল না, অজিতেরও অবিশ্বাস হইল না। আরঙ্গেবের মতলব সিদ্ধ হইল না বলিয়া তিনি আর এক কল করিলেন। তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীর মুন্সবদারি দিলেন। ক্রমে অজিত ও দুর্গাদাসের মনোমালিন্ত হইল। দুর্গাদাস মাড়বার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আরঙ্গেব তথাপি অজিতের কিছু করিতে পারিলেন না। রাঠোরেরা এখন খুব দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপে যাবজ্জীবন আরঙ্গেবের জ্বালায় জ্বালাতন হওয়ার পর এক দিন খবরওয়ালা আসিয়া খবর দিয়া গেল, আরঙ্গেব মরিয়াছে। সেই দিন অজিতের বুক ফাটিয়া এক গাথা বাহির হইল—

"আইয়ো খবর অচিন্তারী
মিট গীয়ো তনরী দাহ।
কসীদা ইম ভাখী ও
মরগীও আওরঙ্গ সাহ।"

'যাহা আমি কখন চিন্তা করি নাই, এমন খবর আসিয়াছে। আমার তনুর দাহ মিটিয়া গিয়াছে। খবরওয়ালারা বলিয়া গেল, আওরঙ্গ সা মরিয়াছে।' যোধপুরের লড়াই লইয়া কত কাব্য, কত গীত, কত দোহা যে আছে—তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

যোধপুরে যেমন, তেমনি প্রত্যেক রাজপুতরাজ্যের ইতিহাসে ও ভাট-চারণের পুথিতে আরঙ্গেবের রাজ্যের অনেক খবর পাওয়া যাইতে পারে। বিকানিয়ারের রাজা অনুপসিং আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দেশে আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে আদোনী সহর দখল হয়। আদোনীতে ইহার পূর্ব্বে কখনও মুসলমান যায় নাই, আদোনীর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত পাঁজি-পুথি লইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে গেল। অনুপসিং তাঁহাদের বলিলেন, 'কেন নষ্ট করিয়া ফেলিবে, আমাকে দাও। আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিব।' সেই পুথি তিনি আনিয়া বিকানিয়ারের কেল্লায় রাখিয়াছেন। রাজপুতানায় তত বড় পুথিখানা আর কোথাও নাই। অনুপসিং দক্ষিণদেশ হইতে ৩৬ ক্রোর দেবতা লইয়া আসিয়াছিলেন। বিকানিয়ারের কেল্লায় এখনও তাঁহাদের পূজা হয়। তিনি অনেক দেশের পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া এক খানি প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। উহার নাম

'অনূপবিলাস'। উহা এখনও কোথাও কোথাও চলে। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোজী ভট্টকে লইয়া গিয়া একখানি পুথি লেখাইয়া ছিলেন। অনুপসিংএর তত্ত্বাবধানে শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকাও লেখা হয়।

জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ আরঞ্জেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ইতিহাসেও আরঞ্জেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। তাঁহারই কথামত শিবাজী দিল্লী আসিয়াছিলেন। যাঁহার তত্ত্বাবধানে শিবাজী দিল্লীতে থাকিতেন, তিনি জয়পুরের একজন জায়গীরদার আচ্‌রোলের ঠাকুর। আচ্‌রোলের বাড়ীতে শিবাজীর অনেক কথা এখনও পাওয়া যায়। বুঁদীর হাড়াচৌহানরাজ আরঞ্জেবের এক জন সেনাপতি ছিলেন। বংশ ভাস্কর নামে হাড়াচৌহানদের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, উহাতেও আরঞ্জেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। কারণ, হাড়ারা খুব বীর ছিলেন এবং আরঞ্জেবের হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শক্রশল্যচরিত নামে এক খানি সংস্কৃত বই আছে, এখানি আরঞ্জেবের সেনাপতি হাড়া-রাজ শক্রশল্যের জীবনচরিত। উদয়পুরের রাজাদের সহিত আরঞ্জেব যাবজ্জীবনই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খবর টডের রাজস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু টড খবর পান নাই, এমন অনেক খবরও আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দানের চেষ্টায় বীর-বীরবিনোদ নামে উদয়পুরের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা হয় ও ছাপা হয়, কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা তাহা প্রকাশ হইতে দেন নাই, একটি কুটুরীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও কুটুরীর বাহিরে কোথায়ও প্রুফ আকারে, কাপি আকারে, ফর্ম্মা আকারে বীর-বিনোদের টুকরা রাজপুতানাময় ছড়াইয়া আছে। তাহা হইতেও আরঞ্জেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক গৌরীশঙ্কর ওঝা শিরোহির দেবড়া ও সোলংখি রাজপুতদিগের ইতিহাস লিখিতেছেন, তাহা হইতেও আরঞ্জেবের রাজত্বের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হইতে পারে। রতলামের ইতিহাস আরঞ্জেব হইতেই আরম্ভ। রতনসিংহের বচনীকা চারণদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ। উহাতেও আরঞ্জেবের অনেক কীর্ত্তির কথা লেখা আছে।

শিখদিগের উপর আরঞ্জেব কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস শিখদের সাহিত্য হইতে অনেক পাওয়া যায়। শিখেরা ইতিহাস লিখিতে খুব মজবুত; ঐ সকল ইতিহাস পঞ্জাবী ভাষায় লেখা। মহারাষ্ট্রদেশের লোকেও অনেক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। মারাঠাদের প্রথম অভ্যুদয় আরঞ্জেবের সময়েই হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ের মারাঠা-ইতিহাস ও আরঞ্জেবের ইতিহাস এক। ইহা ছাড়া রাজপুতানার যেমন ভাট চারণ আছে, তেমনি মহারাষ্ট্রদেশে গন্ধালী নামে একটি জাতি আছে। তাহারা ছড়া কাটে ও গান করে। মারাঠারা যুদ্ধে গেলে ২।১ জন গন্ধালী সঙ্গেই থাকিত। যুদ্ধে জয় হইলে, কর্ত্তারা সব একত্র হইয়া সেই যুদ্ধের ঘটনা গান করিতে বলিতেন, তাহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া গাইত, উঁহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া শুনিতেন। মারাঠা-ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার এইরূপ পোবাড়া আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসের অনেক উৎকৃষ্ট মসলা সরবরাহ হইতে পারে।

নাগরী-প্রচারিণী-সভা হিন্দী পুস্তকের যে সকল বিবরণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। বগেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ডের রাজারা অনেকেই হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন এবং রাজকবিদের দিয়া পুস্তক লিখাইয়াছেন। তাঁহাদের ভণিতায়, সূচনায় ও শেষে অনেক ইতিহাসের কথা পাওয়া যায়। হিন্দী পুস্তক হইতে ইতিহাসের অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কবিগণের জীবনচরিত আছে, অনেক সময় তাহা হইতেও ইতিহাসের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সৎনামীরা অতি নিরীহ লোক। তাহাদের মঠ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই ছিল। আরঙ্গেব তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করেন। তাহারা নিরীহ লোক, কিন্তু এতই চটিয়া যায় যে, দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে হারিয়া গিয়া আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহাদের মঠ খুঁড়িলে এই সকল যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতে পারে। গোকুলে বল্লভীসম্প্রদায়ের বারটি মঠ ছিল, বারটি কৃষ্ণমূর্ত্তি ছিল। আরঙ্গেব যখন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ভাঙ্গিবার হুকুম দেন, বল্লভীরা মনে করিল—আমাদের মন্দিরও বোধ হয় ভাঙ্গিয়া দিবে। তাহারা ঠাকুর লইয়া পলাইল,—কেহ করৌলি গেল, কেহ জয়পুর গেল, কেহ কোটা গেল, কেহ বুন্দী গেল। বল্লভের নিজ বিগ্রহ, বল্লভীদিগের প্রধান বিগ্রহ—উদয়পুরে যাইতে যাইতে পথে আটকাইয়া গেলেন। যেখানে আটক ছিলেন, সে জায়গা উদয়পুর হইতে দশ পোনের মাইল। ভক্তেরা বিশ্বাস করিলেন, ঠাকুর এই খানেই থাকিবেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড নাথদুয়ারা (নাথদ্বার) প্রস্তুত হইল, উহার আয় এখন বার লক্ষ টাকা। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, সমরকন্দ হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে যাহা কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায়, সবই নাথজীর সেবায় আনিয়া দেওয়া হয়। এই যে বল্লভীদের পলায়ন, ইহা হইতেও আরঙ্গেবের সময়ের অনেক ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির আরঙ্গেবের একজন সুবাদার ভাঙ্গিয়া দেন, মন্দির ভাঙ্গার জন্য আরঙ্গেব সুবাদারকে খুব ধমক দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধমকের পত্র সম্প্রতি বাহির হইয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দির কয়েকবার ভাঙ্গা হইয়াছে ও গড়া হইয়াছে। তাহারও ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে, শুধু আরঙ্গেবের সময়ের কেন, মুসলমানদিগের শাসনের অনেক ইতিহাস বাহির হইতে পারে।

কাথিবাড়, মাড়বার, উদয়পুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন মঠে নানাবিধ ইতিহাসের গ্রন্থ পাওয়া যায়। এক প্রকারের গ্রন্থের নাম "রাসা"; উহা হইতেই ফরবেস সাহেব 'রাসমালা' নামক একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের গ্রন্থ আছে, তাহার নাম "চাল", তাহা হইতেও অনেক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। আর এক রকম গ্রন্থ আছে তাহার নাম "সিয়াই"। সিয়াইগুলি হইতেও অনেক প্রকার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে।

আমার প্রবন্ধ লম্বা হইয়া আসিল, আর কথা কহিয়া শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। আজ আমার শেষ কথা এই যে, হিন্দুর তরফ হইতেও চেষ্টা করিলে মুসলমান-

ইতিহাসেরও অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গেব ত মুসলমানদিগের এক প্রকার শেষ রাজা বলিলেও চলে। হিন্দুদের তরফ হইতেও তাঁহার পূরা ইতিহাস লেখা হইতে পারে। যতদিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমানদিগের ইতিহাস লেখা না হয়, ততদিন ঐ ইতিহাস পূরাও হইবে না, ঠিকও হইবে না; কারণ, আমরা শুধু এক দলের কথা লইয়াই তাহাকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি।*

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

উদ্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ—(KARYOKINESES)

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা*

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের গৌণ-কোষ-বিদারণে নাভির (nucleus) গঠনে যে ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার শিক্ষাপ্রণালী কোনও পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই। যে সকল ক্রিয়াপ্রণালী পুস্তকে পাওয়া যায়, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া কোনটীতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, অবশেষে নিম্নলিখিত উপায়টী খুব সহজসাধ্য ও সুসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছি।

প্রথমতঃ—দ্রব্য-সঞ্চয়। উদ্ভিদের যে অংশ বর্দ্ধিষ্ণু, তাহাতেই কোষ-বিদারণ হইয়া থাকে, পত্র ও পুষ্পের কলিকাতেও কোষ-বিদারণ শিক্ষা করা যায়, কিন্তু মূলের অগ্রভাগস্থ কোষগুলি এই কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। নানাবিধ উদ্ভিদের মূল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পিঁয়াজের শল্ককন্দের (bulb) মূলের অগ্রভাগ এই কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। মটর বা ছোলার বর্দ্ধিষ্ণু মূলাণুতেও (radiole-এ) বেশ কাজ চলে।

দ্বিতীয়তঃ—সকল সময়ে কোষবিদারণ হয় না। বিলাতে কোষ-বিদারণ প্রাতঃকালে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এ স্থানে কোন্ সময়ে কোষবিদারণ হয়, তাহা জানা ছিল না। আমি পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছি যে, অন্ততঃ কলিকাতায় রাত্রি ৩টার সময় অধিকাংশ কোষেই নাভির নানারূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে শিকড়গুলি উপযুক্ত দ্রবে (নিম্নে লিখিত হইয়াছে) ফেলিয়া দেওয়া উচিত। রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে কোন কোষই এই অবস্থায় দৃষ্ট হয় না এবং চারিটার সময় কোষগুলির নাভি স্থিরাবস্থায় থাকে; সুতরাং তিনটা হইতে সাড়ে তিনটার মধ্যে শিকড়গুলি তুলিয়া লওয়া উচিত।

একটী ছোট মাটির টব, গামলা বা মালসায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু করাতের গুঁড়া (অর্থাৎ করাতে কাঠ কাটিলে যে গুঁড়া পড়ে, তাহা) রাখিয়া, তাহাতে তিন চারিটী পেঁয়াজের শল্ককন্দ পুঁতিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর এমন ভাবে জলসেচন করিতে হইবে, যাহাতে কাঠের গুঁড়াগুলি কেবলমাত্র ভিজা থাকে। এইরূপে চারি পাঁচ দিনে কন্দ হইতে যে শিকড় জন্মিবে, তাহাতে আমাদের কার্য্য বেশ সাধিত হইবে।

রাত্রি তিনটার সময় কন্দগুলি কাঠের গুঁড়া হইতে আস্তে আস্তে (যাহাতে শিকড়গুলির অগ্রভাগ না ছিঁড়িয়া যায়, এত ধীরে) তুলিয়া জলে ডুবাইয়া দিলে, কাঠের গুঁড়াগুলি ধুইয়া যাইবে। মূলগুলির প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা অগ্রভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া নিম্নলিখিত দ্রবে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিবে। এই দ্রবে ফেলিলে কোষগুলি ঐ সময়ে যে অবস্থায় ছিল, তদবস্থায় থাকিয়া যাইবে। দ্রবটীর নাম এসিটিক্ পিক্রো ফরমল। ইহা এই উপাদানে প্রস্তুত,—

জলে পূর্ণ মাত্রায় পিক্রিক এসিডের দ্রব—৭৫ অংশ
ফরমল ... ... ২৫ অংশ
এসিটিক এসিড (হিমকায়) ... ৫ অংশ

চব্বিশ ঘণ্টা এই দ্রবে রাখিবার পর, এই শিকড়গুলিকে সুরার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

হইবে। দশ পনেরটী শিকড়ের জন্ত দুই আউন্স পরিমিত দ্রব যথেষ্ট হইবে। ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি দ্রব আবশ্যক।

(১) পরিস্রুত সুরা (Absolute alcohal), (২) ৭০p. c. সুরা, (৩) ৫০ p. c. সুরা, (৪) ২০ p. c. সুরা, (৫) যাইলল্, (৬) যাইলল্ + লবঙ্গ তৈল (সমভাগ), (৭) ৯০ p. c. সুরা (Rectified spirit পরিস্রুত)

সাধারণতঃ শিকড়গুলি প্রথমে ৫০ p. c. সুরায় এবং পরে পরিস্রুত সুরায় দুই ঘণ্টা করিয়া ডুবাইয়া রাখিলে কাজ চলিতে পারে; কিন্তু কাজটি ভাল করিয়া করিতে হইলে ২০ p.c. সুরা হইতে ক্রমশঃ ৫০ p. c., ৭০ p. c. ও পরিস্রুত সুরায় আন্দাজ দুই ঘণ্টা করিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রব দুই আউন্স করিয়া লইলে কাজ চলিবে। পরিস্রুত সুরার পর শিকড়গুলিকে যাইলল + লবঙ্গ তৈল দ্রবে রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শিকড়গুলি প্রায় স্বচ্ছ (translucent) দেখাইবে, তখন জানা যাইবে যে ঐ গুলি ঠিক ভিজিয়াছে। যাইলল-লবঙ্গ তৈল দ্রবে ভিজিতে এক ঘণ্টার কিছু উপর লাগিবে।

তৃতীয়তঃ—শিকড়গুলিকে কাগজের ন্যায় পাতলা করিয়া কাটিবার জন্ত গলিত প্যারাফিনে ফেলিয়া দিয়া, প্যারাফিন জমাট বাঁধিতে দিতে হইবে। ইহার কিছু বিশেষত্ব নাই, তবে, যে বিষয় গুলি জ্ঞাতব্য, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

প্যারাফিন গলাইবার জন্ত এবং গলিতাবস্থায় রাখিবার জন্ত একটী যন্ত্র আছে। ইহাকে প্যারাফিন এম্বেডিং বাথ বলে; কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্ত উপায়েও আমাদের কার্য্য সাধিত হইতে পারে। একখানা দেড় ইঞ্চি চওড়া, ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি পুরু পিত্তলের পাত একটী লৌহ নির্ম্মিত টিপাই এর উপর বসাইয়া দিয়া, তাহার এক ধারে একটী ছোট পাতলা পিত্তলের বাটীতে (এলুমিনিয়ামের বাটীতেও বেশ চলিতে পারে) প্যারাফিন রাখিয়া বসাইয়া দাও। বাটীর একটী হাতল থাকিলে ভাল হয়, কারণ যখন বাটীটী গরম হইবে, তখন হাতল ধরিয়া বাটীটী নামাইতে পারা যাইবে। পিত্তলের পাতের অপর ধারের নীচে একটী স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাইয়া দাও। পিত্তলের পাতটী গরম হইতে থাকিবে, ক্রমে বাটীটী গরম হইয়া প্যারাফিন গলিয়া যাইবে। ল্যাম্পটী এদিক ওদিক সরাইয়া পাতের তলায় এমন স্থানে রাখা চাই, যাহাতে প্যারাফিন মাত্র গলিতাবস্থায় থাকিবে (অর্থাৎ ইহার কম উত্তাপে প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া যাইবে)। এই গলিত প্যারাফিনে শিকড়গুলিকে ফেলিয়া তাহাতে ৪।৫ ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া উচিত। শিকড়গুলি তুলিবার জন্ত এক জোড়া সাঁড়াশি আবশ্যক, হাত দিয়া নাড়া উচিত নয়।

প্যারাফিন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। জমাট বাঁধা প্যারাফিন বেশী শক্ত হইলে, কাটিবার সময় গুড়াইয়া যাইবে, আবার খুব নরম হইলে, কাটিবে না, এজন্ত সুবিধা-জনক প্যারাফিন লইয়া কাজ করা আবশ্যক। বিভিন্ন তাপে দ্রবণশীল ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্যারাফিন পাওয়া যায়। এ স্থানে গ্রীষ্মকালে (চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ) ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যে প্যারাফিন দ্রবীভূত হয়, তাহা ব্যবহার করা উচিত। শীতকালের জন্ত এবং বর্ষার সময় যখন বায়ু খুব শীতল থাকে তখন ৫০° হইতে ৫৫° সেন্টিগ্রেডে দ্রবণশীল প্যারাফিন কার্য্যের উপযোগী হইবে।

এক্ষণে শিকড়গুলিকে প্যারাফিন হইতে তুলিয়া অন্ত স্থানে প্যারাফিনের মধ্যে জমাট বাঁধিতে দিতে হইবে। তজ্জন্ত কয়েকটী জিনিষের দরকার (১) L আকৃতির দুই খানা পিত্তল খণ্ড, প্রত্যেকটী সিকি ইঞ্চি পুরু, পৌনে এক ইঞ্চি উচ্চ, দীর্ঘশাখাটী দেড় ইঞ্চি লম্বা ও খর্ব্ব শাখাটী পৌন ইঞ্চি লম্বা। ইহার প্রত্যেক খানিতে সেকরাদের সোণা ঢালাইবার খালকাটা ইটের ন্যায় একটী করিয়া খাল কাটা থাকিবে। (২) একখানা কাচ (৪ইঞ্চি×৩ইঞ্চি), ইহা

না থাকিলেও চলিতে পারে। পিত্তলের খণ্ড দুইখানি মুখোমুখি জুড়িয়া রাখিলে, তাহাদের মধ্যে একটী খাত হইবে। পিত্তল খণ্ড দুই খানি কাচের উপর বা কোন সমতল স্থানের উপর ঐরূপে রাখিয়া তাহার মধ্যে গলিত প্যারফিন ঢালিয়া দিয়া একটি শিকড় সাঁড়াশী দিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। শিকড়গুলি তুলিবার আগে সাঁড়াশীটী একটু গরম করিয়া লওয়া উচিত। নচেৎ প্যারাফিন জমিয়া গিয়া শিকড়গুলি সাঁড়াশীতে লাগিয়া যাইবে।

পিত্তলখণ্ড দুইটীর মধ্যে প্যারাফিন ও শিকড়টী দিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্যারাফিন জমাট বাঁধিতে দিতে হইবে। পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া যাইবে। প্যারাফিন যদি আস্তে আস্তে জমাট বাঁধিয়া দানা বাঁধিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল কাটা যায় না; এজন্ত আর একটী উপায় করিলে, প্যারাফিন খুব শীঘ্র জমাট বাঁধিবে। এক টুকরা বরফ পিত্তলখণ্ডের গাত্রে ধরিয়া রাখিলে, প্যারাফিন শীঘ্রই জমাট বাঁধিবে। গ্রীষ্মকালে এই ক্ষেত্রে বরফ ব্যবহার কর্ত্তব্য, নচেৎ প্যারাফিন ভাল করিয়া জমাট বাঁধিবে না। বরফ কিম্বা জল যেন প্যারাফিনে না পড়ে, তাহা হইলে ইহা প্যারাফিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিবে। প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া গেলে পিত্তলখণ্ড দুইটী সরাইয়া লইলে জমাট প্যারাফিন খণ্ড আলাদা হইয়া যাইবে। এই প্যারাফিন খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে বা হস্তে ক্ষুরধারা কাগজের ন্তায় পাতলা করিয়া কাটিতে হইবে। যদি প্যারাফিন খণ্ডটী ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উহা ছুরি দিয়া চাঁচিলে গুড়াইয়া যাইবে না ও শিকড়টী কাটিলেও বেশ মসৃণ ভাবে কাটিয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ—প্যারাফিন খণ্ডটীকে কর্ত্তন-যন্ত্রে (Microtome) চড়াইয়া কাগজের মত পাতলা করিয়া কাটিতে হইবে। আমরা কেম্‌ব্রিজ রকিং মাইক্রোটোম (Cambridge Rocking microtome) ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্যারাফিন খণ্ডটী চাঁচিয়া ছুলিয়া চৌকা করিয়া লইয়া যন্ত্রে বসাইয়া দিতে হইবে। যেখানে বসাইতে হইবে, সেই অংশটী ও প্যারাফিন খণ্ডটীর পাদদেশ গলাইয়া সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। প্যারাফিন খণ্ডটী এমন ভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে শিকড়টী লম্বালম্বি কাটিয়া যায়। এক্ষণে প্যারাফিনের কাগজের মত পাতগুলি কাটা শিকড় সমেত কাচখণ্ডে (slides) সারি বাঁধিয়া বসাইয়া দিতে হইবে।

যে কাচগুলিতে ঐ পাতলা কাটা শিকড়গুলি বসাইতে হইবে তাহা খুব পরিষ্কার ও মেদশূন্য থাকা উচিত। বোর্ডে লিখিবার খড়ি দিয়া মিনিট খানেক মাজিয়া লইলে কাচখানি বেশ পরিষ্কার ও মেদশূন্য হইবে। তাহার প্রমাণ এই যে, এক ফোঁটা জল কাচের উপর ফেলিয়া দিলে, তাহা সমানভাবে, ছড়াইয়া পড়িবে এবং কাচটী তেল কাটিবে না। এই কাচের উপর আঙ্গুল দিয়া হংসডিম্বের শ্বেতঅংশ খুব পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিতে হইবে। প্যারাফিনের পাতগুলি কাচের উপর সাজাইয়া তাহাতে (পাতগুলির ধারে, উপরে না পড়ে) একটু জল দিলে পাতগুলি ভাসিয়া উঠিবে। কাচখানি একটু গরম করিলে, প্যারাফিনের পাতগুলি বেশ মসৃণ হইয়া যাইবে, বেশী গরম করিলে পাতগুলি গলিয়া যাইবে। এখন জলটুকু ফেলিয়া দিয়া কাচখানি এক দিন রাখিয়া দিলে প্যারাফিনের পাতগুলি কাচে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যাইবে।

পঞ্চমতঃ—কাগজের ন্তায় পাতলা শিকড়ের খণ্ডগুলিকে রং করিলেই আমাদের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। কয়েক রকম রং এই কার্য্যে ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে আর্লিকস্ হিম্যাটক্সিলিন সস্তা ও সুবিধাজনক। ইহা কিনিতে পাওয়া যায় অথবা তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়। এই সঙ্গে আরও দুই চারিটী দ্রব আবশ্যক:—(১) অম্লযুক্ত সুরা (৯০ p. c. সুরাতে শতকরা

এক অংশ হাইড্রোক্লোরিক এসিড), ২। পরিস্রুত জল ৩। এমোনিয়াম কার্বোনেট মিশ্রিত জল (মটর প্রমাণ এমোনিয়াম কার্বোনেট চারি আউন্স জলে দ্রব করিয়া লইতে হইবে) ৪। লবঙ্গ তৈল ৫। ক্যানাডা বালসাম (কাইললে দ্রবীভূত)।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিকড়গুলি রং করিতে হয়।*

১। কাচখানি একটু গরম করিয়া লইতে হইবে; প্যারাফিন গলিয়া যাইবামাত্র ইহা কাইললের ভিতর ডুবাইয়া দিলে প্যারাফিন সমস্ত গলিয়া যাইবে। ইহাতে এক মিনিট রাখিলে যথেষ্ট হইবে। ২। উহা হইতে তুলিয়া পরিস্রুত সুরার মধ্যে দুই এক মিনিট ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। ৩। তৎপরে ৫০ p. c. সুরায় দুই এক মিনিট ডুবাইয়া রাখিবে। ৪। তাহার পর পরিস্রুত জলে ডুবাইতে হইবে। ৫। আলিকৃস্ হিম্যাটক্সিলিন পিপেটে করিয়া কাচের উপর (শিকড়ের উপর) ছড়াইয়া দিয়া পাঁচ মিনিট রাখিয়া দিবে। ৬। পুনর্ব্বার পরিস্রুত জলে ধুইয়া লইতে হইবে। ৭। এমোনিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া ধরিবে। যখন লাল রং বা (বেগুনি রং) একেবারে নীল হইয়া যাইবে, তখন তুলিয়া লইয়া সাধারণ জলে ধুইয়া লইবে। ৮। অম্লযুক্ত জলে ডুবাইয়া ধরিলে যখন রং আবার লাল হইয়া যাইবে, তখন তুলিয়া লইয়া। ৯। আবার পরিস্রুত জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। ১০। আবার এমোনিয়াম কার্বোনেট মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া ধরিলে শিকড়গুলি নীলবর্ণ ধারণ করিবে। ১১। পুনরায় পরিস্রুত জলে ধুইয়া ১২। ৯০ p. c. সুরাতে (Rectified spiritএ) ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। মিনিট পাঁচেক রাখিলেই চলিবে। ১[illegible] পরিস্রুত সুরায় মিনিট ৪।৫ রাখিয়া ১৪। লবঙ্গ-তৈলে ডুবাইয়া দিবে। ১৫। লবঙ্গ তৈলে মিনিট খানেক রাখিয়া কাচটীর তলদেশ ও পার্শ্ব রুমালে মুছিয়া ১৬। উহার উপর ক্যানাডা বালসাম দিয়া শিকড় গুলির উপর পাতলা কাচ (cover slip) বসাইয়া দিলেই আমাদের কার্য্য সমাপন হইয়া গেল।

উপরোক্ত দ্রব ব্যতীত এই কয়েকটা দ্রব্য আমাদের ব্যবহারে লাগিবে,—

১। দুইটী হাতল সমেত ছুঁচ। ২। এক জোড়া সাঁড়াশী। ৩। এক খানা ধারাল ছুরি। ৪। এক খানা লোহার ছুরি।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।

---

* দ্রবগুলি বড় মুখ-বিশিষ্ট এমন শিশিতে রাখিতে হইবে, যাহাতে (৩২ × ১২) কাচখানি ইহার ভিতর অনায়াসে ডুবাইতে পারা যায়।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৩১শে শ্রাবণ, ১৩২০, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ বিপিনচন্দ্র পাল
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ প্রবোধচন্দ্র [illegible]পাধ্যায়
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

} সহকারী সম্পাদকগণ

উপযুক্ত সংখ্যক লোকাভাবে সভাধিবেশন হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে পরে এই সভার পুনরধিবেশন হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১লা ভাদ্র, ১৩২০, ১৭ই আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম্ এ মহাশয়ের "তর্কের পরিভাষা", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের "ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয়ের "চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ"। ৬। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও কালনায় পরিষৎ-শাখাস্থাপন-সংবাদ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ গৌরহরি সেন
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে প্রবোধবাবু সভাপতির আসন ত্যাগ করেন।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ উকীল, কালনা।
”	”	শ্রীসূর্য্যকুমার মুন্সী মধুপুর, মাজিদা, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীপৃথ্বীনাথ বসু মুন্সী জমীদার, কাইগ্রাম, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু ৫৮ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট্।
”	”	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত ১৭।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু অধ্যাপক টি, এন জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায় ১৯ সুকিয়াস লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা	শ্রীনলিনীনাথ সেন Court Sub Inspector, আলিপুর (সার্কুলার রোড)।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত ৭০ সুকিয়া ষ্ট্রীট্।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	”	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বিএল্ ২।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৺গোপাললাল শীলের ষ্টেটের ম্যানেজার, ৯০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
”	”	শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএল্ ৩।৩ রামধন মিত্রের লেন।
”	”	শ্রীবরদাপ্রসাদ সেন ৪৯ কাঁসারীপাড়া রোড।

প্রস্তাবক		সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল্ ছোট আদালতের উকীল।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্‌এ কুটিঘাটা, বরাহনগর।
"	"	শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ ট্রান্‌স্লেটর অব্ দি রাইটার্স বিল্ডিং।
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	রায় বাহাদুর ডাঃ আর, পি, বাগচি, এম, ডি Medical Advisor, the Balwanto Rajput H. E. School, Agra.
"	"	শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বিএ Second master B. R. H. E. School, Agra.
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বি এ Asst. master B. R. H. E. School, Agra.
"	"	শ্রীক্ষুদিরাম সেন বিশ্বাস কবিরাজ বোধখানা, অমৃতবাজার।
"	"	শ্রীদ্বিজবর সেন বিশ্বাস কবিরাজ মহাদেবপুর, যশোহর।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ দাস, বোধখানা।
"	"	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী Hd. master. H. E. School, Gatipara, Benapole, Jessore.
"	"	শ্রীপার্ব্বতীচরণ বিশ্বাস, বেনাপোল, যশোহর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	"	শ্রীবসন্তকুমার রায় তেঘরী, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	"	শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীতিসাম্পতি চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাটোয়া।
"	"	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সাহা, ঐ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ এম্‌এ অধ্যাপক, এ এম কলেজ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এমএ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র বসু বি এস সি অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এমএ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্‌এ, বিএল অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীরজনীকান্ত দত্ত এম্‌এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	এন, এন, ঘোষ এমএ, বিএল অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে এমএ, বিএস সি অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএল ৫৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	গুণালঙ্কার মহাস্থবির, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-সভা, ৬৭।১ হ্যারিসন রোড।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়	১। মা ও ছেলে
" বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	২। আকিঞ্চন (কবিতা)
" রাজনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন	৩। সানুবাদ স্মৃতিসন্দর্ভ
" দিলীপকুমার রায়	৪। পরপারে
	৫। মেবার-পতন
	৬। চন্দ্রগুপ্ত
	৭। নুরজাহান
	৮। সাজাহান
	৯। দুর্গাদাস

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়	১০। পাষাণী
	১১। আনন্দ-বিদায়
	১২। পুনর্জ্জন্ম
	১৩। সোরাব-রুস্তাম
	১৪। সীতা
	১৫। কল্কি অবতার
	১৬। প্রায়শ্চিত্ত
	১৭। তারাবাই
	১৮। বিরহ
	১৯। আষাঢ়ে (গল্প)
	২০। হাসির গান
	২১। আলেখ্য (কবিতা)
	২২। ত্রিবেণী
	২৩। একঘরে
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌এ	২৪। নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ	২৫। বানান-সমস্যা
	২৬। অনুপ্রাস
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২৭। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুমঃ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ
„ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	২৯। প্রাণপ্রতিমা (কবিতা)
„ নকড়ি রায়গুপ্ত	৩০। শান্তি-গীতা (সানুবাদ)
„ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১। জীবন-সংগ্রাম
	৩২। ভবরামের উইল
„ শীতলচন্দ্র রায়	৩৩। যোগশিক্ষা-সোপান (১ম খণ্ড)
	৩৪। জাতিমিত্র (২য় ভাগ)
	৩৫। শ্রীরাম-বনবাস কাব্য (খণ্ডিত)
	৩৬। Selections from Subjects of English and Bengali Language by the Calcutta University for Examination of 1864.
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএল	৩৭। বন্দী
The Director, Geological Survey of India	৩৮। Memoirs of the G. S. of India Vol. 39. pt. 2.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer-In-charge— Bengal Sectt. Book Depot.	৩৯।	Administration Report of the Jails of Bengal for 1912,
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌এ	৪০।	Sukra-Nitisara, Vol 13. pt. I &II.
Superintendent Govt. Printing, India	৪১।	Statistics of British India, (Industrial) 1911-12. pt. I.
	৪২।	,, (Local Funds) pt. 3.
The Registrar— Calcutta University	৪৩।	C. U. Calendar for 1913. pt. III.
Surveyor General of India	৪৪।	General Report of the Survey of India for 1911-12.

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। গীতাবলী
	২। নিত্যবৃন্দাবন-রহস্য
	৩। বৈষ্ণবাভিধান
	৪। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
	৫। ব্রজমণ্ডল-বর্ণনা
	৬। সংস্কৃত শ্লোক-সংগ্রহ

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বিএ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রদর্শন করিলেন এবং সভার পক্ষ হইতে প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

১। ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি।

২। কোন দেবী-মূর্ত্তির ভগ্নাংশ। এক দিকের দুই হস্ত ও আর একটি বাহুমূল বর্ত্তমান। এক হস্তে ধনু, অপর হস্তে সম্ভবতঃ বজ্রঘণ্টা।

৩। পদ্মাসনে সমাসীন ধ্যানস্থ মূর্ত্তির নিম্নাংশ। পাদদেশে বৃষমূর্ত্তি। প্রধান মূর্ত্তির পরিধানে জানুদেশ পর্য্যন্ত ফুলকাটা বস্ত্র বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম। বৃষের পশ্চাতে উপাসিকা মূর্ত্তি। বৃষের সম্মুখে নর্ত্তনশীল পুরুষমূর্ত্তি।

৪। কোন দেবমূর্ত্তির উপরিস্থ কীর্ত্তিমুখ।

৫। কোন দেবমূর্ত্তির পাদপীঠের ভগ্নাংশ। এ সম্বন্ধে অমৃতবাবু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অতঃপর প্রবন্ধ-পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমেই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় "ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, এম আর

এ এম মহাশয়-লিখিত "চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌এ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম্‌এ মহাশয়ের লিখিত "তর্কের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে, মাসিক অধিবেশনে পাঠ জন্ম নির্দ্ধারিত প্রত্যেক প্রবন্ধের সাধারণতঃ সার মর্ম্ম মাত্র পঠিত হইবে। সেই নিয়ম অনুসারে উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির সার মর্ম্ম মাত্র পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ ও শ্রোতৃবর্গ উভয়েরই প্রত্যেক প্রবন্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার সুবিধা হইয়াছে।

শেষ প্রবন্ধের আলোচনা হইয়াছিল। ঐ আলোচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করেন ;—শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মনোমোহন বাবু বলিলেন,—syllogism এর অনুবাদ 'স্তায়' হইতে পারে না, 'অবয়ব' হওয়া উচিত। General termএর পারিভাষিক শব্দ 'সামান্য নাম' ঠিক হইয়াছে কি? copulaর অর্থ বিশেষণ ভাব হওয়া উচিত, 'বিশেষ' অর্থ particularity, singular termএর অনুবাদ 'বিশেষ নাম' হইলে মানে হয় না। law of identity পারিভাষিক শব্দ 'তাদাত্ম্য' নিয়ম ঠিক হইয়াছে, কিন্তু বড়ই কটমট, একটা মোলায়েম শব্দ সৃষ্টি করিলে হইত। Logicএর অনুবাদ 'আন্বিক্ষিকী' ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

খগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বনমালী বাবু যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির সহিত তিনি পরিচিত নহেন। সংস্কৃত ও ইংরাজি স্তায়শাস্ত্র পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন, এইরূপ অনেকের মত। কিন্তু গার্ব্বের gaerbe মতে সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের অনেক কথা আরব্য ভাষার মধ্য দিয়া ইংরাজিতেও আসিয়াছে। পরে বহু সংস্কৃত শব্দের গৌণ অর্থ হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজিতে সেগুলি সেই ভাবে গৃহীত হয় নাই। তাঁহার মতে syllogismএর অর্থ 'ন্যায়' ঠিক হয় নাই। Logicএর পারিভাষিক শব্দ আন্বিক্ষিকী বড়ই কটমট হইবে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বনমালী বাবু সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় শাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন। তিনি ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দের আলোচনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে আমাদের দেশীয় "অনুগম", "অবচ্ছেদক" প্রভৃতি শব্দের ইংরাজি তর্জ্জমা করিয়া দিলে বড় ভাল হইত। লজিক বলিতে ঠিক তর্কশাস্ত্র বুঝায় কি না? তর্কশাস্ত্র বলিতে Evidence ও procedure আসে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও কালনার শাখা-পরিষৎ স্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের মাসিক বিবরণ পাঠ করিলেন। ("ক" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মদিন উপলক্ষে বালক ভোজন

উৎসবে চাঁদা ও যোগদান জন্ম মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বড়লাট বাহাদুরের ধন্যবাদ-পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থপ্রকাশের মাসিক বিবরণ।

গত ৮ই আষাঢ় প্রথম মাসিক অধিবেশনে গ্রন্থ-প্রকাশ-কার্য্যের যে বিবরণ দেওয়া হয়, তাহা প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত ২০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে এই বিভাগের কার্য্য নিম্নোক্তরূপে অগ্রসর হইয়াছে ;—

১। উনবিংশ বর্ষের পরিষৎ-পঞ্জিকা ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণ,—ইহার ১৬ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে। বাকী অংশ আগামী ভাদ্র মাসে ছাপা শেষ হইয়া যাইবে।

২। শ্রীভাষ্য,—তৃতীয় খণ্ডের ৯ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। ইহার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পূজার মধ্যেই এই খণ্ডের অর্দ্ধাংশ ছাপা হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী,—পূর্ব্বে ৯ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছিল, গত আষাঢ় ও শ্রাবণে আরও ৭ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৪। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন,—মূলভাগের ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে, মোট ৫০ ফর্ম্মায় ৪০০ পৃষ্ঠায় মূলাংশ শেষ হইয়াছে, পূজার পর ইহার পরিশিষ্টাংশের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৫। বাঙ্গালা শব্দকোষ,—গত দুই মাসে আরও ৭ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। ইহাতে ত-বর্গের দ-কার চলিতেছে।

৬। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা,—গত দুই মাসে এক ফর্ম্মা মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার সম্পাদক রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর দার্জ্জিলিঙ্গে থাকেন। প্রুফসংশোধক পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ ভাটপাড়ায় থাকেন। অতএব বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী।

৭। ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল,—ইহার আরও ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৮। অনিলপুরাণ,—ইহার আর এক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৯। প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর তালিকা,—এই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত গত আষাঢ় মাস হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একজন সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। অমূল্য বাবু তাঁহার সাহায্যে এই দুই মাসে তিন শতাধিক গ্রন্থের বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় স্থগিত বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়— ১২ই আশ্বিন, ১৩২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা

উপস্থিত,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল
,, মহেশচন্দ্র আতর্থী
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র
,, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
,, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, প্রবোধচন্দ্র দে এফ আর এচ এস
,, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বিএ, বিএস সি
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, মন্মথনাথ বসু
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচডি
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
,, ক্ষেত্রমোহন ভড়
,, সতীশচন্দ্র মজুমদার
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
,, পুলিনবিহারী দত্ত
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, করুণাচন্দ্র মজুমদার
,, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রাইচরণ মুখোপাধ্যায়
,, যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
,, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র
,, শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত
,, অমরচন্দ্র ঘোষ
,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র বিএল্‌
,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শচীন্দ্রকুমার কুণ্ড
,, মতিলাল বসু
,, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, সুরেশচন্দ্র সরকার
,, তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী
,, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ
,, বীরেন্দ্রনাথ সিংহ
,, রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
" অখিলকৃষ্ণ শীল	" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" প্রবোধগোপাল বসু	" সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত
" বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত	" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী	" শ্যামাচরণ সরকার
" শচীন্দ্রকুমার বসু	" ভোলানাথ কোঁচ
" ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার	" যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" বিপিনবিহারী সেন	" গোপালকৃষ্ণ মিত্র
" শিবকুমার বসু	" রবীন্দ্রনাথ বসু
" বিনোদবিহারী গুপ্ত	" মন্মথনাথ ঘোষ
" সূর্য্যকুমার পাল	" নকুড়চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধনে সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন এবং সংক্ষেপে এই সভার জন্য পূর্ব্বে যে দিনস্থির হইয়াছিল এবং যে কারণে সে দিন অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগ্মিতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, চিত্তের দৃঢ়তা এবং সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যান-শক্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ;—

"রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত ও অন্যান্য অনেক সদ্‌গ্রন্থের লেখক, প্রাচীন সাহিত্যসেবী, আধুনিক বঙ্গসমাজের অন্যতম চিন্তানায়ক বাগ্মিবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গদেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছেন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম্, এস মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পর বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দর্শককে সকল বিষয় প্রাঞ্জলরূপে বুঝাইতে স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শক্তি অতুলনীয় ছিল। তাঁহার বক্তৃতারাশি সংগৃহীত হইলে একখানি বিপুলায়তন উপাদেয় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হইতে পারে। তিনি আমাদের পরম ভক্তির পাত্র ছিলেন। আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।"

তৎপরে রায় কুঞ্জলাল সিংহ বসু রায় মহাশয় স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নিজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রস্তাবের সম্পর্কে বলিলেন,—তাঁহাকে কেবল সুবক্তা ও সুলেখক বলিলেই তাঁহার গৌরব করা হয় না। তাঁহাতে এমন একটা শক্তি ছিল যে, যাহা তিনি ভাবিতেন, তাহাই তিনি লেখায় ও বক্তৃতায় জোরের সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতেন এবং পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। নগেন্দ্রনাথ ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। রামমোহন কেশবচন্দ্রের যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, সেখানে ত্যাগের কিছু প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে ত্যাগীর প্রয়োজন হইয়াছিল আর নগেন্দ্রনাথ নানাদিকে সে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ব্রাহ্মসমাজের একখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ হইয়া আছে। তিনি লেখায় যাহা ফুটাইয়া গিয়াছেন, নিজ জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন এবং অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই শোকপ্রকাশক ও সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র তাঁহাদিগকে পাঠাইবার প্রস্তাব করিতেছেন।"—এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া পাঁচকড়ি বাবু বলিলেন,—নানা স্থানে, নানা ভাবে, নানা লোকের মুখে শুনিয়াছি, সে কালে যাঁহাদের লেখায় খাঁটী বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ফুটিত, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমরা যাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, দশ জনে মিলে যদি তাঁহাদের অভাবে তাঁহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, তবে তাঁহাদের পরিবারস্থ যাঁহাদের শোক হইয়া থাকে, তাঁহাদের শোকেও একটা তৃপ্তি আসে এবং তাহা অপনোদনেরও একটা পথ হয়। এই জন্যই আমরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির পাত্রগণের বিয়োগে এমন করিয়া সভা সমিতি করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকি। নগেন্দ্রনাথ ইহজীবনে যে চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইয়াছিল। সুলেখক, সুতার্কিক নগেন্দ্রনাথের মত পূর্ব্বপক্ষ করিতে সমর্থ ব্যক্তি বড় বড় নৈয়ায়িকের মধ্যেও কম দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে কয়জন বাঙ্গালায় কলম ধরিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা খাঁটি বাঙ্গালায় বলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ ও নগেন্দ্রনাথই সকলের শ্রেষ্ঠ। খাঁটী বাঙ্গালায় নগেন্দ্রনাথের ও আচার্য্যের শক্তি অদ্ভুত বিকশিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথের ত্যাগের মহিমা কত, তাঁহার ত্যাগের মূল্য কি, তা ইঁ'র যুগের লোক ব্যতীত বুঝিতে পারিবে না। বাঁশবেড়ের চাটুর্য্যেদের বাড়ীর ছেলে—মান-মর্য্যাদায় অতুলনীয় বংশের ছেলে, কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে—ধনে মানে জাজ্বল্যমান ঘরের ছেলে, ধর্ম্মের জন্য—নিজের ব্রতরক্ষার জন্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, সমাজের বাহিরে আসিয়া যে জ্বালা সহিয়াছিলেন, তাহা এখনকার লোকে বুঝিবে না। তখনকার সমাজের রাগ-দ্বেষ-জিঘাংসা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য তিনি সকল নির্য্যাতন সহিয়া বীরের ন্যায়

কাটাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে তিনি ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, প্রাণে প্রাণে তাহা অতিমাত্র সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন, তাই সকল অবস্থায়, সকল স্থানে, সকল উৎপীড়নের, দুঃখের, কষ্টের মধ্যেও তাহার শ্লাঘা করিতেন, তাহার মহিমা প্রচার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত মিসনরি, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তিমান্ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। এখনকার দিনে তেমন দৃঢ়চিত্ত লোক কৈ? সেই জন্য দুঃখ হয়, আমাদের মধ্য হইতে এমন সকল পুরুষসিংহের লোপ হইতেছে। আমরা আজ সমবেত ভাবে নগেন্দ্র বাবুর পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনকে আমাদের শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের তেমন না হউক, তেমন উপাদানের লোক আমাদের দিন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—পাঁচকড়ি বাবু যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই আমার অনুমোদিত। নগেন্দ্র বাবু যেখানে যাইতেন, সেইখানেই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মিশনরী ও ব্যাখ্যাতা হইয়া যাইতেন, এমন নহে; যেখানে সে ভাবে যাওয়ার প্রয়োজন হইত না, সেখানে অমায়িক বন্ধুভাবে যাইতেন এবং সেখানে তাঁহার যে কোন সাহায্য প্রয়োজন হইত, তাহা করিতেন। ভাষার সরলতা, ব্যাখ্যার বিশদতা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার কোন আসন ছিল না। ইংরাজিতে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় গ্রাম্য কথার আলোচনা হইত, তাহা ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ বিপুল জনসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিত না। যাহাদের প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য বলা হইত, তাহারা বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত থাকিলেও কিছু বুঝিত না। কৃষ্ণনগরে প্রথমে বাঙ্গালায় রাজনীতির কথা বলা আরম্ভ হয়, নগেন্দ্রনাথ বক্তা ছিলেন। তদবধি আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এখন mass পিছনে পড়িয়া থাকে না। নগেন্দ্রনাথের এই কার্য্য জাতীয় জীবনে কম কার্য্য নহে। তাঁহার "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত" উপাদেয় গ্রন্থ। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ছিলই না। ঐখানি এখন আমাদের সাহিত্যের একখানি standard Work হইয়াছে। উহার পরবর্ত্তী জীবন-চরিতগুলি, উহারই আদর্শে লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ বইখানি এই শ্রেণীর গ্রন্থের পথপ্রদর্শক। এরূপ মনীষাসম্পন্ন গ্রন্থকার ও কর্ম্মবীরের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ আজ আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্ক কেমন করিয়া হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, নগেন্দ্র বাবু তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কাগজে লিখিতেন। তিনি নিজের মতের জন্য আজন্ম পৈতৃক-সমাজের বিদ্রোহী ছিলেন। সিংহশাবক কখনও কোথাও মাথা নোয়াইয়া চলেন নাই, কাজেই তাঁহার লেখা orthodox কাগজে স্থান পাইত না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই সময় "সমদর্শী" নামে কাগজ বাহির করিতেন। নগেন্দ্রনাথ তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার ন্যায় খাঁটী স্বাধীনতালোলুপ বাঙ্গালী আর দেখি নাই। প্রথম যৌবনে তাঁহাকে যেমন স্বাধীনচেতা দেখিয়াছিলাম, আমরণ তাঁহার সেই ভাব বজায় ছিল। ছলা-কলা-

কৌশল তিনি জানিতেন না, বুঝিতেন না। সোজাসুজি যাহা বুঝিতেন, সোজাসুজি তাহাই বলিতেন। সত্য কথা বলিতে হইবে বলিয়া যে লাঠিমারা কথা বলিতেন, তাহা নয়; যাহা বলিতেন, তাহা রসসিক্ত করিয়াই বলিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুরসিক ছিলেন, তাঁহার কথায় হাসিতে হইত, তাঁহাকে দেখিলেও হাসিতে হইত। মিষ্ট ভাবের সঙ্গে তাঁহার যুক্তিপ্রবণতা শ্রোতৃবর্গ ও পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তখন বঙ্গদর্শনের যুগ। তিনি বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। তাঁহারই কাছে আমরা বঙ্কিমপ্রসঙ্গ শুনিতাম। তিনি সাধারণীতেও লিখিতেন। তাঁহার লেখাকে বঙ্কিম বিশেষ আদর করিতেন; বলিতেন,—"যদি unalloyed বাঙ্গালা, তবে নগেন্দ্র চাটুর্য্যের লেখা পড়িও" (৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন)। তখন সাহিত্যে মেম-সাহেবী ছিল না। এই সকল কথা বলিয়া বিপিনবাবু জানাইলেন যে, কোন বন্ধু নগেন্দ্রবাবুর স্মৃতি রক্ষার অনুষ্ঠানে ১০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন।—সকলে আনন্দ সহকারে এই দানের সংবাদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন,—

"স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ম পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি ভার অর্পিত হউক।"—এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন,—নগেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হয়। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলেজের শিক্ষক ছিলেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে উপদেশাদি দিতেন। ছাত্র যুবকবৃন্দের মধ্যে তিনি এমন করিয়া মধুরভাবে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতি প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন যে, এখনও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে সকল স্মরণ করেন। আমরা যখন বি এ পড়ি, তখনও লোকে এমন করিয়া নাম করিত, যেন তিনি তখনও সেখানে উপস্থিত, বাস্তবিক কিন্তু তিনি তাহার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাও যেমন সরল, যুক্তিও তেমনি সরল। সহজভাষায় লেখার ক্ষমতা এবং সহজ যুক্তিতে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। ভাব তিনি কাহারও নিকট ধার করিয়া লইতেন না, যাহা তাঁহার হৃদয়ে উঠিত, তাহা সমর্থন করিতেন, সহজ যুক্তি ও সরল ভাষার অভাব তাঁহাকে কোন দিন ভোগ করিতে হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ত্তব্যকে কিছুতে দূরে রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজ পুত্রের কুষ্ঠরোগে তিনি যে প্রকার সেবা করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখিতেন, তাঁহারাই শিহরিয়া উঠিতেন। এরূপ সাধু ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন,—নগেন্দ্রবাবু সাহিত্যের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি জীবনটাকে ধর্ম্মময় করিয়া ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সরলতা ও উদারতার সঙ্গে তিনি নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখার সরলতায় ও উদারতায় তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে বলিলেন,—নগেন্দ্র বাবুর গুণকথা অনেকেই বলিলেন, একটা বিষয়ে আমি কিছু পরিচয় দিব। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি পৈতৃক সমাজ ত্যাগ না করিলে তাঁহাকে কোন রকম অভাবে পড়িতে হইত না ; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে আত্মীয়তার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি ধর্ম্মের জন্য ইচ্ছাসুখে সে আত্মনিগ্রহ বাছিয়া লইয়াছিলেন, শত শত বিপদে ও বাধায় পড়িয়াও তিনি সে সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। ধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা ছিল বলিয়া প্রথম যৌবনে পিতৃগৃহে অর্থস্বাচ্ছল্য স্বত্বেও যথেষ্ট দারিদ্র্য-ভোগ করিয়া সন্তুষ্টহৃদয়ে কাল কাটাইতেন। অভাবের উৎপীড়নে তাঁহাকে মলিন করিতে পারিত না। তাঁহার আত্ম-সম্মানজ্ঞান ছিল, বন্ধুবান্ধবকে জানিতে দিতেন না যে, তিনি কষ্টে আছেন, তিনি উত্তম লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতের মতই সারাজীবনে কখনও নত হন নাই। তিনি অতি সুরসিক ছিলেন। নিমন্ত্রণাদিতে তাঁহার উপস্থিতি অতিমাত্র আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার রসালাপ অমিত ভাল ; কিন্তু রসভাবে জিত হইত নগেন্দ্রনাথের। গত ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়া একদিনও বাঁচিতে হয় নাই। আমি তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় গৌরব অনুভব করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্রনাথের গুণগরিমার কথা অনেক বলা হইয়াছে। বহুকাল হইতে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম। ১২৭৭ সালে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। তখন নগেন্দ্রনাথ কাঁটালপাড়ায় যাইতেন এবং বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে কি রকমে তাহার Federation হইবে, এইরূপ নানা কথা-বার্ত্তা হইত। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহার দোষ মিটাইয়া লিখিতেন। তাঁহার যুক্তি-তর্ক এত সুন্দর ও সহজ ছিল যে, মুগ্ধ হইতে হইত এবং প্রতিপক্ষকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইত। কুচবিহার বিবাহের পর তাঁহার সহিত আমার একবার রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক বাধিয়া যায়। ৪।৫ ঘণ্টা তর্কের পর তিনি আমায় আদর করিয়া কোলাকুলি করেন। তাঁহার উদারতাও এমন মুগ্ধকর ছিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা সুখী হইব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১২ই আশ্বিন, ১৩২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ণ ৬॥০টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। অধ্যাপক-সদস্য নিয়োগ। ৫। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্‌এ, বিএল মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তর মূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রদত্ত উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীস মহাশয়ের প্রদত্ত একটি তাম্রমুদ্রা। (৬) প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঁকুড়া-দর্শন", (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের "বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের পুরাতন রাজপাট" এবং "শঙ্করকৃত পাষণ্ডমর্দ্দন" এবং (গ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের "স্থানভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ" নামক প্রবন্ধ। ৭। শোকপ্রকাশ,—৺মোহনবিহারী আঢ্য মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৮। বিবিধ।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিসভা ভঙ্গের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইল।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কবিরঞ্জন ৭২ বীডন ষ্ট্রীট, শ্যামাদাস ঔষধালয়।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ, এম্ আর এ এস, মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা।
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়		শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর।
শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট, কোচবিহার।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, বিএল, মুন্সেফ, কুমিল্লা।
	শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ	মৌলবী আতাহার রহমান বিএ, সেটেলমেণ্ট অফিসার, কীর্ত্তিপুর, এড়োয়ালী পোঃ, মুরশিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এচ্, এল্. এম্. এস, ৫০ রসারোড, নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা।
„	„	শ্রীকালীচরণ মণ্ডল Civil Hospital Astt. Bongong Charitab'e Dispensary, বনগাঁ, যশোহর।
„	„	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, বোলপুর সিটি।
„	„	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ফরুক্কাবাদ সিটি।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সাহারাণপুর।
„	„	শ্রীবসন্তকুমার বসু বিএল, দি মল, কানপুর সিটি।
„	„	শ্রীপ্রয়াগনারায়ণ মিশ্র, উকীল, কানপুর সিটি।
„	„	শ্রীহরিকেশব সান্যাল এম্‌এ, অধ্যাপক, বেনারস সিটি।
„	„	শ্রীঅভয়াচরণ সান্যাল এম্‌এ, অধ্যাপক, সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ, বেনারস সিটি।
„	„	শ্রীবনওয়ারিলাল বসু সবরেজিষ্টার, গদখালি, য[illegible]হর।
„	„	ডাঃ কে, এন, বসু সিভি[illegible]ার্জ্জন, জৌনপুর, গবর্ণমেণ্ট চেরিটেব[illegible] ডিস্পেন্সারী।
„	„	শ্রীবসন্তকুমার [illegible]চার্য্য এম্‌এ, হেড মাষ্টার, গবর্মেণ্ট [illegible] স্কুল, জৌনপুর সিটি।
„	„	শ্রীসু[illegible]নাথ ভামানী [illegible] রথ ব্রাদার্স, কানপুর সিটি।
„	„	শ্রীঅঘোরনাথ মিত্র Hospital As[illegible] Ry. Dispensary E. I. Ry. কানপুর।
„		শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী, কোল মার্চ্চেণ্ট; কুপারগঞ্জ, কানপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কোল মার্চেন্ট, রেলবাজার, কানপুর।
"	"	শ্রীশচন্দ্র বসু, কোল মার্চেন্ট ধানবাদ, মানভূম।
"	"	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মল্লিক ষ্টেসন মাষ্টার—বাগদেহি, বি, এন, আর।
"	"	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ষ্টেসন মাষ্টার—ঝিকরগাছা, যশোহর।
"	"	শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ষ্টেসন মাষ্টার—গোবরডাঙ্গা, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীভীষ্মদেব দাস বিএল, উকীল, ভাঙ্গা, বরিশাল।
"	"	শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল মট্‌কাগারা, সামটা, যশোহর।
"		শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরাজ বসন্তপুর যাদবপুর, যশোহর।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ মণ্ডল হাজিপুর, কুলায়া, খুলনা।
"	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র মণ্ডল হাজিপুর, কুলায়া, খুলনা।
"	"	সর্দ্দার ধরণীধর মৈত্রেয় C/o লেট সর্দ্দার গদাধর মৈত্রেয় সমাজপতি হাউস, রংমহল নূতনগ্রাম, যশোহর।
"	"	শ্রীদর্পনারায়ণ মহলাদার পুরভাঙ্গা, যশোহর।
	"	শ্রীধর্ম্মচাঁদ বিশ্বাস মনোহরপুর, রজিয়া, যশোহর।
	"	শ্রীনন্দলাল বিশ্বাস মিনার্ভা থিয়েটার।
	"	শ্রীখেত্তিরাম সিংহ, কণ্ট্রাক্টর, ক্যানাল বিভাগ, কুতুড়া, মহারাজপুর, কানপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামতারণ চক্রবর্ত্তী হেড ক্লার্ক, নেশানাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কানপুর।
”	”	শ্রীএককড়িনাথ মুখোপাধ্যায় এজেণ্ট, বাইজল কোং, আগ্রা।
”	”	শ্রীরামধন তরফদার হরিদাসপুর, বনগ্রাম।
”	”	শ্রীপ্রিয়নাথ বিশ্বাস কাটিয়ালি, মেগা, যশোহর।
”	”	শ্রীকেশবলাল দাস পুটমাটি, বনগ্রাম, যশোহর।
”	”	শ্রীপিজরুদ্দিন মণ্ডল পুরাতন গ্রাম, বনগ্রাম।
”	”	জে, এন, লাহিড়ী, কানপুর।
”	”	জি, বসু স্কোয়ার, বোম্বাই।
”	”	ডাঃ সি, কে, বি ধন্বন্তরী কাশ্মীর হোটেল, সীতারাম বিল্ডিং, বোম্বাই।
”	”	শ্রীবীরেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত সম্পাদক—হিতবার্ত্তা, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীতারকনাথ দাস মুহুরী মাটুদহ, ২৪ পরগণা।
”	”	শ্রীকৃষ্ণদাস দাস, ঐ
”	”	শ্রীউমাচরণ বিশ্বাস পাহাপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া।
”	”	শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস ঐ
”	”	শ্রীজগবন্ধু হালদার ৫ জরিফ্‌ লেন, কলিকাতা।
”	”	শ্রীকেশবচন্দ্র সিংহ শিক্ষক, বালওয়ালটা, রাজপুতানা।
”	”	শ্রীশোভাচরণ সরকার নাটুদহ, ২৪ পরগণা।
”	”	শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, ২৬ গ্রে ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমোহিনীমোহন রায় চৌধুরী এম্‌এ, বিএল্, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার রায়, রূপগঞ্জ, নড়াইল।
"	"	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী অরণ্য-কুটীর, আসানসোল।
"	"	শ্রীভগবান্ তেওয়ারী শিক্ষক, ঝরমগরা, থাম্নগাদা, সম্বলপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	"	শ্রীমুকুন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ অধ্যাপক—বি, এন কলেজ, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেরাদুন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু ১৬।১ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুকুমার দত্ত এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্‌এ, বিএল্ ৬৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে এম্‌এ, বিএল্ ১৫।১ গোবিন্দ সরকারের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীরাধাবিনোদ রায়, গোরক্ষপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক—সাহিত্য-সম্মিলন, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নাওডাঙ্গা, রংপুর।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীকালিদাস দত্ত ২০।২ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীকৃষ্ণধন বিশ্বাস দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর।
„	„	শ্রীমহিমচন্দ্র রায়, আমমোক্তার দৌলতপুর, বেনাপোল, যশোহর।
„	„	শ্রীকান্ত রায়, ঐ
„	„	শ্রীধর্ম্মচাঁদ মজুমদার, শ্রীমতী হেমন্ত- কুমারী বিশ্বাসের বাড়ী, ঐ ।
„	„	শ্রীলোকনাথ বসু ছোটআঁচড়া, বেনাপোল, যশোহর।
„	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ৪৪।১ আমহার্ষ্ট রো, "অভয়া আশ্রম"।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ গোঁসাই দুর্গাপুর, নদীয়া।
„	„	শ্রীরাধাগোবিন্দ গোস্বামী ২৬ বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীশান্তিসাধন বিশ্বাস ৮ চেতলা রোড, আলিপুর।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক—"ত্রিবেণী", ইটিণ্ডা, ২৪ পরগণা।
শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত ৮৩ বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	মহারাজ শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বিএ ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কুমার শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ জমীদার, কেঁচকাপুর, মেদিনীপুর।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়, তালুকদার বোথাই সেড়াদোল, মেদিনীপুর।
শ্রীকামিনীনাথ রায়	„	কাজি মহম্মদ ওয়াজী জমীদার, কুসুমগ্রাম, বর্দ্ধমান।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, ২৫।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, বি এল্ ৩২ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, পরানহাটা।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বিএল্ ১৩।১ ডালিমতলা লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীত্র্যম্বক রায় ১৪ বুদ্ধু ওস্তাগরের লেন, হ্যারিসন রোড পোঃ।
শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, উকীল গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, ঘরিয়ালডাঙ্গা, রংপুর।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, ঘরিয়ালডাঙ্গা, রংপুর।
"	"	কুমার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কোঙর পাঙ্গা, রংপুর।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় বিএ ৪৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
আর্য্যসাহিত্য-সমিতি	১। সাধু ম্যাথু
শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির	২। রত্নমালা
" ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী	৩। সতী-শতক (১ম ও ২য় খণ্ড)
	৪। রত্নশতকম্
	৫। সুনীতি-শতকম্
রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বিএল্	৬। ঋক্‌বেদভাষ্যোপদ্‌ঘাতপ্রকরণ
	৭। ব্রহ্মসূত্র
	৮। আমিষের প্রসার (২য় খণ্ড)
	৯। সাংখ্যকারিকা
	১০। পরিব্রাজক-সূক্তমালা
	১১। পল্লীস্বাস্থ্য
	১২। নমঃশূদ্রাচার-চন্দ্রিকা
	১৩। উপবাস

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল	১৪। কাশীখণ্ড (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহিত্যসুমনমালা	১৫। ছায়া (হিন্দী)
"	১৬। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য (হিন্দী)
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৭। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ
" পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী	১৮। মন্দিরা
" তারানাথ রায়চৌধুরী	১৯। মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি ?
" বরদাপ্রসাদ বসু	২০। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)
	২১। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ (মূল)
	২২। পঞ্চতন্ত্র
	২৩। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী
	২৪। অধ্যাত্মরামায়ণম্ (সানুবাদ)*
	২৫। অদ্ভুতরামায়ণম্ (সানুবাদ)
	২৬। অদ্ভুতরামায়ণ (পদ্যানুবাদ)
	২৭। মনুসংহিতা (সানুবাদ)
	২৮। লিঙ্গপুরাণ
	২৯। বত্রিশ-সিংহাসন
	৩০। জগন্নাথমঙ্গল
	৩১। ভারত-ভ্রমণ
	৩২। ভারতে সম্রাট্
	৩৩। কঙ্কাবতী
	৩৪। কুইন্টিন ডারওয়ার্ড
	৩৫। রাসেলাস
	৩৬। দলিতা ফণিনী
	৩৭। মজার গল্প
	৩৮। দশকুমার-চরিত
	৩৯। ভজহরি সর্দ্দার
	৪০। গোপাল ভাঁড়ের টপ্পা
	৪১। মহীরাবণের আত্মকথা
	৪২। রোমাবতী
	৪৩। চণ্ডী
	৪৪। ভূত ও মানুষ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	৪৫। বর্ণ-চিত্রণ
„ হেমচন্দ্র সরকার এম্‌এ	৪৬। বিবিধ প্রবন্ধ
„ অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ	৪৭। বিদ্যাসাগর
„ সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু	৪৮। অর্ঘ্য-পুষ্প
„ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪৯। ঋগ্বেদসংহিতা (১ ফর্ম্মা)
„ সম্পাদক—রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ	৫০। কর্পূরস্তব
„ প্রকাশচন্দ্র সরকার বিএল্	৫১। গোপাল-বান্ধব
„ গোবিন্দকেলী শর্ম্মা মুন্সী	৫২। ভগবত্তত্ত্ব ও আপ্তত্ত্ব (দুইখানি)
„ সম্পাদক—জৈনধর্ম্মপ্রচারিণী সভা	৫৩। সনাতন জৈনগ্রন্থমালা (১ম ও ২য় খণ্ড)
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫৪। সাময়িক পত্রী
„ সুধাকৃষ্ণ বাকচী	৫৫। বাঙ্গালীর সমাজ
	৫৬। কুমার ভীমসিংহ
	৫৭। স্বদেশ কুসুম
	৫৮। জ্যোৎস্না
„ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	৫৯। শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্যলীলা)
„ শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী	৬০। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড, ২ খানি)
„ বঙ্কুবিহারী ধর	৬১। কাকী-মা
	৬২। গৌরীদান
	৬৩। বিষ-বিবাহ
	৬৪। সতী কি কলঙ্কিনী
	৬৫। আর্য্যকাহিনী
„ অনাদিচরণ তরফদার	৬৬। ভক্তের ভগবান্
	৬৭। হিন্দু-সমাজ
কার্য্যাধ্যক্ষ—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন	৬৮। খাদ্যতত্ত্ব
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ	৬৯। চরিত-কথা
„ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বিএল্	৭০। আকাশের গল্প
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী	৭১। নিদ্রা
„ পান্নালাল জৈন	৭২। সনাতন জৈনধর্ম্ম
	৭৩। শ্রীমহাবীর স্বামী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন	৭৪। ষট্‌দ্রব্য দিগ্‌দর্শন
	৭৫। জৈনধর্ম্ম
	৭৬। মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি?
সুধাংশুপ্রসাদ্‌ ভট্টাচার্য্য	৭৭। উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম
The Registrar Calcutta University	78. Calcutta University Minutes for 1912 Parts. IV. V & VI.
	79. Do University Calendar for 1913 Part IV
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	80. 51st. Annual Report of Govt. Cinchona Plantations for 1912-13
	81. Annual Report on the Police Administration of Calcutta & its Suburbs for 1912.
যুক্ত যদুনাথ মজুমদার	82. Sandilya Sutra
রায় বাহাদুর এমএ, বিএল	83. Expansion of self pt. 1.
	84. Seven Gospels
Supdt Govt. Printing Rangoon	85 Report of the Archæological Survey, Burmah for 1913.
Supdt. Archaeological Survey, Frontier Circle.	86. Annual Report of the Archaeological Survey of India. Frontier Circle. 1912-13.
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়	87. The Refugees
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	88. Chronological Tables containing corresponding dates of different Æras. From 1764 to 1135 Do 1876 to 1890 Do. 1891 to 1900 Do. 1901 to 1901
Managing Director Austrian Export & Import Co. Ltd.	89. How matches are made.
Supdt. Govt Printing, India	90. Statistics of British India, Part VI.
	91. Statistics of Cotton spinning & weaving. April to July 1913.

উপহার দাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press Madras.	92. South Indian Inscriptions Vol. II Part IV.
	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ খাঁ	৯৩। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ
মোহিনীমোহন রায়	৯৪। স্মরণমঙ্গল
	৯৫। রাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্ব
	৯৬। মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব)
	৯৭। বিদগ্ধ-মাধব
	৯৮। গীতগোবিন্দ
	৯৯। আশ্রয়-নির্ণয়
	১০০। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু
	১০১। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখণ্ড)

অতঃপর পরিষদের নবম নিয়ম অনুসারে পরিষদের সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনক্রমে নিম্নলিখিত চারিজন চতুষ্পাঠীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
২। ,, ,, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
৪। ,, ,, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ

অতঃপর শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্‌এ, বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রদর্শিত হইল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রামদাস সেনের ব্রোমাইড ছবি পূর্ব্বেই পরিষদে ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে তৈলচিত্র উপহার দেওয়ার জন্য তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ রহিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রদত্ত উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড প্রদর্শিত হইল। শেষোক্ত প্রস্তরখানি কৃত্রিম বলিয়া কেহ কেহ মত দিলেন। তাঁহাদের মতে উহা একখানা ছাঁচ মাত্র। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত একটি আধুনিক তাম্রমুদ্রাও প্রদর্শিত হয়। এই সকল দানের জন্য প্রদাতাদিগকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় "বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের পূর্ব্বতন রাজপাট" এবং 'শঙ্কর-কৃত পাষণ্ডমর্দ্দন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় অসমীয় শঙ্করকৃত বঙ্গলে লিখিত পাষণ্ডমর্দ্দনের খণ্ডিত পুথি এবং কাশীরামদাসের মহাভারতের পাঁচটি পর্ব্বের

পুথি ঐ দিনে পরিষদে প্রদান করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহাঁর প্রথম প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রাখালোবিন্দ বাবু শিলালেখ দেখিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রবাবু শিলালেখ দেখেন নাই। তথাপি শুদ্ধ ছায়াচিত্র দেখিয়াই পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। এরূপ করা ঠিক নয়। তিনি যদি শিলালেখ দেখিতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঁকুড়া-দর্শন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি বাঁকুড়া সহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদীর অপর পারে চিকনা ও অন্যান্য সংলগ্ন গ্রামের বিগ্রহ দেবতাদির বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এ প্রবন্ধালোচনাকালে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, আমরা বাঙ্গালা দেশের নানা গ্রামের গ্রাম্য দেবতার বিবরণ ও তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদাদি এইভাবে যদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি, তবে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় এবং পরিষদেও অনেক প্রবন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। এ কথা তিনি অনেকবারই বলিয়াছেন। এই ভাবে আরও অনেক কাজ করা যাইতে পারে; যথা,—পরিষদে যে সমস্ত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা।

অতঃপর পরিষদের সদস্য ৺মোহনবিহারী আঢ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইলে রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ২৩শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা

এই অধিবেশনের দিন পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বোলপুরে যাত্রা করেন। সেই জন্য এই অধিবেশন স্থগিত ছিল এবং পর রবিবার (১৪ই অগ্রহায়ণ) স্থগিদ অধিবেশনের দিন স্থির হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ৩০শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, আজীবন-সদস্য, রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুরের নিয়োগ। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন;—শ্রীযুক্ত অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি। ৫। আনন্দপ্রকাশ,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "নোবেল" (Nobel) পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আনন্দ প্রকাশ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের "গৌতমের ন্যায়দর্শন", (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "বঙ্গাধিপ রাজভট", (গ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন কামরূপের রাজমালা", (ঘ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা" এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাণীকণ্ঠের মোহমোচন নামক ভক্তিগ্রন্থ" প্রবন্ধ। ৭। শোকপ্রকাশ;—(ক) কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, (খ) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস এবং (গ) হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ কুঞ্জবিহারী দত্ত
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত
„ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
„ আনন্দনাথ রায়
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ সমন পূর্ণানন্দ স্বামী
„ সরলকুমার বসু
„ তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ
„ ললিতমোহন দে
„ চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার
„ সুরেন্দ্রকুমার দাস
„ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

শ্রীযুক্ত আবদুল রহিম
" মদনমোহন দাস
" সদানন্দ দাস
" মণীন্দ্রমোহন বসু
" রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
" শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়
" অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" তারকনাথ বিশ্বাস
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" সৈয়দ আলি আখতার

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" পরানেন্দ্রনাথ ঘোষাল
" হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌এ, বিএল (সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
} সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
	"	শ্রীবসন্তকুমার দাস এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ	"	শ্রীকালীগোপাল বিশ্বাস বি এ প্রাইভেট সেক্রেটারী, কোচবিহার।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্ররাও ভগবান্ লাল এম্‌এ ১৫৪ হ্যারিসন রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস বি এল, জমিদার দশঘরা, হুগলী।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীতারকনাথ সেন ইনকম্ টেক্স অফিস, বরিশাল।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীশশাঙ্কচন্দ্র রায়	কুমার শ্রীসত্যমোহন ঘোষাল ভূকৈলাস রাজবাটী, খিদিরপুর।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় C/o শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ষ্টোনমার্চেন্ট, পাকুড়।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন সংস্কৃতাধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মিঃ চন্দ্রশেখর সেন ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভবানীচরণ লাহা ২১৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্‌এ অধ্যাপক—প্রেসিডেন্সি কলেজ।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম্‌এ, বিএল সেলারাম।
"	"	শ্রীঅরুণচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীরাধাবল্লভ ঘোষ, মুন্সেফ, রাঁচী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম্ আর এ এস, এমডি উকীল, ১৮ রসা রোড।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ ৭৯ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ শিক্ষক—শিবপুর হাই স্কুল, ২০ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বিএল ১১ কৃষ্ণরাম বসুর লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "হিতবাদী" কার্য্যালয়, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ গুহ ১৪ হোগলকুড়িয়া লেন।
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএল্ উকীল, পুরী।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র বিএল উকীল, পুরী।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বিএল ঐ
"	"	শ্রীরামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার—মেটিয়ারী, নদীয়া।
"	"	শ্রীরামপদ সেন জমিদার—মেটিয়ারী, নদীয়া।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ অধ্যাপক—বি, এন, কলেজ, বাঁকীপুর।
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১১ অবিনাশ মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ ১০।১ অবিনাশ মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য *১১০।৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।*
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	"	কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন, ৯৫ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	"	শ্রীশীতলপ্রসাদ রায় জমিদার নিশ্চিন্দাপুর, রাধানগর, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীকালিদাস দত্ত বিএল্, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল, জমিদার মেদিনীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল ২৯।১০ মটস্ লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ৫১।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহীরামকোল, ফুলকোচা, ময়মনসিংহ।
চন্দ্রাহরণ ঘটক	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন জেনারেল সেক্রেটারী—ধর্ম্মসমবায় কোং লিমিটেড।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	"	পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ জেলা স্কুল, পুরুলিয়া।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবগ্রাম, নদীয়া।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৬ রসা রোড, সাউথ, কালীঘাট।

অতঃপর সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, তাজহাট রঙ্গপুরের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর পরিষদের স্থায়ী তহবিলে এককালীন সহস্র মুদ্রা দান করায় জন্য পরিষদের অষ্টম নিয়ম অনুসারে আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রাজা বাহাদুরের এই দানের জন্য পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	১। স্নেহ উপহার
শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায়	২। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস
শ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এ	৩। আর্য রামায়ণে বাল্মীকি (১ম ভাগ)
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	৪। রামায়ণং (বালকাণ্ডং, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)
	৫। ঐ (সানুবাদ অযোধ্যাকাণ্ডং কীটদষ্ট ও ছিন্ন
	৬। ঐ অরণ্যকাণ্ডং
	৭। রামায়ণম্ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)
	৮। ঐ (সুন্দরকাণ্ডং)
	৯। ঐ (যুদ্ধকাণ্ডং কীটদষ্ট)
	১০। ঐ (উত্তরকাণ্ডং—কীটদষ্ট)
শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ	১১। পূজা
শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১২। নিজে হাত দেখা শিক্ষা
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্‌এ, বিএল	১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম ভাগ)

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২য় ভাগ)
" মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৫।	বাঙ্গালীর কথা
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৬।	কর্ম্মকথা
" রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর	১৭।	শান্তি-রহস্য
" কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৮।	কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক
" কবিরাজ রাধালদাস সেন গুপ্ত	১৯।	প্রসূতিতত্ত্ব
" পান্নালাল জৈন	২০।	সনাতন-জৈনগ্রন্থমালায়াঃ তত্ত্বার্থরাজ-বার্ত্তিকম্
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২১।	কবিতাগুচ্ছ ১ম ভাগ (২ খানি) ঐ ২য় ভাগ (২ খানি)
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	২২।	আয়োজন
" প্রমথনাথ খান	২৩।	হৃদয় ও মনের ভাষা
Director General of Observatories	24.	Administration Report of Meteorological Dept. Govt. of India. 1712-13.
Officer in charge Bengal Sect. Book Depot.	25.	Report on Police Administration for 1912.
	26.	Annual Report of Bengal Veterinary College for 1912-13.
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	27.	The Shrines of Sitakund in the Dt. of Chittagong.
	28.	A few plain truths about India.
Astt. to the Agricultural Adviser to the Govt. of India.	29.	The Agricultural Journal of India Vol VII Part II.
Chief Inspector of Mines in India.	30.	Report of Chief Inspector of Mines in India 1912.
Supdt. Govt. Press Madras	31	Annual Report of Archæological Dept, Southern Circle, Madras for 1911-13.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Secy. to the Govt. of India, Revenue Dept.	32.	Proceedings of the 7th Conference of Registrar of Co-operative Societies with Statement showing progress of the co-operative movement in India for 1912-13.
Mr. E. B. Havel	33.	Indian Architecture.
Supdt. Govt. Printing	34.	Statistics of British India Part V.

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। মূর্ত্তিটি বৌদ্ধ যুগের বলিয়া অনুমান করা হইল। মূর্ত্তি কোথায়, কি ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা অর্ণব বাবু না লেখায় জন্ম এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইল না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে ডাক্তার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্ম আহ্বান করিলেন।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"যাঁহার গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, যাঁহার প্রভায় আজি বঙ্গ-সাহিত্য প্রভাবিত, যাঁহার রচনা অবলম্বনে আজি বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের সাহিত্যমধ্যে উন্নত আসন অধিকার করিয়াছে, তাঁহার সম্মানে ভারতবর্ষে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের মুখপাত্রস্বরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই আনন্দে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।—"আমার মত প্রাচীন লোকের পক্ষে আনন্দপ্রকাশের ভার পাওয়ায় বড়ই আনন্দ হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে শুধু যে তিনি সম্মানিত হইয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার জন্মভূমিও সম্মান লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান স্থলে আনন্দের কারণ কি, তাহা দেখা যাউক।

১। পুরস্কারের মূল্য প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। যে পুরস্কারের মূল্য এত অধিক, তাহা আর্থিক হিসাবে বিশেষ আনন্দের বিষয় বটে। কোনও দুস্থ সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাইলে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইত, কিন্তু দ্বারকানাথের (যিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে বিখ্যাত ছিলেন) পৌত্রের পক্ষে এই আর্থিক আনন্দ বিশেষ নহে।

২। কোনও নব্য সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক এই পুরস্কার পাইলে তিনি তৎসমাজে বিশেষ সম্মানভাজন হইতেন ও উচ্চাসন পাইতেন, যাহা তাঁহার পক্ষে অন্ত ভাবে সহজে হইত না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, রবীন্দ্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণকালে কলিকাতা টাউনহলে দেশের লোকের নিকট হইতে যে মান ও পারিতোষিক

পাইয়াছেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। বিরুদ্ধমত বাদ দিলেও এই দেশেই আমরা তাঁহাকে যে পারিতোষিক দিয়াছি, তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আমার মতে আমাদের আজিকার আনন্দ-প্রকাশের দুইটি কারণ আছে।

প্রথম,—পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য-জগতের পক্ষে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। অবশ্য বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন গৌরব বড় কম নয়, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য সাহিত্যিক-বর্গ যাহা দিয়াছেন, তাহারও মূল্য বড় কম নয়, কিন্তু তবুও প্রথম যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ, এম্‌এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়, তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, বিএ, এমএ পড়িবার মত এমন কি বই বাঙ্গালা ভাষায় আছে যে, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য ইউনিভারসিটিতে চাহিব। অবশ্য তাঁহারা ইহার ঠিক জবাব পাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন রবীন্দ্রনাথের পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বঙ্গ-সাহিত্যের পাশ্চাত্য জগতে পরিচয় হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে কালে একজন বড়লোক হইবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই একটি কবিতায় বলিয়াছিলাম। সেই কবিতা আমি আর একবার বলিয়াছি; আজও তাহার কতক অংশ বলিতেছি। ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় শুনে সেই গীতটি রচনা করি। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করিয়াছিলেন।

"ওঠ বঙ্গভূমি মাতঃ! ঘুমায়ে থেক না আর,
অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠিছে নবীন কবি, নব জগতের ছবি
নব "বাল্মীকি-প্রতিভা" দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখ-তৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
মণিময় ধূলিরাশি, খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে পাবে না আর॥

এইবার আনন্দ-প্রকাশের দ্বিতীয় বিশেষ কারণের কথা বলিব। একজন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

"The West is west, the east is east;
And never shall the twain meet.

এই কবিতা-লেখকও এক সময়ে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন আজ Kpling দেখুন যে, তাঁহার জোড়া পূর্ব্বদেশে আছে এবং তিনি তাঁহার সহিত সমাসনে বসিতে অধিকারী। তিনি যে কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—"Never shall the twain meet", আজ তাহা ব্যর্থ হইল।

এই স্থানে পুরস্কারদাতাগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহারা অনুবাদের ভিতর দিয়া

রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিয়াই পুরস্কার দিয়াছেন। সবটা পেলে না জানি কি হইত! আর এক কথা তাঁহাদের পক্ষে বলা যায় যে, তাঁহারা একটু দেখিয়াই সমস্তটা বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে পুরস্কারদাতাগণের গুণপনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রত্যেক কবির কাব্য-জীবন সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়;—উদয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণকাল। ইংলণ্ডের একজন বড় কবি মিল্টন সম্বন্ধে অনেকে এইরূপই বলেন। তাঁহারা বলেন এই যে, মিল্‌টন প্যারাডাইজ লষ্টে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, প্যারাডাইজ রিগেন্ডে তাহা পাওয়া যায় না।

আকাশে রবির উদয়—মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ আছে। বঙ্গাকাশের রবির উদয় ও মধ্যাহ্ন হইয়াছে, কিন্তু অপরাহ্ণ হইবে না, ইহা আমি জোরের সহিত বলিতে পারি। আমার এই উক্তির বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে,—"তুমি কোন গান গাও হে গুণী" যে গান শুনলে মানুষ আর জগতের দিকে চাহিবেও না, ফিরবেও না।

তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া গান রচনা করিতেছেন, সেই জন্যই তাঁহার গানের অপরাহ্ণকাল আসিতে পারে না। এই কবিত্ব-প্রভা পূর্ণানন্দে গিয়া পঁহুছিয়াছে। পূর্ণানন্দের অপরাহ্ণকাল হইতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এই প্রস্তাব সমর্থনকালে বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু যাহা বলিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না।

এই প্রস্তাব অনুমোদনকালে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিবার নাই। আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাবটি এই,—

"সুইডিস একাডেমী ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের রচনাপাঠান্তে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতি সম্ভ্রম-বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এ বৎসর বিদ্বৎসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানকর পারিতোষিক "নোবেল প্রাইজ" দান করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুইডিস্ একাডেমীকে সেই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব মুন্সী আবদর রহিম কর্ত্তৃক সমর্থিত ও ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

"পরিষদের চিরবন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে তাঁহাকে উপযুক্তরূপে সম্বর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গত রবিবারে বোলপুরে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। পরিষদের সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি শতাধিক সদস্য সেই নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের আনন্দের বিষয় যে, রবীন্দ্র বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্বর্দ্ধনার দিন পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির করা হইবে।

অতঃপর প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিদ রহিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বঙ্গাধিপ রাজভট" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ আলোচনাকালে বলিলেন যে, রাজভট এবং রাজরাজভট যে একই ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, যোগেন্দ্র বাবু নিজে রাজরাজভটের মূল তাম্রশাসন আদৌ দর্শন করেন নাই। রাজরাজভটের তাম্রশাসনের লিপি ও সেই সময়ের চীন-পরিব্রাজকের সমসাময়িক বিবরণী একত্রে আলোচনা করিলে উভয়ে যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ-লিখিত "প্রাচীন কামরূপের রাজমালা" প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলে পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাণীকণ্ঠের মোহমোচন নামক ভক্তিগ্রন্থ" সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকবর্গের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল,—

(ক) কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্‌এ, বিএল

(খ) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্

(গ) হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্

(ঘ) রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্‌এ, বিএল্

(ঙ) চন্দ্রশেখর বসু

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার সমর্থন করিলে পর রাত্রি ৭৸৹ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়;—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পিএচ ডি মহাশয়ের "গৌতমের ন্যায়দর্শন," (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "অতীতে ল এবং ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" এবং (গ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "শারদা লিপি এবং ডোগরা বর্ণমালা" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ;—(ক) পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, (খ) প্রিয়নাথ মিত্র বিএ এবং (গ) কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই, (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচডি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর

" নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

" গৌরহরি সেন

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

" অনাথনাথ রায়

" বিহারীলাল সরকার

" মন্মথমোহন বসু এম্ এ

" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

" বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি

" চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ

" চারুচন্দ্র বসু

" বাণীনাথ নন্দী

" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

" আশুতোষ সরকার

" সতীশচন্দ্র মিত্র

" মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

" সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

" অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত

" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

" অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়

" যতীন্দ্রনাথ দত্ত

" নিত্যানন্দ রাম

" সতীশচন্দ্র বসু

" মণিমোহন মিত্র

" শ্রীশচন্দ্র রায়

" অক্ষয়চন্দ্র সরকার

" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

" বিপিনবিহারী নন্দী

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
„ শশিভূষণ ঘোষ
„ বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
„ জানকীনাথ রায়
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
„ রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্‌এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

} সহকারী সম্পাদকগণ

সভাপতি মহাশয় নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। কিছু কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই মহাশয় সভায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি আসন ত্যাগ করিলেন। তৎপরে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং *নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—*

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু, ৫০ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীরমাপতি কাব্যতীর্থ মজিলপুর, জয়নগর, ২৪পঃ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রগতি মুস্তফী ৬ কমারসিয়াল বিল্ডিংস্।
শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	„	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, মনহলি, দিনাজপুর।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, মনহলি দিনাজপুর।
„	„	শ্রীরামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মনহলি, দিনাজপুর।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিসকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ	১। সুখবোধ ভারত-ইতিহাস
„ রমাপতি কাব্যতীর্থ	২। বঙ্গসাহিত্যাদর্শ
„ জংবাহাদুর সিং	৩। ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতীকার-উপায়
„ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪। রেওয়ার পদ্ধতি
„ রামসহায় কাব্যতীর্থ	৫। মালঞ্চ
„ কেশবচন্দ্র বসু	৬। সান্ত্বনা (৬ খানি)
„ কার্য্যাধ্যক্ষ—সিটীবুক সোসাইটী	৭। কর্ম্মক্ষেত্র
	৮। হিতকথা
	৯। সিদ্ধার্থ
	১০। শ্রীগৌরাঙ্গ
	১১। চৈতন্যদেব
	১২। কেশব চরিত
	১৩। রামতনু লাহিড়ী
	১৪। সীতা
	১৫। চম্‌চম্
	১৬। টমকাকার কুটীর
	১৭। ডন্‌কুইক্‌সট
	১৮। ভীষ্ম
	১৯। ছেলেদের গল্প
	২০। মরুদস্যু
	২১। চিড়িয়াখানা (১ম ভাগ)
	২২। চাঁদমুখ
শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী	২৩। বিল্বদল
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল	২৪। পুষ্পক
„ রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫। একটি ফুল
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬। আদর্শ প্রেম
	২৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম খণ্ড)
„ চুনীলাল বসু এমবি, এফ সি এস্	২৮। শারীর-স্বাস্থ্যবিধান

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer in charge, *Bengal* Seot. Book Depot	29. *Report on the Administration* of Excise Dept. in Bengal for 1912-13.
	30. Report on Inland Emigration for year ending June 1213.
The Superintendent, Govt Printing, India	31. Statistics of British India Pt IV (Finance & Revenue)

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

উপহৃত পুথি	উপহৃত পুথি
৩২। কুণ্ডদ্বয়োৎপত্তিকথা (শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের উৎপত্তি)	৫২। স্মরণ দর্পণ
	৫৩। জ্ঞান-চৌতিশা
৩৩। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (কৃষ্ণদাসের)	৫৪। পাষণ্ড-দলন
৩৪। ঐ —(রামাই পণ্ডিত)	৫৫। মথুরা-মাহাত্ম্য
৩৫। রাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্ব	৫৬। উপাসনা-নির্ণয়
৩৬। *কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (কিয়দংশ)*	৫৭। *রসকল্প-সারতত্ত্ব*
৩৭। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খণ্ডিত)	৫৮। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা
৩৮। নবদ্বীপ-পরিক্রমা (২ খানি)	৫৯। মথুরা-সেতু
৩৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৬০। অষ্টকালের আখ্যান
৪০। স্মরণ-মঙ্গল	৬১। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৪১। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি	৬২। দণ্ডাত্মিকা
৪২। গীতকল্পতরু	৬৩। ভাগবত-সংহিতা-কথা
৪৩। পঞ্চস্বরা-নির্ণয়	৬৪। নৈষধটীকা (দুই অধ্যায়)
৪৪। আশ্রয়-নির্ণয়	৬৫। বংশীবদনকৃত ব্যাখ্যারত্ন
৪৫। নিত্যলীলা	৬৬। কঠোপনিষদ্বৃত্তি (খণ্ডিত)
৪৬। স্মরণ-মঙ্গল (১১৯৪ সাল)	৬৭। শারীরকভাষ্য (খণ্ডিত)
৪৭। ভক্তিরত্নাবলী	৬৮। ষট্চক্রদর্শন (খণ্ডিত)
৪৮। ভগবদ্ভক্তিবিলাস	৬৯। অষ্টাবক্র-সংহিতা (খণ্ডিত)
৪৯। কণিকা	৭০। ক্রমসন্দর্ভ (খণ্ডিত)
৫০। রাধারসকলিকা	৭১। রাসপঞ্চাধ্যায়
৫১। কড়চা	৭২। নৃসিংহ-মন্ত্রকবচ

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

উপহৃত পুথি		উপহৃত পুথি	
৭৩।	রাধানাম-সহস্র (খণ্ডিত)	৯৭।	কৃষ্ণকর্ণামৃত (শেষার্দ্ধ)
৭৪।	রাধাষ্টমীব্রত (বৈষ্ণবীয়)	৯৮।	হরিনামামৃতলহরী নাটক
৭৫।	ব্রতবিধি	৯৯।	ভূপতিনাথ ও চম্পতিনাথের পদ
৭৬।	মুগ্ধবোধটীকা (খণ্ডিত)	১০০।	কল্পসার
৭৭।	রাম তর্কবাগীশের টিপ্পনী	১০১।	কুল্লুক-টীকাসহ মনুসংহিতা
৭৮।	অলঙ্কার-কৌস্তুভ	১০২।	প্রবোধচন্দ্রোদয়
৭৯।	পদ্মপুরাণ (খণ্ডিত)	১০৩।	শ্রীমদ্ভাগবত (১—৮ স্কন্ধ)
৮০।	কাব্যপ্রকাশ	১০৪।	চৈতন্যচরিতামৃত
৮১।	জীবন্মুক্তিবিবেক	১০৫।	চৈতন্য-ভাগবত
৮২।	অমৃতবিন্দূপনিষৎ	১০৬।	সহজরসামৃত
৮৩।	নিরালম্বোপনিষৎ	১০৭।	ভক্তিরস-কলিকা
৮৪।	নারায়ণোপনিষৎ	১০৮।	প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা
৮৫।	ভগবদ্গীতাসার	১০৯।	মনঃশিক্ষা
৮৬।	বেদান্ত-স্যমন্তক	১১০।	বৈষ্ণব-বন্দনা
৮৭।	সটীক পিঙ্গল	১১১।	সুদাম-চরিত্র
৮৮।	প্রমেয়রত্নাবলী	১১২।	বৃন্দাবন-লীলামৃত
৮৯।	জয়দেব (বালবোধিনী টীকা সহ)	১১৩।	দণ্ডাত্মিকা
৯০।	সারনির্ণয়	১১৪।	রাসলীলা
৯১।	হরিনামার্থদীপিকা	১১৫।	কৃষ্ণকর্ণামৃত
৯২।	গীতাবলী	১১৬।	কণা
৯৩।	উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশ	১১৭।	স্মরণ-মঙ্গল
৯৪।	শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা	১১৮।	অষ্টকালের আখ্যান
৯৫।	মাধুর্য্য-কাদম্বিনী (খণ্ডিত)	১১৯।	বৈষ্ণব-বিধান
৯৬।	ব্রহ্মসংহিতাটীকা (খণ্ডিত)	১২০।	কাব্যপ্রকাশাদর্শ (খণ্ডিত)

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ, পি এচডি মহাশয় "গৌতমের ন্যায়দর্শন" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি, আলোচনা এবং প্রাচীন হিন্দুযুগে ও বৌদ্ধযুগে তাহার অবস্থা, অবশেষে নব্য ন্যায়ের উৎপত্তি ও শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করেন। তাঁহার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ভারতীয় ন্যায়দর্শন তিন যুগ অতিক্রম করিয়াছে। প্রথম যুগ খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে খৃষ্ট-

পরিবর্ত্তী ৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ খৃষ্টীয় ৪৫০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৩০০ অব্দ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় যুগ খৃষ্টীয় ১৩০০ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত। প্রথম যুগের স্তায়দর্শনের নাম প্রাচীন স্তায়, দ্বিতীয় যুগের স্তায়দর্শনের নাম মধ্যযুগের স্তায় এবং তৃতীয় যুগের স্তায়দর্শনের নাম নব্য স্তায়। প্রাচীন ও নব্য ন্যায় ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রতিপালিত। মধ্যযুগের স্তায় জৈন ও বৌদ্ধগণের হস্তে সংবর্দ্ধিত। স্তায়শাস্ত্রের ক্রমিক পরিপুষ্টি বুঝিতে হইলে তিন যুগের স্তায়-দর্শনই অধ্যয়ন করা উচিত।

প্রাচীন স্তায়প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গোতম বা গৌতম। ইঁহার অপর নাম অক্ষপাদ; কথিত আছে, ইনি মিথিলাপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভাসক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের শেষ-কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি জাতূকর্ণ্য ব্যাসের সমসাময়িক; সুতরাং যাস্ক ও আসুরায়ণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। স্থূলতঃ বলিতে গেলে মহর্ষি গৌতম খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পালি ত্রিপিটকে গোতম নামক এক সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকের উল্লেখ আছে। তাঁহার শিষ্যগণ "গোতমক" নামে প্রসিদ্ধ, উঁহারা গোতম বুদ্ধের সমকালিক। এতদ্ভিন্ন পালি ত্রিপিটকে তর্ক, তর্কী ও তার্কিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্তায়শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তির কাল অনিশ্চিত হইলেও উহা যে খৃঃ পূঃ ২৫৫ অব্দে মহারাজ অশোকের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। "কথাবৎথুপ্রকরণ" নামক পালিগ্রন্থ মহারাজ অশোকের সময়ে তৃতীয় বোধিসংগমের অধিবেশনে বিরচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে প্রতিজ্ঞা, উপনয়ন, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার আছে। স্থানাঙ্গসূত্র, নন্দীসূত্র, ভগবতীসূত্র প্রভৃতি জৈন সিদ্ধান্তগ্রন্থে স্তায়ের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক প্রমাণ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে এ দেশে তর্কবিদ্যার তাদৃশ আদর ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মনোমত সমাজ গঠন করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতি এই লক্ষ্যের পোষক। হেতুবিদ্যার আশ্রয় লইয়া যাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশবাক্যে সংশয় প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা সমাজের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এমন কি, উপনিষদের তাৎপর্য্যসমূহও ব্রহ্মবিষয়ক নহে, কিন্তু যজ্ঞবিষয়ক, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইত। মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থকত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।" বেদবাক্য ক্রিয়াত্মক, যাহাতে ক্রিয়ার আভাস নাই, এইরূপ বাক্য অনর্থক। অতএব যাঁহারা তর্কবিদ্যার প্রথম অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জনসমাজের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। মহর্ষি কপিল আদি-বিদ্বান্। তাঁহার সাংখ্যদর্শন অবিকৃত-ভাবে আমাদের হস্তে পৌঁছে নাই; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। তদনন্তর মহর্ষি গৌতম। ইনি স্পষ্টতঃ তর্কবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথমতঃ ইঁহার শাস্ত্র সমাজে আদৃত হয় নাই। মহাভারতে লিখিত আছে, যাঁহারা গৌতম-প্রোক্ত তর্কবিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহারা জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হন। অতএব

লিখিত আছে, তর্কশাস্ত্রদগ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট বেদান্ত প্রকাশ করিবে না। যাহা হউক, ন্যায়শাস্ত্রের দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। বেদের তত্ত্বসমূহ ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর উক্ত শাস্ত্র জনসমাজে যথোচিত আদর লাভ করিতে লাগিল।

বৌদ্ধ ও জৈনগণ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। গৌতমের ষোড়শ পদার্থ নিরর্থক, এক প্রমাণ পদার্থ দ্বারাই ন্যায়ের সমস্ত কার্য্য চলিতে পারে, এই বলিয়া বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রমাণশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। আত্মা, পরকাল, মুক্তি ইত্যাদির কথা নানাশাস্ত্রে মুখ্যভাবে আনিবার প্রয়োজন কি? এই বলিয়া তাঁহারা কেবল যুক্তিশাস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি করিলেন। মৈত্রেয়নাথের তর্কবিদ্যা বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। ইনি অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তাহার পূর্ব্বে অবশ্য বৌদ্ধগণ ন্যায়ের চর্চ্চা করিতেন, কিন্তু স্বতন্ত্র ন্যায়গ্রন্থ লেখেন নাই। বাসুবন্ধুর তর্কশাস্ত্রও অতি প্রামাণিক, কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দিঙ্‌নাগ প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রমাণসমুচ্চয় প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাই মধ্য-যুগের ন্যায়ের ভিত্তি। কথিত আছে, যখন প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন মেদিনী কম্পিত হইয়াছিল। আমরা "মধ্যযুগের ন্যায়দর্শন" নামক পুস্তকে শতাধিক বৌদ্ধ ও জৈন নৈয়ায়িকের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ন্যায়শাস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডনের জন্য বহু ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক প্রয়াস করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ-ন্যায়ের মত খণ্ডনের জন্যও বৌদ্ধগণ প্রয়াস করিয়া-ছিলেন। উদয়নের কুসুমাঞ্জলি কল্যাণ রক্ষিতের ঈশ্বর-ভঙ্গ কারিকার প্রত্যুত্তর মাত্র। বৌদ্ধ-গণের পতনের পর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামক একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাই নব্য ন্যায়ের আদি গ্রন্থ। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ ইহারই উপর টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাপকতা সম্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে ন্যায়শাস্ত্র অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজমান।

ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধপাঠের মধ্যে পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে সভাসমিতির নিয়মানুসারে অদ্যকার নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রসিদ্ধ। তিনি ন্যায়দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যন্যায়ের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি। ন্যায়দর্শন আমাদের কেবল তর্কবিদ্যা নহে। তদ্দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশের উপায়ও হইয়া থাকে। গোতম ও গৌতম এক ব্যক্তি নহে। গোতম প্রাচীন ন্যায়ের কর্ত্তা আর গৌতম বুদ্ধদেব।

গোতম ও অক্ষপাদ এক ব্যক্তি। পুরাণে স্থানে স্থানে যে স্তায়নিন্দা দেখা যায়, তাহা বৌদ্ধ-ন্যায়ের নিন্দা—অক্ষপাদ-দর্শনের নহে বলিলেই চলে। বেদবাদকে প্রক্ষিপ্ত কল্পনা না করাও চলে, কারণ, উহা অপ্রাসঙ্গিক নহে এবং অক্ষপাদ-দর্শনের অঙ্গীভূত। ইহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে যোজিত হইয়াছে বলিলে পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মধ্যযুগের ন্যায় অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের ন্যায় এখনকার ন্যায়শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের একেবারে অনালোচিত নাই; উদ্যোতকরের গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ন্যায়ব্যবসায়ীর তাহা একবারে অনালোচিত থাকা সম্ভব নহে; তাহার বিশিষ্ট আলোচনা না হইয়া থাকিলেও, তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বাৎস্যায়নকে চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলা হইয়াছে এবং ন্যায়সূত্রকার খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দের লোক বলা হইয়াছে। এ সকল অনুমান মাত্র। অপর পক্ষেও অনুমান আছে যে, বাৎস্যায়ন, চাণক্য, কৌটিল্য, পক্ষিল স্বামী প্রভৃতি নামগুলি একই ব্যক্তির এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তের সমকালীয়। লঙ্কাবতার-সূত্রের পূর্ব্বেও বৌদ্ধদের ন্যায় ছিল। বুদ্ধমতই বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধমতের কোন কোন সূত্র উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়সূত্রগুলি সব একজনের কি না, সন্দেহ হইতে পারে। হিন্দুদর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা বড় কঠিন, কারণ, বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ, সেই সেই মূলকথাগুলির নিত্যতা অথবা দর্শনকারগণের সর্ব্বজ্ঞতা। আমরা ইহা বিশ্বাস করি। তর্কস্থলে যদি তাহা না বিশ্বাসই করি, তাহা হইলেও বলিতে পারি, প্রতি দর্শনের মূলসূত্রগুলি ঋষিরা শিষ্যমণ্ডলীতে প্রচার করিতেন। সমস্ত মত প্রচারিত হইয়া যাইবার পর ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক সেই সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে। নব্য-ন্যায় নামে নব্য হইলেও তাহাতে সকল সময়ের ন্যায়েরই আলোচনা আছে। ডাঃ বিদ্যাভূষণ বলেন, গঙ্গেশ বৌদ্ধ-মতের কাছে ঋণী, তাহা ঠিক নহে। তিনি বৌদ্ধ মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রভাকর-মতকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনপূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। গঙ্গেশের ঋণ যদি খুঁজিতে হয়, তাহা বৌদ্ধ-ন্যায়ের কাছে নয়, মীমাংসা-দর্শনের কাছে নহে। ন্যায়ের মূলসূত্র ষোড়শ পদার্থ নিরূপণের জন্য নয়। ঋষিশাস্ত্র ওরূপ নহে। উহা বাৎস্যায়ন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বিদ্যা চারি প্রকার;—আন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। শাস্ত্রে গোতমোক্ত বিদ্যার প্রশংসাই আছে, নিন্দা যাহা আছে, তাহা গৌতম-মতের; কারণ, গৌতম-মত বেদাবিরোধী এবং গৌতমপ্রোক্ত বেদবিরোধী।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—আমার প্রথম কথা মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। তিনি এত কথা এত সুন্দর ভাবে সহজে আমাদের জানাইয়াছেন যে, ইহা অল্প পাণ্ডিত্যের কথা নহে। তাঁহার দুই তিনটি কথার প্রতিবাদ উঠিয়াছে। ন্যায় পূর্ব্বে নিন্দিত, এমনটা ঠিক বলা যায় না। ন্যায়শাস্ত্র আমাদের কেবল Logic নহে। Aristotle এর Logic যে ভাবে

সম্পূর্ণ, আমাদের ন্যায়ও সেইরূপ সম্পূর্ণ। এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল তর্ক নহে,—সমস্ত তর্কের বিষয় নির্ব্বিরোধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করা। Plato's Dialogue এবং Sophistদিগের Dialectics হইতে Logic উদ্ভূত হয়। বৌদ্ধ বা জৈনের ন্যায়-বিরুদ্ধবাদী শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা পূর্ব্বে ছিল। ন্যায়সার ও গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির ন্যায় গ্রন্থ আর হয় না। ইহাতে বৌদ্ধাদি মতের অবলম্বন করা না হইয়াছে, এমন নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের ন্যায়শাস্ত্র কেবল Logic নহে, ইহা Logic এবং Philosophy একাধারে। আমার একটা কথা প্রবন্ধ-লেখককে বলিবার আছে,—তিনি আজ আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস মাত্র শুনাইলেন, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় আমরা আজ কিছু শুনিতে পাইলাম না, তাহা যেন তাঁহার অনুগ্রহে আর এক দিন শুনিতে পাই।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ যে প্রসঙ্গের আলোচনা, তাহার এক পক্ষে ইংরাজী-প্রণালী-শিক্ষিত ইংরাজী কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অপর পক্ষে টোলে শিক্ষিত, টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ তাঁহার অধীত প্রণালীতে অল্পক্ষণের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার কাল পর্য্যন্ত এবং চায়না থেকে পেরু পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের ন্যায়ের একটা ইতিহাস শুনাইয়া দিলেন। ব্যাপারটা যেমন বিস্তৃত, তাঁহার প্রবেশও তেমনি গভীর। একাধারে এত বড় একটা বিষয়ের এতগুলি কল্পনা করিতে আমিও পারি না। আমিও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আর তাহা কেবল ভদ্রোচিত সৌজন্যের জন্য নহে, অন্তরের সহেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছি। আজকার প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপতঃ ন্যায়ের প্রত্নতত্ত্ব। সম্প্রতি Hindu Logic in Japan বাহির হইয়াছে। জাপানে আমাদেরই ন্যায়শাস্ত্র গিয়াছে। হিয়োনসাঙের সঙ্গে উহা চীন হইয়া জাপানে গিয়াছে। এখন সেখানে কলেজে ইংরেজি Logic পড়া হয় এবং বিহারে প্রাচীন প্রথার ন্যায় পড়া হয়। কলেজের ছাত্র ও ভিক্ষুদের বিচারে বেশ প্রতিযোগিতা দেখা যায় এবং বড় আনন্দও হয়। সেখানে Aristotleএরও আদর হইয়াছে, দিঙ্‌নাগও বজায় আছে, আর দুইকে বজায় করিবার জন্য ছাত্র ও ভিক্ষুর ন্যায়-দ্বন্দ্বও আছে। প্রথমতঃ ন্যায়গ্রন্থের কথা ধরা হউক। হিন্দুর সকল শাস্ত্রের ন্যায় ইহারও আরম্ভ কলারম্ভ হইতে। সে ন্যায় এখনকার ন্যায় নহে। সে ন্যায়ে আটটা প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব উহার মধ্যে "ঐতিহ্য" প্রমাণটিকে ছাড়িয়া দিয়া সাতটি প্রমাণ রাখিলেন। নাগার্জ্জুন আবার তাহা হইতেও তিনটা বাদ দিয়া চারিটা প্রমাণ রাখিলেন। মৈত্রেয় তাহা হইতেও একটা এবং দিঙ্‌নাগ আরও একটা ত্যাগ করিয়া মাত্র "অনুমান ও প্রত্যক্ষ" এই দুইটি মাত্র রাখিলেন। দিঙ্‌নাগ কি যুক্তিতে কি করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে তাঁহার লিখিত তিব্বতী ভাষার গ্রন্থখানি সংস্কৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাঁহার তিব্বতী পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ডাঃ সতীশ তাহাকে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। ইহা হইলে প্রাচীন

ন্যায়ের অবস্থাটা বুঝিবার কতকটা উপায় হয়। মৈত্রেয়নাথের সময় ঠিক করা যায় না। টেঙ্গুর-তালিকায় মৈত্রেয়ের ৮।৯ খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি দেখিয়া কিছু করা যায় কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক। অভিধর্ম্মসময়ালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩০০ কারিকা আছে, তন্মধ্যে নূতন কারিকাও আছে। প্রজ্ঞাপারমিতা ৮।১০ সহস্র শ্লোকের ছিল। ঐ গ্রন্থানুসারে উহা ২৫ সহস্র শ্লোকপরিমিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় পণ্ডিত কুমার-জীব ২৬৯।৩১৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তর্জ্জমা করেন ; সুতরাং মৈত্রেয়কে অন্ততঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে আর তাহা হইলে তিনি নাগার্জ্জুনের কিছু পরবর্ত্তীই হন। গঙ্গেশ আমার মতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, কারণ, বক্তিয়ার বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংস করেন। ঐ সময়ে জগদ্দল বিহার, ওদন্তপুরী ও সারনাথ যায়। এসিয়াটিক সোসা-ইটিতে গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমানের রচিত একখানি (প্রচণ্ডপাষণ্ডদলন্তীর্থী) পুথি আছে। তাহার ১১৯ পাতা এক হাতের লেখা, বাকী অপর হাতের লেখা। প্রথমাংশের লেখার অক্ষর প্রাচীন এবং পত্রাঙ্ক বর্ণাক্ষরে দেওয়া। এই প্রথাও প্রাচীন এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বের প্রথা। উহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৪০৭-৫০=১৩৫৭ খৃষ্টাব্দ এই সময় ত্যাগ করিতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন এ দেশে একটা চিরপ্রবাদ আছে যে, গঙ্গেশ ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়া-ছেন। কাজেই গঙ্গেশের সময় যে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ, তাহা ভুলিয়া যাইতেই হইবে। যতীন্দ্র বাবু যে বলিয়াছেন,—মধ্যযুগে বাঙ্গালী ত্রিলোচন "ন্যায়ভূষণ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কণাদের টীকায় এই ন্যায়ভূষণ হইতে পূর্ব্বপক্ষ লওয়া হইয়াছে। চাণক্য, বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য, পক্ষিল স্বামী যে সব এক, তাহা নহে। বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য দুইটি স্বতন্ত্র গোত্রের নাম—গোত্র-প্রবরমঞ্জরীতে আছে। আন্ধ্‌রাজবংশের ত্রয়োদশ রাজা কুন্তল সাতবাহনের নাম বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে আছে। উহা খৃষ্টের ১০০ বৎসর পরের কথা আর কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে ৩২৪ খৃষ্টাব্দের কথা। অতএব দুই জন এক সময়ের নহে। গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র Logicও নয়, তর্কশাস্ত্রও নহে ; উহা তর্কের নীতিশাস্ত্র ; উহার নিগ্রহস্থান দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। বেদের সময় পরিষৎ ছিল, সেই পরিষদে গ্রামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া সমস্ত বিবাদ-বিতর্কের মধ্যস্থতা করিয়া মীমাংসা করিতেন, শাস্ত্র-বিধির অনুবাদ করিতেন। এ অনু-বাদ Translation নয়। আধুনিক গ্রন্থ নীলকণ্ঠের পুথিতেও এ সকল কথা কথা আছে।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ বিদ্যাভূষণ, সমালোচক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং সভাপতি মহাশয়কে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের মৃত সদস্য ৺প্রিয়নাথ মিত্র বিএ, ৺কালীমোহন রায় চৌধুরী এবং ৺ পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া ৺শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন,—তিনি "বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার

পিতার নাম ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং পিতামহের নাম ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি। ইহাঁরা ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গোত্রের অলঙ্কার ছিলেন। হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় টোলে শিক্ষালাভ করিয়া লাহোর Oriental Collegeএর ২য় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। পিতার আদেশে তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে আসেন। এখানেও তাঁহার বেতন ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাঁহার পাঠনা-প্রণালী সুন্দর ছিল। আমি অধ্যক্ষ ছিলাম, তাঁহার কার্য্য-প্রণালীতে মুগ্ধ হইতাম। সাধুতা, নম্রতা, চরিত্রবল তাঁহার অসাধারণ ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গবাসীর প্রকাশিত স্মৃতিগুলি তিনিই অনুবাদ করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর ৪৫০০ পুথির তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি চারিটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে পণ্ডিত-সমাজ অতিমাত্র শোক-কাতর হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সেবকের মরণে সাহিত্য-পরিষৎ আজ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ৮টি এবং (খ) পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ১টি প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "শারদা-লিপি ও ডোগরা বর্ণমালা", (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" (গ) মুন্সী আবদুলকরিম মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির বিবরণ"। ৬। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের ও পুথিশালার কার্য্য-বিবরণ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" যোগেশচন্দ্র রায় এমএ
" বাণীনাথ নন্দী
" সরলকুমার বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" গিরিশচন্দ্র সরকার
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল্
" পুলিনবিহারী দত্ত
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার
" বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত
" কৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত
" শচীন্দ্রকিশোর রায়
" বাহাদুর সিং সিংহী
" অমৃতগোপাল বসু
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" কৃষ্ণনাথ সেন
" শ্যামলাল গোস্বামী
" সতীশচন্দ্র দত্ত
" তারকনাথ বিশ্বাস
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" বসন্তরঞ্জন রায়
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" ভোলানাথ কোঁচ
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্‌এ, বি এল (সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
" দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী

} সহকারী সম্পাদকগণ

এতদ্ব্যতীত শিরোহীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা, ঐতিহাসিক ও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আপ্পারাও, তেলেগু ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত জি, বি, রামমূর্ত্তি এবং তেলেগু কবি শ্রীযুক্ত নারায়ণমূর্ত্তি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় ইঁহাদের সহিত পরিষদের সদস্যগণের পরিচয় করিয়া দিলেন।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক ৬।১।১ নেবুতলা লেন।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সিঞ্চাইল, হরিপুর, পাবনা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। ১০ হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার Supdt. Kaligram National School কলিগ্রাম, মালদহ।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা ৪।১।৭ কেনাল ওয়েষ্ট রোড, উল্টাডিঙ্গী।
"	"	শ্রীকেশবলাল বসু সহকারী সম্পাদক—"সঞ্জীবনী", ৬ কলেজ স্কোয়ার।
শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীশিবকৃষ্ণ দে ১৫১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীবেণীমাধব চাকী গবর্মেণ্ট প্লীডার, বগুড়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীরায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পঃ।
"	"	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজ।
"	"	রাজা শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী এম্ এ, বি এল, শ্রীরামপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী ৮৩।১ গ্রে ষ্ট্রীট।
”	”	অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০।১ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন।
”	”	শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত ১৩ প্যারীদাসের লেন।
”	”	পণ্ডিত শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজ।
”	”	শ্রীরায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর নড়াইল হাউস, কাশীপুর।
”	”	রায় সাহেব শ্রীতারকনাথ সাধু ৯ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
”	”	মাননীয় রাজা শ্রীহৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
”	”	কবিরাজ শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন ১।১ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীদীননাথ বসু, বি এল উকীল, শিয়ালদহ।
”	”	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ সংস্কৃত কলেজ।
”	”	শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক ৪১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
”	”	মৌলবী বিলায়ত হোসেন ৪ হিয়াত খাঁর লেন।
”	”	শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর ২২ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
”	”	শ্রীশরৎকুমার মিত্র, বি এল ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম্ এ ৬৫ হ্যারিসন রোড।
”	”	কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ, ৩১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
„	„	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুর "দীনধাম", মদন মিত্রের লেন।
„	„	শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় জমিদার, সাধুহাটী, যশোহর
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ রায় Hospital Agent, Lucknow Cantonment ১৮এ অঘোর ভট্টাচার্য্যের লেন, সোনারপুরা, বারাণসী।
শ্রীবাহাদুর সিংহ সিংহী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅমরচন্দ্র বোথরা (আজিমগঞ্জ) ৩৯ আরমানিয়ান ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ ৯২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীদেবকণ্ঠ বাক্‌চী ৯।২ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	„	শ্রীবনবিহারী পালিত উকীল, কটক।
„	„	শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীভূতনাথ কোলে ১৭১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীকালীকৃষ্ণ সেন বি এল, উকীল, ১৩৭।৯ বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা।
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন ৪ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিসকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। গীতালহরী
„ শিবচন্দ্র শীল	২। গৌড়ে সুবর্ণবণিক্

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত বিভূচরণ বটব্যাল	৩। সারস্বতপট (সন্ধিশিক্ষা-বিষয়ক)
„ মথুরানাথ চৌধুরী	৪। ব্রহ্মচর্য্য
„ দেবকণ্ঠ বাগচী	৫। খেয়াল্
„ সুশীলগোপাল বসু	৬। সুহৃদ্
	৭। শেল
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	৮। কুমারসম্ভব কাব্য
	৯। অনন্তরাম ধরবংশের কুলজী-পত্র
	১০। বসুক—(১ম ভাগ)
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	১১। অভিধান-প্রদীপিকা (পালি শব্দকোষ)
ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস—এলাহাবাদ	১২। সচিত্র মেঘনাদ-বধ
	১৩। শুদ্ধি
শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্	১৪। "সাহিত্য"—৩য় বর্ষ হইতে ১৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৫। "নব্যভারত"—১২শ বর্ষ হইতে ২৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৬। "ভারতী"—৮ম বর্ষ হইতে ১৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৭। "তমোলুক পত্রিকা"—১ম ও ২য় বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৮। "বঙ্গদর্শন"—১ম হইতে ৩য় বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৯। "নবজীবন"—১ম হইতে ৪র্থ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	২০। "জ্ঞানাঙ্কুর"—২য় হইতে ৪র্থ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	২১। "আর্য্যদর্শন"—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	২২। "মধ্যস্থ"—৩য় ও ৪র্থ ভাগ।
	২৩। "সাধনা"—৩য় ও ৪র্থ ভাগ।
	২৪। "বান্ধব"—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ।

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্	২৫	"রহস্য-সন্দর্ভ"—১ম হইতে ৭ম পর্ব্ব
	২৬।	"বসন্তক"—২য় হইতে ৭ম পর্ব্ব।
	২৭।	"হরবোলা—ভাঁড়" ১ম হইতে ৭ম পর্ব্ব।
	২৮।	বিবিধার্থ-সংগ্রহ—১ম, ২য়, ৩য় পর্ব্ব।
	২৯।	তত্ত্ববোধিনী—১৭৭০—৭২ শক।
	৩০।	ঐ ১৭৮২ শক হইতে ১৮১২ শক পর্য্যন্ত।
	৩১।	ঐ ১৮১৬।১৭ শক পর্য্যন্ত।
	৩২।	ছহি বড় সাহানামা
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়	৩৩।	জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত
" শ্যামাচরণ পাল	৩৪।	অভিধানচিন্তামণিঃ
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৫।	সিদ্ধার্থ-চরিত
" পুলিনবিহারী দত্ত	৩৬।	The Dhammapada.
Asiatic Society of Bengal	৩৭।	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. V. No. I.
Officer in charge Bengal Sett. Book Depot.	৩৮।	Annual Report of the Archaeological Survey of India Eastern Circle 1912-13

উপহারদাতৃগণের মধ্যে সীরাটের উকীল ও পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু এম এ, বি এল মহাশয় এবং "সময়"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম এ, বি এল মহাশয় বহু পুরাতন মাসিক পত্রের বিশৃঙ্খল সংখ্যাগুলি দান করার জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। এইজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

তৎপরে পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরিষদের পরমহিতৈষী মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত নিম্নলিখিত সম্রাট্‌গণের ৮টি স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ;—

(১) মহম্মদ তোগলক (দেবগিরি টাঁকসাল) হিঃ ৭২৮
(২) ফিরোজ তোগলক এবং তাঁহার পুত্র জাফর খাঁ।
(৩) গিয়াসুদ্দিন বলবন
(৪) গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ
(৫) জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজী (দিল্লী টাঁকসাল) হিঃ ৬৯১
(৬) ফিরোজ তোগলক
(৭) আলাউদ্দিন মহম্মদ খিলজী এবং
(৮) আকবর হিঃ ৯৮৫

তৎপরে নগেন্দ্র বাবু পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধুর প্রদত্ত একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন যে, এই মুদ্রাটি বিশেষ মূল্যবান্। গুপ্তসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এই স্বর্ণমুদ্রাটি পাওয়ায় পরিষদের চিত্রশালার গৌরব বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইল। মুদ্রাটি বর্দ্ধমান জেলার মেমুড় গ্রামের নিকট কশাগ্রামে ভূমিকর্ষণকালে একজন কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ সামন্ত ইহা পরিষদের জন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধু উহা খরিদ করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। যে অঞ্চলে মুদ্রাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বর্ণিত "শূরনগরে"র নিকটবর্ত্তী। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে উক্ত "শূরনগর" বঙ্গের শূররাজগণের রাজধানী ছিল। যদিও এ বিষয়ে অনেকের মতদ্বৈধ আছে, তথাপি এই স্থান হইতেই উক্ত মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বোধ হয়, সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "সারদা লিপি ও ডোগরা বর্ণমালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কাশ্মীরের সারদা লিপি সম্বন্ধে অনেকেই জানিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, "ডোগরা বর্ণমালা" সম্বন্ধে দুর্গানারায়ণ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। অন্ততঃ বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ এবং আমি এ সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, দুর্গানারায়ণ বাবু একটি নূতন বিষয় লিখিয়া আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন, এ জন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং মুন্সী আবদুল করিম মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। অতঃপর পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের এবং প্রাচীন পুথি-বিভাগের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থ-প্রকাশের কার্য্য-বিবরণ।

১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্য সুন্দররূপে অগ্রসর হইয়াছে।

১। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক গত জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত বৎসরের (১৯শ বৎসরের)

চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া দিয়াই আবার আষাঢ় মাসমধ্যেই বর্ত্তমান বৎসরের ১ম সংখ্যার প্রকাশ-কার্য্য শেষ করিয়াছেন এবং গত শারদীয়া পূজার মধ্যেই দ্বিতীয় সংখ্যাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই সংখ্যা পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদস্যগণ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই সংখ্যায় পরিষদের উদ্দেশ্যসূচক প্রায় সকল শ্রেণীর প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় "প্রাচীন বৈদ্যক পুথির বিবরণ" একটি বিশেষত্বপূর্ণ নূতন ধরণের ব্যাপার।

২। পত্রিকার উক্ত দ্বিতীয় সংখ্যার সঙ্গে বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসের বিশেষ অধিবেশনের (৺দ্বিজেন্দ্রলাল-স্মৃতিসভার) কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

৩। শ্রীভাষা—গত কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার ২২ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ—গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম খণ্ডের ন্যায় আরও ৩৩ ফর্ম্মায় ২য় খণ্ডে ত-বর্গ শেষ হইয়াছে। তৎপরে তৃতীয় খণ্ডের ছাপা চলিতেছে।

৫। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম আরও বহুসংখ্যক প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেগুলি প্রকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই মাসেই উহার মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির নাম-নিঘণ্টু সংকলন করিতেছেন। ইহাতে এ কাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত অমুদ্রিত বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থের নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিপাদ্য বিষয় ও অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। কোথায় কিরূপে এই সকল গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও উল্লেখ ঐ তালিকায় থাকিবে।

৬। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের দানে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশার্থ সাধারণ-বোধ্য প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

(খ) পুথিশালার বিবরণ।

বিগত ছয় মাসে ২৭০ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উপহার-প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা ১২৯, ক্রীত পুথি ১৭ এবং পরিষদের ব্যয়ে সংগৃহীত ৬৫। উপহারপ্রাপ্ত পুথির মধ্যে একা শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই ৯০ খানি দান করিয়াছেন।

পূজার অবসরের পর বসন্ত বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কয়েকখানি প্রাচীন পুথির সন্ধান করিয়া আসিয়াছেন এবং কয়েকখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পুথিশালার কার্য্য যথারীতি চলিতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির নিঘণ্টু দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়;—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের কার্য্য-বিবরণ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ;—শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের "দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ,—শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত,—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত
শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরী
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" চিত্তসুখ সান্যাল
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" শ্যামলাল গোস্বামী
" গৌরহরি সেন
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমেন্দ্রনাথ বক্সী
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ সেন
" রসিকচন্দ্র চৌধুরী
" তারকনাথ বিশ্বাস
" শিশিরকুমার মৈত্র
" মণিমোহন বসু
" কালিদাস বাগ্‌চি
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
" অরুণচন্দ্র সিংহ
" যামিনীনাথ সিংহ
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অতঃপর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের রিপোর্ট পঠিত হইল [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅনাথবন্ধু কর্ম্মকার শান্তিধাম, বনগ্রাম, যশোহর।
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বড়বেলুন, বর্দ্ধমান।
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০।৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় পি এচ ডি, ১ লাভলক ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	রায় সাহেব শ্রীগিরিশচন্দ্র বাগচী পুলিস হাঁসপাতাল, ১১৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৫৪ কাঁসারীপাড়া রোড।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীকমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৩৪ সুরি লেন।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার উকীল, নাটোর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার বাণীপ্রেস, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, পাবনা।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, পাবনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় বি এ কাদোয়া, সাতবাড়িয়া, পাবনা।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ হেড্ মাষ্টার—শম্ভুনাথ এচ্ ই স্কুল, চাটমোহর, পাবনা।
"	"	শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মোক্তার, পাবনা।
"	"	শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, বি এস সি ১৯ বৈঠকখানা রোড।
"	"	শ্রীবিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল্ উকীল, জজকোর্ট, পাবনা।
"	"	শ্রীউমাপ্রসন্ন মৈত্র এম্ এ হরিপুর, পাবনা।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ শ্রীহীরালাল বসু এম্ ডি ক্রীক লেন।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমলাল দত্ত ৩৪ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীমাজিবর রহমন ৪ ইলিয়ট্ লেন।
"	"	রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ৬৮ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরিনারায়ণ রায় চৌধুরী সরস্বতী, বি এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। ৫৯ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এল্ সি, পি এস্, বিদ্যাসাগর বাটী, ২৫।২৬ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র		শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ৪ নীলমণি সরকারের লেন।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদেবদাস করণ সম্পাদক,—"মেদিনী-বান্ধব," কোতবাজার, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রমথনাথ খান	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ নাগ সম্পাদক,—"মেদিনীপুর-হিতৈষী," বক্সিবাজার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীশরৎকুমার রায় মুগুলিক্যা, নেড়াদোল, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায় জমিদার, জাড়া, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যগোপাল সিকদার উকীল, গড়বেতা, মেদিনীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য বি এ ১৭।৩ বৈঠকখানা দ্বিতীয় লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল্ ১৫ সাঁকারীটোলা লেন।
"	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা।
"	"	শ্রীদামোদর পাত্রেক দেওয়ান, নরসিংপুর ষ্টেট, গরজাট, উড়িষ্যা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক,—"বীণাপাণি লাইব্রেরী", গণপুর, বীরভূম।
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা c/o শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, বারগণ্ডা, গিরিডি।
শ্রীআবদুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমোহিনীমোহন দাস ম্যানেজার,—কোহিনুর প্রেস, চট্টগ্রাম।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বনগ্রাম, যশোহর।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় বেহালা, ২৪ পঃ।
"	"	রাজা শ্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৬।১ আলিপুর রোড।
"	"	শ্রীশৈলপতি চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ২৬।১৬ অখিল মিস্ত্রির লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীক্ষেত্রনাথ সিংহ ২।১ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীরসিকলাল রায় Asst. Master, Sanskrit Collegiate School কলিকাতা।
ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বক্‌সি	,,	শ্রীঅখিলরঞ্জন মজুমদার এম্ ডি Senior House Surgeon Isolation Hospital Cottage No 4. মেডিকেল কলেজ।
,,	,,	শ্রীযামিনীনাথ ঘোষ এম্ বি, House Surgeon, Isolation Hospital Cottage No. 4. মেডিকেল কলেজ।
,,	,,	শ্রীনলিনাক্ষ লাহিড়ী এম্ বি, ঐ

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বসু	১। আর্য্যনারী
শ্রীল মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর	২। মানস-লীলা
	৩। ত্রি-চিত্র
	৪। বিজয়-গীতিকা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন	৫। বগুড়ার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর	৬। পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ
,, দেবকুমার রায় চৌধুরী	৭। সেবা
,, অনাথনাথ পাল	৮। চৈতন্যদেব
,, জং বাহাদুর সিংহ	৯। অপ্রিয় প্রশ্নাবলী
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ,	১০। স্বভাব-চিত্র
,, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১১। দেবীযুদ্ধ, মঙ্গল-চণ্ডীব্রত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি একত্র
,, ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	১২। মা না মহাশক্তি
"ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী"	১৩। ছায়া-দর্শন
(সংগ্রাহক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)	১৪। জানকীর অগ্নিপরীক্ষা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	১৫। প্রবোধ-লহরী
(সংগ্রাহক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)	১৬। নিশীথ-চিন্তা
	১৭। তুষানল
	১৮। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম
	১৯। নিত্যানন্দ-চরিত
	২০। হিমালয়-ভ্রমণ
	২১। সংস্কৃত নাটকীয় কথা
	২২। নবীনা জননী
	২৩। কর্ম্মফল
	২৪। অবলা-বান্ধব
	২৫। বায়োকেমিক চিকিৎসা-দর্পণ
	২৬। উচ্ছ্বাস
	২৭। প্রতাপ সিংহ
	২৮। ধম্মপদ
	২৯। ভীষ্ম
	৩০। জড় ভরত
	৩১। গিরি-কাহিনী
	৩২। আহোম-সতী
	৩৩। মেঘনাদ-বধ কাব্য (২য়, ৪র্থ ও ৯ম সর্গ)
	৩৪। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ
	৩৫। ছেলে-খেলা
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্	৩৬। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়-পত্র
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৩৭। ধর্ম্ম-পরিচয়
	৩৮। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (অন্ত্যলীলা)
	৩৯। শ্রীনাম-মহিমা
	৪০। একখানি চিত্র (ফটো, রসরাজ মহাভাব)
„ উপেন্দ্রনাথ দত্ত	৪১। জৈনধর্ম্ম
„ জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৪২। স্তুতিপঞ্চকং
„ কিরণগোপাল সিংহ	৪৩। মূর্চ্ছনা
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ	৪৪। কঠোপনিষৎ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	45. Centenary Report of the Indian Museum (1814-1914)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	46. Preliminary Report of the operation in search Mss. of Bardic Chronicles,
পুলিনবিহারী দত্ত	47. The British Poets Vols II. IV.
	48. Duties of man Vol. II
	49. Minna's Holiday.
	50. Labourious days.
	51. Plays of William Shakspeare—Richard III, Henry VIII, Cariolanus, Winter's Tale.
	52. History of England Vol. II.
	53. Keightley's History of Greece.
	54. Do Do of Rome.
	55. Rawlinson's Elementary stoics.
	56. Euclid's Elements of Geometry
	57. Lost in Egypt.
	58. Ten Thousand a year Vol. I.
	59. Macaulay
	60. Xenophon (Grant)
	61. *Herodotus*
	62. Poems by Sir Walter Scott.
	63. A Book of Worthies.
	64. Essays & Treatises on Several subjects Vol. III.
	65. Letters of Charles Lamb.
	66. Keightley's History of India.
	67. Charles Lorraine.
	68. Crieghton's History of Rome.
	69. Young man's own book.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	70. Advice to the Tans or practical Helps (Incomplete).
Officer in charge Bengal Sect. Book Depot.	71. Report on the Land Revenue Administration of Bengal 1912-13.
	72. Report on Wards, Attached & Trust Estates in Bengal for 1912.
	73. Report on the working of the Co-oparative societies of Bengal for 1912.
	74. Report of Agricultural Dept. Bengal for 1913.
Superintendent Govt. Printing, India	75. Report of the Board of Scientific Advice for India 1912-13.
	76. Statistics of British India Part IV. (b) for 1911-12.
চৈতন্য-লাইব্রেরীর সম্পাদক	77. Triennial Report of the Chaitanya Library.
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	78. The Kayastha Prabhus of Bombay, Baroda, Central India & Central Provinces.
প্রমথনাথ বসু (রাঁচী)	79. Epochs of Civilization.
Superintendent Govt. Press Madras	80. A triennial Catalogue of Mss. for Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol I. Part I. Sans. A. B. C.
The Registrar University of Calcutta.	81. University Calendar for 1913, Part II.
The Director Geological. Survey of India	82. Memoirs of the Geological Survey of India Vol. XLIII. part I.

প্রথমে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ প্রস্তাব উত্থাপন-কালে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন এবং পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। "বসুমতী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শরৎকুমারপ্রসঙ্গে বলিলেন,— সংসারে অনেক লোক জন্মিয়া থাকেন, যাঁহারা দেশের কাজ করেন, তাঁহাদের জন্যই শোক প্রকাশ করা হয়। শরৎকুমার প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে উন্নতির আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। তিনি নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-প্রকাশ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিয়াছেন। যে গ্রন্থে সমাজের লাভ হইবে, তাহাই প্রকাশ করিতেন। সমাজের অপকারী অথচ লাভজনক গ্রন্থ তিনি ছাপিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় সরল ও নির্ম্মলচরিত্রবিশিষ্ট ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—তিনি কৃষ্ণনগরের লোক, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার সাধুতা বিশেষ প্রশংসনীয়, তিনি ব্রাহ্ম হইলেও প্রাচীন শাস্ত্র ও অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্র বাবু শরৎকুমারের গুণগাম বর্ণনকালে বলিলেন,—শরৎকুমার আমার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বলা রুচিকর নয়। মৃত রজনীকান্ত সেন যখন পীড়িত ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট, তখন লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে তাঁহার পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইত; আমরাও তাঁহার শেষ কবিতাগুলি ছাপা দেখিতে পাইতাম না। বাঙ্গালা সাহিত্যের সাহায্যকল্পে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পরিষদ্‌গৃহে তিনি বহু বার আসিয়াছেন। তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন,—শরৎ বাবু আমাকে আপনার মত দেখিতেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমিই করি। আমি তাঁহাকে এখানে টেনে এনেছিলাম, তিনি স্বভাবতঃ বিনীত ছিলেন, নিজে হ'তে অগ্রসর হ'য়ে সভা-সমিতিতে আসিতে চান না; "আমি বাঙ্গালা ভাষার কোন উপযুক্ত বই প্রকাশ করি নাই" ইত্যাদি বলিয়া আপত্তি করেন। যাহা হউক, পরিষদের সদস্য হওয়ার অল্প দিন পরেই তাঁহার পিতার ছবি আনিয়া পরিষদের জন্য উপহার দেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পরে একটি বড় তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি একটি যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা এইবার আপনাদিগকে বলিব। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকতা করিতেছেন, তাহা লাহিড়ী মহাশয়েরই দানের ফল। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমার অসুখের সময় তিনি প্রায় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসিতেন এবং একদিন হারমোনিয়ম নিয়ে তাঁহার মেয়েদের গানও শুনিয়ে দিয়ে যান।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শরৎকুমারের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত কিশোর চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত "দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্য-বিবরণ

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—গত মাঘ মাসে বিংশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকা বাহির হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্থ সংখ্যার মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে। ইহার চতুর্থ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ফর্ম্মার প্রুফ দেখা হইতেছে।

২। শ্রীভাষ্য,—ইহার আরও ছয় ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালা শব্দকোষ,—গত অগ্রহায়ণ মাসে ৬৬ ফর্ম্মায় ২য় খণ্ড প্রকাশের পর অদ্য পর্য্যন্ত ইহার আরও ১৭ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৪। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা,—ইহার ৪৭ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ৫০ পল্লবে ইহার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

৫। দুর্গামঙ্গল,—ইহার ১৭ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে ইহাও প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী,—ইহার ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৭। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ,—ইহার ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

৮। মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা,—ইহার মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এক হইতে ৩ ফর্ম্মার প্রুফ দেখা চলিতেছে।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷০টা

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ, এফ সি এস মহাশয়ের "কৃত্তিবাসের জন্মশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। দিল্লীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-প্রতিষ্ঠার সংবাদ। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত এল এম্ এস্
" বাণীনাথ নন্দী
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস সি
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" হরগোবিন্দ লাহা চৌধুরী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" রাধাগোবিন্দ গোস্বামী
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" কালিদাস বাক্‌চি
" যতীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা
" সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
" আশুতোষ মিত্র
" মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ
" কৃষ্ণকিশোর দাস বি এ
" অনন্তকুমার দাশগুপ্ত
" যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
" অরুণচন্দ্র সিংহ
" পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল
" বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" রামকমল সিংহ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ }

সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	"	শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত জমিদার, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র নায়েববাড়ী, বৈদ্য বেলঘরিয়া, রাজসাহী।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীননীগোপাল রায় কণ্ট্রাক্টর, পাবনা।
"	"	শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী এম্ এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীসীতানাথ অধিকারী এম্ এ, বি এল্ উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ রায়চৌধুরী এম এ, বি এল উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীহেমন্তকুমার রায়চৌধুরী এম্ এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীজগদীশনাথ রায়চৌধুরী এম এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীদুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী এম্ এ, বি এল, কবিকিরীটী, উকীল, পাবনা।
"	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র সান্যাল এম্ এ, বি এল উকীল, পাবনা।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীশরৎকুমার বরাট এম্ এ, এল এম্ এস, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীনন্দগোপাল দত্ত মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীকালীচরণ মিত্র ৪৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বি এ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর ৩০ তারক চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন।
"	"	শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ভাইস্ চেয়ারম্যান, কলিকাতা কর্পোরেশন।
শ্রীকালিদাস দত্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীগোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীদুর্গাসুন্দর রায় এম্ এ, বি এল পাবনা।
"	"	শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু বি এল্ পাবনা।
"	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	অধ্যাপক শ্রীভূপতিনাথ দাস বি-এস-সি, ঢাকা।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্‌এ, বিএল	১। নববর্ণ-পরিচয়
" কিশোরীমোহন রায়	২। কর্ম্মফল
" ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী	৩। রোগমুদ্গারং
	৪। মেঘদৌত্যম্
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	৫। ৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ
	৬। দেবগণের অভিনব ভারতদর্শন
" পান্নালাল জৈন মন্ত্রী	৭। জৈনগ্রন্থমালায়াঃ তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকং
	৮। সময়-প্রাভৃতং

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডাঃ গণনাথ সেন এম্ এ, এল এম্ এস্	৯। প্রত্যক্ষ-শারীরং (১ম ভাগ)
হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	১০। ভারত-বাণী
দীননাথ বসু বি এল্	১১। ব্যবস্থা-সংগ্রহ (১ম ভাগ)
	১২। ঐ (২য় ভাগ)
	১৩। বঙ্গদেশীয় খাজনার আইন
	১৪। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য
Superintendent, Govt. Printing India	15. Annual Report of Archæological Servey of India for 1911—12.

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার রচিত "কৃত্তিবাসের জন্মশক" প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—স ও ক্ষ আরবী ভাষায় আছে,—ষ, খ ও ক্ষ বাঙ্গালা পুথির সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দুস্থানীরা 'ভাষা' স্থানে 'ভাখা' বলেন এবং লেখেন। দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা তিনটি শ-কার ও দুটি ন-কারের উচ্চারণ-পার্থক্য ঠিক রাখিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কিছু মীমাংসা করা আবশ্যক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চারণ সম্বন্ধে যে কথা তুলিয়াছেন, তাহার সহিত প্রবন্ধের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে কথাটা যখন তুলিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আমার মতামত বলিতেছি। আমরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ একই রকমে উচ্চারণ করি। আমার মতে ইহাই ঠিক। ঋষিরা ঠিক কি রকম উচ্চারণ করিতেন, তাহা যখন কেহই ঠিক বলিতে পারেন না, তখন আমরা কি পশ্চিমের উচ্চারণ, কি দক্ষিণের উচ্চারণ, কিছুই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "ঋকারের" উচ্চারণ লইয়া উভয় প্রদেশের পার্থক্য অনুধাবন করিলেই সকলে বুঝিবেন। পশ্চিমে ঋ-কার রি-বৎ এবং দক্ষিণে রু-বৎ উচ্চারিত হয়, ৯-কারের উচ্চারণও ঐরূপে লি-বৎ ও লু-বৎ হয়। এরূপ স্থলে আমাদের বাঙ্গালা উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা কি? তৎপরে প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে,—কৃত্তিবাসের জন্মশকের গণনা যোগেশ বাবু যাহা করিয়াছেন, আমার তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১২০৫ সাল হইতে ১৪১৭ পর্য্যন্ত সারা বঙ্গদেশে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত গ্রন্থ লেখাও হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালাই বলুন, আর সংস্কৃতই বলুন, ধ্রুবানন্দের মিশ্রগ্রন্থ ব্যতীত আর গ্রন্থই দেখিতে পাই নাই। পুথি-সংগ্রহের কাজ বহুকাল যাবৎ করিয়া আমি এই অবস্থা জানিতে পারিয়াছি। তাহার পর যেই গণেশ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইলেন, অমনি বঙ্গদেশে সাহিত্য-

চর্চ্চা পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল, চারিদিকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার তাড়া পড়িয়া গেল। গণেশ রাজা হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠানরাজ নামে মাত্র রাজা থাকিলেও গণেশ নিজে সিংহাসনে বসিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। ১৩৯৮ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকর অধ্যর্য্যুর পুত্র শ্রীনাথ স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালীর লেখা স্মৃতিগ্রন্থের এইখানিই প্রথম। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতি অমরকোষের টীকা রচনা করেন। ইনি মহিন্তাবংশীয় (মহিন্ত্যাবংশের কলিকাতাবাসী এক শাখার উপাধি "মতিলাল") শ্রোত্রিয় ছিলেন। ইহাঁর উপাধি রায়-মুকুট।

নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্মের ১০।২০ বৎসর আগে সংস্কৃতচর্চ্চার বড় বেশী আগ্রহ হয়। ফুলে হইতে কৃত্তিবাস বড়গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মা পার হইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন, ইহা খুব ঠিক কথা; কারণ, তখন সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাটা গৌড়েই বেশী হইত। গৌড় অর্থে গৌড় নগর নহে, গৌড়মণ্ডল অর্থাৎ পদ্মার উত্তর পাড়ে সর্ব্বত্র। ইহা দ্বারাও যোগেশ বাবুর মত সমর্থিত হইতেছে। কৃত্তিবাসের জন্মশক নিরূপণ করিয়া যোগেশ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যোগেশবাবু যেরূপ ভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা তৎকালের ঐতিহাসিক অবস্থার সহিত মিলিয়া গিয়াছে এবং গৌড়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কৃত্তিবাস যে "রাজা গৌড়েশ্বরের" নিকট তাঁহার "ধরা পোহাইবার" সময় উপস্থিত হইয়া শ্লোকাদি পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করাতে "পাটের পাছড়া" প্রভৃতি উপহার পাইয়াছিলেন, কবির এই বর্ণনাও মিলিয়া যাইতেছে, অতএব এই গণনায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু দিল্লীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখাস্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—দিল্লী এখন ভারতের রাজধানী হইয়াছে, মাঝের দুইটা শতাব্দী বাদ দিলে, ইহাই ভারতের চিররাজধানী বলিলেও বলা চলে। যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে এখানে ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। এখানে পরিষৎ-শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে অঞ্চলের মৌলিক অনুসন্ধান বাঙ্গালী দ্বারা হইবার সুবিধা হইল। যাঁহারা এই নূতন শাখা-পরিষদের ভার লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কথায় আশ্বাস দিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। ফলে সে সকল ফলেন পরিচীয়তে। এক্ষণে ভারতের রাজধানীতে পরিষৎ-শাখা-প্রতিষ্ঠার সংবাদ আনন্দ সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পুথি অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রধানতঃ কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীর প্রাচীন পুথির সন্ধানেই বাহির হইতে হয়। পাচেট, নাড়াজোড় প্রভৃতি স্থানে পুথি পাইবার আশ্বাস ছিল।

শারদীয় অবকাশের মধ্যে পুথির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত ৩রা কার্ত্তিক হইতে কার্য্যারম্ভ বলিতে হইবে। বাঁকুড়া-বেলিয়াতোড় এবং পুরুলিয়া-ঝালদা অঞ্চলে যথাক্রমে ১১ দিন ও ১৭ দিন অতিবাহিত হয়। (অনেক সময় পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হই।) এই ভ্রমণের ফলে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথির সংখ্যা ৬৫, মুদ্রিত গ্রন্থ ১। চিত্রশালার নিমিত্ত 'টুইলা' নামক একটি বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মালিয়াড়ার ভূম্যধিকারী মহাশয়ের ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়ায় তথায় যাওয়া স্থগিদ রাখিতে হয়। পুরুলিয়াতে পঞ্চকোটরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হয়; তিনি স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পাচেটে পুথি-সংগ্রহের সুবিধা হইবে না। দক্ষিণাবাবুর প্রতীক্ষা করা এবং এককালীন মাসাধিক প্রবাসে থাকা অযৌক্তিক বিবেচনায় নাড়াজোড় না গিয়া গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। উল্লিখিত কারণে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীন পুথির সন্ধান হয় নাই বা পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত অপর দুই এক স্থানেও প্রাচীন পুথি পাইবার সম্ভাবনা ছিল; শুনিলাম, গৃহদাহাদিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সত্বর আরও কিছু পুথি পাওয়া যাইবে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে সংগৃহীত পুথির তালিকা ও জমাখরচ প্রদত্ত হইল।

রাম হাজরা-রচিত একখানি সম্পূর্ণ রামায়ণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কবিকে পুরস্কারস্বরূপ ৩৬০/ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। মূল গ্রন্থ রাজবাঁধ রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকট বেহারপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আছে। পথিমধ্যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। পুথির উদ্ধার হইতে পারে।

বাঁকুড়া সহরে প্যারীমোহন দাস সূত্রধর-বিরচিত একখানি বিরাট পর্ব্বের পুথি দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে প্যারীমোহনকৃত মহাভারতের কথা জানা যায় নাই। গ্রন্থ অপ্রাচীন।

বাঁকুড়াবাসী কুঞ্জদাস বৈরাগী বলে, তাহার অধিকারে ৩০০ তিন শত বর্ষের প্রাচীন, তালপত্রে লিখিত সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে। পুথি গ্রামান্তরে থাকায় দেখাইতে পারিল না, দেখাইবে বলিল। চেষ্টা করিলে উহা পাওয়া যাইতে পারে।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, বর্দ্ধমানরাজ স্বর্গীয় আফতাব বাহাদুর বিষ্ণুপুর রাজবাটী

হইতে অন্যান্য কাগজ-পত্রের সহিত বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি লইয়া আসেন। ঐ সমুদায় এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজমহাফেজখানায় রহিয়াছে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কএকটি স্থান ও মূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

সঞ্গ্রামপুর বা সংগ্রামপুর বাঁকুড়া হইতে উত্তর-পূর্ব্বে ১৮ মাইল। এক সময় এ প্রদেশ গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; এখনও যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্ত্তমান। সংগ্রামপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ হইতে বুঝা যায়, এতদ্দেশে বাউরী জাতীয় কোন এক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণুপুর হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। কারণ, উক্ত সকল স্থান মল্লভূমিরই অন্তর্গত ছিল। অবশ্য একটা খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হয়। যুদ্ধে বাউরী-বীর যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে এবং পরিশেষে পরাজিত হয়। রাজসৈন্যের বিজয়-স্মৃতি-রক্ষণার্থ সংগ্রামপুর গ্রামের উদ্ভব।

রণ্যাড়া,—বাঁকুড়ার ১৪।১৫ মাইল উত্তরে রণ্যাড়া পল্লী। গ্রামবাসীরা পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছে, উহা এক সময়ে বৃহৎ ও সমৃদ্ধ স্থান ছিল। এখানে একটি মৃণ্ময় দুর্গ ও প্রস্তরময় মন্দিরাদির বিলুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে ৺মদন-মোহন দেবের পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজিত। দেবালয় প্রাচীন মনে হয় না। বিষ্ণুপুর দেবত্র মহালের ইজারদার নিত্যানন্দবংশীয় পরলোকগত ক্ষুদিরাম গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি উহার সংস্কার করাইয়াছিলেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এক নাতিবৃহৎ জলাশয়। বিগ্রহ-মূর্ত্তি কষ্টি-পাথরে নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য। শিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। মদনমোহন বীর-ভূমির অন্তর্গত 'সেনপাহাড়ী' হইতে আনীত। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পতিত একখণ্ড প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কবিতাটি খোদিত আছে;—

> ৮৭ ষট্‌পর্ব্বতগ্রহমিতে গতমল্লবর্ষে
> শ্রীবীরসিংহনৃপতিঃ প্রবলপ্রতাপঃ।
> শ্রীরাধিকামদনমোহনতৃপ্তিকামো
> দত্তে শিলারচিতমন্দিরমাদরেণ॥ ৯৭৬

খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ৯৭৬ মল্লশকে (খ্রীঃ অঃ ১৬৭০) মহারাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক মদনমোহনের উদ্দেশে একটি শিলারচিত মন্দির উৎসৃষ্ট হয়। লিপিনির্দ্দিষ্ট মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। শিলাফলকের আয়তন দেখিয়া মন্দির সুবৃহৎ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত জলাশয়ের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি প্রস্তরময় ভগ্ন মন্দিরমধ্যে দশভুজা তারাখ্যা দেবীর ভগ্ন মূর্ত্তি দেখা যায়। শুনিলাম (এবং প্রাচীন সনন্দাদিতে পাওয়া যায়), বিষ্ণুপুররাজের জনৈক সামন্ত, শীতল মল্ল শেষ দুর্গস্বামী ছিলেন। ইনি বিদ্রোহী হইলে, রাজসেনা দুর্গ আক্রমণ করে। শীতল পলাইয়া ডাহুইসিনীর নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন এবং অনুসরণকারী সৈন্য-হস্তে বিনষ্ট হন। গ্রামকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সুন্দ

সূত্রাকারে 'শালী' নদী প্রবাহিত। নদীগর্ভে কূপাদির চিহ্ন বিস্পষ্ট। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়া যায়।

সেনাপতি-মহল, (তরফ) বারহাজারী প্রভৃতি নাম হইতেও প্রতীতি জন্মে, ঐ সমস্ত ভূসম্পত্তি বিষ্ণুপুররাজের অধীনস্থ সৈনিক পুরুষগণ বৃত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার কতিপয় গ্রামের নামে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়; যথা,—বেলিয়াতোড়, মুক্তাতোড, সুবর্ণতোড়; গুলতড়া, উয়াড়া, কোচকুঁড়া, সাঁকরাড়া, শালতড়া; বিয়ারজোড়; সাহারজোড়া, বড়জোড়া; কালবেড্যা, একাড্যা, ফুলবেড্যা; কালজুড়ী, ফুলবাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিজ পুরুলিয়াতে অবলোকিতেশ্বরের এক অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছি। উহা অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের অধিকারে আছে। একটু উদ্যোগী হইলে পাওয়া যাইবে।

পুরুলিয়া হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে বেলকুঁড়ী গ্রাম। এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্টা একটি প্রস্তরময় ক্ষুদ্র চতুর্ভুজা মূর্ত্তি দেখিলাম। উহা সাধারণে কালী নামে পরিচিতা। সেবা-পূজার ব্যবস্থা আছে। প্রভাবও যথেষ্ট। দেবীমূর্ত্তির পশ্চাদ্দেশে খোদিত লিপি আছে। গ্রামের মধ্যস্থলে এক জৈন প্রস্তর-মন্দির অবস্থিত, বিগ্রহ স্থানান্তরিত।

ঝালদা গ্রামে চারিটি জৈন এবং একটি হিন্দুমূর্ত্তি দেখিয়াছি। এক দিগম্বর ও অপর নাগ-ছত্রযুক্ত মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

বড়ামের ধ্বংসাবশেষ গড়-জয়পুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে, কাঁশাই নদীর উপর। এখানে তিনটি সুবৃহৎ ইষ্টক-রচিত দেউল ও কএকটি মন্দিরের ভগ্ন স্তূপ দেখিলাম। যিনি দেখিবেন, তাঁহাকেই দুইটি দেবীমূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। Dist. Gazetteer এর বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না।

সংগৃহীত পুথির তালিকা

১ বিভীষণের খোট্টা রায়বার (সন ১০৯৩) সম্পূর্ণ। ২ জাগরণ (মনসামঙ্গল)—দ্বিজ বাণেশ্বর, খণ্ডিত। ৩ বৈষ্ণব-বন্দনা—দৈবকীনন্দন, (১১০০) সম্পূর্ণ। ৪ প্রার্থনা—নরোত্তম-দাস, (১১১০) সম্পূর্ণ। ৫ অঙ্গদের রায়বার—কবিচন্দ্র (১০৯৫) সম্পূর্ণ। ৬ মহাভারত, শল্যপর্ব্ব—কাশীদাস (১০৯৫) সম্পূর্ণ। ৭ প্রসাদচরিত্র—কবিচন্দ্র (১০৯৪) সম্পূর্ণ। ৮ কুম্ভকর্ণের রায়বার—কবিচন্দ্র (১০৯৩) সম্পূর্ণ। ৯ নন্দবিদায়—কবিচন্দ্র (১০৭৫) সম্পূর্ণ। ১০, মহাভারত, ঐষিকপর্ব্ব—কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ১১ গুরুদক্ষিণা—শঙ্করদাস, সম্পূর্ণ। ১২ লক্ষ্মীচরিত্র—গুণরাজ খান (১২৩৮) সম্পূর্ণ। ১৩ মহাভারত, স্ত্রীপর্ব্ব—নিত্যানন্দ ঘোষ (১২১৫) সম্পূর্ণ। ১৪ রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন—কবিচন্দ্র (১২৪৪) সম্পূর্ণ। ১৫ অর্জ্জুন-সংবাদ—দ্বিজ মুকুন্দ (১২৩০) সম্পূর্ণ। ১৬ হরিশ্চন্দ্রের পালা—কবিচন্দ্র, সম্পূর্ণ। ১৭ দুর্জ্জয়মাল

(১২৩৭) সম্পূর্ণ। ১৮ অতিকায়ের পালা—কৃত্তিবাস, সম্পূর্ণ। ১৯ চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড—লোচনদাস (১২০১) খণ্ডিত। ২০ রসালগ্রন্থ—বলরামদাস, খণ্ডিত। ২১ বিরহমাধুর—ধনঞ্জয়দাস, খণ্ডিত। ২২ নৌকাখণ্ড—জীবনচক্রবর্ত্তী (১২১৭) সম্পূর্ণ। ২৩ চম্পককলিকা, অসম্পূর্ণ। ২৪ মহাভারত, যানপর্ব্ব—কাশীদাস (১২৩৯) সম্পূর্ণ। ২৫ রসপূরকারিকা—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ২৬ অমৃতরসাবলী, (১২২৬) সম্পূর্ণ। ২৭ মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব (১২৩৯) সম্পূর্ণ। ২৮ নারদসংবাদ—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ২৯ মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব—কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৩০ মহাভারত,অশ্বমেধপর্ব্ব—কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৩১ শ্রীকৃষ্ণবিজয়—দ্বিজ রামনাথ, অসম্পূর্ণ। ৩২ ভক্তিরসালিকা—দীন কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৩ অঙ্গদের রায়বার—কবিচন্দ্র, সম্পূর্ণ। ৩৪ বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ—বলরামদাস, সম্পূর্ণ। ৩৫ গুরুতত্ত্বসার—বলরামদাস, সম্পূর্ণ। ৩৬ উজ্জলরসচন্দ্রিকা, সম্পূর্ণ। ৩৭ নিতাই অদ্বৈততত্ত্ব—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৮ দণ্ডাত্মিকা—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৯ রাগমালা, সম্পূর্ণ। ৪০ গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ, সম্পূর্ণ। ৪১ নামহীন বৈষ্ণবগ্রন্থ, খণ্ডিত। ৪২ স্মরণদর্পণ—রামচন্দ্রদাস, খণ্ডিত। ৪৩ গীতগোবিন্দ—গিরিধর দাস, সম্পূর্ণ। ৪৪ প্রলাপ, সম্পূর্ণ। ৪৫—৫৬ প্রেমতরঙ্গিণী, ১ম স্কন্ধ হইতে ১২ স্কন্ধ—ভাগবতাচার্য্য, সম্পূর্ণ। ৫৭ মনসামঙ্গল—ক্ষেমানন্দ (১২০৩, দেবনাগর অক্ষর) সম্পূর্ণ। ৫৮ শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস—কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণকিঙ্কর) সম্পূর্ণ। ৫৯ কৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ—বৃন্দাবনদাস (১২২১) সম্পূর্ণ। ৬০ কপিলামঙ্গল—কবিচন্দ্র সম্পূর্ণ। ৬১ মহাভারত, বনপর্ব্ব—কাশীদাস (১২২৪) সম্পূর্ণ। ৬২ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৬৩ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—রামপ্রসাদ, সম্পূর্ণ। ৬৪ ভক্তামরস্তোত্র(রায়মল্লকৃত টীকা সহ) সম্পূর্ণ। ৬৫ বৈষ্ণজীবন টীকা—হরিনাথ গোস্বামী, সম্পূর্ণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (শক ১৭৯০ অগ্রহায়ণ, ১৭৯১ চৈত্র)

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ, (ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের চণ্ডীদাস-রচিত "কৃষ্ণজন্মলীলা" নামক পুথির বিবরণ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের "মানভূমের গ্রাম্য সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। শোক-প্রকাশ,—(ক) গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল, (খ) উমেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন, (গ) শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, (ঘ) শশিভূষণ সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ চিত্তসুখ সান্ন্যাল বি ই
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ গৌরহরি সেন
„ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
„ বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত
„ যতীন্দ্রনাথ সেন
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত
„ চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ
„ যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ হেমচন্দ্র গুহ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ কালিদাস বাক্‌চি
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়
„ কালীপদ চক্রবর্ত্তী
„ তারকনাথ ভট্টাচার্য্য
„ হরিকৃপা চৌধুরী
„ রামকমল সিংহ
„ আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
„ দেবেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ শ্যামলাল গোস্বামী
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীগৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী ।
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল উকীল, চুঁচুড়া ।
"	"	শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী বিএল্. উকীল, চুঁচুড়া ।
"	"	ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র বিএল্, চকবাজার, হুগলী ।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাজেশ্বর দাস গুপ্ত বসিরহাট ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বিএ, "যমুনা" সম্পাদক, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।
"	"	শ্রীননীগোপাল দে ১ মিসন্ রো ।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত বিএ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট ।
শ্রীআবদুল করিম	"	শ্রীসূর্য্যকুমার সেন বি এ হেডমাষ্টার, পটিয়া হাই স্কুল । পটীয়া, চট্টগ্রাম ।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কুমার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া রাজবাড়ী ।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় এম্বি ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট ।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় উকীল, বসিরহাট, ২৪ পঃ ।
"	"	কবিরাজ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সেন ৩ কুমারটুলি ।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী ১২।৩ ডফ্টর্স লেন ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন এল্ এম্ এস ২১৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ মুন্সীবাড়ী, কুঠীঘাটা, বরাহনগর।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী ১৫৮ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী "নিয়োগী-ভবন", বাগ্‌বাজার।
	„	শ্রীহরেকৃষ্ণ চন্দ্র ৬০।১ আহীরিটোলা ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র	১। বঙ্গবীর-চরিত (১ম সংখ্যা) ২। কুলকল্পলতিকা (১ম ভাগ) ৩। গীতিকবিতা (১ম হইতে ৪র্থ ভাগ) ৪। শুভঙ্করী আর্য্যা (১ম ভাগ) ৫। চিত্তরঞ্জিনী (১ম ও ২য় বর্ষের ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা)
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	৬। গীতাচ্ছায়া ৭। শ্রীমদ্ভগবতী গীতা ৮। মানস-কুসুম ৯। চণ্ডিকামঙ্গল ১০। আমার খেয়াল
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	১১। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য
শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর কে সি, এস, আই	১২। পঞ্চদশী ১৩। কমলাকান্ত নাটক
শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী	১৪। দশানন-বধ মহাকাব্য

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। স্ত্রীশিক্ষা
	১৬। সুসন্তান লাভের উপায়
" কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ	১৭। প্রাচ্যবিজ্ঞান
" আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৮। পণগ্রহণে বিবাহ
" দেবকণ্ঠ বাগচী	১৯। হেস্তনেস্ত
" হরিনাথ ঘোষ বি এল	২০। লালসিংহ (দুইখানি)
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	২১। মালদহ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ (১ম ও ২য় ভাগ)
Officer in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	22. Bengal Districts Gazetteers (Vol I to XXX)
	23. Eastern Bengal Dist. Gazetteers (Vol. 1. 5. 10. 11 & 12
	24. Eastern Bengal & Assam Vol. I Bogra, (Chittagong Hill Tracts) Vol III.
	25. Bengal District Gazetteers B Vol. (Dist Statistics from 1900-01 to 1910-11), Birbhum, Bogra, Darjeeling, Dinajpur, Faridpur, Howrah, Jalpaiguri, Khulna, Midnapure, Murshidabad, Rajshahi, 24 Pargannas.
	26. Dist. Gazetteers Statistics from 1901 to 1902 Angul, Backerganj. Balasore, Bankura, Bhagalpur, Birbhum, Bogra, Burdwan, Calcutta, Champaran, Chittagong, Chittagong Hill Tracts, Chota Nagpur Tributary States, Cooch Behar State, Cuttack, Dacca,

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer in-charge Bengal Sectt. Book Depot.		Darbhanga, Darjeeling, Dinajpur, Faridpur, Gaya, Hazaribagh, Hooghly, Howrah, Jalpaiguri Jessore, Khulna, Manbhum, Malda, Midnapure, Monghyr, Murshidabad, Muzaffarpur, Mymensingh, Nadia, Noakhali, Orissa Tributary States, Pabna, Palamau, Patna, Purnea, Puri, Rajshahi, Ranchi, Rungpur, Saran, Sahabad, Singbhum, Sikkim State, Sonthal Parganas, 24 Parganas, Tippera.
	27.	Progress of Education in Bengal 1907-08 to 1912.
	28.	Supplement to Do (4th quinquennial Review)
Superintendent Govt. Printing, India.	29.	Statistics of Cotton spinning & Weaving for Decr. 1913.
Superintendent Govt. Press United Prov. India.	30.	List of Sanskrit, Jaina & Hindi MSS. 1911-12.
	31.	List of Sanskrit & Hindi manuscripts 1912-13.
Superintendent. Govt. Printing, India	32.	Statistics of Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Jan.
		উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত	৩৩।	সত্যনারায়ণের পাঁচালী
	৩৪।	ঐ

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় চণ্ডীদাস-রচিত "কৃষ্ণজন্মলীলা" নামক একখানি পুথির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলেন। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, এই পুথির রচয়িতা চণ্ডীদাস ও প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নহেন। এই পুথি হইতে এই কবির "দীন চণ্ডীদাস" এই ভণিতা ব্যতীত আর কিছু জানিবার

উপায় নাই। কবি চণ্ডীদাস এই কৃষ্ণজন্মলীলা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পুরাণে যে সকল কথার বর্ণনা নাই, কিন্তু কবি চণ্ডীদাস সেগুলি নিজের মন-গড়া কথা বলিয়া প্রচার করিতে অসম্মত হইয়া লিদাদি পুরাণের যথাযথ অধ্যায় ধরিয়া নজির দিয়া গিয়াছেন। দুই এক স্থানে "সিদ্ধপুরাণে, ব্যাসের বর্ণনে" লিখিয়া ব্যাসোক্ত এক অভিনব পুরাণের সংবাদ দিয়াছেন। সিদ্ধপুরাণ নামটা ধরিয়া অনুসন্ধান চলিতে পারে। এই চণ্ডীদাসের পরিচয় আলোচনায় ব্যোমকেশ বাবু পদাবলীকার চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনকার চণ্ডীদাস এবং এই কৃষ্ণজন্মলীলার চণ্ডীদাস—এই তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। এই নবীন কবিকে ব্যোমকেশ বাবু কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে চাহেন। পুথিখানি ১৫০ বৎসরের হইবে।

এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সুন্দর ও সরল হইয়াছে। ইহাতে মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। পুথিখানিও অভিনব রীতির গ্রন্থ। সিদ্ধপুরাণ নামটি বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক। উহার সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ব্যোমকেশ বাবুকে এই প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ করিতেছি।

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ প্রাচীন কবি ও পুথির আলোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ এই সকল বিষয় আলোচনার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। প্রাচীন পুথিতে হস্তাক্ষর নানারূপ দেখা যায়। এই অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া কবির সময় নিরূপণের চেষ্টা করিতে পারা যায়। পরিষদের এ চেষ্টা করা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধে Table হওয়া আবশ্যক, প্রফেসর বুলার ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষরের আকার-ভেদের Table তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর হইতে করা আবশ্যক। পরিষদে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি যাহা আছে, তাহা হইতে যতদূর পারা যায়, তাহার একটা Table করিতে চেষ্টা করা উচিত। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে যে সিদ্ধপুরাণের কথা জানা গেল, উহা জিনিষটা যে আসলে কি, তাহা জানা গেল না। সন্দেহ হয়, এই সকল প্রসিদ্ধ পুরাণেরও পূর্ব্বে "পুরাণ" নামে একটা না একটা কিছু ছিল, তাহা হইতেই এই সকল পুরাণের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, গৃহ্যসূত্রে "পুরাণং" পাঠ আছে, অর্থাৎ একখানি পুরাণের উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ পুরাণে একটা জিনিষ আছে, তাহাই পুরাণের প্রধান লক্ষণ অর্থাৎ বংশাবলী, সৃষ্টিপ্রকরণ ভুবনবিন্যাস ইত্যাদি। এইগুলি সকল পুরাণেই এক অর্থাৎ এক মূল হইতে সংগৃহীত বলিয়া সব এক। সিদ্ধপুরাণ বলিতে এমন অর্থও হয় যে,

যে পুরাণবাক্য সর্ব্বথা সিদ্ধ, অর্থাৎ authenticated, কিন্তু এখানে একখানি পৃথক্ পুরাণ বলিয়াই মনে হয়। এই পুথিতে কাত্যায়নীর যে গল্প আছে, নবাবিষ্কৃত কবি ভাসের নাটকে তাহা অন্যরূপে দেখা যায়। কাত্যায়নী নাম ভাসের নাটকে ও এই পুথিতে পাইয়া একটু কৌতূহল বর্দ্ধিত হইয়া রহিল। যাহা হউক, ব্যোমকেশ বাবুর এই পুথিখানির আলোচনা করিয়া অনেকগুলি নূতন বিষয় জানিতে পারা গেল।

অতঃপর মানভূমের উকীল শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীই পাঠ করিলেন।

ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত বলিলেন,—সকল জেলাতেই এইরূপ গ্রাম্য সঙ্গীত আছে। বিভিন্ন জেলার লোকেরা সেগুলি সংগ্রহ করিলে অতি উপকার হয়। পরিষৎ উপযুক্ত লোক লাগাইয়া এই সকল গ্রাম্য গীত সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন।

সভাপতি মহাশয়ও প্রবন্ধলেখকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—জীবেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব অতি সাধু। তিনি নিজে কবি, চট্টগ্রামে তাঁহার বাড়ী। তিনি যদি চট্টগ্রামের গ্রাম্য গীত সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বেশ ভালই হয়। আশা করি, তিনি এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের সুখী করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মৃত সদস্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৺উমেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন, শশিভূষণ সরকার এম্ এ মহাশয়ের পরলোক-গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া শশিবাবু সম্বন্ধে জানাইলেন যে, শশি বাবু বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। তাহার অকালমরণে শিক্ষাবিভাগ একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হারাইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রপরিচালক, সুবক্তা, সরস বাক্‌পটু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, শশিবাবু সুলভে ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচারের অগ্রণী ছিলেন। তিনি power and guardian, Echo, Beaver, power, guardian প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। হিতবাদী ও বঙ্গবাসী প্রথম প্রচারের সময় ইনি তাহাদের মধ্যেও অনেক পরিচালক ও লেখক ছিলেন। ব্যঙ্গ রচনায় কি ইংরেজিতে, কি বাঙ্গালায় ইহাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। সুলভে ছাপাখানা চালাইবার জন্য তিনি ঐ ব্যবসায়ের নানা ভেদ শিক্ষা করিয়া অতিমাত্র নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। সুলভে সচিত্র সংবাদপত্র প্রচারের জন্য তিনি ফটোগ্রাফী এবং ছাপাখানার সংক্রান্ত বহু ব্যাপার নিজেই উদ্ভাবন ও শিক্ষা করিয়া একখানি বড় সংবাদপত্র বাহির করিবার আয়োজন করিতে করিতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অল্প বয়সে তাঁহার নাট্যানুরাগও ছিল। লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে তিনি নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকটে অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় সদালাপী, সৎপরামর্শদাতা, অমায়িক বন্ধু সহজে মেলে না। তিনি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন না। বহু বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রথমে সিদ্ধিলাভ করিয়া শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শশিবাবুর মৃত্যুতে সংবাদপত্র-সম্পাদকবর্গের মধ্যে একজন বহুদর্শী তেজস্বী লেখকের অভাব হইল। এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত। যথারীতি এই সকল মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
কার্য্য-বিবরণী

বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

আলোচ্য বিষয়,—১। সভাপতির অভিভাষণ। ২। বিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ। ৩। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়। ৪। বান্ধব, বিশিষ্ট-সদস্য ও সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৫। পরিষদের ১২শ নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। ১৩২১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৭। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৮। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৯। শোকপ্রকাশ ;—(ক) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, (খ) ডাঃ ললিত-মোহন সিংহ বি এ, (গ) রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঙ) রাজা স্যার সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও (চ) জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ১০। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১১। প্রদর্শন ;—(ক) সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত তিন সহস্র টাকা মূল্যের সমগ্র "তেঙ্গুর গ্রন্থমালা", (গ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশীয় চিত্রিত প্রাচীন পুথির একটি পত্র, (ঘ) শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। ১২। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, (সভাপতি)

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ. বি এল, এল এল ডি

ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল
শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ, বিএল
" মহাস্থবির গুণালঙ্কার জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ
" কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্‌এ, বিএল
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল
" গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্‌এ, বি এল

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
„ পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল (ভাগলপুর)
„ প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল
„ অক্ষয়কুমার বসু বি এল
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ প্রসন্নকুমার সরকার বি এল
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত বি এ
„ ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম বি
„ „ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল, এম, এস
„ „ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস
„ কবিরাজ রাজমোহন সেন
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ পণ্ডিত ভবেন্দ্র শাস্ত্রী
„ পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ আনন্দনাথ রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক (আগরা)
„ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ মিঃ আর কিমুরা
„ মন্মথনাথ রায়
„ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমন্তকুমার সেন
„ মোহিতমোহন ভড়
„ পান্নালাল দাস
„ গুরুনাথ কাহানী
„ গৌরমোহন সাহা
„ যামিনীনাথ সিংহ
„ শরচ্চন্দ্র ধর
„ রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শ্যামাপদ আচার্য্য
„ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ মন্মথনাথ পাল (উকীল)
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
„ সীতানাথ দাস

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দে
„ যদুনাথ সেন	„ রামকমল সিংহ
„ যদুনাথ সান্যাল	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ বসন্তকুমার ঘোষ	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ যতীন্দ্রমোহন ঘোষ	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ শ্যামাচরণ পাল	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নরনারায়ণ চন্দ	„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ শ্যামলাল দে	„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ } সহকারী সম্পাদক

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সভার শেষভাগে হইবে বলিয়া স্থির হইল। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা হইতে জানা গেল,—(১) এবার পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ২০৩৩ হইয়াছে। (২) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্থায়ী ভাণ্ডারে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া বান্ধব এবং রঙ্গপুর ডাঙ্গহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়বাহাদুর স্থায়ী ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়া আজীবন-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। (৩) বঙ্গের চারি জন সংস্কৃত-শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। (৪) বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট বন্ধক ছিল। রাজা বাহাদুর সেই বন্ধকী স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (৫) কলিকাতা মিউনিসিপালিটি পরিষৎ-পুস্তকালয়ের বার্ষিক সাহায্য ৩০০৲ হইতে ৪৫০৲ করিয়া দিয়াছেন। (৬) সর্ব্বশুদ্ধ পরিষদের আয় ১৬০৪০৲ ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ১২১২৯॥৶৫। স্থায়ী ভাণ্ডারের টাকা ও পরিষদের হস্তে গচ্ছিত কয়েকটি স্মৃতি-ভাণ্ডারের টাকা বাদে প্রকৃত প্রস্তাবে নগদ উদ্বৃত্ত ৬১৩৲১০। (৭) ১৩১৯ সালের বাকী ও ১৩২০ সালের সমস্ত পত্রিকা, ১৩১৯ সালে আরব্ধ চারিখানি এবং ১৩২০ সালে আরব্ধ তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশ-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। (৮) পরিষৎ-পুস্তকালয়ের শ্রীবৃদ্ধি আশাতিরিক্ত রকমে হইয়াছে। ১১৫ খানি ক্রীত ও ৬১৯ খানি উপহৃত পুস্তক ব্যতীত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী হইতে এবার ১৮৯১৬ খানি পুস্তক উপহার আসিয়াছে। ২৭ বৎসরের প্রাচীন সিকদারবাগান পুস্তকালয় ৩২১৩ খানি পুস্তক ও সমস্ত আসবাব সহ ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং এইরূপে এই পুস্তকালয়ে ৩০২৭৭ খানি পুস্তক সঞ্চিত হইয়াছে। (৯) পুথিশালাতেও বহু পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। উহার মোট সংখ্যা ২৫৩৫ খানি। (১০) চিত্রশালায় ৩০টি প্রাচীন মুদ্রা, ৯টি প্রস্তর-প্রতিমা ও একখানি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছে। (১১) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বহু কার্য্যের মধ্যে এ বৎসর পরিষৎ-

পুস্তকালয়ের নিয়মাবলী সংস্কার, শাখা-সভার নিয়মাবলী সংস্কার, গ্রন্থপ্রকাশের নিয়ম সংস্কারের ব্যবস্থা, পুস্তকালয়-সমিতি গঠন এবং আয়-ব্যয়ের বিশিষ্টরূপ শৃঙ্খলা সাধন করিয়াছেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নামে জোড়াবাগানের একটি রাস্তার নাম পরিবর্ত্তনের জন্য, সমস্ত নবপ্রকাশিত পুস্তক পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিখাইবার ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমূহে বাঙ্গালার স্থান নির্দ্দেশের জন্য সমিতি গঠন প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

অতঃপর ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রসদস্যগণের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং গ্রন্থাগার, পাঠাগার, পুথিশালা, চিত্রশালা, গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের বিশেষ বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর ১৩২১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পঠিত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের "বান্ধব"-শ্রেণীতে এবং রঙ্গপুর তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুরের আজীবন-সদস্য-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং সমস্ত সদস্যের নির্ব্বাচন অনুসারে যথানিয়মে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিশিষ্ট-সদস্য-পদে নির্ব্বাচন-সংবাদও জানাইলেন।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী, বহু গ্রন্থরচয়িতা, "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সাহিত্য-পরিষদের সহায়ক-সদস্য-পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয় অনুমোদন করিলে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে যথানিয়মে গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ নিয়মে আছে যে, "প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং অন্যূন ।৹ আনা হিসাবে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।" এই নিয়মটিতে একটি বিশেষ বিধি সংযোগ করা আবশ্যক হইয়াছে। ১৩১২ সালে যখন রঙ্গপুরে সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হয়, তখন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নানা বিবেচনায় কিছু অর্থ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করেন। রঙ্গপুরবাসী মূল-পরিষদের সদস্যগণ রঙ্গপুর-শাখার সদস্য হইতে চাহিলে তাঁহারা সেখানে আর চাঁদা না দিয়া যাহাতে সদস্য হন, তজ্জন্য রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ প্রথম শ্রেণীর সদস্য ব্যবস্থা করেন। এই শ্রেণীর সদস্যগণ শাখা-পরিষদের এবং মূল-পরিষদের বিনামূল্যে পত্রিকা

প্রাপ্তি এবং উত্তর সভার সদস্যের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হন। ক্রমে এই অধিকারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হইতে শাখা-পরিষদের প্রথম শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তখন শাখা-পরিষদের প্রার্থনামত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের আদায়ী টাকার উপর প্রথমে টাকায় ৵৹ আনা হিসাবে, পরে টাকায় ।৹ হিসাবে এবং আরও পরে টাকায় ॥৹ আনা হিসাবে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ-সম্বন্ধ হওয়া অবধি অর্থ ও ব্যবস্থা লইয়া কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। গত বর্ষে রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া মূল-পরিষৎ স্থির করিয়াছেন,—অতঃপর রঙ্গপুর-শাখা রঙ্গপুর জেলার বাহিরে আর কোন জেলার প্রথম শ্রেণীর সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রথম শ্রেণীর সদস্য আছেন এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর জেলায় যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের মূল-পরিষদে দেয় চাঁদা ৬৲ টাকার মধ্যে ৩৲ টাকা শাখা-পরিষৎ এবং ৩৲ টাকা মূল-পরিষৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদায় করিবেন। এই ব্যবস্থা হওয়ায় এখন ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, এখন হইতে রঙ্গপুর-শাখার কোন প্রথম শ্রেণীর সদস্যের ৬৲ টাকা চাঁদা বা প্রবেশিকা ১৲ টাকা এখানে জমা হইবে না; ৩৲ ও ॥৹ হিসাবে হইবে; কাজেই দ্বাদশ নিয়মের সংস্কার না হইলে এই সকল ব্যক্তিকে সদস্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই নিয়মটির পর এই ব্যবস্থার অনুকূলে একটি বিশেষ বিধি সংযোগ করা আবশ্যক। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এই দ্বাদশ নিয়মের পরে নিম্নলিখিত বিশেষ বিধিটি সংযোজিত হউক ;—

"রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বর্ত্তমান প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণ এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর জেলায় যে সকল ব্যক্তি উক্ত শাখার প্রথম শ্রেণীর সদস্য হইবেন, তাঁহারা মূল-পরিষদে প্রবেশিকা ॥৹ আট আনা ও বার্ষিক ৩৲ টাকা চাঁদা দিলে মূল-পরিষদের সাধারণ-সদস্যের সমস্ত অধিকার পাইবেন।"

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় সদস্য আর কোনও শাখার সহিত এরূপ অর্থ সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে চাহিলে, ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন যে, আর কোন শাখার সহিত কোন প্রকার অর্থ-সম্বন্ধ নাই। প্রত্যুত সে সম্বন্ধ আর কোনও শাখার সহিত রাখা হইবে না বলিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বহু পূর্ব্বেই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামের অর্থ ও উদ্দেশ্য সমালোচনা করিয়া, নেপালে যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পালরাজগণের রাজত্বকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল (এই অভিভাষণ ১৩২১ সালের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) শাস্ত্রী মহাশয়ের

বহু দিনের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও গবেষণার ফলমূলক ব্যাপারের পরিচয় পাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া তাঁহার অশেষ ধন্যবাদ করিলেন।

তৎপরে ১৩২১ সালের কর্ম্মচারি-নিয়োগ আরম্ভ হইল। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় ১৩২১ সালের নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হউন।" তিনি এই প্রস্তাব উপস্থাপনকালে বলিলেন,—ইনি যে এই পরিষদের সভাপতি হইবার একান্ত উপযুক্ত, তাহার পরিচয় আজকার এই অভিভাষণেই পাওয়া গিয়াছে। আমি এবং আমার ন্যায় অনেকেই উহা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপের যে আস্বাদন দিয়াছেন, তিনি সভাপতি থাকিলে বৎসর বৎসরই আমরা এইরূপ বিষয় সকল জানিতে পারিব। তিনি ভিন্ন এ সকল জিনিষ আবিষ্কার করিতে এবং তাহার আলোচনা করিয়া একটা নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে তাঁহার ন্যায়ই ক্ষমতা আর কাহার আছে? অতএব আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
২। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল, এল এল ডি
৩। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর (লালগোলা)
৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (দীঘাপাতিয়া)

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল মহাশয় সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সহকারী সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন;—

১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
২। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ, জি এস্
৩। " কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
৪। " মৃণালকান্তি ঘোষ
৫। " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়

মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি ই মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মহাস্থবির গুণালঙ্কার জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সদস্যমণ্ডলীর নির্ব্বাচনক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
২। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
৩। " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
৪। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৫। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
৬। " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
৭। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৮। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
৯। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্‌এ, বিএল
১১। " বাণীনাথ নন্দী
১২। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৩। " রওশন আলী চৌধুরী
১৪। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। " শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু
১৬। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমস্ত শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচন অনুসারে তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ১৩২১ সালের নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
২। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
৩। শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্‌এ, বি এল্
৪। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে। এখন আর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" শুনিবার সময় হইবে না। উহা প্রথম মাসিক অধিবেশনে আমরা শুনিব। এখন সভার অন্য কাজ শেষ করা যাউক। এবার চারিটি বস্তু প্রদর্শনের আছে,—(১) একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তি। এটি পদ্মপাণির মূর্ত্তি। মজঃফরপুরের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু মহাশয় এইটি পাইয়াছিলেন আর আমাদের সদস্য শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এটি তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। উভয়েরই পরিষদের প্রতি স্নেহের প্রশংসা করিতে হয় এবং উভয়ের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানান হইতেছে।

২। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় ব্রহ্মদেশের অক্ষরে এই গালার রঙ্গে সোনার অক্ষরে লেখা পুথির একখানি পাতা উপহার দিয়াছেন।

৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নয়টি বাক্সপূর্ণ ২২৫ খণ্ড পুথি উপহার দিয়াছেন। ইহার নাম টেঙ্গুর। ইহা তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত। ইহাতে বহু প্রাচীন কালের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষার বহু গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আগামী অধিবেশনে সে সকল কথা বলা যাইবে। এই পুঁথি-গুলির মূল্য ৩৫০০৲ টাকা। সতীশ বাবুর এই বহুমূল্য দানে আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৪। অতঃপর ২৭ বৎসরের প্রাচীন যে শিকদারবাগান "বান্ধব-পুস্তকালয়" ৩২১৩ খানি পুস্তক এবং সমস্ত আসবাব লইয়া পরিষৎ-পুস্তকালয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহা এই সভার প্রাচীর-গাত্রের দশটি আলমারিতে বর্ত্তমান। এই দানের জন্য উক্ত পুস্তকালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকেও ধন্যবাদ জানান হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় এই সংযোগের ব্যবস্থা করিয়া এই পুস্তকালয়টির কথঞ্চিৎ রক্ষা সাধন করিয়াছেন। এই জন্য ইনিও সাহিত্যপরিষদের এবং সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

অতঃপর অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের মৃত্যুসংবাদ দিতে হইতেছে। ইহাঁরা পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁদের গত বর্ষে মৃত্যু হইয়াছে।

১। ডাক্তার ললিতমোহন সিংহ বিএ

২। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী

৩। জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

এতদ্ভিন্ন ৺দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৺রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট বাহাদুরের বর্ত্তমান ১৩২১ বঙ্গাব্দেই মৃত্যু হইয়াছে। ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন ;— ইহাঁদের মধ্যে ৺দুর্গাদাস রায় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইনি ১৩১২ সালে সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হন। ইনি দক্ষিণ-বাঙ্গালার এক অতি পুরাতন জমিদার-বংশে

জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ রায় চৌধুরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্গাদাস বাবু অল্প বয়সেই দেশহিতৈষী, সমাজ-প্রতিপালক এবং লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজ দেশের সকল সৎকর্ম্মেই তিনি অগ্রণী হইতেন। রাজসরকারেও তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মিউনিসিপালিটী ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে তিনি উচ্চ পদে কাজ করিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কবিতা ও সংগীত রচনায় কৃতিত্ব ছিল। ৪৭ বৎসর বয়সে হরিদ্বারে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। দুর্গাদাস বাবুর অকাল- মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

২। ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সাহিত্য পরিষদের এক জন অতি পুরাতন সদস্য। ১৩০৬ সালে ইনি ইহার সদস্য হন। তাহার পর ১৩০৯ সাল হইতে তিনি প্রতি বৎসর ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়া আসিতেছিলেন। এ বৎসরেও তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনগুলিতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন ও উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সম্মিলনগুলিতেও তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষার্থ তিনি স্বব্যয়ে একখানি সুন্দর বৃহদাকার ব্রোমাইড ছবি উপহার দিয়াছিলেন। স্বজাতি কবি ও সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার্থও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সপ্তদশশতকের সুপ্রসিদ্ধ কবি ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তাব হইলে ৺শৈলেশ বাবুই স্বব্যয়ে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার ভার লন। সেখানি প্রস্তুতপ্রায়, অতি শীঘ্রই তাহা একদিন এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরিষদের ছাত্র-সদস্যগণকে যে সকল গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হয়, তজ্জন্য এবং পরিষৎ-পুস্তকালয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার পুস্তকের দোকান হইতে বিনা মূল্যে পুস্তক দান করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিতেন। পরিষদের উৎসবাদিতেও তাঁহার নগদ দান ছিল। এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। শৈলেশ বাবু সুলেখক ছিলেন; তাঁহার লিখিত ছোট ছোট উপন্যাস গ্রন্থ বাঙ্গালীর বিশেষ আদরের পাঠ্য। গল্প রচনায় তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" যখন পূর্ব্বে একবার ৺সঞ্জীবচন্দ্রের হাত হইতে ডুবিয়া যায়, তখন ইঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার সম্পাদন-ভার লইয়া কিছুদিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের আসনে বসিতে তিনি সাহস করিতেন না বলিয়া তিনি কখনও বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপান নাই। তাহার পর কিছু দিন পরে যখন বঙ্গদর্শন সত্য সত্যই লুপ্ত হইয়া গেল, তখন হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-সংসারে তাহার অভাব অনুভূত হইতেছিল। ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এ দেশে মাসিক পত্র প্রচারের কিছু আতিশয্য

ঘটিয়াছে। সেই সময়ে পূর্ব্বকালে লুপ্ত কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র প্রচারের কথা আবার লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ঢাকা হইতে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর তাঁহার নিজের "বান্ধব" পত্রের নব পর্য্যায় এবং কলিকাতা হইতে ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁহার "প্রবাহ" পত্রের নব পর্য্যায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।. এই সময়ে ৺শৈলেশ বাবুর মনে "বঙ্গদর্শনে"র পুনঃ প্রকাশের কথা উঠে। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে ১৩০৮ সাল হইতে "বঙ্গদর্শনে"র নব পর্য্যায় প্রকাশ আরম্ভ করেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও ৺বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্মান রাখিয়া বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপান নাই। কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ নানা কার্য্যে বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলে পুনরায় ৺শ্রীশচন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন। এ বারেও তিনি পূর্ব্বপন্থা অনুসরণ করিয়াই সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপান নাই। শেষে ১৩১৫ সালে শ্রীশচন্দ্রের অকালমৃত্যু হইলে ৺শৈলেশচন্দ্রই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও মহাজনগণের অনুসরণে নিজ নাম সম্পাদক বলিয়া ছাপান নাই। তদবধি বঙ্গদর্শন বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। ৺শৈলেশচন্দ্র এই সুদীর্ঘ সাহিত্য-সেবার মধ্যে দেশহিতকর আর একটি বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেটি তাঁহার জমীদারী কলেজ। শৈলেশচন্দ্র স্বয়ং জমীদারী কার্য্যের সকল বিভাগে কার্য্য করিয়া বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তিনি জমীদারীর সকল বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া শেষে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুইটি সুবৃহৎ জমীদারের সেরেস্তায় কাজ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান কালের কেবল কলেজের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা অথবা পল্লীগ্রামের মাইনার, ছাত্রবৃত্তি বা ইউ পি স্কুলের ছাত্রগণ দ্বারা জমীদারীর কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। সে কালের কিতাবতী বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযোগী যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহা এখন দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, পাটোয়ার, সুমারনবীশ, আমিন, মুহুরী, কারকুন প্রভৃতির কার্য্য শিখাইবার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিবেচনায় ৺শৈলেশচন্দ্র বহু জমিদারীর ম্যানেজারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় একটি জমিদারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সুখের বিষয়, এই অল্প দিনের শিক্ষায় এখানকার শিক্ষিত কয়েক জন ছাত্র কয়েক জন প্রসিদ্ধ জমিদারের সেরেস্তায় চাকরী লাভ করিয়াছেন। ৺শৈলেশচন্দ্র ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটের সম্মানকর পদ ত্যাগ করিয়া নিজে এই কলেজের শিক্ষকতা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুঃস্থ সাহিত্য-সেবিগণকে মধ্যে মধ্যে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিতেন। এইরূপে শৈলেশচন্দ্র সাহিত্যের ও সমাজের কল্যাণে নানাবিধ কার্য্য করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ৪৮ বৎসর বয়সে গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "সুপ্রতি-ষ্ঠিত সাহিত্যসেবক, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, নানা গ্রন্থের রচয়িতা, জমিদারী কলেজের প্রতি-

ষ্ঠাতা, বহু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর বন্ধু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন সদস্য, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বহু বৎসরের সদস্য ও হিতৈষী, জনপ্রিয়, সদালাপী, মধুর-প্রকৃতি ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।" শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করেন। খগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ যদি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সাহায্যার্থ ১০৲ টাকা দিবেন। সভাস্থ সকলেই এই দানের জন্য খগেন্দ্র বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, এই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে প্রদত্ত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৪) অতঃপর ৺রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোকগমনে সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম কেবল বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত। তিনি যেমন এ দেশে রাজসরকার হইতে, পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে ঐ জন্য বহু উপাধি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতেই ঐ জন্য সম্মানকর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এত উপাধি আর কাহারও ছিল না। হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহে ও আলোচনায়, বাদশাহী আমলের সঙ্গীতের আলোচনায়, শাস্ত্রোক্ত বাদ্যযন্ত্রসমূহের সংগ্রহে ও নির্ম্মাণে, সঙ্গীতের শিক্ষাদানে রাজা বাহাদুর যেরূপ যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা না করিলে বোধ হয়, এ দেশ হইতে সঙ্গীত-বিদ্যার লোপ হইত। রাজা বাহাদুর তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে ইংরাজীর অনুকরণে স্বরলিপি রচনার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাস্ত্রোক্ত অনেক কথার পারিভাষিক শব্দ রচনা করেন এবং একতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নানাবিধ তন্ত্রযন্ত্র বাজাইবার তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও ইহাঁর অধিকার ছিল। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র আলোচনায় এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি কলাপ ব্যাকরণের অনুকরণে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সূত্র সকল রচনা করিয়া "গান্ধর্ব্ব-কলাপব্যাকরণং" নামে একখানি সঙ্গীত-বিদ্যার অভিনব ব্যাকরণ রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাদুর বহু বিদ্যার পণ্ডিত, সদালাপী, অমায়িক ও আচারবান্ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের সদস্য

ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য-পরিষদের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের ক্ষতি হইল, বলিতে হইবে। বঙ্গালা দেশে এক জন বহুদর্শী, প্রাচীন কালের অবস্থাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও লোকপ্রিয় প্রাচীন জমিদারের অভাব হইল।

অতঃপর রাজা বাহাদুরের মৃত্যুতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ, হিন্দু সঙ্গীত-বিদ্যার উদ্ধারকর্ত্তা, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বাঙ্গালায় একতানবাদনের প্রতিষ্ঠাতা, স্বরলিপি রচনার উদ্ভাবনকর্ত্তা, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যামোদী, সুবিদ্বান্‌, সদালাপী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আচারবান্‌, বহু সভ্য দেশের রাজগণপূজিত রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট, মিউজিক ডক্টর, সি আই ই বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহা অনুভব করিয়া আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং রাজা বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।"

অতঃপর রাজা বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার কথা উঠিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, রাজা বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যবস্থা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হউক। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তির, যথা—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যা-সাগর রায় বাহাদুর, মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির স্মৃতিরক্ষার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি লইয়াছেন, কিন্তু এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতএব এই সঙ্গে সেগুলিরও ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদ্যোগী হইবার জন্য নূতন বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হউক। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীদুর্গাদাস রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারিণীপ্রসাদ ধর নিত্যকালী দাসীর এষ্টেটের ম্যানেজার, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। শ্রীফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বিএ, বি এল, মুন্সেফ, তমলুক।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		শ্রীঅনন্তকুমার দাশগুপ্ত ৩ কালীঘাট ওয় লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীকান্তিচন্দ্র মৌলিক পুরুলিয়া।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	"	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি আর এস, সহকারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৬ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীবল্লভানন্দ গোস্বামী কলিগ্রাম, মালদহ।
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	শ্রীজগদ্বন্ধু মোদক	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস, জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
"	"	শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
"	"	শ্রীকালিদাস বিশ্বাস সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুন্সী জমিদার, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর	"	শ্রীরামেশ্বর সেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	"	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রায়, জমিদার, পয়দা, মালঞ্চি পোঃ, পাবনা।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র লাহিড়ী বি এ পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ, পাবনা।
"	"	শ্রীযদুনাথ বাকচি বি এল পাবনা।
"	"	শ্রীব্রজলাল সরকার মোক্তার, পাবনা
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম আর এ এস, টেক্‌নিক্যাল স্কুলের শিক্ষক, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুহ উকীল, পাবনা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াছিমুদ্দীন আহাম্মদ বি এল পাবনা।
"	"	শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দত্ত, জমিদার, সাগরকান্দি পোঃ, পাবনা।
"	"	শ্রীপঞ্চানন সাহা, জমিদার দোগাছি পোঃ, পাবনা।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র রায় বিদ্যারত্ন এম এ, এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক, পাবনা।
চৌধুরী বিশ্বরাজ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি "স্বাস্থ্যনিবাস", দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
"	"	ডাঃ শ্রীকেদারনাথ সেন এল্ এম্ এস্ ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারি, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু বি এস্ সি, এম বি, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি এল, উকীল, মজঃফরপুর।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ	শ্রীনবগোপাল দত্ত বি এল স্মলকজ কোর্টের উকীল, ৩৩।১ শুলু ওস্তাগরের লেন।
"	"	শ্রীননীগোপাল রায় ৮২ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, কুচবিহার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি এ লাইব্রেরীয়ান, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	পি, এন, দত্ত স্কোয়ার, বার-এ্যাট-ল, ১২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল, পুরুলিয়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ পটুয়াখালি, বরিশাল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ৭০ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
	„	শ্রীতারাপদ সেন গুপ্ত C/o কবিরাজ শ্রীহরিনারায়ণ সেন গুপ্ত বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাইভেট সেক্রেটারী, বর্দ্ধমানরাজ, বর্দ্ধমান।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি এল সিনিয়র মুন্সেফ, সাসারাম, সাহাবাদ।
„	„	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র মৌনা, পি, ও, ছাপরা, সারন।
„	„	শ্রীজগতিনাথ চট্টোপাধ্যায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কালেক্টার, পি, ও, ছাপরা, সারন।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, ৪ রাধানাথ বসুর লেন।
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	„	ডাঃ শ্রীলালমাধব ঘোষাল এল এম এস, ১১।৭ রামকৃষ্ণ দাসের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„	শ্রীজীবনহরি মুখোপাধ্যায় বি এল, ২১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ, সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩।১।১ রামরতন বসুর লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫ কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন ২ শিবতলা লেন, বড়বাজার।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	„	শ্রীগুণেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ১৪ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	"	শ্রীভূপতি মুখোপাধ্যায় কলিয়ারী ম্যানেজার, জিওলগড়া, জামাদোবা পোঃ, মানভূম।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	পণ্ডিত মহাবীর মিশ্র কবিরাজ ৫৩।২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল উকীল, নওগাঁ, রাজসাহী।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঈশ্বরপাঠশালা, ৺কাশী।
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	"	শ্রীনলিনীপ্রসাদ বসু ৯ নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কেসিয়ারী, বর্দ্ধমান।
"	"	ডাঃ শ্রীজহরীলাল সরকার বড়বেলুন।
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, উকীল, তমোলুক।
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	"	শ্রীকেশবচন্দ্র ভক্ত চৌধুরী "মনোমোহন লাইব্রেরীর" স্বত্বাধিকারী, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৭ কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব ৫৭ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরঘুনাথপ্রসাদ পীঠি ১ শ্যাম স্কোয়ার, বাগবাজার পোঃ।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায় একষ্ট্রা ডেপুটি কন্‌সারভেটর অব ফরেষ্ট, শিলং, আসাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কন্‌সার্ভেটর অব্ ফরেষ্ট আফিস, শিলং, আসাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		শ্রীফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল, মুন্সেফ, তমলুক।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল,—

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	১। সরল উর্দ্দ শিক্ষা
„ আনন্দচন্দ্র সেন	২। পাণ্ডববর্জ্জিত প্রতিবাদ
„ বেণীমাধব চাকী বি এল	৩। সীতানির্ব্বাসন
ডাঃ „ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪। সদৃশবিধান চিকিৎসা
	৫। সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব (পরিশিষ্ট ভাগ)
	৬। শিরঃপীড়া চিকিৎসা
	৭। সদৃশ-বিধানতত্ত্ব
„ চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ	৮। সাগর-সঙ্গীত
„ তারকনাথ বিশ্বাস	৯। তারকনাথ-গ্রন্থাবলী
„ সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১০। রসমঞ্জরী
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	১১। ব্যাকরণবিভীষিকা
	১২। কপালকুণ্ডলা সমালোচনা
„ অনুকূলনাথ মিত্র	১৩। দুর্জ্জয় মান
	১৪। প্রবাস
„ পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য	১৫। অমরমঙ্গলং নাটকং
„ রাজশেখর বসু	১৬। বেদান্তদর্শন (১ম খণ্ড)
	১৭। পরলোকতত্ত্ব
	১৮। প্রলয়-তত্ত্ব
	১৯। বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি
	২০। হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ
	২১। অধিকার-তত্ত্ব
ডাঃ „ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	২২। প্রকৃতি

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	২৩। ভূদেব-গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)
	২৪। ঐ (২য় খণ্ড)
	২৫। ঐ (৩য় খণ্ড)
	২৬। ঐ (৪র্থ খণ্ড)
" দৌলত আহাম্মদ	২৭। সমাজ-সংস্কার
" সতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চৌধুরী	২৮। মিলন
" সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৯। বেকারের উপায় (১ম খণ্ড)
" পান্নালাল জৈন মন্ত্রী	৩০। সনাতন-জৈনগ্রন্থমালায়াঃ তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকং
	৩১। ঐ ষষ্ঠ অঙ্কং (জৈনেন্দ্রপ্রক্রিয়া-পূর্ব্বার্দ্ধং)
" মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র	৩২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত
মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর	৩৩। চন্দ্রজিৎ
	৩৪। গায়ত্রী
শ্রীযুক্ত নারায়ণহরি বটব্যাল বি এ	৩৫। তুলসী
	৩৬। ঐ
" ব্রজবল্লভ রায়	৩৭। রাধাজীবনের কবিতাবলী (১ম খণ্ড)
	৩৮। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা
" রামসহায় নাগ	৩৯। কলঙ্ক
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০। পাষাণের কথা
" অন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	৪১। গৃহশিল্প বা দরিদ্রের অন্নসংস্থান
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৪২। সারঙ্গরঙ্গদা
" কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন	৪৩। জৈন ধর্ম্ম
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৪। প্রাকৃতপ্রকাশ
" সন্তোষকুমার লাহিড়ী	45. Letters of Condolence received by Santoshkumar Lahiri on the death of Babu Saratkumar Lahiri.
Superintendent, Govt. Printing, India.	46. Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa (1912-13)
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	47. Off to the Western Himalayas.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Officer-in-charge Bengal Sectt, Book Depot.	48.	Annual Progress Report on Forest Administration in Bengal for 1912-13.
The Hony. Manager, Jiva Daya Jnan Prasarak Fund.	49.	Third Annual Report of the Jiva Daya Jnan Prasarak Fund.
Rev. Haji Syed Gafur Shah.	50.	Blessed Lord, Hazi Hafiz Syed Waris Ali Shah of Dewa.
	51.	The Martyr of Truth (Life of Hussain Halloj Ibn-mansoor)
	52.	Ibrahim Ibn Adham.
Director, Geological Survey of India.	53.	Records of the Geological Survey of India Vol. 43. Pt. 3.
	54.	Do. Do. Pt. 4.
শ্রীযুক্ত মৌলবি দৌলত আহম্মদ	55.	Bengal Provincial Conference—Presidential Address in 1914 at Comilla.
	56.	Nation Building in India, Tract No. 1.
Assistant Superintendent, General Dept. Bombay Secretariat.	57.	Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle for 1913.
Superintendent, Govt. Printing, India.	58	Annual Reports on Archaeological Survey of India during 1909-10.
	59.	Progress of Education in India Vol. I (1907 to 1912)
	60.	Do. Do. Vol. II (Do.)
Under Secretary to the Govt. of Bengal.	61.	Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammadan & British Monuments, Northern Circle, for 1912.
Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	62.	Bengal Dist. Gazetteers, Birbhum 1900-01 to 1910-11
		Do. Do. Backergunge.
	63.	Do. Do. Burdwan.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	64.	Dist. Gazetteers—Bankura.
	65.	Do Do Chittagong.
	66.	Do Do Chittagong Hill Tract
	67.	*Do Do Dacca.*
	68.	Do Do Hooghly.
	69.	Do Do Jessore.
	70.	Do Do Malda.
	71.	Do Do Nadia.
	72.	Do Do Pabna.
	73.	Do Do Rangpur.
Agricultural Adviser to the Govt. of India.	74.	Reports on the Progress of Agriculture in India for 1912-13.
Superintendent Govt. Printing, India.	75.	Statistics of Cotton Spinning and Weaving (April 13 to Feby. 1914)
Assistant Secretory to the Govt. of Bengal, Marine Dept.	76.	Annual Report of the Health Officer of the Port of Calcutta for 1913.
	77.	Annual Reports of the Sanitation of the Port of Chittagong for 1913.
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার	78.	The Sacred Books of the Hindus Vol. XVI. The Positive Background of Hindu Sociology Book I.
The Asiatic Society of Bengal	79.	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III. No 9.
Superintendent Govt. Printing India.	80.	Statistics of Cotton Spinning & Weaving in the Indian Mills in March 1914.
The Hon'ble Mr. Justice Woodroffe	81.	Principles of Tantra Part I.
Director, Geological Survey of India.	82.	Records of the Geological Survey of India, Vol. 44 Pt. I.
	83.	Memoirs of the Geological Survey of India. Vol 40 Pt. 2.
Asst. Secy. to Govt. Punjab. P. W. D. Buildings & Roads Branch.	84.	Annual Archaeological Progress Report.

প্রদাতা		পুথি
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ	৮৫।	২২৫ খানি তেঙ্গুর গ্রন্থমালা
„ কিরণচাঁদ দরবেশ	৮৬।	মহাভারত (আদি ও সভাপর্ব্ব) খিলহরিবংশ
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৮৭।	মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব)
„ প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্	৮৮।	বিনন্দ রাখালের পালা (দয়ারাম দাস)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ,—(ক) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্ মহাশয়ের সংখ্যাপূরণবাচক "বাঙ্গালা প্রত্যয়", (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ", (গ) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বিএল্ মহাশয়ের "দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মীচরিত্র" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'বাঁশে লেখা ঠিকুজি" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশে লেখা ঠিকুজি। ৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) শম্ভুচন্দ্র রায়, (খ) বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) পণ্ডিত গুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন ও (ঘ) "মেদিনী-বান্ধব"-সম্পাদক দেবীদাস করণ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি) —

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএল্
„ ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস্‌সি
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

শ্রীযুক্ত সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ পান্নালাল মল্লিক
„ আনন্দনাথ রায়
„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্এ,
„ বাণীনাথ নন্দী
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ ডাঃ সরসীলাল সরকার এমএ, এল এম এস্
„ যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
„ ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ সুরেশচন্দ্র নন্দী
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বিএ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়।
„ রাধাগোবিন্দ গোস্বামী
„ রামহরি ভড় বিএল্
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূপতিচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীবিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ কলমা, ঢাকা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	মৌলবী সৈয়দ নূর উল হোসেন কাসিমপুরী, জালালপুর, হাইপুর, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	মৌলবী নসিমুদ্দীন আহম্মদ এম্ এ, বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বার লাইব্রেরী, আলীপুর।
	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৭ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ, বি ই ২২ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র ১৮।১ কালীঘাট থার্ড লেন।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি বি এ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, লোকাল বোর্ডের মেম্বর ও এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, হাই স্কুল, কাঁথি।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এল উকীল, কাঁথি।
"	"	শ্রীরেবতীনাথ মাইতি ব্যারিষ্টার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় মোক্তার, কাঁথি।
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	"	শ্রীপৃথ্বীনাথ বসু মুন্সী জমিদার, দেমুর, পুঁটশুরী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্ এ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, বাসুদেব গ্রাম, জাড়া।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি এল্ উকীল, পুলিশ কোর্ট। ৩।১।১ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীউদয়নারায়ণ ভাদুড়ী সোপুরা, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর, ১২০।৩ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় বি এল্ হাই কোর্টের উকীল, ৯ হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কবিরাজ শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন ১৬।১৭ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ বৈদ্যশাস্ত্রী, পালপাড়া, চন্দননগর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ ২০৭ মদনপুরা, কাশী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	কুমার শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসত্যচরণ শাহা এম্ এ, বি এল, ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরামকমল রায় বি এল্ ৫২ রাজবল্লভ সাহার লেন।
"	"	শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় বি এল, ২ কাটাপুকুর লেন, বাগবাজার।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কালেক্টার, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ।
"	"	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, আরা।
"	"	শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী পোষ্ট মাষ্টার, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা কবিরত্ন আনন্দ-কুটীর, সাখুয়াই পোঃ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী বাজালা, মহিলপুর, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	জে, এন, মুখার্জ্জি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা।
"	"	পি, এন্, বিশ্বাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং, মন্দালে, বর্ম্মা।
"	"	শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী সাব রেজিষ্ট্রার, ঝিকরগাছা, যশোহর।
"	"	কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এল্ এম্ এস্ ২৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীআশুতোষ সরকার বি এল্ সবজজ, হাবড়া।
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী সরকার, ভক্তিরত্ন
"	"	শ্রীদুবলচাঁদ ভক্তিকুটীর, নোয়াখালী।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুঁথি ও পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ;—

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও " বোধিসত্ত্ব সেন	১।	রামদাস-গ্রন্থাবলী
" উদয়নারায়ণ ভাদুড়ী	২।	গীতোদয়-কৌমুদী
" ললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ	৩।	আরতি
" রামকমল সিংহ	৪।	বঙ্গদেশে শিশু প্রতিপালন
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	৫।	দুর্গামঙ্গল
" চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	৬।	সেবক (হিন্দি মাসিক পত্র)
	৭।	ব্যাস-সংহিতা
" বিধুভূষণ সেন গুপ্ত	৮।	হিতদীপ
	৯।	জ্যামিতি-সহায় (১ম ভাগ)
	১০।	ইতিহাস-শিক্ষা
	১১।	সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত
	১২।	মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণম্ (১ম ভাগ)
	১৩।	ঐ (২য় ভাগ)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন গুপ্ত	১৪। বীরোত্তর কাব্য
	১৫। রত্নাকর পত্রিকা
	১৬। তত্ত্ববোধ পত্রিকা (১—৮ম সংখ্যা)
„ সত্যানন্দ রায়	১৭। মধুমতী
„ রাধাকিশোর কর	১৮। শরীর-পালন-বিধি
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৯। শ্লোকমালা
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২০। শাস্ত্রাপবাদ-নিরাকরণ (১ম ভাগ)
	২১। সঙ্গীত-হার (২য় ভাগ)
	২২। প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট
	২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
	২৪। শ্রীশ্রীচণ্ডী
	২৫। গীতা-কৌমুদী
	২৬। প্রকৃতি ও পুরুষ
	২৭। কলি-মাহাত্ম্যম্
	২৮। প্রয়াগ-মাহাত্ম্যম্
	২৯। দ্বারকা-মাহাত্ম্যম্
	৩০। পঞ্চগীতা
	৩১। শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ-গীতা
	৩২। গীতা (পদ্যানুবাদ)
	৩৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
	৩৪। মনোমোহন গীতাবলী
	৩৫। অনুরাগ-বল্লী
	৩৬। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ
	৩৭। প্রেম-বিলাস
	৩৮। শ্রীস্বরূপ-দামোদর
	৩৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত
	৪০। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব
	৪১। গুপ্ত-সংহিতা
	৪২। শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী
	৪৩। যুগ-ধর্ম্ম
	৪৪। পঞ্চতীর্থ-মাহাত্ম্য

উপহার দাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	৪৫। আনন্দ-মীমাংসা
	৪৬। শ্রীমৎদাস গোস্বামী
	৪৭। সাধক-জীবনী, চৈতন্ত-চরিত
	৪৮। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা
	৪৯। কমলা (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)
	৫০। আত্মবিদ্যা (৪র্থ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)
	৫১। শ্রীভগবদ্গীতা
„ ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫২। ব্রহ্মচর্য্য
	৫৩। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী (১ম খণ্ড)
„ পরেশনাথ হোড়	৫৪। ম্যালেরিয়া নাটিকা
„ আব্দুল বারি	৫৫। কারবালা
Director, Geological Survey of India.	56. Records of the Geological Survey of India Vol. 43 H 2.
Registrar, Calcutta University.	57. Calcutta University Minutes Vol. LV. Pt. 6—1911.
	58. Do, Do, Vol, 57 parts 1 & II. 1913.
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	59. Reports on Survey & Settlement Operations in Bengal for 1913.
	60. Annual Returns of the Lunatic Asylums in Bengal for 1913.
Secretary to Working-man's Inst.	61. Second Annual Report of the Central Committee of Workingman's Institution.
শ্রীযুক্ত কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	62. Karma Jogee Sasipada.
	63. Elevation of the masses of the depressed classes.
	64. The Devalaya movement,
	65. Prospectus for King George's Medical College, Lucknow.
	66. On the moral aspects of nature.
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	67. The New Testament of our Lord Jesus Christ in Bengali.
	68. Hallam's Middle Ages Vols. I. II & III.
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	69. The Hindu University Deputation in Calcutta.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Director General of Commercial Intelligence.	70.	Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills in April 1914.
Officer-in-charge, Bengal. Sectt, Book Depot.	71.	Report on the Maritime Trade of Bengal 1913-14.*
	72.	Resolution reviewing the reports on the working of the District Boards in Bengal 1912-13.
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	73.	24th Annual Report of the National Association for supplying female medical aid to the women of India for 1908.
	74.	Twentisixth annual report of the *Do, Do, etc.*
	75.	Inventions of Designs in 1911.
	76.	Short stories on marriage reform and allied topics.
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	77.	Triennial Report on the Administration of the Registration Deptt, in Bengal for 1913.
Chief inspector of Explosives in India.	78.	Fifteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India.
Secy. to the Govt of India Revenue and Agriculture.	79.	*Resolution on the Deptt. of* Revenue & Agriculture.

উপহারদাতা		উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত তারানাথ রায়	৮০।	প্রার্থনা-বিলাস
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৮১।	রামায়ণ—(আদিকাণ্ড)
	৮২।	„ (সুন্দরকাণ্ড)
	৮৩।	„ (লঙ্কাকাণ্ড)
	৮৪।	লক্ষ্মণের ফলরক্ষা (উত্তরাকাণ্ড)
	৮৫।	চৈতন্য-মঙ্গল (সূত্রখণ্ড)
	৮৬।	ঐ (মধ্যখণ্ড)
	৮৭।	ঐ (অন্ত্যখণ্ড)
	৮৮।	ইছাই ঘোষের পালা
	৮৯।	কালকেতুর চৌতিশা

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৯০। তন্তুবায়-কুলপঞ্জী
" মৃণালকান্তি ঘোষ	৯১। সংগ্রহ গ্রন্থ
" অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	৯২। পদাবলী
	৯৩। মহাজন-পদাবলী
" দেবনারায়ণ ঘোষ	৯৪। মহাভারত—(সভাপর্ব্ব)
	৯৫। ভাগবত

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার "সংখ্যাপূরণ-বাচক বাঙ্গালা প্রত্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত বলিলেন,—প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন যে, ইংরাজী রীতির অনুকরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় "লা", "রা", "স" লিখিয়া গিয়াছেন, আমার কিন্তু বোধ হয়, ১লা, ২রা ইত্যাদি কথাগুলি উর্দ্দু পহেলা, দোস্‌রা, তেস্‌রা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে। তাহা হইলে এই কথাগুলি ইংরাজদিগের এ দেশে আসিবার বহু পূর্ব্বে আমরা গ্রহণ করিয়াছি, বলিতে হইবে। প্রবন্ধ-লেখক ১লা, ২রা হইতে "লা", "রা" বাদ দিতে চাহিতেছেন, ইহার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী বলিলেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "অনুকরণপ্রিয়তা" ছিল বলিয়া সারদা বাবু তাঁহার দোষ ধরিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজেই এখন সেই ইংরাজী ধরণের অনুকরণ করিতে যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—ইংরাজেরা বণিকের জাতি; তাঁহারা অনর্থক সময় নষ্ট করিতে চাহেন না বলিয়া ১ জুন, ২ জুন লিখিয়া থাকেন। আমরা এখনও সেরূপ ব্যবসাদার হইতে পারি নাই। কাজেই এখনও আমাদের ১লা, ২রা জুনের পরিবর্ত্তে ১ জুন, ২ জুন লেখা আবশ্যক হয় নাই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর প্রবন্ধটি বেশ গবেষণাপূর্ণ। আমি অনেক জমিদারী সেরেস্তায় ১ বৈশাখ, ২ জ্যৈষ্ঠ লিখিতে দেখিয়াছি। ত্রিকাণ্ডশেষ, অমরকোষের শেষাংশ, ইহাতেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়। সারদা বাবু বলিয়াছেন যে, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি ইয়োরোপ হইতে আমরা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু অনেক প্রাচীন পুথিতে কমার ব্যবহার দেখিয়াছি। একটি শ্লোক আছে,—"দুর্য্যোগ নাস্তি অথচ নাস্তি।" এখানে "নাস্তি অথচ নাস্তি"র কোন অর্থবোধ প্রথমে হয় না। শেষে দেখিলাম, প্রথম "নাস্তি"র "না"র পর একটা কমা আছে। তখন এই শ্লোকের অর্থ সহজ হইল।

ইহার পর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষায় নেতি-বাচকের প্রয়োগ" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—নেতিবাচক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যেমন

বাক্যের পূর্ব্বেও বসে, বাঙ্গালাতেও তাহাই। কারক যে প্রথমেই ব্যবহৃত হইবে, তাহা নহে। যে পদটি যেখানে দিলে সুন্দর হয়, সেটি সেখানেই দেওয়া হয়।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধটির সুখ্যাতি করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। তবে প্রাচীন বাঙ্গালায় যে এরূপ ব্যবহার ছিল না, তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক, তিনি প্রবন্ধ দ্বারা এই সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশের লেখা ঠিকুজী প্রদর্শন এবং তৎসম্বন্ধে রঞ্জন বাবুর লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ পাঠ করেন। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, এই বাঁশের লেখা ঠিকুজী একটা নূতন জিনিষ। ইহা আমরা পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। এইটি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার রঞ্জন বাবুকে এই সভার পক্ষ হইতে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অতঃপর পরিষদের কয়েক জন সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোক-গমনে সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোক প্রকাশ করেন। সর্ব্বপ্রথমে ৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ ভাগ উড়িষ্যা প্রদেশেই অতিবাহিত করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি কাশীতেই বাস করিতেছিলেন। ইনি একজন বঙ্গসাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার "পুলিশ ও লোকরক্ষা" এবং "৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী" অনেকেই বোধ হয়, পাঠ করিয়াছেন।

তৎপরে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের কথা উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন,—কেদার বাবুও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। যখন আমি নৈহাটী মিউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যান ছিলাম, সেই সময় কিছু দিন তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। তাহাতে আমি দেখিয়াছিলাম, তিনি সুপণ্ডিত, সদালাপী ও সদাশয়—তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন এক ভাবেই কাটিয়াছে।

তৎপরে পরিষদের সদস্য শম্ভুচন্দ্র রায়, বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন ও "মেদিনীবান্ধব"-সম্পাদক দেবীদাস করণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌এ মহাশয় কর্ত্তৃক ভবনগর রাজ্যে প্রাপ্ত এক খণ্ড প্রস্তর। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়ের "দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মীচরিত্র"। শোক-প্রকাশ—(ক) ধন্নূলাল আগরওয়ালা বিএ এটর্ণি, (খ) সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও (গ) মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত—

ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস্‌সি

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ, বিএল
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" বাণীনাথ নন্দী
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রজনীকান্ত বক্সী
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" শ্যামলাল গোস্বামী
" মন্মথনাথ ঘোষ
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" শিবচন্দ্র কুণ্ডু
" অম্বিকাচরণ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা
" যতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" ক্ষেত্রমোহন সেন
" সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" সুধীররঞ্জন রায় চৌধুরী
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" নিত্যানন্দ রায়
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" ললিতমোহন রায়
" গোপেন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত　　শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ
　　নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়　　" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পরে পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীইন্দুভূষণ নাগ ৩২।১ সার্পেণ্টাইন লেন।
শ্রীপ্রমথনাথ পান	"	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পাল উকীল, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় জজ কোর্টের উকীল, মেদিনীপুর।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "দর্শক"-সম্পাদক, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শেঠ শ্রীপাদামরাজ জৈন প্রেসিডেণ্ট জৈন সিদ্ধান্ত-ভবন, ২৩ কালাকার ষ্ট্রীট, বাঁশতলা, কলিকাতা।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীসন্তোষকুমার বসু উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী ৯২।৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক আমমাবাদ কাছারী, নোয়াখালী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তমলুক, মেদিনীপুর।
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"	ডাঃ শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য্য গোপালপুর পোঃ, হুবাইল গ্রাম, ময়মনসিংহ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	"	কবিরাজ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপার চিৎপুর রোড।
	"	শ্রীতুষ্টুলাল বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর ২২৫ হ্যারিসন রোড।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	"	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "নাট্যমন্দির"-সম্পাদক, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৃন্দাবন মল্লিকের ১ম লেন।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৪ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।
"	"	কবিরাজ শ্রীকেশবলাল রায় ৪৪ বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	শ্রীআবদুল রসুল, ব্যারিষ্টার ১৪ রয়েড ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	১। আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর
" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ	২। বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাশ
	৩। ঈশ্বরের স্বরূপ
" বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	৪। হিন্দু বিবাহ-সংস্কার
	৫। প্রার্থনা-শতক
	৬। উপদেশামৃত (১ম খণ্ড)
" রাধারমণ দাস	৭। ভারত-বিধবা
" দুর্গামোহন কুশারী	৮। পল্লী
" কবিরাজ অধরচাঁদ চক্রবর্ত্তী	৯। জয়দেব-পদ্মাবতী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	১০। ভাণ্ডের জন্ম-কথা
দুর্গাসুন্দর বিত্তাবিনোদ	১১। শ্মশান-স্মৃতি
মাননীয় মহারাজাধিরাজ	
শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর	১২। কতিপয় পত্র
	১৩। বিজন-বিজলী
	১৪। সঙ্গীত-সুধাকর (১ম ভাগ)
	১৫। ঐ (২য় ভাগ)
	১৬। ভক্তিগানামৃত
	১৭। বিত্তাসুন্দর গীতাভিনয়
	১৮। মস্‌নবি
	১৯। পতিভক্তি-প্রদায়িনী
	২০। সতীবিয়োগ নাটক
	২১। কাপালিক নাটক
	২২। পাকরাজেশ্বর
	২৩। ব্যঞ্জন-রত্নাকর
	২৪। পতিব্রতোপদেশ
	২৫। ইন্দর্ সভা
	২৬। রামাষ্টকং পরমেশ্বরাষ্টকং চ
	২৭। রামায়ণং—আদিকাণ্ডং
	২৮। রামায়ণ—অনুবাদ, আদিকাণ্ড
	২৯। রামায়ণং—অযোধ্যাকাণ্ডং
	৩০। ঐ অযোধ্যাকাণ্ড
	৩১। ঐ আরণ্যকাণ্ডং
	৩২। ঐ ঐ
	৩৩। ঐ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডং
	৩৪। ঐ ঐ
	৩৫। ঐ সুন্দরাকাণ্ডং
	৩৬। ঐ ঐ
	৩৭। ঐ লঙ্কাকাণ্ডং
	৩৮। ঐ ঐ
	৩৯। ঐ উত্তরকাণ্ডং

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর	৪০।	রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড
	৪১।	শ্রীমহাভারতং—আদি ও সভা
	৪২।	ঐ বন, বিরাট
	৪৩।	ঐ উদ্যোগ, ভীষ্ম
	৪৪।	ঐ খিল হরিবংশ
	৪৫।	ঐ দ্রোণ, কর্ণ, শল্য
	৪৬।	ঐ শান্তিপর্ব্ব
	৪৭।	ঐ অনুশাসন—স্বর্গারোহণ
	৪৮।	প্রশ্নোত্তরমালা
	৪৯।	ঐ ২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৫০।	কবি-কাহিনী
	৫১।	বিজ্ঞান-প্রবেশিকা
„ আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী	৫২।	পুষ্পাঞ্জলি
„ নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি	৫৩।	বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড (কায়স্থ কাণ্ডের ১ম অংশ)
„ গৌরহরি সেন	54.	Ruskin's Seven Lamps of Architecture.
	55.	Imitation of Christ.
Officer-in-charge Bengal Sectt.	56.	Resolution on the Reports on the working of Municipalties in Bengal 1912-13.
A. Y. Sen.	57.	Annual Report on Youngmen's Christian Association, Calcutta.
Superintendent, Govt. Press, Madras,	58,	Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS, in the Govt. Oriental MSS, Library, Madras, Vol. 17.
Superintendent Govt. Printing India.	59.	Statistics of Cotton Spinning & Weaving in April and May 14.
Surveyor General of India.	60,	General Report on the Opea tion of the Survey of India 1912-13.
Asiatic Society of Bengal.	61.	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. V No. 2.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Librarian, Cambridge University Library.	62.	Report of the Cambridge University Library 1913.
Superintendent, Archaeological Survey, Frontier Circle	63.	Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle 1913-14.

তাহার পর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ভবনগর রাজ্যে প্রাপ্ত এক খণ্ড প্রস্তর প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন,—যখন এ দেশে লৌহের প্রচলন ছিল না, সে সময় পাথরের অস্ত্র-শস্ত্রই ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানে এই প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র এখনও পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সিংহভূম জেলায় এবং আসামের শিবসাগর ও অপর একটি জেলায়ও পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র মাঝে মাঝে দেখা যায়। সংপ্রতি কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি ভবনগর রাজ্যে গিয়াছিলাম। সেখানে এই প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হই। প্রথমে এখানি পাথরের অস্ত্র বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শেষে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহা পাথরের অস্ত্র নহে, জলের স্রোতে বা অন্য প্রকারে পাথর ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ ভ্রমে মাঝে মাঝে অনেকেই পড়িয়া থাকেন। এমন কি, ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এইরূপ ভ্রমে পড়েন, এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়ের "দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মীচরিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, ধন্নুলাল আগরওয়ালা বি এ এটর্ণি, সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিল ও গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলে লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের দানের সংবাদ জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বি এল্ মহাশয়ের "দেউপানি গোসানী" নামক প্রবন্ধ। ৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম নিয়ম পরিবর্ত্তন ও দশম নিয়মের পর নূতন নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ, (খ) ডাক্তার শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল্ এম্ এস্, (গ) ডাক্তার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ ও (ঘ) যামিনীকান্ত বসু বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
" ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
" বাণীনাথ নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" অমৃতগোপাল বসু
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
" অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ রায়
" আনন্দমোহন সাহা
" সত্যহরি দাস

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিরত্ন
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" পুলিনবিহারী দত্ত
" অনন্তকুমার দাসগুপ্ত
" রামকমল সিংহ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" রাখালরাজ রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	মিঃ এ, রসুল, ব্যারিষ্টার ১৪ রয়েড ষ্ট্রীট।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীরামকমল সিংহ	এস, সি, রায় স্কোয়ার, ব্যারিষ্টার ৫১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ৫৯।১ পটুয়াটোলা লেন।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	"	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮।১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পাল এম্ এ, বিএল, মুন্সেফ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস সি প্রিন্সেস কলেজ, জম্মু।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রিন্সেস কলেজ, জম্মু।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীসরোজনাথ বাগচি কণ্ট্রোলার জেনারেল আফিসের কর্ম্মচারী, দিল্লী।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগজেন্দ্রনাথ গুচ্ছাইত বি এ প্রধান শিক্ষক, মডেল ইনষ্টিটিউসন, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ সহকারী প্রধান শিক্ষক, মডেল ইনষ্টিটিউসন, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র ত্রিপাঠী শিক্ষক, মডেল ইনষ্টিটিউসন, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীকুঞ্জলাল সেনগুপ্ত খাসমহল, সাব ওভারসিয়ার, কলাগেছে, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এল্ উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিফ্ একাউণ্টেণ্ট, মিউনিসিপালিটী, রেঙ্গুন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র দে এম্ এ, বি এল ৪ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
"	"	শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক এম্ এ, বি এল ২ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
"	"	শ্রীললিতমোহন বসু ১৩৭ অপার সার্কুলার রোড।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ ৩২ বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্যামলাল মল্লিক ২৬।১ "নন্দালয়", প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ দত্ত	শ্রীশ্যামাচরণ পাল	শ্রীঅমৃতলাল দত্ত ৩৪ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম শিক্ষা)
" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২। পাটীগণিত
	৩। বীজগণিত
	৪। জ্যামিতি
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫। প্রহ্লাদ উপাখ্যান
" মৃণালকান্তি ঘোষ	৬। কায়স্থ-সমাজের সংস্কার
	৭। মায়ের আহ্বান

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	৮। ৺জগবন্ধু ভদ্রের জীবন-কথা
	৯। গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহোৎসব
„ প্রফুল্লচাঁদ বসু	১০। ইংরাজী ১৮২২।২৩ ও ২৪ সালের আইন (খণ্ডিত),
	১১। আইন-সংগ্রহ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	১২। বিষ্ণুসহস্রনাম
	১৩। সনাতন ধর্ম্ম (১ম সংখ্যা)
	১৪। রামকৃষ্ণ পরমহংসনাং সদ্বচন।
Officer in charge Bengal Scott, Book Dept	15. Report on the Progress of Education in E. B. and Assam during 1907-08 to 1911-12 Vol 1.
	16. Do. Do. Voll II.
Supdt. Govt, Printing, India	17. Review of the Trade of India in 1913-14.
Do	18. Statistics of Cotton Spinning of Weaving in June 1914.
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	19. Annual Progress Report of the Supdt. Muhammadan and British Monuments, Northern Circle 1913
	20. Catalogue of the State University of Iowa 1912-13.
	21. The marriage question from the Hindu point of view.
	22. Do Do
	23. South Indian Inscriptions Vol II.
Officer in-charge, Bengal Scott. Book Depot.	24. Report on the Administration of Bengal 1912-13.
Registrar, University of Calcutta.	25. Calcutta University Minutes Vol 56 pt. 7.
	26. Do „ Vol 57 pt. 3.
	27. Do „ Vol 58 pt. I.
	28. Do „ Vol 58 of II.
	29. Calcutta University Calender pt. III. 1914.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ	30. Epigraphia Indica Vol 12. No 13. 1914.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Director, Geological Survey of India	31. Records Geological Survey of India Vol 44. pt. 2.
	32. Memoirs of the Geological Survey of India Vol 41. pt. 2.
	33. Do Do 42. of I.
Officer in-charge, Bengal Scott Book Depot	34. Bengal Dist. Gazetteers 24 Pergs.
	35. Dist, Gazetteers B Vol. Mymensigh, 1900-01 to 1910-11.
	36. Do Do, Noakhali Dist,
	37. Do Do Tippera Dist.

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভাপতির আদেশে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরি প্রেরিত "দেওপানি গোঁসানী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রবন্ধ-প্রেরককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুর রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশের—বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্রের বাঙ্গালা ভাষ্য প্রকাশের জন্য যে বিপুল অর্থ-সাহায্য করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় রাজা বাহাদুরের সাহিত্যপ্রচার-কার্য্যে বিপুল সাহায্য ও উদ্যমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রকৃতপক্ষে একজন সাহিত্য-বন্ধু। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইনি প্রাণস্বরূপ। ইঁহারই বিপুল দানে পরিষদের প্রধান কার্য্য "গ্রন্থ-প্রকাশ" অতি গৌরবের সহিত নির্ব্বাহিত হইতেছে। পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, পুস্তকালয় প্রভৃতি সকল বিভাগেই রাজা বাহাদুরের প্রচুর দান আছে। সম্প্রতি ইহার স্থায়ী ভাণ্ডারে ইনি এককালে ১৫০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ দান রাজার মত দানই বটে। যখন সাহিত্য-পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণ হয়, সেই সময়ে কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রায় সাত কাঠা ভূমি দান করেন এবং দেশের বদান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহাতে মাত্র একতালা বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট এই অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি আশার অতিরিক্ত—দ্বিতল নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় প্রায় ১০০৫৮৲ টাকা দান করেন। "গ্রন্থ-প্রকাশ" কার্য্যে তিনি যে ভাবে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন ও করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা যে কত দূর উন্নত হইয়াছে, তাহা সামান্য কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সংগৃহীত কয়েক সহস্র টাকা যখন কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশেই ফুরাইয়া যায়, তখন সে কথা রাজা

বাহাদুরের গোচরে আনয়ন করিলে তিনি ১৩১১ সাল হইতে প্রতি বৎসর তিন শত টাকা গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য দান করিতে আরম্ভ করেন। ১৩১৫ সাল হইতে ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেন এবং তদবধি প্রতি বৎসর পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে ৮০০৲ টাকা পাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন পুথি ও পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন। এই সকল সহায়তা ভিন্ন এক্ষণে রাজা বাহাদুর স্বব্যয়ে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় বেদান্তের শ্রীভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন এবং উহা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি উহার তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে রাজা বাহাদুরের দেড় হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। তিনি "গ্রন্থ-প্রকাশে" অকাতরে দান করিতেছেন এবং বেদান্তশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থেরও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই সহায়তা পাইয়া উপযুক্ত লোকের দ্বারা সমস্ত বেদান্ত-ভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া লইবেন ও উহা রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত হইবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা হইবে। ইহা পরিষদের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম, দশম শতাব্দীতে লিখিত যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থও রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত "সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা প্রকাশে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। লালগোলার রাজা বাহাদুর ঐ গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব পরিষদে দান করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর "বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী"র বন্ধকী তমঃসুক প্রায় ছয় হাজার টাকায় খরিদ করিয়া পরিষৎকে হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। এই সকল দানের জন্য কেবল সাহিত্য-পরিষৎ নহে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। মাতৃভাষার পুষ্টির জন্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য, বাঙ্গালীর কীর্ত্তিগাথা রক্ষার জন্য রাজা বাহাদুরের ন্যায় এমন মুক্তহস্তে বিপুল অর্থ দান করিতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। এই জন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। বলিতে কি, এ ধন্যবাদ প্রদান শব্দ কেবল সভার নিয়ম রক্ষাকল্পে ব্যবহৃত হইল মাত্র, কিন্তু এই শব্দের দ্বারা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না। বোধ হয়, ভাষায় এমন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা আমাদের মনের ভাব সুপ্রকাশিত হয়। আমার আর একটি প্রার্থনা এই যে, এই ধন্যবাদ দানের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রস্তাবটি অদ্যকার সভাপতির স্বাক্ষরিত হইয়া রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

অতঃপর অধ্যাপক-সদস্যের ন্যায় মৌলবী-সদস্য গ্রহণের জন্য পরিষদের নবম ও দশম নিয়মের পর নিম্নলিখিত নূতন নিয়ম বসিবে, স্থির হইল।

৫। নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্য লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইবে। যথা ;—

১। বিশিষ্ট সদস্য
২। আজীবন-সদস্য
৩। অধ্যাপক-সদস্য
৪। মৌলবী-সদস্য
৫। সাধারণ-সদস্য
৬। সহায়ক সদস্য

১০। মোক্তব ও মাদ্রাসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী ;—কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১১। মৌলবী-সদস্যের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না।

অতঃপর অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ, ডাক্তার শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল্ এম্ এস, ডাক্তার হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ ও যামিনীকান্ত বসু বি এল্, এই সকল সদস্যের পরলোক-গমনে যথারীতি শোক প্রকাশ করা হইলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া যথারীতি সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময় ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক "লঘুকালচক্রটীকা-বিমলপ্রভা" নামক পুথি। (পুথিখানি হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত।) (খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি। (গ) শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল্ এম্ এস্ ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের 'জব্বলপুরের ইতিবৃত্ত" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের "রঙ্গপুর-ভাষার ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ, (খ) তারাপ্রসন্ন মিত্র ও (গ) বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (ঘ) অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" যতীন্দ্রমোহন দত্ত
" অমৃতলাল দত্ত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত
" সরলকুমার বসু
" ললিতমোহন সিংহ

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" বাণীনাথ নন্দী
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" ননীগোপাল মজুমদার
" পূর্ণচন্দ্র সাহা
" মহিমচন্দ্র পাল
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" যাদবগোবিন্দ রায়
যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীগোবিন্দ রায়
„ বনমালী নাগ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ যতীন্দ্রমোহন বসু
„ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
„ অনন্তকুমার দাসগুপ্ত

শ্রীযুক্ত রামহরি ভড়
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ শ্যামলাল মল্লিক
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী ৫৩ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	„	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, আরামবাগ, হুগলী।
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, পি, ডব্লু, ডি, সেক্রেটারিয়েট, সিমলা।
„	„	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হরিভবন, সিমলা পাহাড়, ইষ্ট।
„	„	শ্রীশিবকালী মজুমদার ইউ, এস ক্লাব, সিমলা।
„	„	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় বিএ, বি টি ছোট-সিমলা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅনিলমোহন মুস্তফী লেজিস্‌লেটি ডিপার্টমেন্ট, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, সিমলা।
„	„	শ্রীআশুতোষ ঘোষ ছোটসিমলা, শিমলা পাহাড়।
„	„	শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় আর্কিওলজিক্যাল ডিরেক্টার জেনরেলের অফিস, সিমলা।
„	„	শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ ছোটসিমলা, পাঞ্জাব।
„	„	শ্রীহরনন্দন পাণ্ডেয় বিএ ইণ্ডিয়া আর্কিওলজিক্যাল ডিরেক্টর জেনারেলের আফিস, সিমলা।
„	„	শ্রীনটেশ আইয়র একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট, ঐ।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় সাহেব শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী রিটায়ার সিভিল সার্জ্জন, পুরুলিয়া।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	„	পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৬ সার্পেণ্টাইন লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ "যমুনা"-সম্পাদক, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজ।
„	„	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	„	শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এল্ বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী এম্ এ অধ্যাপক, মেট্রপলিটন কলেজ।
"	"	শ্রীনলিনচন্দ্র মিত্র ৪।১ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্যামবাজার।
"	"	শ্রীপান্নালাল দাস ১৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে এম্ এ, বি এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, বি এ, বি লিট (অক্সন), এম্ আর এ এস, পি এচ ডি ঐ ঐ।
"	"	শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিএস্ সি (লণ্ডন), এফ আর ই এস্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসুকুমার দত্ত এম্ এ ঐ ঐ। ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
"	"	শ্রীমুকুন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ১ হরীতকিবাগান লেন। ঐ ঐ।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্এ, বিএল্ রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্ এ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি ঐ ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ঐ ঐ।
„	„	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ ঐ ঐ।
„	„	শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ ঐ ঐ ।
„	„	শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	„	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম্ এ অধ্যাপক, সিনেট হাউস।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবঙ্কিমবিহারী গুপ্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবামাচরণ মজুমদার ২।১।১ আণ্টনীবাগান লেন।
„	„	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "নাট্যমন্দির"-কার্য্যালয়, ১৪৪।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানান হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	১। কাহিনী
„ ভুজঙ্গভূষণ রায়	২। নিত্যানন্দ-চরিতামৃত
„ কুলদাচরণ সরকার	৩। তৃষা
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪। মালা
„ তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	৫। পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
	৬। ৭ম এড্ওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ
	৭। তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত
	৮। প্রেম-সংহিতা
	৯। প্রসাদ পাঠ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	১০। হরিনামামৃত রস
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১১। সার্ভে অব সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি
„ প্রফুল্লকুমার বসু	১২। রোসেনা
„ সুখেন্দ্রলাল মিত্র	১৩। নবনাটক
	১৪। শাক্যসিংহ-প্রতিভা
	১৫। আটাকাটি
	১৬। চিরসন্ন্যাসিনী
	১৭। প্রভাত-কুসুম
	১৮। শুক-বিলাস
	১৯। প্রসাদ-পদাবলী
	২০। সবিতা সুদর্শন
	২১। প্রার্থনা (১ম ভাগ)
	২২। সাধু অঘোরনাথের জীবন-চরিত
	২৩। আর্য্যমহিলা (১ম খণ্ড)
	২৪। গৃহকর্ম্ম
	২৫। ললনা
	২৬। পুলিশ-কার্য্য সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর
	২৭। সূক্ষ্ম কালি কথা (খণ্ডিত)
	২৮। শ্রীমদ্ভাগবত (খণ্ডিত)
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	২৯। বিশ্বকোষ (১৫শ খণ্ড)
„ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৩০। মর্ম্মগাথা
„ কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১। অসাধারণ প্রেম-প্রতিভা
	৩২। মৃত্যুবিজয়
„ বিনোদবিহারী রায়	৩৩। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (২য় খণ্ড)
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৩৪। যামেন্দ্র ঠাকুর সমালোচনা
	৩৫। সন্দেহ-নিরসন
	৩৬। অশৌচ সমালোচনা
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩৭। কর্ম্মযোগী শশিপদ
	৩৮। এমার্সন সন্দর্ভ
	৩৯। প্রাচ্যবিজ্ঞান

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ৭ম অধিবেশন, দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
	৪১। জ্বরতত্ত্ব ও কীটাণুতত্ত্ব
" যতীন্দ্রমোহন বসু	৪২। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা
" চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	৪৩। মুকুল
	৪৪। মোহমুদ্গর
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪৫। নীতিমালা
	৪৬। শারীরক-ভাষ্যং
	৪৭। মহাভারতং (১ম ভাগ, আদি, সভা, বন পর্ব্ব)
" নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী	৪৮। ভক্তিরসায়নং
	৪৯। শ্রীমদ্ভাগবতং (১ম—৩য় সংখ্যা)
	৫০। ঐ (১০ম স্কন্ধ সম্পূর্ণ)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫১। জাপানের অভ্যুদয়
	৫২। তত্ত্বপরিচয়
	৫৩। গীতাঞ্জলি-সমালোচনা-প্রতিবাদ
	৫৪। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু
	৫৫। মালদহের রাধেশচন্দ্র
	৫৬। জঙ্গলী মেয়ে
	৫৭। মহাভারত—(বিরাট পর্ব্ব)
	৫৮। মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির প্রথম বর্ষ
	৫৯। মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন
	৬০। শিক্ষাবিজ্ঞান, ৩য় বিভাগ, সংস্কৃতশিক্ষা
	৬১। স্বল্পব্রহ্মচর্য্যবিধি
	৬২। চারুচর্য্যাশতক
	৬৩। উপাখ্যানমালা
Superintendent, Govt. Printing, India	64. Report of the Chief Inspector of Mines in India for 1913.
Curator, Govt. Book Dept. of Burma.	65. Report of the Supdt. Archaeological Survey of Burma for 1914.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Superintendent, Govt. Press Madras.	66. Annual Report of the Archaeological Dept, Southern Circle, Madras 1913-14.
Do	67. Epigraphy (G. O. No 92014. 813).
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	68. Minutes of Calcutta University for 1874-75.
	69. Do 1875-76.
	70. Do 1875-77.
	71. Do 1877-78.
	72. Do 1879-80.
	73. Do 1880-81
	74. Do 1881-82.
Officer in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	75. 52nd Annual Report of the Govt. Cinchona Plantations for 1913-14.
শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	76. Ascension of Edward VII to Heaven.
Govt. of India, in the Mecorological Deptt.	77. Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Govt. of India, 1913-14.
Superintendent, Govt Printing India.	78. Annual Report of the Archaeological Survey of India 1910-11
	79. Statistics of Cotton Spinning & Weaving April to July 1914.
Officer in-charge, Bengal Sectt, Book Dept	80. Report on Sanitation in Bengal for 1913.
	81. Ninth Triennial Report on vaccination in Bengal for 1911-12 to 1913-14.
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু	82. The Education that India needs at present.
পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ	83. Iron in Ancient India.
Superintendent, Govt. Printing, India.	84. Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills for Aug 14.
	85. Antiquities of Indian Tibet Part I.
Officer in-charge, Bengal Sectt, Book Depot	86. Report on the Salt Dept. in Bengal 1913-14.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	87. Preparation of the Nitrites of Primary, Secondary & Tertiary Amines by the interaction of the Hydrocolorides of the bases and *Alkali Nitrites.*
	88. Elevation of the massses & the Depressed classes.
	89. How to be a great orator.
	90. Principles of Trigonometry.
	91. Address by Lord Carmichael at the Annual Convocation 1914.
	92. Address at the Foundation Stone ceremony of the University College of Science 1914.
	93. Report of the National Council of Education.
	94. Report of the Dacca University Committee 1912.
Offieer in-charge, Bengal Seott, Book Depot	95. Report on the administration of the Excise Dept. in Bengal 1913-14.
	96. Report on the Police Administration in Bengal for 1913.
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু	97. A letter to Sir William Windham.
Officor in-charge, Bengal Sect, Book Depot	98. Administration Report on Jails of the Bengal Presidency for 1913.

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—গত মাসে কয়েকখানি পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে ;—

১। গোবিন্দলীলামৃত
২। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা
৩। রূপ-সনাতন-সংবাদ
৪। পদাবলী
৫। ভক্তিচিন্তামণি
৬। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
৭। ভগবদ্ভক্তি-রত্নাবলী
৮। ছন্দোমঞ্জরী
৯। তুলসীচন্দ্রিকা
১০। জগন্নাথবল্লভ নাটক
১১। ভাগবতামৃত-কণিকা

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—

১২। হরিভক্তি-উদ্দীপন

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য—

১৩। রসকদম্ব

"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" পুথি সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা আছে। এই পুথিখানি মহারাজ নবকৃষ্ণের কনিষ্ঠা পত্নীর পাঠের জন্য লিখিত হয়। তিনি এখানি নিয়মমত পাঠ করিতেন। ঘটনাচক্রে পুথিখানি গগনেন্দ্র বাবুর হস্তগত হয়। তিনি অপর কয়েকখানি পুথির সহিত এখানিও সাহিত্য-পরিষদের লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি আমাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার "লঘুকালচক্রটীকা-বিমলপ্রভা" নামক যে পুথি দেখাইবার কথা ছিল, তাহা হইল না; সম্ভবতঃ আগামী মাসিক অধিবেশনে তাহা দেখাইবেন। অতঃপর পুরুলিয়ার ডাক্তার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—"মূর্ত্তিটিকে পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া এখন মনে হইতেছে। তবে বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় পরীক্ষা না করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে এখন আর অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না।"

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছেন, ইহা অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি নয়। এটি মহারাজ-লীলায় অবস্থিত গুহামন্দিরমধ্যস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি।

তৎপরে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি তাম্রমুদ্রা দেখাইবার যে কথা ছিল, তাহাও হইল না। কারণ, মুদ্রাগুলি এখনও বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—অদ্যকার সভায় দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার কথা ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয়ের 'জব্বলপুরের ইতিবৃত্ত" পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা পরে জানিতে পারিয়া উক্ত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদের বিধি অনুসারে পরিত্যক্ত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের "রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিতেছেন,—এ প্রবন্ধ পরিষদের রঙ্গপুর শাখায় পঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন সকল প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন এই প্রবন্ধও এই সভায় পঠিত হইতে পারে। লেখকের পিতৃদেব বহু কাল পূর্ব্বে রঙ্গপুর ভাষার একখানি ব্যাকরণ-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক তাঁহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গপুরে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দের রূপ, ধাতু প্রত্যয়, সমাস, অব্যয় পদ, বাক্যবিন্যাস, লৌকিক প্রয়োগ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়া এ বিষয়ের

ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে অনুরোধ করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য পত্র দান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কামতা বিহারী ভাষার শব্দ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন বাবুও রঙ্গপুরের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবেন, বলিয়াছেন। ইঁহাদের দুই জনের পরিশ্রম-ফল একত্র করিলে রঙ্গপুরের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইবে। এ বিষয়ে আমি উভয়ের নামেই পত্র-ব্যবহার করিতেছি। এই সকল বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দরূপের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা নির্ণীত হইয়া ক্রমে একখানি প্রাদেশিক শব্দার্থ-বোধ প্রণয়নের উপকরণ সংগৃহীত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—গত ১০।১২ বৎসর হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন। প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শব্দের ব্যাকরণ সংগ্রহও প্রয়োজনীয়। কারণ, এই সকল লইয়া ক্রমে প্রাদেশিক শব্দসমূহের একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান সম্পাদিত হইতে পারিবে। এই জন্য অদ্যকার প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও বিশেষ ভাবে আদরণীয়। এই জন্য প্রবন্ধলেখক এই সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন ;—

১। রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর
২। তারাপ্রসন্ন মিত্র
৩। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল
৪। অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন যে, ইঁহারা সকলেই সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-দিগের মধ্যে সুপরিচিত। হরিমোহন বাবু শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের শিক্ষক ছিলেন। রামেন্দ্র বাবুর মুখেই প্রথমে ইঁহার পরলোকগমনের সংবাদ পাই। ইনি পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। "বেঙ্গলী" কাগজের অধ্যক্ষ তারাপ্রসন্ন মিত্রের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন এবং সাহিত্য-জগতে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম নহে। তাঁহার অভাবে বেঙ্গলী পত্রের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের একজন সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। বহু মাসিক পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। "পূর্ণিমা" পত্রের সম্পাদন-ভার এক প্রকার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তিনি সুবক্তা ও দেশ-সেবায় একজন নেতা ছিলেন। চুচুঁড়া সাহিত্য-সম্মিলনে বিষ্ণু বাবুর কৃতিত্ব অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক কালীপদ বসুর নাম আবালবৃদ্ধ সকলে জানেন। তাঁহার প্রণীত Algebra Arithmetic আজকাল বিদ্যালয়ে বহু প্রচলিত। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গের একজন খ্যাতনামা গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হইল, বলিতে হইবে। আমি প্রস্তাব

করিতেছি, এই পরলোকগত ব্যক্তিদিগের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের পক্ষ হইতে অদ্যকার এই শোক-প্রকাশক প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরলোকগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনের নাম বাদ পড়িয়াছে। ঢাকা-সারস্বত সমাজের অগ্রণী মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর ইহ-জগতে নাই। তাঁহার বিয়োগে পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যদিও ইনি সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন না, তথাপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাঁর পরলোকগমনে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। কারণ, ইনি যেমন সংস্কৃত বিদ্যার জন্য সারস্বত-সমাজের উন্নতির চেষ্টা করিতেন, তেমনি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া মাতৃভাষারও সেবা করিতেন। ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা ইহাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, মাতৃভাষার প্রতি ইহাঁর কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। এই প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—সার তারকনাথ পালিত পরিষদের সদস্য না হইলেও তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে যে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের যে বিশেষ ধন্যবাদার্হ, তাহা কেহই বোধ হয়, অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, অদ্যকার সভায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হউক এবং উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করুন। খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব-মত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—সার্ তারকনাথ পালিতের নাম বাদ যাওয়া একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়া খগেন্দ্র বাবুও আমাদের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২০শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই কর্ত্তৃক "লঘুকাল-চক্রটীকা-বিমলপ্রভা" নামক পুথি (পুথিখানি হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত।) (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত "হরিভক্তি-উদ্দীপন" নামক পুথি। (গ) শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত হরিদাস ঠাকুরের পাটের চিত্র। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ধর্ম্মপূজাবিধি নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য"। (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের "রাঢ়-ভ্রমণ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের "সুবর্ণবিহারের স্তূপ" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ
" নিখিলনাথ রায়
" পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" মোহিনীমোহন দত্ত বিএল
" অম্বিকাচরণ গুপ্ত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" করুণাচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়
" যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
" ননিগোপাল মজুমদার
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
" বাণীনাথ নন্দী
" কুঞ্জলাল দত্ত
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" ললিতমোহন দে
" বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য
" ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ,
" রামকমল সিংহ
" শ্রীকৃষ্ণহরি দাস
" শিশুপদ দাস
" রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
" প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য
" নন্দদুলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত
" সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী
" শ্রীশচন্দ্র রায়
" হৃষীকেশ ঘোষ
" কালীপদ চন্দ্র
" মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
} সহকারী সম্পাদক

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র বি ই ১৭৩এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রো।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র গোস্বামী অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার। আসাম সেক্রেটারিয়েট, শিলং, আসাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	রায়সাহেব শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু ২৯।১০ মদনমিত্রের লেন।
শ্রীনিখিলনাথ রায়	"	শ্রীমন্মথনাথ রায় বরাকর, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীবিষ্ণুচরণ সেন জমিদার, বহরমপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় পুঁড়া, ২৪ পরগণা।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস	১। অরণ্যবাস
„ কৃপাশরণ মহাস্থবির	২। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার ২২শ কার্য্যবিবরণী
	৩। ঐ
„ মুন্সী আজিজুদ্দিন আহম্মদ	৪। কৃষক-বন্ধু
„ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। অহল্যা বাঈ
„ নলিনীকান্ত ভট্টশালী	৬। ময়নামতীর গান
„ সতীশচন্দ্র মিত্র	৭। যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড)
„ বামাপদ চট্টোপাধ্যায়	৮। বৃহৎ সারাবলী (১ম খণ্ড)
	৯। ঐ (২য় খণ্ড)
„ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০। ব্রহ্মপুত্র
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১১। ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা
„ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১২। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ
	১৩। রায় রামানন্দ
	১৪। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
„ বিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৫। গীতগোবিন্দ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৬। ধ্যানলোক
	১৭। রবীন্দ্র-প্রতিভা
	১৮। শ্রীশ্রীনাথ সেন
	১৯। জীবনীশক্তি
	২০। নীতিচন্দ্রিকা
	২১। দময়ন্ত
	২২। কোকিলদূতং
„ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২৩। ঠান-দিদির থ'লে
	২৪। দাদা মহাশয়ের থ'লে
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৫। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তি-পঞ্জিকা
	২৬। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু
	২৭। নোট লিখিবার পদ্ধতি ও আদর্শ
	২৮। শ্রীগৌরভূমিগ্রন্থাবলী (৭ম, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)
„ কৈলাসচন্দ্র সিংহ	29. Epigraphia Indica Vol I.
	30. *The Gupta Inscriptions Vol III.*

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	31.	Archaeological Survey of India Vol III.
	32.	A Record of the Buddhist religion.
	33.	Budhist Records of the Western World Vol I.
	34.	Do. Do. Vol II.
	35.	Journal, Royal Asiatic Society Vol 20, Part I. 1888.
	36.	Do Do Vol 20, Part II.
	37.	Do Do " III.
	38.	Do Do " 21, Part I.
	39.	Do A. S. B. " 48, Part I. 1879
	40.	Do " 67, Part I.
	41.	Do " 49 " 1.
	42.	Do " 52 " 1.
	43.	Do " 54 " 1.
	44.	Do " 39 " 1.
	45.	Do " 38 " 1.
	46.	Do " 35 " 1.
	47.	Do " 50 " 1.
	48.	Do " 53 " 1.
	49.	Do " 45 " 1.
	50.	Do " 47 " 1.
	51.	Do " 42 " 1.
	52.	Do " 43 " 1.
	53.	Do " 37 Part 1. No 1 & 2
	54.	Do " 17 " 1.
	55.	Do No 175 of 1846, No 3 of 1851
	56	Do Vol 36, Part 1.
	57.	Do " 72 " 1.
	58.	Do " 44 " 1.
	59.	Do " 73 " 1.
	60.	Do " 40 " 1.
	61.	Do " 46 " 1.
	62.	Do " 41 " 1.
	63.	Do " 42 – 1873
	64.	Do January to Decr 1874.
	65.	Asiatic Researches Vol II.
	66.	Calcutta Review " II.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	

67. Calcutta Review Vol IX.
68. Do Vols 15, 35, 55 & 59.
69. Do Vol 18 No 35
70. Do 23 „ 45
71. The Indian Mussalmans.
72. Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883.
73. Archaeological Survey Reports Vol II.
74. The Oriental Baptist, Vol 9, 1855.
75. Calcutta Review Vol 75—1882.
76. Do „ 66 No 132.
77. Report on the Portuguese records relating to the East Indies.
78. Memoirs on the History, Folk-lore of N. W. Provinces of India, Vol. I.
79. Essay on Productive resources of India
80. Indo Aryans.
81. Hand-book of Archaeological collections in Indian Museum Pt I
82. Do Do „ II.
83. Maithili language of North Bihar.
84. Indian Infanticide.
85. Life and legend of Gautama.
86. Aryan Witness.
87. History of India as told by its own historians Vol I.
88. Archaeological Survey Reports Vol 8.
89. Travels of Marco Polo.
90. Bernier's Moghul Empire Vol I.
91. History of Maritime & Inland discovery Vol I.
92. Travels of a Hindoo Vol 1.
93. Do II.
94. Roe & Fryer's Travels in India in the 17th Century.
95. Rajputana Gazetteer Vol I
96. Do II.
97. Dow's History of Hindustan Vol II.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	98. Dow's History of Hindustan Vol. III.
	99. Archaeological Survey Reports Vol VII.
	100. Stewart's History of Bengal.
	101. Wild tribes of India.
	102. *Journal A. S. B. Vol 35 pt II. 1866.*
	103. Progs of the A. S. B. Jan. to Dec. 1871.
	104. Do „ Jan. to „ 1875.
	105. Journal A. S. B. Pt I 1870 „
	106. Do Vol 55 part, I 1886.
	107. Historians of Mahammedan India Vol 1.
	108. Asiatic Researches Vol I
	109. History of Cooch Behar.
	110. The Oriental Baptist Vol 8.
	111. *Do* „ 11.
	112. Memoir of a Map of Hindustan.
	113. History of Hindu Civilisation.
	114. Hind Rajsthan.
	115. Gazetteer of the territories under the East Indian Company.
	116. Dictionary of Religious Ceremonies of the Eastern Nations.
	117. Celestial objects.
	118. *Hindu tribes and castes in Benares.*
	119. Census of British India Vol III. 1881.
	120. Archaeological Survey of India Vol 29.
	121. The Hill Tracts of Chittagong.
	122. History of the N. E. Frontier of Bengal.
	123. Tod's Rajasthan Vol I.
	124. Do II.
	125. Fragments of the Indika of Megasthenes.
	126. Ayeen Akbary Vol I.
	127. Munnipore Political Agency for 1868-69.
	128. Do 1873.
	129. Do 1874-75.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	130. Seeley's Introduction to Political Science.
	131. Hemchandra Memorial Series, pt I.
	132. Social problem, pt. I.
	133. Lord Ripon in India.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	134.	Steps to a University.
	135.	Co-operative Credit Movement in India.
	136.	Footprints or Every Boy's book.
	137.	Address at the Convocation 1914.
	138.	Life story of Sebabrata Sasipada.
	139.	Journal of Buddhist Text pt II. 1894.
	140.	Do pt II. 1895.
	141.	Do pt I. 1896.
	142.	Do Vol 7. pt II. 1901.
	143.	Buddhist Texts fasc. I. 1896 (সমাধিরাজসূত্রম্)
	144.	Do faso II. 1898 (করুণাপুণ্ডরীকং)
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Dept.	145.	Report on Public Instruction in Bengal for 1912-13.
	146.	Supplements to 1912-13.
Messrs. Thacker Spink & Co	147.	Great Britain & the European crisis.
Manager, Govt. Monotype Press Simla.	148.	Forest Administration in 1912-13.
Supdt, Govt. Press, Madras.	149.	Catalogue of Govt. Publications No 27.
Officer in charge, Bengal Sect, Book Depot	150.	Triennial report on the working of Hospitals & dispensaries in Bengal for 1911 to 1913.
Suptd. Govt. Printing, India.	151.	Cotton Spining & Weaving in Sept. 14.

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "লঘুকালচক্রবিমলপ্রভা" নামক পুথি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—এত পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরের গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। এই টীকাখানি হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে (৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) যশোহর জেলায় "বেজ" নামক নদীতীরবর্ত্তী স্থানে লিখিত। পুথিখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার অধিকাংশ অক্ষরের আকৃতি বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরের আকৃতির সমান। এই সময়ের রাজসাহী অঞ্চলের লেখায় বাঙ্গালা অক্ষরের যে আকৃতি দেখা যায়, তাহা এখনকার আকৃতি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। সুতরাং অক্ষরের আকৃতির প্রাচীনত্ব বিচারেও এ পুথিখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুথির যে দুইটি পত্রে তারিখ এবং স্থানের পরিচয় আছে, সেই দুইটি পাতের ফটোগ্রাফ লইয়া রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। "কালচক্র" একখানি বৌদ্ধ সঙ্গীতি-গ্রন্থ।

উহা বুদ্ধ-বচন-সংগ্রহ। বুদ্ধ কি বলিয়াছিলেন, তাহা তখন কেহ লিখিয়া রাখেন নাই। শ্রুতি-পরম্পরায় সেই-সকল বচন চলিয়া আসিতেছিল। তাহার অধিকাংশই গদ্য। এখানি পদ্য, স্রগ্‌ধরা ছন্দে লিখিত। টীকার গ্রন্থকারের নাম পুণ্ডরীক। তিনি এই গ্রন্থে বলিয়াছেন, আমি অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায় অর্থাৎ অবতার। তিনি আরও বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বলিয়াছিলেন, তাহা কে জানে ? তবে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পশু, পক্ষী, মানব, সকলেই বুঝিয়াছিল। সুতরাং তাহার নাম সর্ব্বজ্ঞ ভাষা বলা যায়। মানবের মধ্যে বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্ন ভাষায় বুদ্ধ-বচন পাওয়া যায়। মগধের জন্য মাগধী ভাষায়, সিন্ধুর জন্য সৈন্ধবী ভাষায়, রুম্ম দেশের জন্য রুম্ম ভাষায়, চীন দেশের জন্য চীন ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন। রুম্মদেশ এখনকার রোম। চীন দুইটি—মহাচীন (এখনকার যেমাচীন) এবং চীন (এখনকার আনাম)। এই প্রসঙ্গে খেতা নদীর উল্লেখ আছে। খেতা বর্ত্তমান চীনের হোয়াংহো নদীকে বুঝায়। পুণ্ডরীক আরও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা বড় দুষ্ট। ভাষাকে ব্যাকরণের বান্ধনীতে বাঁধিতে গিয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে ভাব ফুটাইতে দেয় নাই, স্পষ্ট কথা বলিতে দেয় নাই। সেই জন্য আমি ভাষাকে কোনরূপ ব্যাকরণের শৃঙ্খলে বাঁধিব না। বাস্তবিক তিনি তাই করিয়াছেন। তাঁহার টীকায় উত্তম পুরুষের কর্ত্তায় প্রথম পুরুষের ক্রিয়া, বহু বচনের স্থানে একবচন, পুংলিঙ্গের স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি যত প্রকার গণ্ডগোল করিতে হয়, তাহা তিনি করিয়াছেন। অথচ সংস্কৃত ভাষাতেই তিনি লিখিয়াছেন। অর্থ-সরলতাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। তাহার জন্য তিনি কিছুই মানেন নাই। এই টীকাখানির অনুবাদ ভোট-ভাষায় আছে। মূলের অনুবাদও নাই এবং মূল পুথিও কোথা পাওয়া যায় নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত "হরিভক্তি-উদ্দীপন" নামক পুথি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার লিখিত ঐ পুথির পরিচয়-প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রাগুলির যে পরিচয় দিয়াছেন, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

১। প্রাচীন তাম্র কার্ষাপণ—কোন চিহ্ন অঙ্কিত নাই।

২। " " " (ছাঁচে ঢালা) এক পৃষ্ঠে—হস্তী ইত্যাদি (অস্পষ্ট)
অপর পৃষ্ঠে—বোধিবৃক্ষ, সুমেরু ও বিশ্বরদেশীয় ক্রস।

৩। " " " " এক পৃষ্ঠে—বোধিবৃক্ষ, সুমেরু ও গ্রীক ক্রস।
অপর পৃষ্ঠে—অস্পষ্ট।

৪। " " " " এক পৃষ্ঠে—সুমেরু।
অপর পৃষ্ঠে—হস্তী।

৫। প্রাচীন তাম্র কার্ষাপণ (ছাঁচে ঢালা) এক পৃষ্ঠে—সুমেরু, বোধিবৃক্ষ ও কুশময় ব্রাহ্মণ (অন্য মতে মিশরদেশীয় ক্রস Symbol of life) অপর পৃষ্ঠে—হস্তী ও স্বস্তিক।

৬। " " " " এক পৃষ্ঠে—হস্তী, মিশরদেশীয় ক্রস, [Crux Ansata, Symbol of Life, ব্রাহ্মী "ম" Tourine symbol] দ্বিতীয় পৃষ্ঠে—বোধিবৃক্ষ ও ক্রস (Greek cross)।

৭। জৌনপুরের শার্কীবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম শাহ্‌র তাম্রমুদ্রা—হিজরী ৮৪১।

৮। জৌনপুরের শার্কীবংশীয় সুলতান মহম্মদ শাহ্‌র তাম্রমুদ্রা—(৩টি মুদ্রা) রাজ্যকাল ১৪৪০—১৪৫৮।

৯। খিলজীবংশীয় আলাউদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌র তাম্রমুদ্রা—(সুরিত্রাণ শ্রীঅলাবদীন)।

১০। বাদশাহ ২য় শাহ্‌ আলমের নামাঙ্কিত লক্ষ্ণৌএর নবাব উজীরবংশের তাম্রমুদ্রা—রাজ্যাঙ্ক ২৬, হিজরী ১২০১।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়-প্রদত্ত হরিদাস ঠাকুরের পাটের ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ধর্ম্মপূজা-বিধি" নামক পুথি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—ননী বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। এ জন্ম তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ধর্ম্মপূজা যে বুদ্ধপূজা, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সংপ্রতি "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ধর্ম্মপূজা যে শিবপূজা, তন্ত্র হইতে তাহার প্রমাণ দিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন লৌকিক ব্যবহারে ধর্ম্ম কোথাও শিবরূপে এবং কোথাও বিষ্ণুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। কেবল তন্ত্রের প্রমাণেই ধর্ম্মপূজাকে শিবপূজা বলা যাইতে পারে না। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরাও অনেক দেব-দেবীর পূজা করিতেন। রামচরিতে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ নরপতি রামপালও আপনাকে 'চণ্ডীচরণশরণপরায়ণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্যের স্তব করিয়াছেন। সে সময়ও আমাদের এখনকার মত অনেকে বহু দেবপূজা করিতেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় যে রকমে ধর্ম্মপূজাকে বুদ্ধ-পূজার অবশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কারণ, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এখন যে জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব, সেই বর্দ্ধমান জেলায় আমি কার্য্যোপলক্ষে থাকি। বর্দ্ধমানের যে অঞ্চলে আমি থাকি, তাহার চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা হয়। সাধারণতঃ সকল স্থানেই নীচ-জাতীয় পূজকের সংখ্যাই বেশী। বৈশাখী পূর্ণিমায় কোথাও

কোথাও ব্রাহ্মণ পূজকে পূজা করিয়া থাকে। সকল গ্রামের পূজা আমি দেখি নাই, দু এক স্থানে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অন্তকার এই পদ্ধতি অনুসারের পূজা নহে। শূন্যপুরাণ-মতেও হয়। তবে ইহারও কিছু আছে, আবার নূতন ব্যবস্থাও আছে। রাণীগঞ্জ, আসানসোল, এখোড়া, ডামড়া প্রভৃতি গ্রামে ধর্ম্মের গাজনের খুব ধুমধাম হয়। এমন কি, ডামড়ায় দুর্গোৎসব হয় না। সেখানে ধর্ম্মোৎসবের অর্থাৎ গাজনের সময় দুর্গোৎসবের মত ছেলে-মেয়েদের নূতন কাপড় দেওয়া হয়, বৌ-ঝিকে আনা-নেওয়া করে। ডামড়ার ধর্ম্মের ডাক অর্থাৎ প্রভাব বড় বেশী। অনেকে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই ধর্ম্মের কাছে মানত করিয়া থাকে। কাশীমবাজার-রাজের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য একবার এই ধর্ম্মের পূজা দিয়া সাজ্যাতিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর অনু-গ্রহে সেই ধর্ম্মঠাকুরের ঘরটি দালান হইয়াছে। এই ধর্ম্মের মন্দিরেই গ্রামের সকল উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক পারিবারিক শুভ কর্ম্মেও এই মন্দিরেই গ্রামবাসীরা যত কিছু মানত করিয়া থাকে। ধর্ম্মনিরঞ্জন নামে গ্রামের সকল কার্য্যে ডাক পড়ে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—এই পুথিখানি তালপাতে লিখিত। ১৬শ কি ১৭শ শতাব্দীতে এখানি সঙ্কলিত। গ্রন্থকার কে, জানা নাই। তবে "বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ" দেখা যায় অর্থাৎ রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া ধর্ম্মকে হিন্দু ঠাকুর করা হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুর যে শিব নহেন, তাহা এই পদ্ধতি হইতেই দেখা যাইতেছে। ইহাতে শিব একজন আবরণ-দেবতারূপে পূজা পাইয়াছেন। কলিকাতার তালতলায়, কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে, জোড়াসাঁকোয়, বলরাম দের ষ্ট্রীটে দুইটি বড় ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে। ও পারে শালিখায় ধর্ম্মতলায় ধর্ম্মঠাকুরের খুব বেশী ডাক। অন্যান্য সমস্ত কথার আলোচনা পুথি ছাপা হইলে হইবে। কবি চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবীর পূজা করিতেন, অনেকে তাঁহাকে বিশালাক্ষী দেবী বলেন। এই পুথিতে দেখা গেল, বাশুলী ও বিশালাক্ষী স্বতন্ত্র দেবতা। এই পুথিতে বাশুলীকে মঙ্গলচণ্ডীও বলা হইয়াছে। নান্নুরে চণ্ডীদাসের পূজিতা বলিয়া যে বাশুলী দেবীর মন্দির আছে, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহার ফটোগ্রাফ আনা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সে দেবী চতুর্ভুজা, বীণাপাণি ও হংসবাহিনী। কাজেই এ পুথির বাশুলীর ধ্যানের সহিত এ প্রতিমার মিল হইতেছে না। সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গলে যে বলুকা নদীর কথা পাওয়া যায়, বর্দ্ধমানের মাইল দুই তফাতে যে ছোট নদীটি ঘুরিয়া আসিয়াছে, লোকে তাহাকেই বলুকা বলে। বড়োঞা গ্রামের নীচে এই নদী বেশ বহতা আছে। সেখানকার ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির এক সময়ে প্রকাণ্ড ছিল। সেই প্রাচীন মন্দিরের কীচক ও আমলক নিকটেই পড়িয়া আছে। মুখী পণ্ডিত অর্থাৎ মোক্ষদা নাম্নী স্ত্রীলোক সেই ধর্ম্মের পূজা করে। সে জাতিতে ডোম পণ্ডিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল,—আমিই সকল পূজা করি, কেবল বড় পূজা অর্থাৎ গাজনের সময় ব্যাকরণ জানা পণ্ডিত আসেন অর্থাৎ সে সময় ব্রাহ্মণে পূজা করে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য

সম্বন্ধে বলিলেন,—গত বিজয়ার পরদিন রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির ও বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব দর্শনে গমন করি। একদল রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রদত্ত হস্তি-পৃষ্ঠে পানাগড় হইতে সেনপাহাড়ী পরিদর্শন করিয়া কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হন। আমরা বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের একান্ত যত্নে ও উৎসাহে হেতমপুর হইয়া কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হই। আমাদের যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় হেতমপুরের মহারাজকুমারই সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়াছিলেন। জয়দেব-কেন্দুলীর মোহান্ত আমাদের সকলের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতেও আমরা একটি হস্তী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রথমে জয়দেবের সিদ্ধিস্থান দেখা হয়। পরে আমরা সকলে দুইটি হস্তীতে চড়িয়া কেন্দুলী হইতে যাত্রা করিয়া লাউসেনতলা, প্রতাপপুর, উদয়পুর, সেনপাহাড়ীর গড়জঙ্গল, শ্যামরূপার গড়, ইচ্ছাই ঘোষের দেউল, বিল্বমঙ্গলের গৃহাশ্রম, চিন্তামণির স্মৃতি প্রভৃতি দর্শন করি। তখনও মাঠের সর্ব্বত্র জল ও অপক্ক ধান্যে পরিপূর্ণ থাকায় সকল স্থান পরিদর্শনে সুবিধা হয় নাই। তবে যাহা দেখিলাম, তাহাতে এখানকার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, বলিতে হইবে। এখনও স্থানীয় প্রাচীনেরা লাউসেনতলা হইতে প্রতাপপুর পর্য্যন্ত অজয়তীরস্থ ভূখণ্ডকে প্রাচীন 'ঢেকুর' বলিয়া জানেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে নির্ম্মিত ইছাই ঘোষের দেউল এখনও বঙ্গীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করিতেছে। ইছাই ঘোষের দেউলের চূড়া ও শিরোভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখনও যাহা অভগ্ন ও ঠিক আছে, তাহার উচ্চতা ৫০ ফুটের অধিক হইবে। আমরা যে যে স্থান দর্শন করি, তাহার ছায়াচিত্র লইয়া আসিয়াছি। ইছাই ঘোষের দেউলের চিত্র দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ইছাই ঘোষের মন্দিরটিকে ভারতীয় আর্য্যস্থাপত্যের Indo-Aryan architecture নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নানা অসুবিধায় সকল স্থান ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। শীঘ্রই আমরা পুনরায় সেনভূম ও সেনপাহাড়ীর অনুসন্ধানে বাহির হইব এবং অনুসন্ধানের ফল ভবিষ্যতে সবিস্তার প্রকাশ করিব।

অতঃপর নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংগৃহীত ফটোগ্রাফগুলি প্রদর্শন করিলেন। কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইছাই ঘোষের দেউলের ছবি দেখিয়া বলিলেন,—বাঙ্গালা দেশের ইষ্টকালয়ের মধ্যে এরূপ প্রাচীন মন্দির কমই আছে। ইহা সম্পূর্ণ Indo-Aryan ধরণের নির্ম্মিত। ইহাতে মুসলমানী ধরণের কোনও চিহ্নই নাই। এই মন্দিরটি রক্ষা করিতে পারিলে একটি প্রাচীন বিশুদ্ধ বাঙ্গালী-কীর্ত্তি রক্ষা করা হইবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—ইছাই ঘোষের ইষ্টদেবী শ্যামরূপা এখন কল্যাণেশ্বরী নামে বরাকরের নিকট কল্যাণকুট পর্ব্বতে আছেন। বরাকরে প্রবাদ এই,

চেকুর অঞ্চলের রাজা বল্লালের কন্যার সহিত পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণশেখরের বিবাহ হয়। রাজা শ্যামরূপা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্বশুরের নিকট উহা প্রার্থনা করেন। রাজকন্যাও দেবীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ছিলেন; তিনিও দেবীকে ছাড়িয়া যাইতে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। রাজা কাজেই কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ দেবী দান করিলেন। রাজা কল্যাণশেখর দেবী লইয়া যাইতে যাইতে পথে কল্যাণকূট পর্ব্বতে কোনও দৈব বিপাকে পড়িয়া ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদবধি দেবী সেইখানে আছেন। প্রবাদ যাহাই হউক, পঞ্চকোটের রাজবংশের তালিকায় রাজা কল্যাণশেখরের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং এ প্রবাদে সত্য কি আছে, বলিতে পারি না।

অতঃপর পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার সরকার সুবর্ণবিহারের স্তূপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই যুবক ছাত্র-সভ্যটি নিজে উক্ত স্তূপ দেখিয়া আসিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—সুবর্ণবিহার যে বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বহু প্রাচীন কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় এই ভগ্ন স্তূপকে বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া জানিয়া আসিতেছি। ইহার নাম সুবর্ণবিহার কেন, তাহা জানি না। ইহা অতি সুদৃশ্য ছিল বলিয়াই ইহার নাম সুবর্ণবিহার হইয়াছে। ইহা যে সুদৃশ্য ছিল, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণনগরের প্রাসাদে ও গঙ্গাবাসের হরিহর-মন্দিরে যে সকল কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন এবং কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের যে সুদৃশ্য তোরণ আছে, সে সমস্ত সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সমস্ত প্রস্তর এই সুবর্ণবিহারের ভগ্ন স্তূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,— সুবর্ণবিহার আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। বল্লালঢিবি আর সুবর্ণবিহার এ পার ও পার মাত্র। এই দুই স্থানই খুঁড়িয়া দেখা দরকার। বল্লাল ঢিবিতে কষ্টি বা কাল পাথরের অশোক রেলিংএর মত রেলিং আছে। তাহার কতক রেলিং নিকটবর্ত্তী দরগায় আনিয়া রাখিয়াছে। অল্প খুঁড়িলেই এই সকল পাথর পাওয়া যায়। বল্লালঢিবিটি যে কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে বল্লালের একটি সপ্তভূমিক প্রাসাদ অর্থাৎ সাততলা বাড়ী ছিল। হয় ত সেই সাততলা বাড়ীর ভগ্নাবশেষই এই বল্লালঢিবি।

অতঃপর সাহিত্য-পরিষদের আর একটি ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক দ্বিজ বংশীদাসের একখানি খণ্ডিত পুথি উপহার দিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই পুথি ছাপা হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা ছাপাইয়াছেন। এই পুথিতে একটি চমৎকার ঘটনার কথা বিবৃত আছে। মনসার কোপে চন্দ্রধরের ডিঙ্গাগুলি যখন ঝড়ে টলমল করিতেছিল, বড় বড় ঢেউ উঠিয়া সেগুলিকে প্রায় ডুবাইয়া দিতেছিল, তখন চন্দ্রধর ভয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে মাঝিরা কতকগুলি তৈলকুপী হইতে জলে তেল ঢালিয়া

দিল; যত দূর তেল ছড়াইয়া পড়িল, তত দূর আর ঢেউয়ের জোর রহিল না। এইরূপে নৌকা বাঁচিয়া গেল। এই কৌশলে এখনও অনেক সময়ে ঢেউয়ের মুখে জাহাজ বাঁচাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা এই দেশে আসিবার পূর্ব্বেও যে এই বিজ্ঞান-সম্মত কৌশলটি এ দেশের মাঝী-মাল্লারা জানিত, তাহা আমরা এই বংশীদাসের কাব্য হইতে জানিতে পারি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় মৃত সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৮৬ বৎসর বয়সে গত ৩০শে কার্ত্তিক কাশীলাভ হইয়াছে। ইঁনি ভাটপাড়ার পণ্ডিত-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। শেষে সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ ও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি এখনকার অনেকগুলি বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র হরকুমার শাস্ত্রী অল্প বয়সেই মারা যান। হাতোয়ার রাজা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কাশীবাস করান। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল পরিষৎ নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়েরও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইউনিভারসিটিতে এম্ এ পরীক্ষা সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় বৎসরে এম্ এ পাশ করেন এবং সারা জীবন গ্রন্থ লিখিয়া কাটাইয়াছেন। বহুকাল ইউনিভারসিটির নানাবিধ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। সাহিত্য-সংহিতার কিছু দিন সম্পাদক ছিলেন এবং ইউনিভারসিটির 'ফেলো' হইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

তাড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাদুরেরও মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। বৃন্দাবনে ছাপাখানা করিয়া তিনি স্বব্যয়ে বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন হিতৈষীর অভাব হইল।

এই সকল মৃত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাহিত্য-পরিষদের সমবেদনা জানান হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।